ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৮, জানুয়ারি, ২০২৫

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
Vol. 12th Issue 28th, January, 2025

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 12th Issue 28th, 20th January, 2025, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১২ তম বর্ষ ও ২৮ তম সংখ্যা
২০ জানুয়ারি, ২০২৫

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিস্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ, পি. কে. কলেজ, কাঁথি)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০ - ২৫০০ এর মধ্যে।

২. বাংলা হরফে লিখলে অভ্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।

৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল - ebongprantik@gmail.com

৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।

৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 8250595647
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

ভারতে ডিজিটাল লিঙ্গ বৈষম্য : সমস্যা ও সম্ভাবনা
চন্নম্মা মণ্ডল ১১
ধর্মঠাকুর ও সিঞবঁগা
গুহিরাম কিস্কু ১৮
কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত 'সুন্দরী মলুয়া' : বারোমাস্যা-রীতির প্রকৃতি ও অনুসৃজন
হুমায়ুন কবির ২৬
অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম : নিম্নবর্গের আখ্যান
মধুমিতা সেনগুপ্ত ৩৪
বাঙালি পর্যটকের দর্শনে ফরাসী উপনিবেশ বিরোধী ভিয়েতনামের
মুক্তিযুদ্ধ : ১৯২০-১৯৫৪
মলয় পাতলা ৪০
বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চায় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান
মোসাম্মৎ রোজিনা খাতুন ৪৮
কুকুর উপকথা 'লুব্ধক' - উপন্যাসের ভিন্নপাঠ
সেখ মোফাজ্জাল হোসেন ৫৬
ভূমি ও কুসুম : 'ব্রাত্য' মানুষের আখ্যান
সংহিতা মাল ৬৭
সম্পর্কের রসায়ন : ত্রিপুরার মহারাজা ও রবীন্দ্রনাথ
শিপ্রা দত্ত (ঘোষ) ৭৪
আধা-মিলিশিয়া : সুন্দরবনে নারীশক্তির উজ্জীবন,
তেভাগা আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস
শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম ৮১
ধর্ম ও নৈতিকতা
শুক্লা নাথ ৯৪
ক্ষমতা ও রাজনীতির আবর্তে তিনজন নারী : একটি সাধারণ পর্যালোচনা
সুরজিৎ মজুমদার ১০০
শঙ্খ ঘোষের কবিতা : পরিবেশ ভাবনার নিরিখে
সুরজিৎ প্রামাণিক ১০৭
রক্তকরবী : মুক্তির আকাশে যাত্রা
দেবাশিস ঘোষ ১১৩
কোম্পানির শাসন আমলে মালদা জেলায় কৃষক বিদ্রোহ (১৭৫৭-১৮৫৮ খ্রীঃ)
আব্দুল বাসির ১১৯
নারীমুক্তি অথবা আদর্শনারী নির্মাণ : উনিশ শতকে নারী প্রগতির স্বরূপ
সামিমা আক্তার ১২৫
ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি
সঞ্জয় বিশ্বাস ১৩১

সাম্প্রতিক বিশ্বব্যবস্থায় আদর্শ 'বডি ইমেজ' এর প্রতিফলন : একটি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ
সায়ন দত্ত
সহেলী মণ্ডল ১৪০
পশ্চিমবঙ্গের জীবন-জীবিকা শিউলীদের কথা : পূর্ব বর্ধমান জেলার
অঞ্চল বিশেষে সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা
রুদ্রনীল চোংদার ১৪৮
মানিক দত্তর চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য
রঞ্জনা ভট্টাচার্য ১৫৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (নির্বাচিত) ছোটগল্প : স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা
পুষ্পা রায় ১৬২
ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতশিল্পে প্রযুক্তির বিবর্তনে পাওয়ারলুম : প্রসঙ্গ জেলা বর্ধমান
পুলক বিশ্বাস ১৬৬
'ক্ষণিকা' কাব্যের 'এক গাঁয়ে' : 'ধুলা মাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি'
প্রীতম চক্রবর্ত্তী ১৭৩
উনিশ শতকের কিশোর সাহিত্যে উপদ্রুত কিশোরীর ক্ষমতায়ন :
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'
সঞ্চিতা চক্রবর্তী ১৮১
পুরাণের পরিসরে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনার রূপ : বুদ্ধদেব বসুর
'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'
মৌসুমী পাল ১৮৯
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাসের দলছুট নায়ক খগেনবাবু
মৌমিতা দে ১৯৭
হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' : এক নারীর জীবন আখ্যান
মনিকা বর্মন ২০৪
রবীন্দ্র-ভাবনায় বৌদ্ধ দর্শনের কয়েকটি দিক : একটি পর্যালোচনা
শেখ মোঃ মাকতুবুল ইসলাম ২১১
আয়ুর্বেদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আদিবাসীদের যোগদান
মধুমিতা জানা ২১৯
শ্রীহর্ষপ্রণীত রত্নাবলী নাটিকার অলঙ্কার অন্বেষণ
লিটন মিত্র
অনিন্দিতা দাশ ২২৪
কঙ্কাবতী : সংরূপের সন্ধানে
অরুণাভ মিত্র ২৩৩
গান্ধীজির মৌলিক সদ্‌গুনাবলী : একটি সমীক্ষা
বরুন কুমার ঘোষ ২৪০
ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতা : বিংশ শতাব্দীতে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর
গতিশীল নগরায়ণ
প্রভাত ঘোষ ২৪৫

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষ
সঞ্চিতা হাজরা ২৫৪
দেশভাগের তীব্র প্রতিচ্ছবি তুলসী লাহিড়ীর ‘বাংলার মাটি’
সফিকুল ইসলাম ২৫৯
লৌকিক ভাবনায় অভিজিৎ সেনের ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’ উপন্যাস
সৈকত মণ্ডল ২৬৬
মুসলমান শাসকদের বদান্যতায় ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃতি
প্রহেলিকা মন্ডল হাজরা ২৭২
বিশ শতকে গোবরডাঙার নাট্যচর্চা : একটি তথ্যভিত্তিক সমীক্ষা
অনিমেষ সরকার ২৭৮
বাংলার নাট্য আন্দোলনে নাট্যকার শম্ভু মিত্র
প্রিয়াঙ্কা পাল ২৮৪
দস্তয়েভস্কির উপন্যাস : আত্মমুখী নায়কের আত্ম-অতিক্রমণের আর্তি
মইজুদ্দিন মোল্লা ২৮৯
উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের কথ্যভাষার কবিতা ও তার
ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয় সন্ধান
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ২৯৬
নারীবাদী দৃষ্টিতে ন্যায় বিচার : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
জগন্নাথ জানা ৩০৬
সাঁওতালদের আদি নিবাস ও বাঁকুড়া জেলা : একটি আলোচনা
পরিতোষ মণ্ডল ৩১৩
বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন
ভাস্কর পাল ৩২০
ন্যায় মতে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ
সায়ন ভট্টাচার্য্য ৩২৮
ব্যবহারিক জীবনে পঞ্চশীল ও ব্রহ্মবিহারের গুরুত্ব
ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার ৩৩৪
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদের দৃষ্টিতে বাহ্যার্থবাদীদের মতামত খণ্ডন প্রক্রিয়া
সন্তু সামন্ত ৩৪১
Enhancing The Quality of Teacher Education Through
Various Initiatives As Recommended By NEP -2020
Sudipta Kumar Das ৩৪৮
Adding “Sex” to Sex Education : A discussion on Consent,
Desire and Positive Sexuality
Biswayan Bhandari ৩৫৩
An Overview of Dalit Theatre and Readers'
Response in the Light of Translation Studies
Debashis Biswas ৩৫৯

India-Bangladesh Relations : Strategic Engagement in Water, Connectivity and Boundary Dynamics (1999-2022)
Minakshi Sarkar ৩৬৫
Proper Names as Rigid Designators : Kripke's Semantic Revolution
Pranab Ghosh ৩৭৫
The Early Period of Printing and Social Culture of Bengal (India)
Saikat Jana ৩৮২
A Study on Content Knowledge of Geography Students at Secondary School Level in Purba Medinipur District
Tarak Nath Bhunia
Sheikh Manirul Islam ৩৮৮
Shakti in Indian Philosophy : A Study from Feminist Perspective
Bhaswati Basu ৩৯৫
Moral Values and Ethics as Depicted in Srimad Bhagavad Gita : An Analytical Study
Uday Sarkar ৪০২
Dropout Scenario in Upper Primary School Level : A Geographical Analysis on Baidyapur Gram Panchayet under Ranaghat- II C.D Block of Nadia District
Ujjal Roy ৪০৮
Cholera Outbreak and Prevention in colonial India : 1817 to 1947
Uttam Das
Supriti Mondal ৪১৭
India-Pakistan Relations : Background, Challenges and Current Situation
Parvin Khatun ৪২৪

সম্পাদকীয়

কোন বিষয়ের গুরুত্ব নির্ভর করে আপনার বিচার বিবেচনাকে কেন্দ্র করে। যেমন ভাবে দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন, অন্যরা কিছু সময়ের জন্য হলেও সেটাই দেখে। আপনার দেখানো বিষয় যদি অন্যকে মুগ্ধ করতে পারে তাহলে আপনি সফল। আপনার শানিত বুদ্ধি যদি অন্যকে বশ্যতা শিকারে বাধ্য করে, তাহলে অন্যদের থেকে শত হস্ত এগিয়ে থাকবেন। আপনার এগিয়ে থাকাতেই আপনার নামাঙ্কিত ফলক প্রতিষ্ঠিত হবে। কোন জিনিসকে কেমন ভাবে ব্যাখ্যা করে প্রতিষ্ঠা দেবেন সেটাই মূল বিবেচ্য হওয়া উচিত। উচিত অন্যদের মনের মধ্যে নতুন বীজ বপন করা। নতুনত্বের সন্ধানে একজন প্রাবন্ধিক নিজেকেও নতুন করে আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক বারের মত এবারেও ‘এবং প্রান্তিক’ সেই নতুন নতুনের সন্ধান দিয়ে চলেছে।

ভারতে ডিজিটাল লিঙ্গ বৈষম্য : সমস্যা ও সম্ভাবনা

চন্নম্মা মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রযুক্তি বর্তমান সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক জীবনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদিও ডিজিটালাইজেশনের অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা সব শ্রেণির মানুষ সমানভাবে ভোগ করতে পারে না; বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে আজও যাঁরা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গ-বৈষম্যজাত সমস্যার সম্মুখীন, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির এই অভাবনীয় উন্নতি এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। বর্তমান গবেষণাপত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় – সর্বসাধারণের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের হার, লিঙ্গ-বৈষম্যের ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের পার্থক্য এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা। এরই সঙ্গে এই গবেষণাপত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাগুলির একটি বাস্তবোচিত সমাধান-সূত্রও দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: ডিজিটালাইজেশন, তথ্য-প্রযুক্তির পরিকাঠামো, লিঙ্গ-বৈষম্য, প্রযুক্তিগত লিঙ্গ-বৈষম্য।

মূল আলোচনা:

আজকের ডিজিটাল যুগে আমাদের সমাজ, প্রযুক্তির ব্যবহারের দিক থেকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তথ্য-প্রযুক্তি বর্তমান যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষ করে ডিজিটাল যুগের পৃথিবীতে এটি আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবন-সহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের একটি অনিবার্য অংশ; তবে দুঃখের বিষয় – সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারে না এবং এখান থেকেই প্রযুক্তি-ব্যবহারের ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজনের সৃষ্টি হয়।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার-সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত বয়স, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর এই বৈষম্য গড়ে ওঠে। বর্তমান গবেষণাপত্রে এই প্রযুক্তিগত সামাজিক বৈষম্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করবার ক্ষেত্রে প্রধানত লিঙ্গ-বৈষম্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 'ডিজিটাল ডিভাইড' বা প্রযুক্তিগত বৈষম্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছে – এই বৈষম্য সমাজের দুই শ্রেণির ওপর নির্ভরশীল। এক শ্রেণি ইন্টারনেট পরিষেবা, অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা সহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করেন এবং অন্য এক শ্রেণি এগুলি ব্যবহার করেন না। সুতরাং এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তথ্য-প্রযুক্তিগত বৈষম্য বলতে, যাঁরা এর ব্যবহার করেন এবং যাঁরা করেন না – এই দুই শ্রেণিকে বোঝানো হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রযুক্তি-ব্যবহারে বৈষম্যের বিষয়টি আকস্মিক নয়। এই বৈষম্য বিশ্বব্যাপী সমাজের সর্বত্র নারীদের সমানভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলারা নিত্যনতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট

সমস্যার সম্মুখীন হন। এছাড়া প্রযুক্তির ব্যবহারের সময় সমাজের জনসাধারণের মধ্যে একটি মানসিকতা কাজ করে, তা হল – ‘এগুলি শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়’। এছাড়া সমাজে মেয়েদের মধ্যেও প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক বিধি-নিষেধের ভীতি কাজ করে।

ভারতবর্ষে প্রযুক্তিগত লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক সমস্যার প্রধান কারণ:

উপরোক্ত আলোচনায় নারী-পুরুষের মধ্যে যে প্রযুক্তি-ব্যবহারজনিত বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে তা ঠিক প্রযুক্তি-ব্যবহারের দুর্বোধ্যতার কারণে নয়। এর নেপথ্যে সুদূরপ্রসারী জটিল অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণও রয়েছে যা প্রাথমিকভাবে লিঙ্গ-বৈষম্যের মূল কারণের সঙ্গে যুক্ত। ডিজিটাল-প্রযুক্তির সুযোগসুবিধা ব্যবহারে মেয়েদের অক্ষমতার প্রধান কারণ - বৃহত্তর অর্থে সামাজিক কাঠামোগত তারতম্য। এই তারতম্য সমাজের অভ্যন্তরে গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে। সুতরাং ডিজিটাল জগৎ থেকে মহিলাদের বিচ্যুত করবার ক্ষেত্রেও এই বৈষম্যগুলিই দায়ী। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার থেকে মহিলাদের বঞ্চিত হওয়ার কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল। এই কারণগুলি প্রত্যেকটিই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এর মূল সমাজের গভীরে সুদূর প্রসারিত-

অর্থনৈতিক কারণ:

আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম উদাহরণ – স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ কেনার ক্ষমতা, আর্থিক দুর্বলতার কারণে সকলের থাকে না। একই কারণে সকলের পক্ষে সঠিকভাবে প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জন করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া সামাজিকভাবে অবহেলিত হওয়ার কারণে মেয়েদের পক্ষে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগসুবিধা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকার কারণে ব্যক্তি এবং পরিবারগুলির কাছে প্রযুক্তিগত সুযোগসুবিধার ব্যবহার সাধ্যের বাইরে অন্যদিকে স্বচ্ছল পরিবারগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি-ব্যবহারের হার অনেক বেশি। ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত শ্রমিক এবং শিক্ষানবিশরা যেমন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে পুরোপুরি যোগদান করতে পারে না তেমনই আবার প্রযুক্তি ব্যবহারকারী শ্রমিক এবং শিক্ষানবিশদের সঙ্গে জীবিকাকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতাতেও তাঁরা পিছিয়ে পড়েন।

বিশ্বস্তরে মহিলাদের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল – তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং এর সঙ্গে লিঙ্গ-বৈষম্য। বিশ্বের বহু দেশে মহিলারা আর্থিকভাবে প্রধানত তাঁদের স্বামী অথবা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যের ওপর নির্ভরশীল। ফলে অনেক সময় পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মাথাপিছু রোজগারের হার সমান থাকে না বা সেই রোজগারের ওপর মহিলাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিসংখ্যান অনুসারে ৬০ শতাংশ মহিলাই অবৈতনিকভাবে পরিবারে শ্রমদান করেন। প্রধানত এই কারণেই মহিলাদের মধ্যে একটি বড়ো অংশ যথাযথভাবে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হন।

অনেক সময় পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সর্বসাধারণের কাছে এখনও মোবাইল ফোনের নির্ধারিত মূল্য একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে নির্ধারিত মূল্য বলতে মোবাইল ফোন এবং তা ব্যবহারের জন্য আনুষঙ্গিক আর্থিক মূল্য – উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। প্রযুক্তিগত এই সুবিধা ব্যবহারের মূল্য, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি প্রভাবিত করে যেহেতু পুরুষদের তুলনায় তাঁদের রোজগারের হার অনেকটাই কম। এছাড়া অনেক সময় মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা পুরুষদের তুলনায় কম থাকে এবং পুরুষদের মতো রোজগারের পথও তাঁদের ক্ষেত্রে খুব একটা সহজ হয়ে ওঠে না। ফলে মোবাইল বা এই জাতীয় কোনও

কিছু ক্রয় করবার সময় পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ব্যয়ভারের প্রতি যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয় এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের তুলনামূলক কম দামি মোবাইল এবং চলনসই ইন্টারনেট পরিষেবাতেই খুশি থাকতে হয়।

সামাজিক বিধিনিষেধ

সামাজিক বিধিনিষেধ এবং লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক চিন্তাভাবনা বারংবার মহিলা এবং মেয়েদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করে ফলে তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষা এবং চাকরির সম্ভাবনা ক্রমশ সীমিত হয়ে আসে। সাধারণ ঘরে দেখা যায় যে, প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের (মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি) ওপর বাড়ির মহিলা বা মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অধিকার বেশি। যেমন: মোবাইল, ল্যাপটপ বা ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবক বাড়ির ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের অনেক বেশি শাসনে রাখেন।

ভৌগোলিক অবস্থান:

শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক কারণেই প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর পার্থক্য দেখা যায় অথবা অনেক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিষেবা নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের মধ্যে সীমিত হয়ে থেকে যায়। লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বৈষম্যের ওপর নির্ভর করেই নারী-পুরুষের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে। অন্যান্য এলাকার তুলনায় গ্রামের দিকে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার অনেক স্বল্প এবং সীমিত। এছাড়া, বেশিরভাগ গবেষণায় শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবস্থিত মহিলাদের ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। আবার যে দেশগুলিতে নারীশিক্ষা অনেক সহজ এবং সুলভ, সেখানে মহিলাদের ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহারের হার অনেকটাই বেশি।

উপরোক্ত তথ্যের সাহায্যে পরিকাঠামো, বৈদ্যুতিক পরিষেবা এবং নেটওয়ার্কের অপর্যাপ্ততাকেই বোঝানো হয়েছে। প্রযুক্তিগত যোগাযোগ সীমিত হওয়ার জন্য যে সব মহিলারা দরিদ্র এলাকায় এবং গ্রামাঞ্চলের দিকে বসবাস করেন, তাঁদের পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্টারনেট পরিষেবা ভোগ করা দুষ্কর। সর্বসাধারণের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবার ব্যবস্থা উপরোক্ত সমস্যার একটি সমাধান হতে পারে কিন্তু এই ধরণের পরিষেবার ব্যবস্থা এমন জায়গায় রয়েছে যে জায়গায় মহিলাদের জন্য যাওয়া সবসময় সম্ভব নয় বা সুরক্ষিত নয় অথবা যেখানে নারী-সুরক্ষার নামে সামাজিক দিক থেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে, মহিলাদের স্বাধীনভাবে যাতায়াত ব্যাহত করা হয়েছে। সমাজের অনেক স্তরে মেয়েদের নতুন সিমকার্ড নেওয়ার জন্য নিজের পরিচয়পত্র জমা করতে গিয়েও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

পরিবারের সদস্যদের তথাকথিত সুরক্ষা-বিধান:

পরিবারে কন্যাসন্তানের প্রতি অনেক সময় মা-বাবার অতিরিক্ত যত্নশীল এবং উদ্বিগ্ন মনোভাব কন্যা সন্তানদের মোবাইল ফোন বা অন্যান্য প্রযুক্তি পরিষেবা ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে অভিভাবকরা কন্যা-সন্তানকে প্রযুক্তিগত পরিষেবা ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে বলে থাকেন – 'মোবাইল ব্যবহার করা মেয়েদের পক্ষে সুবিধের নয়', 'এসব দেখা মানে সময় নষ্ট করা', 'এসব দেখলে চোখ খারাপ হয়ে যায়' ইত্যাদি।

প্রযুক্তি-ভীতি এবং সাইবার-সুরক্ষা:

প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবের ফলে সর্বসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অস্বস্তিতে পড়তে হয় ফলে স্বাভাবিকভাবেই একটি বৈষম্য তৈরি হয়। বর্তমান সময়ে

শিক্ষা, জীবিকা এবং মাসিক আয়ের পরিমাণ – ইত্যাদি কারণগুলি প্রায়শই সাধারণ মানুষের মধ্যে 'টেকনোফোবিয়া' বা 'প্রযুক্তি-ভীতির' তৈরি করে। সঠিক প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবে অনলাইন পরিষেবায় হয়রানি, সাইবার বুলিং এবং সাইবার স্টকিংয়ের মতো সাইবার অপরাধগুলি মেয়েদের কাছে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশেষে এসবের ভয় তাদের ক্রমশ ডিজিটাল লিঙ্গ-বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেয়। নারীদের সক্ষম, স্বনির্ভর করা এবং তাদের ক্ষমতাহীন করা – উভয় ক্ষেত্রেই ডিজিটাল প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার বা অপব্যবহার দায়ী। অনলাইন পরিষেবায় মহিলাদের হয়রান করা, তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা এবং তাঁদের প্রতি সহিংস আচরণ করা ডিজিটাল সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধা। ফলে অনেক দেশেই, মহিলারা অনলাইনে দুর্ব্যবহার, অযথা হয়রানি, ট্রোলিং থেকে শুরু করে স্টকিং এবং যৌন-নিগ্রহের মতো তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন।

একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মতো শিক্ষা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। অনেক দেশে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধা অনেকটাই কম, ফলে সেখানে মেয়েদের মধ্যে অশিক্ষার হার বেশি। এই সীমিত শিক্ষা থেকেই ক্রমে মেয়েদের মধ্যে ডিজিটাল দক্ষতার অভাব, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায় ফলে তাদের মধ্যে অনলাইন সুযোগসুবিধা ব্যবহার করবার ক্ষমতাও তুলনামুলকভাবে কম থাকে। আত্মবিশ্বাসের অভাবের ফলে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে মোবাইলের মতো প্রযুক্তিগত পরিষেবা ব্যবহারের হার কম। যদিও-বা ব্যবহার করেন, তবু তাঁদের ব্যবহার নির্দিষ্ট কিছু পরিষেবা এবং মোবাইল অ্যাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। National Family Health Survey (2019–21) অনুসারে, ভারতের গ্রামাঞ্চলের দিকে ৬০ শতাংশ এবং গ্রাম-শহর মিলে ৫৯ শতাংশ মহিলা মাধ্যমিক পর্যন্তও পড়াশুনো শেষ করতে পারেননি। এই অশিক্ষার ফলেই তাঁরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত।

ডিজিটাল পরিষেবাগুলি ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি এটি বিদ্যমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও জোরদার করে, একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। ফলে তথ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, সরকারী পরিষেবা, স্বাস্থ্যপরিষেবা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি ভোগ করবার ক্ষেত্রে জনসাধারণের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

এটি সামাজিক গতিশীলতাকে সীমিত করতে পারে, বৈষম্যকে আরও দুর্বিষহ করে তুলতে পারে এবং সমাজের ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সক্ষম শ্রেণির সঙ্গে প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যে ব্যবধানকে আরও প্রসারিত করে। তথ্য ও প্রযুক্তি সমানভাবে ব্যবহার করতে না পারলে, প্রতিনিয়ত ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সুসজ্জিত হয়ে-ওঠা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলারা সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এই একটি ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতাগুলি তাঁদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। ফলে তাঁদের নিজেদের প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি থেকে উত্তরণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার মানসিকতাও প্রভাবিত হয়। প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের সমান ব্যবহার করতে না পারায় মহিলারা আরও উন্নততর ডিজিটাল সমাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

প্রযুক্তিগত লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করবার প্রয়োজনীয়তা:
প্রযুক্তিগত বৈষম্যের কুপ্রভাব শুধুমাত্র মহিলাদেরই প্রভাবিত করে না বরং সে যে সমাজ এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত তাকেও সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তথ্য ও প্রযুক্তির সমান ব্যবহার সম্ভব হলে, বর্তমান পুরুষ-শাসিত বাজারব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তিত হবে এবং মহিলারাও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারবে। তথ্য-প্রযুক্তি মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রথাগত এবং অপ্রথাগত শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাকে অনেক বেশি উন্মুক্ত করে দেবে। তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা মহিলাদের আজীবন শিক্ষাগ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ফলে যে সব মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয়নি, তাঁদের শিক্ষা লাভের জন্য তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

প্রতিনিয়ত ডিজিটাল জগৎ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যাঙ্কিং, দক্ষতাভিত্তিক কাজকর্ম এবং পরিবহনব্যবস্থায় প্রযুক্তি-ভিত্তিক লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করতে বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য অত্যন্ত সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভারতে লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করবার লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিভিত্তিক স্বাক্ষরতা একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ভারত G-20-র সভাপতিত্ব গ্রহণের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন' বা 'Women-led development'-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করবার কার্যক্রমকে আরও সক্রিয় করবার জন্য Women-20 নামে G-20-এর মঞ্চ তৈরি করা হয় এবং এই বছর প্রধান যে পাঁচটি বিষয়কে মূল ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য G-20-র প্রধান বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্বাচন করা হয়, তার মধ্যে একটি হল 'প্রযুক্তিগত লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণ'।

প্রযুক্তি বর্তমান সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে এবং সমাজের প্রায় প্রত্যেকটি স্তরেই এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – মানব-সম্পদের ক্ষমতায়নে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলারা বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করতে পারেন, তাঁদের চিন্তাভাবনা বাস্তবায়িত করতে, নিজেদের অধিকার সুরক্ষিত করতে এবং সমাজের সর্বস্তরে যোগদান করতে এর ব্যবহার করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের অনলাইন পরিষেবার কুপ্রভাবগুলি থেকে দূরে থাকবার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে হবে যাতে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে তাঁদের কোনও রকম হয়রানির সম্মুখীন বা সন্ত্রস্ত না হতে হয়।

সর্বোপরি নারীদের সুরক্ষা, প্রতিকার বা সমান অংশগ্রহণের প্রধান লক্ষ্যই হল – তাঁদের ক্ষমতায়ন। এক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি সত্যিই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে মহিলারা জীবন-রক্ষাকারী তথ্য, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সরকারী পরিষেবা, চাকরি-সংক্রান্ত খোঁজখবর, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে পারেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি যেহেতু লিঙ্গ-বৈষম্য নির্মূল করবার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম, তাই আরও বেশি করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ডিজিটাল প্রযুক্তিগত লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকটি মহিলা তাঁর সাধারণ মানবাধিকারগুলি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে পারেন।

আজকের দিনে প্রথাগত শিক্ষার মতোই ডিজিটাল প্রযুক্তিগত শিক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৯০ শতাংশ চাকরিই ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল এবং প্রতি নিয়তই তাঁরা নিত্যনতুন প্রযুক্তি-সুকৌশলী মেধা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সরকার যদি তথ্য-প্রযুক্তির শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে মেয়েদের ডিজিটাল দক্ষতায় সুশিক্ষিত করেন, তাহলে তাঁদের জীবিকানির্বাহের যে কাজকর্মগুলি ডিজিটাল প্রযুক্তির

ওপর নির্ভরশীল সে কাজগুলি করবার মাধ্যমে মেয়েরা আর্থিকভাবে আরও বেশি স্বচ্ছল হয়ে উঠবেন। মেয়েদের সামাজিকভাবে সক্রিয় এবং সরব হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। যেমন আজকের বিভিন্ন সমাজ-মাধ্যমগুলি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের ওপর সরব হওয়ার এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলবার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষের কাছে নিজের বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগসুবিধা উপভোগ করবার ব্যয়ভার বহন করবার জন্য শুধুমাত্র এই বিষয়েই রাজ্য এবং কেন্দ্রস্তরে সরকারীভাবে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ পরিকল্পনা এবং তহবিল গঠন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বিষয়বস্তু সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার স্বার্থে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্টারনেট পরিষেবার খরচ কমানোর জন্য আর্থিক ভর্তুকি, সহায়তা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থার আর একটি বিকল্প হল কমিউনিটি সেন্টার, কলেজ এবং স্কুলগুলিতে উন্নত এবং সহজে ডিজিটাল পরিষেবা ভোগ করবার সুবিধা প্রদান করা।

মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত লিঙ্গ-বৈষম্যের প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল–পরিবারের কঠোর বিধিনিষেধ। সুতরাং অনলাইন বা অফলাইনে পরিবারের সদস্য এবং অভিভাবকদের কাউন্সেলিং করে তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন করবার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে মেয়েদের মুক্ত করা সম্ভব। এর ফলে পরিবারেও ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য দূর করা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে শেখাতে হবে কীভাবে অনলাইন কাজকর্মের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমানো যেতে পারে এবং সুরক্ষিতভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা ভোগ করা যেতে পারে। এছাড়া কীভাবে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পরিবারের অসামঞ্জস্যপূর্ণ গৃহস্থলীর কাজ ভাগ করা যায় সে বিষয়ে অভিভাবকদের পরামর্শ দিতে হবে এবং পরিবারের মেয়েদের পর্যাপ্ত সময়ের জন্য স্বাধীনভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম করবার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে নিত্যনতুন অনুষ্ঠান, বিষয়বস্তু, অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবাগুলি অনলাইন শিক্ষার জন্য পরিবেশন করবার পাশাপাশি চাকরি, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, সংবাদ এমনকি বিনোদনের তথ্যাবলীও জানবার স্বাধীন সুযোগ দিতে হবে। এরই সঙ্গে এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে সাইবার বুলিং এবং অপরাধমুলক গতিবিধিকে প্রশাসনিক এবং বিচার ব্যবস্থার আওতার মধ্যে নিয়ে এসে, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সাইবার বুলিং এবং অনলাইনে বিভিন্ন অপরাধমূলক গতিবিধি থেকে সুরক্ষিত থাকবার জন্য মেয়েদের অন্তত প্রাথমিকভাবে সাইবার নিরাপত্তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এই ধরনের পদক্ষেপ তাদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি করবে এবং তাঁরা নিজেরাই অনলাইন এবং অফলাইন পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবেন।

ডিজিটাল যুগে একটি সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য প্রযুক্তিগত সাম্যের প্রয়োজন। সর্বস্তরের মানুষের কাছে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়া, সুযোগসুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের মোকাবিলা করা, ডিজিটাল স্বাক্ষরতার প্রচার করা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেকের জন্য প্রযুক্তির সুযোগসুবিধা সমানভাবে উন্মুক্ত করতে আমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তিগত বৈষম্যকে দূর করতে হবে। এটি অর্জনের জন্য একটি আন্তঃবিভাগীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন যার মাধ্যমে উন্নত পরিকাঠামো, সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবা উপভোগ করবার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বর্তমান

ডিজিটাল যুগে সকলের ক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের সমান ক্ষমতায়ন সম্ভব হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. Saha, P., Prusty, A. K., & Nanda, C., (Jul- Aug, 2024). Extension strategies for bridging gender digital divide. Journal of Applied Biology & Biotechnology. 12(4), 76-80
https://jabonline.in/admin/php/uploads/1165_pdf.pdf
2. Hilbert, M., (2011). Digital gender divide or technologically empowered women in developing countries? A typical case of lies, damned lies, and statistics.
https://martinhilbert.net/DigitalGenderDivide.pdf
3. Bimber, B. (2000). Measuring the gender gap on the internet. Social Science Quarterly, 81(3), 868–76.
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=2a9cc6656dac376cf4a413bf29f4549cdd80b868
4. Saha, P., Prusty, A. K., & Nanda, C. (Jul-Aug, 2024). Extension strategies for bridging gender digital divide. Journal of Applied Biology & Biotechnology, 12(4), 76-80,
https://jabonline.in/admin/php/uploads/1165_pdf.pdf
5. POLICY BRIEF, BRIDGING THE DIGITAL DIVIDE for girls in India. Centre for Catalyzing Change
https://www.c3india.org/uploads/news/Bridging_the_Digital_Divide-Policy_Brief_2021_(website)1.pdf
6. Bala, S., (2017). ICT Imperatives to Bridge the Digital Divide: Gender Perspective. NLI Research Studies Series No. 129/2017
https://vvgnli.gov.in/sites/default/files/NLI%20Research%20Studies%20Series%20No.%20129-2017.pdf
7. GENDER EQUALITY IN DIGITALIZATION: Key issues for programming (2021) United Nations Development Programme https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kg/gender_equality_in_digitalization.pdf
8. Nath, M., & Barah, P., (2017). Digital India and Women: Bridging the Digital Gender Divide
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/DigitalIndiaandwomen%20(1).pdf
9. Galpaya, H., & Zainudeen, A., (2022). Gender and Digital Access Gaps and Barriers in Asia: But What About After Access?
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.2_Helani%20Galpaya.pdf.

ধর্মঠাকুর ও সিঞবঁগা

গুহিরাম কিস্কু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ— বেশকিছু কবি 'ধর্মমঠকুর'কে নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। সমসাময়িক সময়ে সাঁওতাল সমাজে 'সিঞবঁগা' নামে এক দেবতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন; যদিও সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন যে এই দেবতা সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান দেবতা এবং পৃথিবী সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই সাঁওতালরা তাঁকে পূজা করে আসছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ধর্ম' শব্দটিকে অস্ট্রিক শব্দ 'দড়ম'-এর সংস্কৃত রূপ বলে মনে করেন। 'দড়ম' শব্দের অর্থ এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকা। প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসী-সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন যে, 'সিঞবঁগা' (সূর্যদেবতা) এক জায়গায় স্থির। প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।

শুরুতে সাঁওতালদের একটাই দেবতা ছিল, তিনি 'ঠাকুর' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সঠিক এবং সৎ-পথ দেখান বলে তিনি 'ধর্মঠাকুর' নামে পরিচিত। ধর্মঠাকুরের গাজনের শেষ অনুষ্ঠানের ছড়ায় 'হংস-হংসি'-এর উল্লেখ আছে। সাঁওতাল পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বেও 'হাঁস-হাঁসলি' নামে দুটি পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়; এই পাখি দুটির প্রাণদান করেছিলেন 'সিঞবঁগা'। 'ধর্ম ঠাকুর' যেমন মদের ভক্ত ছিলেন, তেমনি 'সিঞবঁগা'-এর উপাসনায় মদ অনিবার্য নৈবেদ্যরূপে নিবেদিত হয়। 'ধর্ম ঠাকুর' পূজায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, অন্যদিকে সাঁওতালদের 'সিঞবঁগা' পূজা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না।

সূচকশব্দ: সিঞবঁগা, কৌমধারার দেবতা, ধর্মঠাকুরের মূর্তি, সূর্যরূপে প্রকাশ, বিশ্বসৃষ্টির কাহিনি, হংস-হংসির উল্লেখ, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার।

মূল আলোচনা:

ধর্মঠাকুর সম্পর্কে বিভিন্ন মত থাকলেও অনেকেই একমত যে, ইনি অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের অন্ত্যজ মানুষ দ্বারা পূজিত হতেন। পরবর্তীতে ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন বিবর্তিত রূপ, বিভিন্ন পূজা পদ্ধতি এবং তাঁর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। উৎস যাইহোক না কেন, ধর্মঠাকুরের সাথে সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান দেবতা 'সিঞবঁগা'র মিল অনেকাংশে খুঁজে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত অমরকোষ অভিধান অনুযায়ী 'ধর্মরাজ' হলেন বুদ্ধদেবের আরেক নাম। জাতকের গল্পে বুদ্ধদেবকে ধর্মরাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্মের আরেক নাম নিরঞ্জন - পরম সত্য। সাঁওতালি 'ধরম' শব্দের মূল কথা হল 'সারি' অর্থাৎ সত্য। ধর্মঠাকুরের সাধারণ নাম ধর্মরাজ অথবা ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের পূজা শুধু রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না। যুগে যুগে কালে কালে ধর্মঠাকুরের বহু রূপান্তর ঘটেছে; তবে এই দেবতা অনার্য কল্পনাপ্রসূত এবং কালের অগ্রগতির সাথে সাথে ধর্মঠাকুরের মধ্যে নানা ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে.। পণ্ডিতেরা মনে করেন ইনি প্রাক-আর্য কৌমধারার দেবতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্মঠাকুর হচ্ছেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা; ড.

আশুতোষ ভট্টাচার্য আদিবাসী-সাঁওতালদের পূজিত সূর্য দেবতা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সাঁওতাল পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু'র একটি কবিতায় আছে -

> "ধরম দ সেরমারে মেনায় আজ্ দ বায় ঞেলঃ
> সিঞ বঁগাতায় আজাঃ পারসাল, হানি ঞেলে পে।"[১]

অর্থাৎ ধর্ম আকাশে আছে, তাকে দেখা যায় না। সূর্য রূপে তার প্রকাশ, ঐ দেখা যায়।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ধর্ম' শব্দকে প্রাচীন কৌমবাচক অস্ট্রিক 'দড়ম' শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ বলে মনে করেন। 'দড়ম' শব্দের অর্থ এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকা। প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসী-সাঁওতালদের বিশ্বাস 'সিঞ চাঁদো' (সূর্য দেবতা) এক জায়গায় স্থির আছেন; প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময় বিভিন্নরূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই একসময় তিনি মারাংবুরু অর্থাৎ বৃহৎ পাহাড়ের রূপও ধারণ করেছিলেন। অনেকেই প্রাক-আর্য বহির্ভারতীয় প্রাচীন পারসিক ও কাশ্মীরি প্রভৃতি প্রাচীন মানব গোষ্ঠীর বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের তুলনা করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীতে নানা ধর্মের সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর যে মিশ্র দেবতায় পরিণত হয়েছেন, তার সবথেকে বড় প্রমাণ তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিত হন। কোথাও বাঁকুড়া রায়, কোথাও জগৎ রায়, কাঁকড়া বিছে, মোহন রায় ইত্যাদি। তবে রাঢ় অঞ্চলের নিম্নবর্ণের মানুষদের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ধর্মঠাকুর জাগ্রত দেবতা; ভক্তিভরে পূজা করলে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা, বিভিন্ন রোগ-ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়; কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়। সমাজ-সংসারে কোনো অশুভ শক্তি প্রবেশ করতে পারে না এবং কামনা পূর্ণ হলে ধর্মঠাকুরকে কখনো ছাগল বা হাঁস, মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। এপ্রসঙ্গে সাঁওতালদের 'সিঞবঁগা'র কথা মনে পড়ে; বলিপ্রথা সাঁওতাল সমাজে এখনো বজায় আছে। শুধু 'সিঞবঁগা' বা 'মারাংবুরু' নয়, পাশাপাশি বিভিন্ন দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে পশু-পাখি বলি দেওয়ার প্রথা এখনো সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত।

সাঁওতাল বিষয়ক বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আদিতে সাঁওতালদের একমাত্র দেবতা - তিনি 'ঠাকুর' নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন শক্তিতে তিনি বিভক্ত হয়েছেন। অর্বাচীন কিছু কিছু কাব্য কবিতাতেও তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট। বর্তমানে সাঁওতাল সমাজে যে সমস্ত দেব-দেবীদের স্মরণ করা হয় বা পূজা করা হয়, তাতে 'ঠাকুরে'র নাম সচরাচর উচ্চারিত হয় না। সাঁওতালদের প্রধান দেব-দেবীদের মধ্যে অন্যতম হলেন ধর্ম, মারাংবুরু, জাহের এরা, মড়ে ক তুরুই ক প্রভৃতি। 'ঠাকুর' ধর্মপথ অর্থাৎ সঠিক পথ দেখান বলে তিনি 'ধরম ঠাকুর' বা 'ধর্ম ঠাকুর' নামে পরিচিত। তিনি তাঁর রূপ সূর্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন বলে তিনি 'সিঞ চাঁদো' অর্থাৎ সূর্য দেবতা; তিনি মর্ত্যভূমিতে মানুষরূপী 'লিটা গডেৎ' নামে আবির্ভূত হয়ে জগৎ সৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছেন; তিনিই একসময় বেপরোয়া মানুষদের জব্দ করার জন্য 'মারাংবুরু' অর্থাৎ বৃহৎ পাহাড় রূপে পথ আটকেছিলেন। তিনিই আবার 'জাহের আয়ো' রূপে মাতৃস্নেহ দান করেছেন -

> "মারাংবুরু কাতে মিৎ দ এতমতেম অঙ এন
> জাহি রাঁগি কাতে মিৎ দ কঞে তেম অঙ এন।"[২]

অর্থাৎ 'মারাংবুরু' (বৃহৎ পাহাড়) রূপে উত্তরদিক থেকে প্রকাশ, 'জাহি রাঁগি' রূপে দক্ষিণদিক থেকে প্রকাশ। গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে -

> "পিলচু তিকিন আমসেদ্ কিন কয়ঃ রাকাব কেৎ
> জুজুলাঙ গে গনড়হেদ্ গে আমকিন ঞেলকেৎ মে।

বাবা লেকা আয়োলেকা এতম কঞেতে
হন ক লেকা মড়ে ক আর তুরুই ক সাঁও তে।
...
ইঞাঃ রূপ দ বানুঃ সুমীদ অঙ দাড়ে মেনাঃ
...
ইঞাঃ দাড়ে দ নংকাঞ অঙ হাটিঞ আকাৎ
মিৎ দ বাবা লেকা আর মিৎ দ আয়ো লেকা
বাবা পাহটা ঞুতুম দ সিঞ বুরু বারাং কান
আয়ো পাহটা ঞুতুম দ তিঞ জাহিরাঁগি কান।"[৩]

অর্থাৎ আদিম মানব-মানবী 'পিলচু'রা তোমার দিকে যখন তাকিয়ে উঠল, জলন্ত গোলাকার পিণ্ডের মত তোমাকে দেখল; তোমার দুপাশে ঝলসে উঠেছিল পিতা-মাতার মত রূপ; মানুষরূপী 'মড়ে ক তুরুই ক' নামক দেবতাও তোমার পাশে ছিল। ... আমার নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই কেবল অদৃশ্য ক্ষমতা আছে। ... আমার শক্তিকে এভাবে ভাগ করলাম - এক শক্তি পিতা রূপে আরেক শক্তি মাতা রূপে; পিতা রূপে 'সিঞ' অর্থাৎ 'সিঞ চাঁদো' (সূর্য) এবং 'বুরু' অর্থাৎ 'মারাংবুরু' (বৃহৎ পাহাড়) রূপে প্রকাশ। মাতা রূপে আমি 'জাহিরাঁগি' নামে প্রকাশিত। সাধু রামচাঁদ মুরমু'র 'লিটা গডেৎ' গ্রন্থে পাই -

"সারি সুলুক চট উসুলরে মেনাঃ স্বরগ পুরী।
গোল গোলিমা ঞুতুমানা অনা বোঠেল পুরী।।
নডে মেনায় আবন রিনিঃচ জিওয়ি এমঃ ঠাকুর।
সিঁগে ঞিদা ওপেল চাঁদো জাওগে অঁড়ে বিহুর।।"[৪]

আকাশের উপরে আছে স্বর্গ নামে এক শান্তিপ্রিয় স্থান। দেব-দেবীদের গোল-টেবিল বৈঠক বসে ঐ শান্ত 'বোঠেল পুরী'তে। এখানেই থাকেন আমাদের জীবনদাতা 'ঠাকুর'। দিন-রাত বসে থাকেন, চাঁদ তাঁকে ঘিরে আছে।

'সিঞবঙ্গা' আদিবাসী-সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান দেবতা। সাঁওতাল পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, জগতের জীবজন্তু থেকে শুরু করে মানুষও তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট। সাঁওতালদের কাছে সে 'ঠাকুর' নামে পরিচিত। সমুদ্র সংলগ্ন অরণ্য পরিবেষ্টিত স্থানে ঠাকুরের কৃপায় সুরম্য বসতি গড়ে উঠেছিল একসময়। ধীরেধীরে জনবসতি বাড়তে থাকে এবং সাথে সাথে নিরাপত্তাহীনতাও বাড়তে থাকে। তারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থান পরিবর্তন করেছে বারংবার - খোজ কামান, হারাতা বুরু দাঁদের, সাসাং বেডা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করার পর জারপি দিশমে এসে তারা উপস্থিত হয়। এখানে কিছুদিন থাকার পর অনিবার্য কারণে যখন অন্যত্র যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন পথ হারিয়ে ফেলে তারা। এক বৃহৎ পাহাড় তাদের সামনের পথকে আবেষ্টন করে রেখেছিল; এদিক-ওদিক চেষ্টা করেও কোনমতেই যখন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন তাদের মনের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হয়, তাদের ধারণা এই পাহাড়ের দেবতাই বোধহয় পথ আটকে রেখেছেন। মনে হয়েছিল বৃহৎ পাহাড়রূপী 'সিঞবঁগা' অর্থাৎ ধর্মঠাকুরই পথ আটকেছেন। তাই তাঁকে তুষ্ট করার জন্য আরাধনা শুরু করল; মারাংবুরু অর্থাৎ বৃহৎ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে তারা যখন তাদের অন্তরের কথা নিষ্ঠা সহকারে জানায়; কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড় ভেদ করে দেখা যায় আলোর রেখা, আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হতে থাকে সেই আলো এবং অবশেষে সূর্যরূপে স্পষ্ট হয়। সূর্যালোকে তারা পথ খুঁজে

পায়। তারা পাহাড় ও সূর্যকে দেবতা রূপে বিশ্বাস করতে শুরু করে। কারণ এই অলৌকিক ছলনা দেবতা ছাড়া কারো হতে পারে না। আদিবাসী-সাঁওতালদের কাছে ঐ বৃহৎ পাহাড় 'মারাংবুরু' এবং সূর্য 'সিঞবঁগা' হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ধর্মঠাকুরের গাজনের শেষ অনুষ্ঠানের ছড়ায় হংস-হংসির উল্লেখ পাওয়া যায় - 'ভালো গো ডোমের ঝি সরোবর রাখ/ সুহংস চরিয়া।' এপ্রসঙ্গে সাঁওতাল পুরাণের 'হাঁস-হাঁসলি' নামক দুটি পাখির কথা মনে পড়ে। ধর্মমঙ্গলের বিশ্বসৃষ্টির কাহিনি অনুযায়ী সৃষ্টির পূর্বে শুধু ছিলেন আদি গোঁসাই ধর্মঠাকুর, অব্যক্ত নিরাকার নিরঞ্জন। অতএব শূন্যরূপে এবং 'অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুন্ধুকার'। এই শুন্য মূর্তি থেকে প্রথমে দুটি ভাগে ভাগ হল - অনিল অর্থাৎ পবন এবং নীল অর্থাৎ মন। সাঁওতাল পুরানে ঠাকুর অর্থাৎ 'সিঞবঙ্গা'ও তার কাজের সুবিধার জন্য নিজের শক্তিকে কয়েকটি ভাবে ভাগ করেছেন। সাধু রামচাঁদের 'লিটাগডেৎ' কাব্যে পাই -

"লাগাও কেদায় উনরে উনি অনা পেয়া দাড়ে।
আডি গাহির বিচৗরকাতে আকিল অড়াঃ ফোড়ে।।"[৫]

সেই তিন শক্তিকে তিনি গভীর বিচার-বিশ্লেষণ এবং সুক্ষ্ম বোধবুদ্ধির উপর ভিত্তি করে কাজে লাগালেন। এই তিনশক্তি হল - মারাংবুরু বা লিটা, মড়ে ক তুরুই ক এবং জাহের এরা। এই তিন শক্তির মধ্যে লিটা গডেৎ-এর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি সকলের থেকে আলাদা। সবাই তাকে প্রশংসা করে এবং ঠাকুর লিটাকে সাথে নিয়ে সৃষ্টির কাজে ধাপে ধাপে এগিয়েছিলেন।

ধর্মঠাকুর যে মদের ভক্ত ছিলেন এটা বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না। ধর্মঠাকুরকে অবজ্ঞা করার ফলে মার্কণ্ডেয়র যখন কুষ্ঠ রোগ হয়, তখন এই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার পত্নী ধর্মঠাকুরের পূজা মদ দিয়ে করেছিল। 'সিঞবঁগা'র পূজাতেও মদ বা হাঁড়িয়া অবধারিত। শূন্যপুরাণে ধর্মমঙ্গলের আদি পুরোহিত পণ্ডিত যে রামাই-এর নাম আমরা পাচ্ছি, এখনো সাঁওতাল সমাজে শিশুদের নামকরণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও এই নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবদেবীর সাথে ধর্মঠাকুরের নাম উচ্চারিত হলেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মত ধর্মঠাকুর কোনো সংঘর্ষে জড়িত হননি। তাঁর আচরণের মধ্যে সাঁওতালের সরলতা লক্ষ করা যায়। ধর্মপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি সংস্কৃত পুরানে নেই। বরং সাঁওতাল পুরাণের বিশ্বসৃষ্টির কাহিনির সাথে অনেকটাই মিল পাওয়া যায়। সাঁওতাল পুরাণে পাই এই জগৎ আদিতে জলময় ছিল। জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সৃষ্টিকর্তা 'ঠাকুর' জলচর প্রাণী সৃষ্টি করার পর দুটি পাখিকে তৈরি করেন; এবং ফুঁ দিয়ে তাদের প্রাণদান করেছিলেন। এই পাখি 'হাঁস-হাঁসলি' নামে পরিচিত। তাদের ডিম থেকে দুটি মানব-মানবীর জন্ম হয়। শূন্যপুরাণের বিশ্বসৃষ্টির কাহিনিতে আমরা পাই ধর্মঠাকুর জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর হাই থেকে উলুক পাখির জন্ম।

ধর্মমঙ্গলের কোনোকোনো কবি তাঁদের কাব্যের নাম 'বারমতি' নামে উল্লেখ করেছেন। মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যের অপর নাম 'বারমতি'। ঘনরামের কাব্যে পাই 'বার্মতী'। স্বপ্নাদেশ মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানিকরামকে ধর্ম স্বপ্নে বলেছিলেন -

"বারদিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি
বিলম্ব করহ যদি হবেক বিগতি।"[৬]

এই 'বার' প্রসঙ্গ সাঁওতালদের পুরানেও পাওয়া যায়। বার বা দ্বাদশ সংখ্যাটি সাধারণত সাঁওতাল সমাজে শুভ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্মপূজার ক্ষেত্রেও দ্বাদশ আদিত্যের সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের সম্পর্ক আছে। ধর্মঠাকুরের সেবার জন্য ১২ জন ভক্তা বা সেবাব্রতীর প্রয়োজন। ধর্মঠাকুরের গান

১২দিনে ১২টি পালায় শেষ হয়। সাঁওতাল পুরাণ অনুযায়ী ‘পিলচু হাড়াম পিলচু বুঢ়ি’ (সাঁওতালদের আদি পিতামাতা) তাদের সন্তানদেরকে বারোটি কুল বা বংশে ভাগ করেছিল - হাঁসদা, মুরমু, কিস্কু, হেম্ব্রম, মান্ডী, সরেন, টুডু, বাস্কে, বেসরা, পাঁউরিয়া, চঁড়ে এবং বেদেয়া। ‘সিঞবঁগা’ তথা সমগ্র দেবতাকুলকে তুষ্ট করার জন্য সাঁওতাল সমাজে যাঁদের ভূমিকা সর্বাধিক, তাঁরা হলেন - ১) নায়কে ২) নায়কে এরা, ৩) মাঝি ৪) জগ-মাঝি, ৫) পারানিক, ৬) কুডৗম নায়কে ৭) গড়েৎ। এই সাতজন ছাড়াও ‘মড়ে হড়’ অর্থাৎ গ্রামের পাঁচজনকে সাথে থাকতে হয়। অবশ্য এই ‘মড়ে হড়’ পাঁচজন অর্থে গ্রামবাসীকে বোঝানো হয়। সাঁওতালরা ধর্মপথ অর্থাৎ ধর্ম ঠাকুরের আদর্শের সন্ধান পেতে ১২ বছর সময় লেগেছিল।[৭] মানিকরামের কাব্যে বিবাহ বর্ণনায় পাওয়া যায় নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। সাঁওতালদের বিবাহ-রীতিতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু বিবাহ ক্ষেত্রে নয়, সাঁওতালদের যেকোনো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নাচ-গান সহকারে উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে সাঁওতাল পাড়া। ধর্মঠাকুরের পূজা অর্চনার ক্ষেত্রেও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল একথা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।

> “I have to note one very special thing about Dharma : his great annual festival is everywhere always accompanied by ritual dances, and sometimes by mimicry and drama : without these dances by his worshippers (who usually faking up a vow and observe strictly some regulations in living for a month), this annual festival (gājan, from garjona, as it is called) cannot be held. These dances are accompanied by songs, and are performed by troups of devotees. Now, dance as a fundamental religious ritual is certainly not Aryan; it is neither Buddhistic nor Brahmanical. It may be Dravidian, it may also be Tibeto-Chinese; but it is emphatically Austric.”[৮]

ধর্মমঙ্গলের কাহিনি অনুযায়ী জানা যায় লাউসেনের জন্মের সাথে ‘অভীর পাখর’ নামক সূর্যের ঘোড়া জন্মগ্রহণ করেছিল লাউসেনেকে সাহায্য করার জন্য। লাউসেন ধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য এসেছে মর্ত্যভূমিতে। এই কাহিনি সাঁওতাল পুরাণের সাথে মিল লক্ষ করা যায় । 'সিঞ সাদম' (শ্বেত ঘোড়া)-এ আরোহণ করে 'সিঞবঁগা' স্বর্গ থেকে মর্তে যাতায়াত করেন। সাঁওতালরা ‘জাহের গাঢ়’-এ (দেবদেবীর আরাধনা স্থল) যখন পূজা করে, বছরের শুরুতে সেখানে মাটির ঘোড়া রাখা হয়। কোনকোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরকে মাটির ঘোড়া উপহার দেওয়ারও একটি বিশিষ্ট রীতি প্রচলিত আছে। সূর্যদেবও বিশেষ বাহন 'অভীর পাখর' নামক ঘোড়ার অধিকারী। সাঁওতালদের পূজারীতিতে দেখা যায় প্রথমে গোবরজল দিয়ে থালার মত গোলাকার চিত্র আঁকা হয়; তাতে চালের গুঁড়ি দিয়ে গোলাকার চিত্রকে আরও স্পষ্ট করা হয় এবং সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে সূর্যের প্রতীককে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই প্রতিকৃতি ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মবিষয়ক একটি ধ্যান মন্ত্র আছে -

> “মন্ডলং বর্ত্তলাকারং শূন্যদেহং মহাবলম।
> একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম।।”[৯]

তাই ধর্ম পূজাকে আদিম সূর্য পূজা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'শূন্যপুরাণ'এ পাওয়া যায় ধর্মের বাহন উলুক, তাঁর ভার বহন করতে না পেরে হাঁস সৃষ্টি করেছিলেন ধর্মঠাকুর। সাঁওতাল পুরাণ অনুযায়ী ঠাকুর হাস-হাঁসলি নামে দুটি পাখির সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের নিরাপদ আশ্রয় নির্মানের জন্য কচ্ছপকে জলের উপর ভাসিয়ে দেন এবং তার উপর মাটি ফেলে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্মঠাকুরের সাথে জলদেবতা বরুণ-এর সাদৃশ্য আছে, তবে এ নিয়ে দ্বিমত আছে। ধর্মঠাকুরের সাথে বিষ্ণুর যে মিল আছে এনিয়ে সংশয় নেই। অর্থাৎ ধর্ম, বিষ্ণু, সূর্য ও বরুণের মধ্যে যে একটা সংযোগসূত্র আছে তা সন্দেহাতীত। এই সংযোগসূত্র ‘সিঞ বঁগা’র সাথেও লক্ষ করা যায়। ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। এসব মূর্তির বেশিরভাগই কূর্মমুর্তি। ধর্মঠাকুরের মূর্তির পাশে মোট ৫টি মূর্তি পাওয়া যায়। সাঁওতালদের জাহেরে পাই পাঁচজন প্রধান দেবতা - ১) জাহের এরা, ২) মড়ে ক, ৩) মারাংবুরু, ৪) গঁসাই এরা ও ৫) পারগানা হাড়াম। আবার অঞ্চলভেদে দেখা যায় - ১) ধর্ম, ২) পুরুধুল, ৩) মারাংবুরু, ৪) মড়ে ক তুরুই ক এবং ৫) জাহের এরা। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন -

> “Traditions in the Dharma cult often show a great tendency to identify Dharma, or dharma- raja with the dharma-raja Yama. As a matter of fact Yama himself seated on his Vahana (mount) or buffalo...”[১০]

ধর্মরাজের বাহন পাহাড় কিংবা ষাঁড়। ধর্মঠাকুর এর মধ্যে বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব ইসলামী এবং লৌকিক পৌরাণিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি সাঁওতাল ধর্মের সংস্পর্শ লক্ষ করা যায়। ধর্মরাজ শুধু রোগ নির্ণয় বা রোগ নিরসনের রাজা নন; তিনি বৃষ্টি দেবতা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন। শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে সন্তানকামীর স্বপ্ন পূরণ করেন। মোটকথা মানুষের কল্যাণ সাধনায় তিনি সদা সচেষ্ট। ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন -

> “...great annual festival is everywhere, always accompanied by ritual dances, ...These dances are accompanied by songs, and are performed by troups of devotees. Now, dance as a fundamental religious ritual is certainly not Aryan; it is neither Buddhist nor Brahmanical. It may be Dravidian, it may also be Tibeto-Chinese; but it is emphatically Austric.”[১১]

‘সিঞবঁগা’ বা ‘মারাংবুরু’কে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের যে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়, প্রতিক্ষেত্রেই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে নাচগান সহকারেই পালিত হয়। সৃষ্টি-পত্তনের পর ধর্মপূজার পদ্ধতি আরম্ভ হচ্ছে। শূন্যপুরাণ-এ যে পাঁচজন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন গোঁসাই পন্ডিত। এই পন্ডিত শূন্য বা পঞ্চম দ্বারের পূজক ছিলেন। এই নাম সাঁওতাল পুরানেও পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'সিঞবঁগা'কে তুষ্ট করার জন্য গোঁসাইয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য, ধর্মীয় আচার-আচরণ শুরু করার আগে তাঁকে ডাকা হয়। তাঁর আগমনের মধ্যদিয়ে ধর্মীয়ানুষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। একটি ‘বাহা’ গানে আছে -

> “হেঁসাঃ মা চটেরে যা গঁসায় তুদেদয় রাঃ লেৎ
> বাড়েমা লাড়েরে যা গঁসায় গোতরোৎ দয় সাঁহেৎ লেৎ।”[১২]

ওহে গোঁসাই, অশ্বত্থ গাছের ডগায় 'তুৎ' পাখি ডাকছিল, ওহে গোঁসাই বট গাছের কোটরে 'গোতরোৎ' নামক এক পশু নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। আসলে সাঁওতালরা প্রকৃতির পূজারি। গাছপালা

পশুপাখির মধ্যেই তারা দেবতাদের অস্তিত্ব অনুভব করে। 'তুৎ' পাখির ডাক ও 'গোতরোৎ'এর শ্বাস-প্রশ্বাস দেব-দেবীর আগমনের বার্তাকে ইঙ্গিত করে।

সাঁওতাল পুরাণ অনুযায়ী ঠাকুর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা স্থলচর প্রাণিদের থাকার জন্য জলের উপরেই স্থলভাগ তৈরি করার বাসনা হয়েছিল। জলের তলা থেকে মাটি তোলার জন্য প্রথমে ডাক পড়েছিল বোয়াল মাছের, তারপর চিংড়ি মাছ। তারা মাটি তুললেও মাটি কি আর জলের উপরে থাকে! তাই ঠাকুরের নির্দেশে কচ্ছপ জলের উপরে ভেসে থাকল আর কেঁচো জলতল থেকে মাটি তুলতে থাকে। শূন্যপুরাণ-এ উল্লেখ আছে ধর্মের বাহন উলুক, ধর্মের ভার সহ্য করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর তিনি হাঁসকে তার ভার বহন করার জন্য সৃষ্টি করলেন; হাঁস কিছুদিনের মধ্যে ধর্মঠাকুরকে ফেলে পালিয়ে যায়। অবশেষে তিনি কূর্মকে সৃষ্টি করেন তাঁর ভার বহনের জন্য। ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি এখনও বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। তিনি সবই করেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য, মানুষের সুবিধার জন্য। তাই মানুষ যখন তাঁর অবাধ্য হয়, তাঁকে অবহেলা করে এবং বেপরোয়া হয়ে ওঠে; তখন ধর্মঠাকুরকেও কঠোর হতে হয়েছে। সাঁওতাল পুরাণ বিষয়ক এক গ্রন্থে পাই -

> "Living there (Khoj kaman) mankind became very bad, they became like buffaloes and buffalo-cows, they did not respect each other. Seeing all this Thakur became very angry, and he firmly made up his mind to destroy mankind, if they did not return to him. So he called them to come: "Come, mankind, come back to me". But they did not heed his word. Therefore Thakur called to him whether it was Pilcu Haram and Pilcu Budhi or another holy pair ... and said to them: "Mankind does not listen to my word; therefore I will make an end of them. But you two go into the cave in the Harata Mountain; there you two will be saved. These two listened to (obeyed) Thatkur's word. They went into the mountain cave. When they had gone in there, for seven days and seven nights Thakur let fire-rain (some gurus say, sky-rain) stream down from the sky and destroyed mankind and animals, every one of them, only the two who were in the Harata mountain cave were saved and left alive."[১৩]

ধর্ম ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা পাওয়া যে অর্বাচীন হিন্দু প্রভাব, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 'সিঞবঁগা'র পূজা সাঁওতালরা গাছের তলাতেই করে থাকেন। পাশাপাশি তিনটি শাল গাছের তলায় তিনটি পাথর রাখা হয়, এই তিনটি পাথররূপী দেবতা হলেন যথাক্রমে জাহের এরা, মড়ে ক তুরুইকো এবং মারাং বুরু। কিছুটা দূরে গঁসাই এরাকে রাখা হয় মহুল গাছের তলায় এবং পারগানা হাড়ামকে যে কোনো গাছের তলায় রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন -

> "সাধারণতঃ এই সকল প্রস্তররূপী ধর্মঠাকুরগন পল্লীর কোন নির্জন বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া থাকেন, অনাবৃষ্টির সময় কিংবা কোন মানসিক পূর্ণ করিবার

> সময় গ্রামবাসীগণ বৃক্ষমূলে গিয়াই তাঁহার পূজা দিয়ে থাকে।...কোন কোন সময় সিদ্ধাভীষ্ট কোন ভক্ত বৃক্ষের সংলগ্নই তাঁহার জন্য মন্দির গড়িয়া দেন।"[১৪]

অভীষ্ট সিদ্ধ হলে দেবতাকে মাটির ঘোড়া দেওয়া হয়। সাঁওতালদের 'জাহের গাড়'এ দেখা যায় সারিসারি মাটির ঘোড়া। ধর্মঠাকুরের মন্দির যেখানে আছে সেখানে আমরা দেখি তিনটি শিলাখণ্ড পাশাপাশি অবস্থান করে, অঞ্চলভেদে তিনটি শিলাখণ্ডের তিনটি নাম - বাঁকুড়া রায়, বুড়া রায় ও কালা রায়। সর্বোপরি ধর্মঠাকুরের এই পূজা-পদ্ধতি ও বহুরূপী বেশ সাঁওতাল পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর অর্থাৎ 'সিঞবঁগা'র মহিমাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১) মুরমু, রঘুনাথ, হিতৌল, মার্শাল বাস্বের, ঝাড়গ্রাম, ২০০৮, পৃঃ ২৭
২) তদেব, পৃঃ ২
৩) তদেব, পৃঃ ১৮
৪) মুরমু, সাধু রামচাঁদ, লিটা গডেৎ, ঝাড়গ্রাম, ২০১২, পৃঃ ০৬
৫) মুরমু, সাধু রামচাঁদ, ঔদ রেয়াঃ বুটা, লিটী গডেৎ, অনল মালা, মার্শাল বাস্বের, ঝাড়গ্রাম, ১৯৯৭, পৃঃ ১৮৯
৬) দত্ত, বিজিত কুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পা.), মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল-৭৩, ২০০৯, পৃঃ ২৩
৭) স্ক্রেফ্স্রুড, রেভারেণ্ড এল. ও (সম্পা.), হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, খেরওয়াল তরাও আখড়া, কল- ১৪, ২০০৭, পৃঃ ১৫২
৮) Chatterji, Suniti Kumar, Buddhist survivals in Bengal, B.C. Law Vol.,Part-1, Calcutta, 1945, p. 78
৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল (সম্পা.), শ্রী রামাই পণ্ডিত বিরচিত ধর্ম্মপূজা বিধান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩, পৃঃ ৫২
১০) Dasgupta, Shashibhusan, Obscure Religious cults, Firma KLM, kol-22, 1962, p- 270
১১) পূর্বোক্ত, সূত্র-৮, পৃঃ ৭৮
১২) সরেন, বাবুলাল, বাহা বঙ্গা, মার্শাল বাস্বের, ঝাড়গ্রাম, ২০১৮, পৃঃ ২৬
১৩) Bodding, P.O (edtd.),Traditions and Institutions of the Santals, Oslo 1942, p-08
১৪) ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ , কল- ১২,, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০, পৃঃ ৫৯৩।

কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত ‘সুন্দরী মলুয়া’ : বারোমাস্যা-রীতির প্রকৃতি ও অনুসৃজন

হুমায়ুন কবির
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম

সারসংক্ষেপ (Abstract): প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য একজন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী দেবীর রচনাকর্মের অনন্য সাধারণ রচনা ‘সুন্দরী মলুয়া’। গ্রামবাংলার দুটি সন্তান-সন্ততির মধ্যেকার প্রণয়কেন্দ্রিক পালায় প্রাসঙ্গিকভাবে কবি যুগপ্রচলিত বারোমাস্যার সংযোজন করেছেন। কবি চন্দ্রাবতীর অপর একটি রচনা ‘রামায়ণ’-এর মধ্যেও বারোমাসির উল্লেখ পাই। সাধারণভাবে বারোমাসি নারীমনের বারোমাসের অনুভূতির বিবরণ। বারোমাসি মৌখিক সাহিত্যের সৃষ্ট হলেও শিষ্ট সাহিত্যেও জনপ্রিয়তার কারণে অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়। ‘সুন্দরী মলুয়া’তে কবি চন্দ্রাবতী বারোমাস্যার রীতি অনুসৃজন করে নায়িকা মলুয়ার মনের বিরহমূলক আর্তি প্রকাশ করেছেন, দয়িত তথা পালার নায়ক চাঁদ বিনোদকে কেন্দ্রকরে মলুয়ার নারীমনের মনস্তত্ত্ব প্রকটিত। বারোমাস্যা পালায় বর্ণনাত্মক রচনার অংশ হিসেবে কবি ব্যবহার করলে এককরীতি হিসেবেও এটি বেশ জনপ্রিয় আলোচনায় সেদিকটি উঠে এসেছে। প্রবন্ধটির মূল লক্ষ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বারোমাসির বিস্তৃতি ও প্রসারে নারী রচিত সাহিত্যের অবগঠন। প্রবন্ধটি রচনায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি যেমন গ্রহণ করা হয়েছে, অনুরূপ অন্যান্য মধ্যযুগের মহিলা কবিদের রচিত বারোমাস্যার সঙ্গে প্রতিতুলনা প্রসঙ্গে তুলনামূলক পদ্ধতিও কয়েকটি স্থানে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূচকশব্দ (Keywords): মধ্যযুগ, বাংলা সাহিত্য, বারোমাস্যা, সুন্দরী মলুয়া, মহিলা কবি, সমাজ, সংস্কৃতি।

মূল আলোচনা (Discussion):

‘বারোমাস্যা’ হল জাগতিক মানব সমাজের ছয় ঋতুর পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিতে বিশেষ কোনো অনুভূতির ভাব-বিমোক্ষণ। আমরা জানি, পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে দিন-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি তথা ঋতু পরিবর্তন ঘটে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে প্রত্যেকটি ঋতুতে প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এক একটি ঋতুতে প্রকৃতিলোকের বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া খরা, কখনও বন্যা অথবা ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা মলয়সমীর প্রভৃতি মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করত, কেননা, সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগ। ফলে ঋতু চক্রের পরিবর্তনে মানব সমাজ মনের হত পরিবর্তন। তাই বলা যায়, ছয় ঋতুর পরিবর্তিত পটভূমিকায় প্রকৃতিলোকের পরিবর্তনে মানব হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির বারোমাসব্যাপী বর্ণনায় হল বারোমাস্যা।

বারোমাস্যা বলতে সর্বত্রই ছয় ঋতু বা বারোমাসের বর্ণনা থাকে তা কিন্তু নয়, সেই বিবরণ কখনও ছয় মাস, কখনও আবার আট কিংবা দশ মাসের, এমনকি চার মাসের বর্ণনাও দুর্লক্ষ্য নয়। এই বর্ণিত মাসের পরিব্যাপ্তি অনুযায়ী নামেরও রকমফের হতে দেখা যায় আকৃতি বোঝার সুবিধার্থে। যেমন চার মাসের বর্ণনাকে চারমাসি বা চতুর্মাস্যা, ছয় মাসের বর্ণনাকে

ছয়মাসি বা ষাণ্মাসিকী, আট মাস এবং দশ মাসের বর্ণনাকে যথাক্রমে অষ্টমাসি এবং দশমাসি বলা হয়ে থাকে। তবে শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন, এসবই বারোমাসি গীতের সগোত্র এবং বারোমাস্যা শিরোনামেই এদের সাধারণ পরিচয়। সহজ কথায়, বারোমাস বা ছয় ঋতুর কয়েকটি মাস বা ঋতুর চিত্র অবলম্বনে মানব-মানবীর আনন্দ আশ্রুর আবেগঘন উচ্ছ্বাসময় গীতিই হল বারোমাস্যা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বর্ণনা সর্বক্ষেত্রে বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র মাস ভিত্তিক হয়ে থাকে এমন বলা যাবে না, মাসের পরিবর্তে ঋতুর উল্লেখ করতেও দেখা যায়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে সব ধরনেরই বারোমাস্যা লক্ষ করা যায়। যেমন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার চতুর্মাস্যা, ময়মনসিংহ গীতিকায় কঙ্ক ও লীলার ষাণ্মাসিকী, 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বেহুলার অষ্টমাসি, ময়মনসিংহ গীতিকার 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় মলুয়ার দশমাসি উল্লেখযোগ্য। এইসব মধ্যযুগীয় বারোমাস্যার প্রণোদনায় আধুনিক যুগে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতেও এই ধারাটি বহমান। আধুনিক কবিদের কলমে বারোমাস্যা মধ্যযুগীয় ধারার মতো গতানুগতিক ও যান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি। এই সময় পর্বে রচিত কয়েকটি বারোমাস্যা হল— যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪ খ্রি.) 'পথের চাকুরি', কালিদাস রায়ের (১৮৮৯-১৯৭৫ খ্রি.) 'চির-মিলন', বিষ্ণু দে-র (১৯০৯-১৯৮২ খ্রি.) 'বারমাস্যা', মল্লিকা সেনগুপ্তের (১৯৬০-২০১১ খ্রি.) 'ভোটারিণীর বারোমাস্যা' প্রভৃতি।

বারোমাসির উৎস অনুসন্ধানে সারস্বত সমাজে তথা গবেষক মহলে মতান্তর দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, লোকসংগীতের অংশরূপে বারোমাস্যার জন্ম লোকসাহিত্যে। কালক্রমে লোকমানসে জনপ্রিয়তার কারণে অভিজাত সাহিত্যের কবিরা তাঁদের সাহিত্যে টেনে নিয়েছেন। অনেকে গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে বর্ণিত ছয় ঋতুর বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপটকে বারোমাস্যার উৎস বলে মনে করেন। মতানৈক্য কোনো কোনো গবেষক আবার বলেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্য লোকায়ত বারোমাসির প্রভাবজাত।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' (১৩৩৬ ব.) গ্রন্থে বলেছেন— "বারমাসী একান্তই নারীজীবনাশ্রিত সঙ্গীত। নারীজীবনের আশা, আকাঙ্খা, ভাবনা, কল্পনাদিই এ গানের মূল সুর, মর্মবাণী।"[১] তিনি আরও বলেছেন, বারোমাসি মুখ্যত নারী জীবনের বিরহ কেন্দ্রিক গান, কিন্তু দেখা যায় বিরহিণী নারীর বিরহমূলক দয়িত মিলন কেন্দ্রিক আর্তি প্রকাশ প্রধান উপজীব্য বিষয়বস্তু হলেও একমাত্র নয়, নায়িকার সুখের অনুভূতিও বারোমাস্যার বিষয়বস্তু হিসেবে কবিগণ নির্বাচন করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে শ্রীমন্ত জায়া সিংহল রাজকন্যা সুশীলার বারোমাস্যা বা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২ খ্রি.) কাব্যের বিদ্যার বারোমাস্যায় বিরহ নয়, সুখের বাণী চিত্রার্পিত। কতিপয় বারোমাসিতে নায়কের প্রেমকথা নায়িকার কাছে বর্ণিত হতে দেখা গেছে। বারোমাসির বিষয় বৈচিত্র্যের পরিসর ব্যাপ্তিলাভ করেছে প্রকৃতিলোকে অথবা জীবলোকে আলোড়ন সৃষ্ট করতে পারে এমন বিষয়বস্তুর দিকে। যেমন অনেক বারোমাসিতে পুত্র বিয়োগে শোকাকুল পিতা অথবা মাতার আর্তনাদ কিংবা বিশ্বস্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ বা ধর্মকেন্দ্রিক রীতিনীতির বর্ণনা দেখা যায়, বেশকিছু বারোমাসি আবার নানারকম সতর্কবাণী, উপদেশ বা পরামর্শে ভারাক্রান্ত। ক্রমে বারোমাসির বিষয়বস্তু সম্প্রসারণ লাভ করে। তবে অর্বাচীন কালের রচনা অনেকাংশে গতানুগতিক ও যান্ত্রিক।

বাংলা সাহিত্যে বারোমাস্যার সাহিত্যিক রূপ প্রথম লক্ষ করা যায় 'মঙ্গলকাব্য'-এ। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার চতুর্মাস্যার কথাও অনেকে বলে থাকেন। বারোমাসির বর্ণনা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ মাস থেকে ক্রম পরম্পরায় চৈত্র মাস পর্যন্ত বর্ণিত হয় এমন

নয়, বছরের একটি নির্দিষ্ট কোনো মাস দিয়ে বারোমাসি শুরু হয় না, বারোমাসির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এটি। কোনো বারোমাসির বৈশাখ মাস দিয়ে সূচনা, আবার কোনোটি অগ্রহায়ণ মাস দিয়ে অথবা বছরের অন্য কোনো একটি মাস দিয়ে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ বছরের সূচনা বা প্রথম মাস বৈশাখ মাস বর্ণনার মধ্যদিয়ে বারোমাসির সূচনা হবে এমন কোনো ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট নিয়ম রীতি নেই। কবিগণ পছন্দ মতো যে-কোনো মাসের বর্ণনা প্রারম্ভে বারোমাসি রচনা করেছেন।

বারোমাস্যার প্রকারভেদ নানাভাবে করা হয়ে থাকে। আকৃতিগত দিক থেকে বারোমাসিটি কত মাসের বর্ণনা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী সেটিকে ষাণ্মাসিকী, অষ্টমাসি, দশমাসি প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে। 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' গ্রন্থে শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ভাব ও প্রকৃতি অনুসারে বারোমাস্যাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করেছেন— (১) আদি বা মৌলিক (২) মধ্যযুগীয় বা সাহিত্যিক (৩) আধুনিক বারোমাস্যা (৪) আখ্যানমূলক বা বর্ণনামূলক (৫) ব্যক্তিগত দুঃখ-দারিদ্র্যমূলক (৬) পূজা বা অর্ঘ্যমূলক (৭) মিলনমূলক (৮) বিরহমূলক বা ভাবাত্মক।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য কৃত এই শ্রেণিকরণ সর্বজন মান্য, স্বীকৃত এবং অনড়-অটল এমন নয়, গবেষকগণ বারোমাস্যার বিভাজন অন্যভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং তার সপক্ষে যুক্তিও দিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি গবেষক অধ্যাপক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৪২ খ্রি.) তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সাতকাহন' (২০০৯ খ্রি.) গ্রন্থে বারোমাসির প্রকারভেদ বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। যথা—

(১) মাসের ভিত্তিতে: বারোমাস্যায় বর্ণিত মাসের সংখ্যার প্রেক্ষিতে। (২) বক্তার নিরিখে: বারোমাস্যায় বর্ণিত বিষয় কবির জবানীতে রচিত নাকি নায়কের বা নায়িকার জবানীতে কিংবা নায়ক-নায়িকার যুগ্ম জবানীতে রচিত সেই প্রেক্ষিতে। (৩) দীর্ঘ বর্ণনাত্মক রচনার অংশরূপে নাকি স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে রচিত সেই প্রেক্ষিতে। (৪) পরিণতির নিরিখে: বারোমাস্যার সমাপ্তি মিলনমূলক নাকি বিষাদাত্মক সেই প্রেক্ষিতে। (৫) উদ্দেশ্যের নিরিখে: কবি কোন উদ্দেশ্যকে উপলক্ষ্য করে বারোমাসিটির উপস্থাপন করেছেন সেই প্রেক্ষিতে। (৬) বর্ণনাত্মক না বিশ্লেষণাত্মক বারোমাসিটি সেই সাপেক্ষে। (৭) দীর্ঘাকৃতি নাকি ক্ষুদ্রাকৃতি সেই ভিত্তিতে।

বৈপরীত্যে, বারোমাসি গবেষক আতোয়ার রহমান বিষয়বস্তু অনুসারে বারোমাস্যাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা— (১) ধর্মকেন্দ্রিক (২) ভক্তিমূলক (৩) কর্মবিষয়ক (৪) কাহিনিমূলক (৫) ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক কথা কেন্দ্রিক, এবং (৬) প্রেম বিষয়ক।

'সুন্দরী মলুয়া' পালায় বারোমাস্যার প্রসঙ্গ :

'সুন্দরী মলুয়া'-তে বারোমাসির সংখ্যা দুটি (মলুয়ার বারোমাস্যা)। একটিতে আট মাসের বিবরণ অর্থাৎ অষ্টমাসি, একটিতে দশমাসের বিবরণ— সেটি দশমাসি বা দশমাস্যা।

(ক) মলুয়ার অষ্টমাসি :

পালার পঞ্চম পর্বে আমরা মলুয়ার আট মাসের বর্ণনা পাই। ষোল চরণ ব্যবহৃত হয়েছে এই অষ্টমাসি বর্ণনায়। আড়ালিয়া গ্রামের মোড়ল হীরাধরের একমাত্র কন্যা মলুয়ার এগারো উৎরে বারোয় পদার্পণ হলে বিয়ের বয়সে উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বিয়ে না-দিলে পাড়ার লোক কানাকানি করে। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় নানা সামাজিক কুপ্রথা তথা বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় অল্প বয়সেই কন্যার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত, নতুবা সমাজপতিদের চোখ রাঙানি অথবা পাড়াপড়শির গঞ্জনা ছিল অনিবার্য। শাক্তপাদাবলিতে উমার বিবাহে পাড়াপড়শির গঞ্জনা কিংবা মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে খুল্লনার বারো বৎসর বয়সে বিবাহের সময় সমাজপতিদের নানাকথা পিতা লক্ষপতিকে শুনতে হয়েছিল। সতেরো শতকের কবি ক্ষেমানন্দের 'জগতীমঙ্গল'

কাব্যেও দ্বাদশ বর্ষীয় কন্যা বেহুলাকে বিয়ে না-দিয়ে ঘরে রাখলে অবশেষে অপমান সহ্য করতে হবে বলে পিতা সায়বেনেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, সেদিনের সমাজব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। আদরের দুলালী কন্যা সুন্দরী মলুয়াকে বিয়ের উপযুক্ত বয়সে বিয়ে না-দিয়ে ঘরে রাখার কারণের ফলশ্রুতি হিসেবে আষাঢ় মাস থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত আট মাসের ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনা অনুযায়ী—

(এক) আষাঢ় মাসে মলুয়ার পিতা-মাতা ভালো বর আগমনের আশায় চেয়ে থাকে কিন্তু উপযুক্ত পাত্র না মেলায় চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে।

(দুই) শ্রাবণ মাসে প্রচলিত বিশ্বাসের আনুগত্যে পিতা কন্যার বিধবা হবার আশঙ্কায় বিয়ে দিতে চাননি। বেহুলা এই মাসে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বৈধব্যের কবলে পড়ে।

(তিন) ভাদ্র মাসে 'শাস্ত্রমতে শুভকার্যে মানা' ফলে এই মাসে বিয়ে দেওয়া হবে না, কেবল দেখাশোনা চলতে পারে।

(চার) আশ্বিন মাস উৎসবের মাস। এই সময় বাঙালিদের দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মলুয়ার পিতার আমোদ-প্রমোদ, ব্যস্ততায় পাত্র সন্ধানের অবসর হয়ে ওঠে না।

(পাঁচ) কার্তিক মাস প্রশস্থ। মলুয়ার পিতা কার্তিকসম বরের আশা করেছেন এই মাসে, তাই সম্বন্ধ এলেও মনোমত যোগ্য পদবাচ্য হয়ে ওঠেনি পিতার কাছে—
"মন নাই সে উঠে বাপের আইল যত ঘর।"[২]

(ছয়) অগ্রহায়ণ মাস ফসলের কাল। এই মাসে মাঠে ফলে সোনার ফসল। ফসলের মরশুমে কন্যার পিতার রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে অসুবিধে আছে।

(সাত) পৌষ মাস বিয়ের পক্ষে প্রতিকূল তাই পরের মাসে কন্যাকে পাত্রস্থ করার কথা বলেন পিতা।

(আট) মাঘ মাসে সম্বন্ধ নিয়ে করমি অর্থাৎ ঘটকের হীরাধরের বাড়ি যাতায়াত। উপযুক্ত পাত্র বিবেচনার্থে পিতা সম্বন্ধ বিচার করে দেখেন।

- এই বারোমাস্যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—

প্রথমত, জনমানসে প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাব বারোমাস্যায় দেখা যায়। যেমন—

"শাওন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রাঁড়ী হইছে।।
ভাদ্রমাসে শাস্ত্রমতে শুভকার্যে মানা।
এই মাসে না হইব বিয়া কেবল আনাগুনা।।"[৩]

নারী জীবনকে কেন্দ্রকরে গড়ে ওঠা বিশ্বাস-সংস্কার প্রসঙ্গে শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন— "নারীজীবন আশৈশব বিচিত্র বিশ্বাস সংস্কারে ভরা, এ জীবনের ধর্ম ও কর্মে, আচার ও আচরণে, পাপ ও পুণ্যবোধের প্রতি পদেই অজস্র অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কার ক্রিয়াশীল...। তারা নানাভাবে নানা উদ্ভট, উৎকট ধারণা সংস্কারের দাস।"[৪] অর্থাৎ নারী চরিত্রের বিশ্বাস-সংস্কারের দিকটি এই বারোমাস্যায় চির-উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত। বস্তুত অধিকাংশ বারোমাসি নারী কেন্দ্রিক ফলে নারী চরিত্রের বিবিধ দিকের প্রাধান্য স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, চরিত্র চিত্রাঙ্কনে যে-সংকট নারী চরিত্রের মধ্যে সমকালীন মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় প্রতিফলিত বয়স্থা সুন্দরী মলুয়ার বৈবাহিক সংকট তারই প্রকাশ। বয়স্থা কন্যাকে

সহায়সম্বল সংযুক্ত পাত্রস্থ করতে না-পেরে উঠলে পিতা-মাতা আর কোনো অদ্বিতীয় উপায় খুঁজে পাননি। কবির ভাষায়—

"বিয়া নাই সে হইল কন্যার কি করে উপায়।"[৫]

আবার দেখা যায়, বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে পাত্র পক্ষ মলুয়ার পিতার কাছে এলেও পিতার মনে সে সম্বন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি। কার্তিক মাসের বর্ণনায় সে কথা স্পষ্ট—

"মন নাই সে উঠে বাপের আইল যত ঘর।"[৬]

এদিক থেকেও বারোমাসিটি উল্লেখযোগ্য।

(খ) মলুয়ার দশমাসি :

'সুন্দরী মলুয়া' পালার বিংশতম পর্বে মলুয়ার দশমাস্যা বা দশমাসি লক্ষ করা যায়। এই পালায় বর্ণিত তিনটি বারোমাস্যার তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরিসরে বৃহৎ, এখানে পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকায় নারী মনের দশমাসের বিবরণ পাওয়া যায়। এ দশমাসির সূচনা মাঘ মাস থেকে এবং পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে কার্তিক মাসের বর্ণনায়। প্রকৃতিগত দিক থেকে ব্যক্তিগত দুঃখ দারিদ্র্যমূলক বারোমাসি, তবে বিরহমূলক ভাবধারারও প্রকাশ ঘটেছে এই বারোমাস্যায়।

সংসারে অভাব-অনটন চরম পর্যায় অতিক্রম করলে চাঁদ বিনোদ উপার্জনের আশায় স্ত্রী মলুয়ার অজ্ঞাতেই সংগোপনে রাত্রি নিশাকালে গৃহ ত্যাগ করে। সংসারে উপার্জনকারী গৃহকর্তার অবর্তমান পরিস্থিতিতে মলুয়া দমে যায়নি, সংসার তথা পরিবার পালন করেছে কিন্তু অন্তরে রয়ে গেছে মলুয়ার স্বামী বিরহের বেদনা। এসবের প্রেক্ষাপটে মলুয়ার দশমাসের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন কবি চন্দ্রাবতী। যথা—

(এক) মাঘ এবং ফাল্গুন মাস মলুয়ার প্রবাসী পতির চিন্তা ভাবনাতেই নিঃশেষিত।

(দুই) চৈত্র এবং বৈশাখ মাস মলুয়ার পতির ঘরে আগমনের আশায় চেয়ে থেকে অতিবাহিত হয়।

(তিন) জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে এবং শোনা যায় কাকের কর্কশ ধ্বনি, মলুয়ার মনে পড়ে স্বামীর কথা, না জানি কোন দেশে অবস্থান করছে। কাছে থাকলে হয়তো জ্যৈষ্ঠ মাসের রসাল ফল আম দিয়ে মনের মতো করে ফলাহার করানো যেত।

(চার) আষাঢ় মাস অর্থাৎ বর্ষা ঋতুর আগমন। আষাঢ়ের অঝোর বারিধারায় এবং বিদ্যুৎ বিজড়িত মেঘের ক্ষীণ তাৎক্ষণিক দর্শনে স্বামী সংসর্গের বাসনায় গৃহ শয্যায় একাকী স্বামীর কথাই স্মরণ হয়—

"মেঘ ডাকে গুরু গুরু
দেওয়ায় ডাকে রইয়া।
সোয়ামীর কথা ভাবে কন্যা
খালি ঘরে শুইয়া।।"[৭]

এই প্রসঙ্গে শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "বারমাস্যা গীতির সর্বত্রই দেখা যায় মেঘসন্দর্শনে বা বর্ষাধারার আবির্ভাবে নারীচিত্তে জাগে বিরহবেদনা। বাইরে মেঘ ও মৃত্তিকার দাম্পত্য জীবনের লীলাসন্দর্শনে সমপ্রাণতার প্রভাবে গৃহমধ্যে নারীহৃদয়েও স্বামিসংসর্গের বাসনা স্বতঃই উৎসারিত হয়ে উঠত।"[৮]

(পাঁচ) শ্রাবণ মাসে প্রায় ঘরে ঘরে মনসা পূজা। মলুয়া চাঁদ বিনোদের ঘরে ফিরে আসার আশায় মঙ্গলকামনা করে দেবীর কাছে মানত করে।

(ছয়) ভাদ্র মাসের নাম উল্লখ আছে মাত্র, কোনো রকম বর্ণনা করা হয়নি। বর্ণনায় গতিময়তা আনতে এই মাসের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

"শাওন গেল ভাদ্দর গেল
আশ্বিন মাসও যায়।"[৯]

(সাত) আশ্বিন মাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

"দুর্গাপূজা আইল দেশে
শব্দে শুনা যায়।।"[১০]

উৎসবের মাসে গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বউরা নতুন নতুন রঙিন পোশাকে সাজসজ্জা করে মনে আনে আনন্দের জোয়ার। কিন্তু মলুয়ার উৎসব আমোদ মদির দিনেও শতছিন্ন পরিহিতা উৎসবের আমেজ ও আনন্দের কোনো প্রভাব মলুয়ার মধ্যে পড়ে না। পূজার উৎসবে প্রাণপ্রিয়ের ঘরে না-থাকার দুঃখ মলুয়ার উৎসবের দিনগুলিকে করেছে মলিন।

(আট) কার্তিক মাস মলুয়ার কাছে ব্যতিক্রম অন্যান্য নয়মাসের থেকে। কেন-না, এই মাসে চাঁদ বিনোদ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। বিনোদ কুড়া শিকার করে অনেক টাকা উপার্জন এবং বাজেয়াপ্ত জমিজমা ভূসম্পত্তি খালাস করার পাশাপাশি 'নজর মরেচা'র টাকাও পরিশোধ করে। বহুদিন পরে পুনরায় মনের সুখে—

"আটচালা বান্ধিল বিনোদ যতন করিয়া।
হরষিতে শুইল বিনোদ মলুয়ারে লইয়া।।"[১১]

ফলে মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত যে নয়টি মাস বিরহ, দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিল মলুয়া, কার্তিক মাস সেদিক থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। দীর্ঘ বিরহ বিচ্ছেদের পর প্রিয়ের সঙ্গে মিলনে বিরহ প্রশমনের উজ্জ্বল প্রশান্তি লাভ করে মলুয়া এই মাসে। বিরহে মিলনের যে-সুখ তা সকল প্রাপ্ত বস্তুকে হার মানায়। কবি শেষ কয়েক কাব্যপঙ্‌ক্তিতে তা ব্যক্ত করেছেন ব্যতিরেক অলংকার প্রয়োগে—

"মেওয়া মিছ্‌রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গার জল।
তার থাইক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল।।...
তার থাইক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকলের থাইক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন।।"[১২]

- এই বারোমাস্যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে সূত্রাকারে নির্দেশ করা হল—

প্রথমত, কবির জবানীতে রচিত বারোমাসি। অর্থাৎ মলুয়ার দশমাসের দিনযাপনের চিত্র পাঠকের সম্মুখে বর্ণনা করেছেন কবি, ভণিতা না-থাকলেও পালা পাঠে সহজেই তা অনুমেয়।

দ্বিতীয়ত, বারোমাসিটিকে মিলনান্তক বারোমাসি রূপে উল্লেখ করতে হয়। কেন-না, দীর্ঘ নয় মাসের মলুয়ার স্বামী বিচ্ছেদের পর শেষ মাসে অর্থাৎ কার্তিক মাসে তাদের মিলন ঘটেছে। মিলনান্তক পরিণতির মধ্যদিয়েই কার্তিক মাসে বারোমাস্যার পরিসমাপ্তি।

- আমাদের আলোচিত 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় বারোমাস্যার আলোকে কয়েকটি প্রসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরা হল—

(ক) পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকায় অর্থাৎ বাংলাদেশের ষড়ঋতু বা বারোমাসের বৈচিত্র্যের ফলে মানব জীবনের পরিবর্তনের বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়।

(খ) বারোমাস্যায় কালক্ষেপণের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয়বস্তুকে গতিদান বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস মলুয়ার বারোমাসিতে দেখা যায়। এই পালায় কালক্ষেপণের দৃষ্টান্ত—

(১) "মাঘ ফাল্‌গুণ গেল মলুয়ার
ভাবিয়া চিন্তিয়া।
চৈত বৈশাখ কাইট্যা গেল
আশায় রহিয়া।।"[১৩]

আবার,

(২) "শাওন গেল ভাদ্দর গেল
আশ্বিন মাসও যায়।"[১৪]

(গ) বারোমাসি লোকায়ত জীবনের অংশ এবং এতে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সংস্কার, লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাই। মলুয়ার দশমাসিতেও সংস্কারকেন্দ্রিক মননের পরিচয় ফুটে ওঠে—

"শাওন মাসেতে লোকে
পুজে মা মনসা।"[১৫]

বারোমাস্যায় মনসা পূজার প্রচলন প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মনে করেন— "বারমাস্যার মধ্যে নানা সূত্রে যে মনসাপূজার প্রসঙ্গ দেখা-যায়, সে মনসাও যথার্থতঃ প্রজননশক্তির প্রতীক। আদি বা কৌম-সমাজের প্রজনন শক্তির পূজাই যে মনসাপূজায় পর্যবসিত, একথা স্বতঃসিদ্ধ বললেও অত্যুক্তি হয় না।"[১৬]

(ঘ) বারোমাস্যা একক নায়ক বা নায়িকার জবানীতে এবং কবির জবানীতে রচিত হয়। 'সুন্দরী মলুয়া' পালায় বর্ণিত মলুয়ার দশমাসির বিবরণও কবির জবানীতে রচিত।

(ঙ) বারোমাস্যায় গতানুগতিক এবং একঘেয়েমি পুনরুক্তি লক্ষণীয়। কেন-না, একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর আঙ্গিকে রচিত সাহিত্যের রীতি অনেক সময় অনুকরণে বৈচিত্র্যহীনতায় পর্যবসিত হয়। কোনো একটি মাসের প্রাকৃতিক পটভূমি বর্ণনা করতে প্রায় একই বৈশিষ্ট্য বা উপমাযুক্ত বাক্য ব্যবহৃত। কয়েকটি উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

আশ্বিন মাস বর্ণনায়—

(১) "আশ্বিন মাসেতে দেখ দুর্গাপূজা দেশে।"[১৭] [মলুয়ার অষ্টমাসি]

(২) "আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা মায়ের আগমনে।"[১৮] [মলুয়ার নয়মাসি]

ভাদ্র মাস বর্ণনায়—-

(১) "ভাদ্র না মাসেতে মাও ভরা নদীত যাইয়া।"[১৯] [দুর্গার বারোমাসি]

(২) "ভাদ্রেতে সম্পূর্ণ জল, করে মহী টলমল।"[২০] [রহিমুন্নিসার বারোমাসি]

পুনরুক্তি দোষ সম্পর্কে লেখক ও গবেষক নন্দলাল শর্মা (জন্ম ১৯৫১ খ্রি.) বলেছেন— "বারমাসী বার মাসের বর্ণনার কাঠামোর মধ্যে রচিত হয়। বারমাসের বর্ণনা এখানে মুখ্য নয়, প্রাসঙ্গিক। অথচ এই প্রাসঙ্গিক কাঠামোই বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে চিত সাহিত্য পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। বারমাসী এই দোষ থেকে মুক্ত নয়।"[২১] পুনরুক্তির কারণে একসঙ্গে অনেক বারোমাসি পাঠ পাঠকের কাছে একঘেয়েমি মনে হয়।

অন্ত্যটীকা :

১. ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, ১৩৬৬, 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা', কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, পৃ-৩৫
২. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), ১৯৭০, 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, পৃ-১১০
৩. তদেব, পৃ-১০৯
৪. ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৯৩
৫. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১০৯
৬. তদেব, পৃ-১১০
৭. তদেব, পৃ-১৬২
৮. ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২৬
৯. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১৬২
১০. তদেব, পৃ-১৬২
১১. তদেব, পৃ-১৬৪
১২. তদেব, পৃ-১৬৪
১৩. তদেব, পৃ-১৬১
১৪. তদেব, পৃ-১৬২
১৫. তদেব, পৃ-১৬২
১৬. ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৭২
১৭. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১১০
১৮. তদেব, পৃ-১৩১
১৯. আলী, মুহম্মদ আসাদ্দর, ১লা কার্তিক ১৪০৪, 'ময়মনসিংহ গীতিকা বনাম সিলেট গীতিকা', সিলেট, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, পৃ-৯১
২০. মুসা, মনসুর (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, 'মুহম্মদ এনামুল হক-রচনাবলী' (তৃতীয় খণ্ড), ঢাকা, বাংলা একাডেমী পৃ-৩৮১
২১. শর্মা, নন্দলাল (সং. ও সম্পা.), আষাঢ় ১৪০৯, 'সিলেটের বারমাসী গান', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ-৩৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১। চক্রবর্তী, বরুণকুমার, ২০০৯, 'লোকসংস্কৃতির সাতকাহন', ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন।
২। নস্কর, সনৎকুমার, বইমেলা ২০২২, 'প্রাগাধুনিক কাব্য প্রকরণ : উৎপত্তি স্বরূপ বিবর্তন', কলকাতা, পাড়ি।
৩। ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, ১৩৬৬, 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা', কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ।
৪। মল্লিক, দীপঙ্কর, ১লা বৈশাখ ১৪২০, 'লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য' (লোকসংস্কৃতি ও মঙ্গলকাব্যের তুলনামূলক পাঠ), কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন।
৫। মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), ১৯৭০, 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬। শর্মা, নন্দলাল (সং. ও সম্পা.), আষাঢ় ১৪০৯, 'সিলেটের বারমাসী গান', ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম : নিম্নবর্গের আখ্যান

মধুমিতা সেনগুপ্ত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আর্য্য বিদ্যাপীঠ কলেজ, গুয়াহাটি

সারসংক্ষেপ: স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে এসেছে নানা পরিবর্তন। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের আড়ালে তৈরি হয়েছে এক ধরনের প্রতিবাদী বয়ান। কখনও বা ঔপন্যাসিকদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতির অন্বেষণে। অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে রয়েছে নদী তীরবর্তী মালো সংস্কৃতির যাপনচিত্র এবং তার প্রতিফলন। আমাদের অন্বিষ্ট হবে উপন্যাসের নিবিড় পাঠবিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা এবং প্রান্তেকায়িত জনগণের সমস্যার দিকটি তুলে ধরা।
সূচক শব্দ: নিম্নবর্গ, তিতাস, সংস্কৃতি, স্বাধীন, নদী।

রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিকতা থেকে বেরিয়ে এসে 'কল্লোল' পত্রিকার হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যখন প্রথম উঠে এসেছিল বাস্তব জগতের বিভিন্ন অনালোকিত পরিসর, 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের রচনা প্রায় সেই সময়েই। রচনাকাল সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানতে না পারলেও উপন্যাসের ভূমিকায় আমরা এটুকু জানতে পারি যে, উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৫৬ এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিল ঔপন্যাসিকের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর। রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে, এটি হবে মোটামুটি পঞ্চাশের দশক। যখন তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণরা বাংলা উপন্যাসের অঙ্গন আলো করে আছেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি প্রায় একই সময়ের রচনা হলেও কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক তালিকায় অদ্বৈতের নাম খুব একটা খুঁজে পাই না।

স্বল্পায়ুর জন্যে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মনের রচনা সংখ্যায় এতটাই কম যে, তিনি কোন্ ধারার সাহিত্যিক তাও খুব একটা স্পষ্ট হয় না। অর্থাৎ প্রথমেই একথা স্পষ্ট বলে নেওয়া দরকার যে, রবীন্দ্রমোহ পরিত্যাগ করে রোমান্টিকতার বিরোধিতার সংকল্প নিয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের জন্ম হয়নি। তিতাসের পারের মালো জনগোষ্ঠীর বাস্তব জীবনচিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে অব্যক্ত, অচেনা এক জগত সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছিল সত্যি, কিন্তু তা একেবারেই লেখকের নিজস্ব তাগিদে লেখা এক সহজ সরল অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

বিশ শতকের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস প্রসঙ্গে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাড়াও মনে পড়ে আরো তিনটি উপন্যাসের কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), সমরেশ বসু'র 'গঙ্গা' (১৯৫৭) এবং সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' (১৯৯৭)। এগুলোর মধ্যে সাযুজ্য হলো সবগুলো রচনাই কোন না কোনভাবে লেখকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। কিন্তু তবুও 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিকে একটু আলাদা করে দেখতেই হয়, কেন না উপন্যাসটির পরতে পরতে আমরা খুঁজে পাই লেখকের নিজস্ব জীবনের প্রতিচ্ছবি। বিংশ শতাব্দীর দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পটভূমিতে মেঘনার শাখানদী তিতাসের বক্ষলগ্ন গোকর্ণঘাটের তীরবর্তী মালোপাড়ার জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমাদের এই উপন্যাসে। অদ্বৈতের জন্মবৃত্তান্তে জানা যায়, তিতাসতীরবর্তী এক গোকর্ণ গ্রামে দরিদ্র মাল্ল

পরিবারেই তাঁর জন্ম। ফলে বুঝতেই পারি, তিতাস এবং তার জনজীবনযাত্রা লেখকের কোন অর্জিত অভিজ্ঞতা নয়। তিতাসের মানুষ, প্রকৃতি, আনন্দ, বিষাদের সঙ্গে অদ্বৈতের ছিল নাড়ীর সংযোগ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক শান্তনু কায়সার যথার্থ বলেছেন- "বাইরে থেকে, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত অবস্থান থেকে প্রাকৃত জীবনকে যতখানি সরল দেখায়। আসলে যে তার মধ্যেও রয়েছে বহুভঙ্গিম বৈচিত্র্য, ভেতর থেকে দেখেছেন বলেই অদ্বৈত তা ধরতে পেরেছেন"[১] অদ্বৈতের কথায়- "তিতাস সাধারণ একটি নদী মাত্র। কোন ইতিহাসের কেতাবে, কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে এ নদীর নাম কেউ খুঁজিয়া পাইবে না।"[২] কিন্তু সেই তিতাসকে কেন্দ্র করে লেখকের কলমে ফুটে উঠেছে বাংলার এক মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনগাঁথা। নদী যেমন বয়ে চলে, সময়ও বয়ে চলে। সেই নিরবচ্ছিন্ন সময় ধরে মালোদের উত্থানপতন, হর্ষবিষাদ সমস্ত কিছুর সাক্ষী এই তিতাস। লেখক তাই বলেন "মালোদের ঘরের আঙিনা থেকে শুরু হইয়াছে যত পথ সে সবই গিয়া মিশিয়াছে তিতাসের জলে"[৩]।

উপন্যাসের একদিকে যেমন ফুটে ওঠে নদীনির্ভর দুর্দশাগ্রস্ত মালোদের কথা, তেমনি আরেক দিকে আছে ভূমিহীন অন্যের জমিতে জোরখাটা চাষিদের কথাও। চৈত্রের খরায় নদীতে যখন জল কম থাকে, মালোরা তখন শরণাপন্ন হয় নয়ানপুরের বোধাই মালোর। বোধাই মালো টাকায় মালোদের চেয়ে বড়। নিজের দিখিতে সে মাছ ফেলে, জাল দিয়ে মাছ তোলে, মাছ চালান দেয়। অন্যদিকে দেখি, নিজেদের জমি না থাকায় বন্দে আলী আর করমালী জোতদার জোবেদ আলীর বাড়িতে সারাবছর জন খাটে। খায়, দায়, মাহিনা পায়, ভোররাতে একবার শুধু পরিবারের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। করমালী ও বন্দে আলীর কথোপকথনে তাই ঝরে পড়ে আপশোস-- "আমরার জমি নাই, জিরাত নাই পরের জমি চইয়া জান কাবার করি। যদি জমি থাকত তা' অইলে বউরা নিজেরার ঘরে খাটত, তোমারে আমারে মুনিবের মত দেখত।"[৪]

কিন্তু উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে কিশোর মালোর গল্প। প্রবাসে মাছ ধরতে গিয়ে শুকদেবপুরের মোড়লবাড়িতে কোন এক বসন্তে মালাবদল হয়ে যায়, কিশোরের সাথে এক অনাম্নী পঞ্চদশীর। বউ নিয়ে ফিরে আসার সময় মেঘনার খাড়িতে ডাকাতের আক্রমণ থেকে বাঁচতে জলে ঝাঁপ দিয়ে সেই পঞ্চদশীর হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কিশোরের মত একটি সম্ভাবনাময় জীবনের বোধশক্তির বিলুপ্তি ঘটে। অনেকদিন পর পুত্র অনন্ত সহ গোকর্ণঘাটে পুনরায় আবির্ভাব ঘটে কিশোরের সেই হারিয়ে যাওয়া বউয়ের। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে তার স্বামীকে স্বাভাবিক করতে পারে না। তারপর কোন এক দোল উৎসবের দিনে কিশোরের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং তার কয়েকদিন পর অনন্তর মা'রও জীবনাবসান হয়। সংসারে তখন থেকে যায় শুধু তাদের একমাত্র পুত্র অনন্ত।

তিতাসপারের এইসব জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প বলতে গিয়ে লেখক অনুপুঙ্খভাবে তুলে এনেছেন, মালোদের নিজস্ব রীতিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সুখ-দুঃখের অনুষ্ঠান, সংস্কার কিংবা আচার ব্যবহার। মালোদেরও যে নিজস্ব একটা সুগঠিত সংস্কৃতি আছে তারই বিশদ পরিচয় পাই আমরা উপন্যাসের বিভিন্ন অনুষঙ্গে। প্রবাসখণ্ডের প্রথমেই চোখে পড়ে, কুমারীদের মাঘমণ্ডল ব্রতর কথা কিংবা শুকদেবপুরের ঢোল-করতাল-সংগীত সহযোগে নারীপুরুষ নির্বিশেষে এক আড়ম্বরপূর্ণ দোল উৎসবের পরিচয় পাই আমরা। এছাড়া কালোবরণের মেজবউয়ের সন্তান জন্ম, তেরোদিনের অশৌচ পালন এবং অন্নপ্রাশনের বিবরণ। শ্যামসুন্দর ব্যাপারীর বিবাহের বিবরণের মাধ্যমে মালোদের বিবাহপদ্ধতির পরিচয় মেলে। এছাড়া মালোরা কালীপূজাও করে। লেখক জানান- "কালীপূজাতে হয় সব চাইতে বেশি সমারোহ। বিদেশ হইতে কারিগর আসে। পূজার

একমাস আগে মূর্তি বানানো হয়”[৫]। আবার অন্যত্র লক্ষ করি, বাংলার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো মালোসমাজেও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বিশেষ আয়োজন। লেখকের কথায়- "কালীপুজার সময় গান বাজনায় আমোদ আহ্লাদে মালোরা অনেক টাকা খরচ করে সত্য, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ করে এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে। এইদিন পৌষ মাসের শেষ। পাঁচ ছদিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে গুড়ি-কোটার ধুম পড়ে। মুড়ি ভাজিয়া ছাতু কুটিবার তোড়জোড় লাগে। চাউলের গুড়ি রোদে শুখাইয়া খোলাতে ঢালিয়া পিঠার জন্য তৈরী করিয়া রাখে। পরবের আগের দিন সারারাত জাগিয়া মেয়েরা পিঠা বানায়।"[৬]

আবার অনন্তর মাতৃশ্রাদ্ধের বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক তুলে ধরেন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মালোদের নিজস্ব সংস্কার, নীতি নিয়ম পদ্ধতি, যার সাথে হয়তো প্রায় সবসমাজের হিন্দু বাঙালির নিয়মের খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। অদ্বৈতর বর্ণনায় "কলার খোল কাটিয়া সাতখানা ডোঙ্গা বানায় তাতে জাউ আর কলা দিয়ে তুলসীপাতায় সারি সারি সাজায়। অনন্ত স্নান করিয়া আসিয়া তাতে জল দেয়। সরিয়া পড়িলে কাকেরা আসিয়া উহা ভক্ষণ করে। যেদিন কাক আসে না সেদিন অনন্ত ডোঙ্গা হাতে করিয়া আ আ করিয়া ডাকিয়া বেড়ায়- তারা বলিয়াছে, মা নাকি কাকের রূপ ধরিয়া আসিয়া অনন্তর জাউ-কলা খাইয়া যায়।"[৭] কিশোর মালো এবং তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর উপন্যাসে যেন এক পর্বান্তর ঘটে। তখন তাদের একমাত্র পুত্র অনন্তর চোখ দিয়ে যেন তিতাসকে রূপ-রস-গন্ধে ফুটিয়ে তুলতে চান অদ্বৈত। পিতৃমাতৃহীন অনন্তর তখন কখনো কিশোরের বন্ধুপত্নী সুবলার বউ কখনো বা বনমালীর বোন উদয়তারার কাছে দিন কাটে। এই দিনগুলিতে অনন্তর কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা পড়ে মালোদের দুঃখ-কষ্ট; তাদের নিরক্ষর জীবনে প্রতিদিনের সংগ্রামের যন্ত্রণা। অনন্তর দৃষ্টি এই সীমাবদ্ধ জীবন ভেদ করে বেরিয়ে পড়তে চায়। তাই মাতৃবিয়োগের প্রতীকচিহ্ন গায়ে ধারণ করেও সে আকাশের রামধনু দেখে বিভোর হয়। তার রহস্য ভেদ করতে চায়। আর একদিন এক নাপিতানীর সুপরামর্শে সে বেরিয়ে পড়ে এই মালোদের জীবন ছেড়ে। পাড়ি দেয় শহরে। অনন্তবালা বলে এক কিশোরী তাকে বাঁধতে চায় সংসারজীবনে। বনমালী তাকে জেলেনৌকার সাথী করতে চায়। কিন্তু অনন্তর মনে তখন নাপিতানীর জাগিয়ে দেওয়া স্বপ্ন "এই তিনকোণা পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, ভূমণ্ডল, সব তোকে জানিতে হইবে। সাত সমন্দুর তের নদীর কথা, পাহাড় পর্বত হাওর প্রান্তরের কথা তোকে জানিতে হইবে।“[৮]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মালোদের জীবিকা স্বাধীন জীবিকা। নদীর জলে কারো মালিকানা নেই। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের মজ্জায় মজ্জায় যে শোষণের বীজ নিহিত তারই পরিচয় পাওয়া যায়, উপন্যাসটির বিভিন্ন প্রসঙ্গে। প্রবাসখণ্ডে নয়াকান্দা গ্রামের একবালের মুখে কিশোর শুনতে পায় "নদীর পারে যেখানে তারা নৌকা বাঁধিত জাল ছড়াইত, জমিদার সে জমি তাদের নিকট হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া অন্য জাতের কাছে বন্দোবস্ত দিয়াছে। তাই তারা সেই অবিচারে গ্রাম ছাড়িয়া এখানে আসিয়া নূতন বাড়ি বাঁধিয়াছে। এখানে জমিদার নাই। বেশ শান্তিতে আছি। হাটবাজার দূরে। কিন্তু ঘাটে নৌকা আছে, দেহে ক্ষমতা আছে।"[৯]

আবার তিতাসের মালোদের আয়োজিত সভায় আলোচিত হয় অন্য এক সমস্যার কথা--"আনন্দবাজারের মাছ বিক্রেতাদের কাছে এখন জমিদারের লোকে মাশুল চাহিতে শুরু করিয়াছে। মাছের ভার পিছু দুই আনা করিয়া মাশুল না দিলে বলিয়া দিয়াছে মালোদিগকে বাজারে বসিতে দিবে না"[১০] পুঁজিবাদী শোষণের কৌশল যে মালোগোষ্ঠী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এ যেন তারই এক উদাহরণ। বনমালী মালোও কাদিরের সাথে কথোপকথনে জানায় "মাছ

বেপারীরাও এই রকম। পাল্লার সাথে মুলামুলি কইরা দর দেয় টেকার জাগায় সিকা। শহরে নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়"[১১]। এইভাবে অদ্বৈতর উপন্যাসে একদিকে হতদরিদ্র জমিহীন কৃষক করম আলি, বন্দে আলির শ্রমে বন্দি শোষিত জীবন যেমন ধরা পড়ে তেমনি ফুটে ওঠে পুঁজিপতি মহাজনদের নিকট শ্রমে বন্দি সুবল মালোদের জীবনও। তাই মালিকের অসঙ্গত আদেশ পালন করতে গিয়ে সুবলের অকাল মৃত্যু।

উপন্যাসে যেমন বর্ণবাদী ভাবাদর্শের অনুপুঙ্খ বিবরণ দেন অদ্বৈত, ব্রাহ্মণের ছেলে বুরুজ যখন জানতে পারে সে জাতে মালি এক মেয়ের কাছে জল চেয়ে খেয়েছে তখন "আছাড় খাইয়া বুরুজ কান্দে, পিছাড় খাইয়া বুরুজ কান্দে, জাতি গেল ভূইমালির ঘরে"[১২] তেমনি আবার কৃষক এবং মালো এই দুই গোষ্ঠীর অসাম্প্রদায়িক মিত্রতার ছবিও ফুটিয়ে তুলেন নিখুঁতভাবে। তাই বৃষ্টিতে যখন কাদির মিয়ার আলুর নৌকা ডুবিডুবি, বনমালী তখন কাদিরের সব আলু কৌশলে তার জেলে নৌকায় তুলে নেয়। বনমালীর সাহায্য পেয়ে কাদিরের সব আলু এক দণ্ডের মধ্যে হাটে গিয়া ওঠে। কাদির বলে "মালোর পুত, বড় বাঁচানটাই আজ বাঁচাইলা"[১৩] পরে একদিন কাদিরের বাড়িতে বোন উদয়তারা ও অনন্ত সহ বনমালীকে একদিনের অতিথি হতেও দেখা যায়। উদয়তারা এবং কাদিরের বোন জমিলার বন্ধুত্বও জমে ওঠে এই সূত্রে। আসলে তিতাস তীরবর্তী এই অন্ত্যজ মালোশ্রেণি এবং ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে আর যতপ্রকারের বিভেদ থাকুক না কেন, আসলে সমাজে তাদের অবস্থান এক, উভয়েই তারা শোষিত শ্রেণি।

উপন্যাসের শেষাংশে থাকে, কৌম সংস্কৃতির ভাঙন, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তার। শোষন তো ছিলই, কিন্তু সেই শোষণের সাথে লড়াই করে বেঁচেছিল চাষি-জেলেরা। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের সাংস্কৃতিক সংহতি তে ফাটল ধরল। অদ্বৈত উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে নানা লৌকিক প্রবাদ ও লোকগানের উল্লেখ করেছেন, যা মালোদের একেবারেই নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু উপন্যাসের শেষদিকে আমরা দেখি, তিতাস নদী শুকিয়ে যাওয়ার দিন গুলিতে নিজেদের সংকট সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বদলে মালোরা নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে 'বাবু' সংস্কৃতির আপাত ফুর্তির ফাঁদে পা দেয়। এই সুযোগে ঋণ কোম্পানির বাবুদের সাথে মিলে অভিন্নস্বার্থ পালেরাও ঋণ আদায়ের নামে নিরক্ষর লোকেদের সম্পদও কেড়ে নেয়। একদিকে মালোসমাজের তরুণর পালেরাও খালি ছেড়ে যাত্রাগানের দিকে ঝুঁকেছে, তামাক ছেড়ে সিগারেট ধরেছে। অন্যদিকে স্বাধীন সচ্ছল জেলেরা হয়েছে মোটবাহক কিংবা বড়লোকের দিনমজুর। অদ্বৈতের কথায়-

"বাজারের পালেরা তাদের দয়া করিয়া কাজ দিল, শহর হইতে তাদের জন্য মালের বস্তা ঘাড়ে করিল। দোকানে আনিয়া দিবে আর রোজ চার আনা করিয়া পাইবে। সেইসব বস্তা বহিতে বহিতে তাদের কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন তারা বেঁকা হইয়া পড়িয়াছে, কাজ করিতে না পারিয়া তারা এখন কেবল মরিবার অপেক্ষায় আছে"[১৪]। উপন্যাসের শেষে তাই মনে হয়-

"'তিতাস' শেষপর্যন্ত প্রান্তিকায়িত মানুষের অপ্রতিষ্ঠার, পরাভবের কাহিনি হয়েই থাকে, হয়ে থাকে সংঘচেতনাহীন, হেজিমনির চাপে দিশেহারা কোমের 'ক্ষয়, ভাঙন ও আত্মবিস্মৃতির ইতিহাস'"[১৫]। মালোসমাজের এই ভাঙন তো শুধুমাত্র তিতাসের ইতিহাস নয়, গোটা তৃতীয় বিশ্বের এই হলে আজকের বাস্তব। পুঁজিবাদী সমাজের সাংস্কৃতিক রাজনীতির চক্রান্তের শিকার হয়ে এসেছে বিশ শতকের ভারতবর্ষও। বারবার রূপান্তর ঘটেছে মৌলিকতার। আগ্রাসনের চাপে নিরন্তর আত্মবিস্মৃতি এবং নিঃসহায় আত্মসমর্পণ মিশে আছে আমাদের রক্তে রক্তে। তাই ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনকালেও স্বাধীনতা আনয়নের মূল আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে ভারতবাসীদের মধ্যে সংগঠিত হয় শ্রেণি আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রভৃতি।

এসবই আসলে ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক কৌশল। শহুরে বাবুদের এই যে মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভাঙিয়ে নিজেদের মুনাফালুঠের অপচেষ্টা, এ আসলে মালোগোষ্ঠীর সংহতিকেই বিনষ্ট করা। সংঘবদ্ধ স্বাধীন জীবনধারণকে ব্যাহত করা। তিতাসের উপন্যাসে প্রতিবাদ যে একেবারেই ছিল না তা নয়, সুবলার বউ বাসন্তী তেজস্বিনী নারীর মতো শেষ চেষ্টাটুকু করেছিল শেকড়কে বাঁচিয়ে রাখতে। প্রতিবেশী মনমোহন তার পাশে দাঁড়িয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। এদিকে তিতাস শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালোদের জীবনেও যেন আকাল ঘনিয়ে আসে। ভূমিহীন চাষিদেরও বিশেষ লাভ হয় না। নদীর চরের দখল নিতে এলে লাঠালাঠি করে জমির মালিকরাই তা আত্মসাৎ করে। উপন্যাসের উপসংহারে আবার শহরফেরত শিক্ষিত অনন্তকে ফিরিয়ে আনেন ঔপন্যাসিক মালোসমষ্টির ত্রাণকার্যের স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে। "কে বলে তিতাসের তীরে ইতিহাস নাই"--লেখকের নিজের তোলা এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে চলি আমরা পুরো উপন্যাস জুড়ে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিতাসতীরবর্তী মালোসমাজ এবং সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে অদ্বৈতের উপন্যাসে প্রকরণগত কিছু দুর্বলতা হয়তো থেকে গেছে। কিন্তু তারও সংগত ব্যাখ্যা দেন এক সমালোচক এভাবে "প্রকরণের যে শিথিলতাকে প্রাথমিক পাঠে উপন্যাসের বড়ো ত্রুটি বলে মনে হয়, তাই হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকতা। মধ্যবিত্তের ন্যাস আর মাল্যে জীবনের ন্যাস তো এক নয়, হতে পারে না. অদ্বৈতর বয়ন থেকে সে নিষ্ক্রান্ত হয়"[১৬]।

এই উপন্যাসে হয়তো তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১)র সেই পরিবর্তিত ব্যবস্থার মোহময় হাতছানি নেই, কিংবা নেই মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)র শোষিত বাস্তব থেকে সরে গিয়ে এক বিকল্প মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান। কিন্তু তাতে আছে এক অন্ত্যজ মালোসমাজের সহজ সরল জীবন দিবে বর্ণনা, তাদের স্পষ্ট-অস্পষ্ট স্বরের বিস্তার এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিস্তৃত করুণ ইতিহাস। যে ইতিহাস শুধু তিতাসের নয়, যার সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে আমাদের যাপিত জীবনেতিহাস। হয়তো সংঘবদ্ধ কোন কৃষক আন্দোলন বা মালো সমাজের রুখে দাঁড়ানোর কোন দৃশ্য স্পষ্ট হয় না এ উপন্যাসে। কিন্তু অদ্বৈতর বর্ণনায় ধরা পড়ে যুগে যুগে এই অন্তেবাসীবর্গের নিঃশব্দ প্রতিবাদের বহুস্বরিক মাত্রা "প্রতিষ্ঠাহীন জীবনে, সাহবের স্বভাব-সুলভ অভাবই ইহাদিগকে যুগে যুগে দাবাইয়া রাখে। তাই ইহারা আগাইয়া আসিয়া সরবে মনের আলোড়নকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস হারাইলেও অন্যায়কে এরা কোন যুগেই হজম করিয়া নেয় না। তাই কালে কালে দেশে দেশে এরা আগাইয়া সামনে আসিতে না পারিলেও এই অব্যক্তের দল প্রতিবাদ ঠিক জানায়"[১৭]। মর্মস্পর্শী অনুভবে মালো সমাজের ইতিহাস রচনার মাধ্যমে অদ্বৈত যেন সেই প্রতিবাদেই সামিল হতে চান। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি সেই প্রতিবাদেরই এক সহজ সরল দলিল।

উল্লেখপঞ্জি:

১. কায়সার শান্তনু, ১৯৯৮ 'অদ্বৈত মল্লবর্মন: জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য', কলকাতা, পৃঃ ৩২।
২. মল্লবর্মন অদ্বৈত, ২০14 'তিতাস একটি নদীর নাম', মাইতি বুক হাউস, কলকাতা, , পৃঃ ১৩।
৩. তদেব, পৃঃ ১৩।
৪. তদেব, পৃঃ ১৭।
৫. তদেব, পৃঃ ১০৪।
৬. তদেব, পৃঃ ১১১।
৭. তদেব, পৃঃ ১৫৩।

৮. তদেব, পৃঃ ২৩।
৯. তদেব, পৃঃ ২৯।
১০. তদেব, পৃঃ ৮৫।
১১. তদেব, পৃঃ ১৪০।
১২. তদেব, পৃঃ ২১৫।
১৩. তদেব, পৃঃ ১৩৮।
১৪. তদেব, পৃঃ ২৬৪।
১৫. ভট্টাচার্য তপোধীর,১৯৯৯ 'উপন্যাসের প্রতিবেদন', কলকাতা, পৃঃ ১০০।
১৬. ভট্টাচার্য দেবাশিস, ২০১০ 'বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা, পৃঃ ২৪৩।
১৭. মল্লবর্মন অদ্বৈত, ২০১৪ 'তিতাস একটি নদীর নাম', মাইতি বুক হাউস, কলকাতা, পৃঃ ৩০৫।

বাঙালি পর্যাটকের দর্শনে ফরাসী উপনিবেশ বিরোধী ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ : ১৯২০-১৯৫৪

মলয় পাতলা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারত ভিয়েতনাম সম্পর্কের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ভারত ও চীন দেশের মধ্যভাগে যে বৃহৎ উপদ্বীপ অঞ্চল অবস্থিত, তা বহুদিন পৃথিবীতে "ইন্দোচীন" নামে পরিচিত ছিল। এর উত্তরে চীন ও বর্মা, দক্ষিণ ও পূর্বে চীন সাগর আর পশ্চিমে শ্যাম দেশ। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাসী ঔপনিবেশিকরা ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়াকে যুক্ত করে সমগ্র অঞ্চলটির নামকরণ করে ইন্দোচীন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ভারত ভিয়েতনাম সম্পর্কের সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে। দ্বিতীয় শতক নাগাদ ভিয়েতনামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভারতবর্ষ প্রভাবিত চম্পা নামে একটি রাজ্য গড়ে ওঠে। চম্পাতে প্রথম খ্রিস্টাব্দে তৈরি হিন্দু দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্তির সাক্ষ্য প্রমাণ ভারত ভিয়েতনামের মধ্যে আর্থিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক সম্পর্কের সুপ্রাচীন ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। ড. বিজন রাজ চ্যাটার্জি এই স্থানগুলিকে ভারতের 'Colony' উপনিবেশ বলে আখ্যা দিতে রাজি নন। তাঁর মতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলি ছিল ভারতীয়ভাবে প্রভাবিত রাজ্য বা Indianised States। এই প্রভাব হল 'রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত সাংস্কৃতিক প্রভাব' (Cultural influence without Political influence)।[১]

প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতার এই প্রসার প্রথমে ভারতের সঙ্গে ইন্দোচীন তথা দ্বীপময় ভারতের ব্যবসা ঘটিত আসা-যাওয়া, লেন-দেনের সূত্রকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক কে. এম. পানিক্কর-এর মতে, সেই ধারা বহন করেছিলেন তৎকালীন ভারতীয় বণিক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ্য ধর্মী বেনিয়া রাজা আর তাঁদের দ্বারা আনীত ব্রাহ্মণ্যগুরু আর পুরহিত শ্রেণী প্রভৃতি।[২] ঊনবিংশ শতকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে 'দ্বীপময় বৃহত্তর ভারত' ধারণা ভারতীয় তথা বাঙালী গবেষকদের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সুপ্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসস্তুপ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে নবরূপে ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ সময় বহু বাঙালি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা ইন্দোচীন যাত্রা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে গবেষক, সরকারী কর্মচারী ও ভূপর্যাটক প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন ছিলেন। আলোচ্য নিবন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে বিংশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে বিভিন্ন সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা ইন্দোচীনে ভ্রমণকারী বাঙালির স্মৃতিকথায় ফরাসী ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ভিয়েতনাম মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস কিরূপ ফুটে উঠেছে।

সূচক শব্দ: ইন্দোচীন, ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধ, বাঙালি পর্যাটক, ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন, গান্ধীর প্রভাব, জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি।

মূল আলোচনা:

১৯২২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়ে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী ইন্দোচীন গিয়েছিলেন প্রচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গবেষণার কাজে। তাঁর রচিত 'ভারত ও ইন্দোচীন' নামক

গ্রন্থটি অধ্যায়ন করলে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভিয়েতনামের ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক চালচিত্র অল্প হলেও অনুধাবন করা যায়। তিনি একজন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে বিষাদের সুরে বলেছিলেন যে, "... আজ যখন এই সাগরের উপকূলের দিকে তাকাই তখন দেখি নানা জাতির হা-হুতাশে বাতাশ অগ্নিময় হ'য়ে উপকূলভাগ দুঃসহ হয়েছে। এই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জনসমাকুল নগরসমূহের মন্দিরচূড়া পূর্ব্বে যেখানে অভ্যাগতকে সাদর আহ্বান জানাত এখন সেখানে শাস্ত্রীর তাড়নায় মানুষের নামতেও ঘৃণা বোধ হয়।..."[৩] বিংশ শতক ছিল এশিয়ার 'ঔপনিবেশিক মুক্তি' জাতীয় চেতনার এক নবীন পর্ব। সেই নবচেতনার আলোকরশ্মি ইন্দোচীন তথা ভিয়েতনামের জনগণকেও ফরাসী ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচীর ভাষায়, "আনামীরা এখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বাগ্র। সেই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর থেকে রাজনৈতিক দলও সংগঠিত হয়েছে। পারিসে অবস্থানকালে এই দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল।..."[৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপর্ব থেকেই এশিয়ার অধিকাংশ দেশপ্রেমিক মনুষজন পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে ঔপনিবেশিক দেশের ভূমিকে স্বাধীনতার আন্দোলনের কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করতে থাকেন। এসময় ভারতবর্ষসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ভারতীয়দের কাছে যেমন ছিল ব্রিটিশের লণ্ডন, তেমনি ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামী যুবকের দল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ফরাসী দেশের প্রাণকেন্দ্র প্যারিসে অবস্থান করে যে স্বাধীনতার লড়াই লড়ছিলেন তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখনিতে। তিনি ১৯২৭ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মলয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। অবশ্য এই ভ্রমণসূচীতে আজকের ভিয়েতনাম যুক্ত না থাকলেও কোচিন-চীন, আনাম, টনকিং, সাইগণ, প্রভৃতি ভিয়েতনাম প্রদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার পথে ফরাসী জাহাজে এক আনামী যুবকের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "পড়ুশু একটী আনামী যুবক এসে কবির সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। এই জাহাজেই যাচ্ছে, প্যারিস-ফেরৎ।...এই যুবকের মুখ দেখলে মনে হয়, যেন কি এক অব্যক্ত বিষাদ মাখা। আনামবাসীদের ইন্দোচীন শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্যারিসে নানা রকম বই প'ড়েছি—এই শাসন ব্রিটিশদের ভারত—শাসনের মতন কেবল যে শাসিত-বর্গেরই কল্যাণের জন্য নয়, সে-বিষয়ে আমার কোনও ভুল ধারণা নেই। একে জিজ্ঞাসা ক'রে দুই-একটি কথায় যা আভাস পাওয়া গেল, তা থেকে তুলনায় সমালোচনা ক'রে দেখে, ইংরেজকে তার Prestige -এর বা অহমিকার বালাই সত্ত্বেও অনেক গুণে ভদ্র ব'লে মনে হ'ল। একদল আনামী যুবক এখন প্রাণপণে চেষ্ট ক'রছে, যাতে তাদের ভাষা, সাহিত্য আর জাতীয়তা নষ্ট না হয়।..."[৫]

১৯২৮ সালে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রমজুমদার লণ্ডন, প্যারিস হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ না করলেও ভিয়েতনামের তৎকালীন আনাম প্রদেশে এক রিক্সা দূরঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালীন ভিয়েতনামীরা যে অপরিতিত ছিলেন না তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক মজুমদার

লিখছেন যে, "...বলিদ্বীপ থেকে জাভায় ফিরে এসে আনামে যাই। এখানেই ছিল প্রাচীন হিন্দু চম্পা রাজ্য।...একদিন এক দুর্গম স্থানে রিকশা করে মন্দির দেখতে চলেছি। পথে আর একটি রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমার রিকশাটি উল্টে যায়। আমি গাড়ীর নীচে পড়ে যাই।...অল্প দূরে একটি যুবক দাঁড়িয়ে ছিল; সে এসে আমাকে তুলল এবং জল এনে ময়লা ধুয়ে দিল। আমি যে বিদেশী—তা বুঝতে পেরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'দেশ কোথায়?' বললাম, 'ভারতবর্ষ।' শুনেই মাথায় হাত ঠেকিয়ে সে বলল, 'La Patrie de Gandhi'—অর্থাৎ গান্ধীর দেশ। ওদেশে তখন ফরাসীদের আধিপত্য থাকায় শিক্ষিত লোকেরা ফরাসী বলত।..."[৬]

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর রাজনৈতিক লড়াইয়ের আত্মপ্রত্যয়কে ব্রিটিশই নয়, সমস্ত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর দল যে সমীহের চোখে দেখত তা ১৯৩১ সালে বাঙালি ভূপর্যাটক রামনাথ বিশ্বাস কম্বোজ অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এক পুলিশ আধিকারিক রামনাথ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তিনি পুলিস অফিসারটিকে বলেছিলেন যে, "কম্বোজদের ধমকিয়া, অত্যাচার করে আপনাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে, আমার সংগে সেরূপ ব্যবহার চলবে না, আর কিছু আমরা না পারি, সত্যাগ্রহ করা শিখেছি। চলুন, "মহাত্মা গান্ধীকী জয়। তখনকার দিনে ইন্দোচীনে সত্যাগ্রহ এবং মহাত্মা গান্ধীর কার্যকলাপ নিয়ে সাধারণ লোকও আলোচনা করত। ভদ্রবেশী কম্বোজ মহাত্মা গান্ধির নাম শুনে কেঁপে উঠল।"[৭]

অনুরূপভাবে শ্রীস্বাপনে অবস্থানকালে এক স্থানীয় পোস্ট মাস্টার রামনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষে গান্ধী পরিচালিত আইন অমান্য বা সিভিল ডিস অবিডিয়েন্স চলছে সে বিষয়ে জানতে। ভারতের রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও পোষ্টমাস্টার ইন্দোচীনে এই ধরনের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ছিল ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মমতা সত্যাগ্রহের মত অশস্ত্রনৈতিক আন্দোলনের কোন অবকাশ রাখেনি। রামনাথ বিশ্বাস লিখছেন যে, "আমার কথা শুনে তিনি থ মেরে গেলেন এবং বললেন তাঁদের দেশে ভারতের সত্যাগ্রহীদের বৃটিশরা যেমন ব্যবহার করে যদি ফরাসীরা সেইরূপ ব্যবহার করে তবে কোন কথাই ছিল না, তারাও সত্যাগ্রহ নিশ্চয়ই করতেন। কিন্তু ফরাসীরা অন্য ধরণে শাসন চালায়।"[৮] সেদিন রামনাথ বিশ্বাস পোষ্টমাস্টার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি ভিয়েতনামে পৌঁছে পোস্ট মাস্টারের কথার সারমর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তিনি আনাম কয়েদীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, যেদিন শুনলাম আনাম কয়দীর সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন তাদের অন্যত্র না পাঠিয়ে মাথা কেটে ফেলা হয় সেদিনই বুঝলাম আনামিতরা কেন সত্যাগ্রহ করে না। সত্য কথা বলতে কি ফরাসীরা মহাত্মা গান্ধীর মত লোককে আতুর ঘরেই মেরে ফেলত। ভারতে যদি ফরাসী সাম্রাজ্য হ'ত তবে ভারতের জহোরলাল, চিত্তরঞ্জন জন্ম নিতেন বটে কিন্তু তাঁদের মৃত্যু কাজের সূচনাতেই হ'য়ে যেত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সেদিক দিয়ে ধন্যবাদ পাবার দাবী রাখে।"[৯]

রামনাথ বিশ্বাস একজন ভূপর্যাটক ছিলেন। তাই তাঁর লেখা থেকে উৎসারিত হয়েছিল সমকালীন ভিয়েতনামের ঔপনিবেশিক বিরোধী রাজনৈতিক লড়াইয়ের উত্তাপ। ইন্দোচীনে থাকাকালীন তিনি সেখানকার ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি লিখছেন, "তখন ছিল ১৯৩১ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগ। ভারতের ক'জন লোক তখন বলসেভিজম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল?... সিংগাপুরে কতকগুলি চীনা যুবকের সংস্পর্শে এবং নোয়াখালি নিবাসী গৌরীশচন্দ্র সিংহ রায়ের দয়ায় বলসেভিজমের

ভ্রম ও ভয় অনেকটা অপসরণ হয়েছিল। এদের কাছে এসেই আজ সর্বপ্রথম বলসেজিমের কথা শুনলাম। এরা হল আনাম এবং চীন দেশের কতগুলি প্রগতিশীল পলাতক।"[১০] ইন্দোচীন তথা ভিয়েতনামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে প্রতিবেশী চীন দেশকেও বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, ১৯২৪ সালে সান ইয়াৎ সেন চীনের ক্যান্টনে একটি জাতীয়বাদী সরকার গঠন করেন। তখন এম. এন. রায় আন্তর্জাতিক কমিন্টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে যান। কমিন্টার্নের তখন মূল উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁদের নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লব সংগঠিত করা। এই সময় হো চি মিন ক্যান্টনেই ছিলেন এবং তিনি এই কমিটিতে যোগদানের জন্য এম. এন. রায়ের কাছে আবেদন করেন।[১১] সাইগণে রামনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে পারেয়ারী নামক এক ফরাসী কমিউনিষ্ট মতালম্বী পর্যাটকের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। যে ছিল আন্তর্জাতিক কমিন্টার্নের প্রতিনিধি। এবিষয়ে রামনাথ বিশ্বাসের মন্তব্য তৎপর্য্যপূর্ণ, "সেদিন রাত্রে পারেয়ারী ভিয়েতনামীদের আথিক দুর্দ্দশা কত নীচে নেমে গেছে তাই আমাকে দেখিয়ে দিতে লাগলেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় দেখাবার পর ফরাসীদের দোষী করতে ছিলেন। ফরাসী হয়ে ফরাসীদের দোষী করা আশ্চর্যের বিষয় বলতেই হবে।"[১২]

আবার এই সময় ইন্দোচীন জুড়ে যে ছোট ছোট রাজনৈতিক গ্রুপ ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের জন্য সক্রিয় ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় রামনাথ বিশ্বাস যখন অংকোর ওয়াট পরিদর্শন করে এক চীনা ভদ্রলোকের বাড়িতে যখন অবস্থান করেছিলেন। সেখানে কতকগুলি পুলিশ ও অন্যান্য যাত্রীদের আলোচনাচক্র বসেছিল। যেখানে চীনা যুবকদের ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে কথা বলতে শুনেছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সোয়াই রিয়াৎ নামক এক ছোট্ট শহরে অবস্থানকালে রামনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে নাংতে নামক এক আনামী যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যে ছিল আনহোয়াত সোসিয়েল ডিমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারী। তিনি একটি চরিকূট রামনাথ বিশ্বাসকে দিয়েছিলেন বিপদে পড়লে আনামীদের দেখাতে। যদিও ফরাসীদের কাছে সেই কাগজটি গোপন রাখতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে রামনাথ বিশ্বাস পাঠকদের উদ্দেশ্য বলেছেন, "আনামিতদের মধ্যে ফরাসীদের নিযুক্ত কোনও গোপনীয় পুলিশ কি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু আনামী গোপনীয় পুলিশের প্রকৃতি অন্য রকমের। তারা পেটকাওয়াস্তে অথবা স্ত্রীর গয়ণা গড়াবার জন্য ফরাসীদের চাকরি করে না। তারা চাকরী করে বেঁচে থাকবার জন্য। তারা জাতের মংগলটা নিজের মংগল হতে বড় করে দেখে। সেই জন্যই "নিমকহালালী" করত না। আনামিতদের মধ্যে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকলের মন একই ছাঁচে গঠিত ছিল। সেইজন্য আজ মুষ্ঠিমেয় আনামিত সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীর সঙ্গে একাই লড়তে ভয় করছে না।"[১৩] আনামীদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে রামনাথ বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন, "আনামরা সকল সময়েই স্বাধীনতাপ্রিয়। তারা স্বাধীনতা অর্জনের বিদ্রোহ আরম্ভ করে ১৮৮৪ সালে। তাদের জাতীয়ভাব এবং স্বাধীনতাবোধ একই সংগে জাগ্রত হয়। প্রথম প্রথম তারা বিদ্রোহ করত। বিদ্রোহে সকলে যোগ দিত না। তবুও ফরাসী সরকার বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার ভান করে গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করতে কসুর করত না। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে হইতে তারা বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে, এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় গণ-জাগরণের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে বদ্ধ পরিকর হয়। গণ-জাগরণের কাজে শুধু কোচীন চীনা আনাম এবং তংকিনের যুবকরাই যোগ দিয়েছিল। কম্বোজ এবং লোয়াস প্রদেশের লোক এরূপ বৈজ্ঞনিক ধরণের গণ-আন্দোলন মোটেই পছন্দ করত না। রাজভক্তি এবং ধর্মের মোহ এই দুই প্রদেশের

লোককে গণ-জাগরণ হতে বিরত রেখেছিল। যাতে কম্বোজ এবং লোয়াসরা গণ-আন্দোলন হতে বাদ না পড়ে সেজন্য আনামিতরা কম্বোজ এবং লোয়াসের নানা স্থানে ঘাঁটি করে। আমাকে যেখানে ডেকে নেওয়া হয়েছিল সে স্থানটাও তারই একটি।”[১৪] এখানে রামনাথবাবু বোর্ডারদের কাছ থেকে শুনেছিলেন ইন্দোচীনে ইংলিশ ভাষা শিক্ষার উপর ছিল প্রতিবন্ধকতা। কারণ ইংলিশ ভাষায় প্রকাশিত মার্কসইজমের অনেক বই চীন দেশ থেকে আসলেও ফ্রেন্চ ভাষায় প্রকাশিত কোন প্রগতিশীল সাহিত্য ইন্দোচীন আসত না। সেইজন্যই আনামিরা যাতে ইংলিশ শিখতে না পারে তার জন্যই এরূপ ফরাসী শাসন নীতি।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ভারতবর্ষে যখন জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িত যুবক যুবতীরা জেলে যাচ্ছে, মার খাচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে তেমনি ভিয়েতনামে এই সময় যাঁরা জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য জেলে যাচ্ছিলেন তারা কিন্তু আর ফিরে আসছিলেন না। এবিষয়ে রামনাথ বিশ্বাসকে একজন ভিয়েতনামী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, “আমরা কিছুই করতে পারছি না। তবে গ্রামে গুপ্ত ইউনিয়ন হয়েছে। শহরগুলিতে মজুরদেরও সেইরূপই ইউনিয়ন হয়েছে এরবেশি কিছুই নয়। যারাই ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছে এবং সেই সংবাদটি ফ্রেনচম্যানরা জানতে পারছে তাকেই তারা ধরে নিয়ে জেলে পুরছে এবং দরকার মনে করলে বিনা বিচারে গিলোটিনে দিচ্ছে তবুও আমরা দমে যাই নি, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি, এবং কাজ করে যাবও।”[১৫]

সাইগণে অবস্থানকালে রামনাথের সঙ্গে ইন্দোচীনের নিকটস্থ দ্বীপগুলি থেকে কয়লার খনিতে কাজ করা দুইজন যুবকও সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন । তাঁরা ভারতে চলা অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল। এবিষয়ে রামনাথবাবু লিখেছেন যে, “প্রশ্নকারীরা যখন শুনলেন বৃটিশ কাউকে সাবাড় করে না শুধু অত্যাচার করে তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাদের আলোচনা করতে না দিয়ে আমি বললাম, যেখানে যতদূর করলে কার্য ফতে হয় বৃটিশ তাই করে। দরকার হলে গুলিও চালায়। আপনারা হয়ত ফরাসীদের স্বার্থে প্রবল আঘাত করেছেন সেজন্য ফরাসীরা আপনাদের গিলটিনে দিচ্ছে, এর বেশি আর কি হতে পারে। একজন বললেন, “Exectly that” যার বাংলা আমি করব “অবিকল তাই।”[১৬] এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় রাশিয়ার কমিন্টান প্রচারিত কমিউনিস্ট চিন্তাধারার পাশাপাশি ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রতি ইন্দোচীনের মানুষজনের আগ্রহ কম ছিল না।

হ্যানায় পৌঁছে রামনাথ বিশ্বাস কানাইয়া নামক এক দুধ বিক্রেতার কাছে শুনেছিলেন, যে হোটেলে তিনি উঠেছেন সেখানে ভিয়েতনামী স্বদেশীদের আড্ডা। কিন্তু রামনাথের জানার আগ্রহ ছিল উত্তর ভিয়েতনামের লোক স্বাধীনতার দিকে কতদূর অগ্রসর হয়েছে? তিনি এক বৃদ্ধ পাঠানের কাছ থেকে ভিয়েতনামের গণান্দোলন সম্বন্ধে শুনেছিলেন, “ভিয়েতনামীদের গণ আন্দোলন ফরাসীরা এমনই সুচতুর ভাবে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে যে পৃথিবীর লোক ভিয়েতনামীদের সম্বন্ধে একটি কথাও জানছে না। আপনার কাছে অনেকেই চীনা ডাকাতের গল্প করবে। আপনার মনে আতঙ্ক এনে দিবে কিন্তু ভাববেন না, যাদের নিয়ে এই গল্প রচনা করা হয়, তারা ডাকাত, তারা হল প্রগতিশীল।”[১৭] হ্যানয়ে রামনাথবাবু শুনেছিলেন ভিয়েতনামী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কেবলমাত্র আনামী ভাষায় সংবাদপত্র বের করতেন। তবে দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা ইংরেজী এবং আনাম ভাষায় তাদের সংবাদ পত্রও প্রকাশ করতেন।

'দুচাকায় পৃথিবী' গ্রন্থের রচিয়তা অপর এক বাঙালী ভূপর্যাটক বিমল মুখার্জী ১৯৩৭ সাল নাগাদ ভিয়েতনামের প্রাণকেন্দ্র সাইগণ শহরে পৌঁছে ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা না করলেও সাইগণ বন্দরে ভারতীয় জাহাজ লক্ষ্য করেছিলেন। সেই জাহাজের কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে বাঙালি ছিলেন সেবিষয়েও উল্লেখ করেছেন। ফলে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনকালেও বাঙালির ভিয়েতনাম যোগসূত্র সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৮]

১৯৫৪ সালে জেনেভায় ইন্দোচীনের যুদ্ধ বিরতির চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ তদারকী কমিশনের চেয়ারম্যান হয়। 'ইন্দোচীনের কথা' গ্রন্থের লেখক অজিত কুমার তারন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যুক্ত থাকার সুবাদে এই কমিশনের সঙ্গে ইন্দোচীন গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেরূপ বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল, ভিয়েতনামেও ফরাসীরা সেই ধরণের অঘন ঘটানোর প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভিয়েতনামের নারীরা এই মহাসংকটে বিশেষ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন বলে অজিত কুমার তারন লিখেছেন। তাঁর মতে, "ভিয়েৎনামের নারীরা পশুর বদলে নিজেরাই কাঁদে লাঙ্গল-জোয়াল টেনে খাদ্য সঙ্কট থেকে দেশকে বাঁচিয়ে রাখে। ফরাসীরা বস্ত্র আমদানী বন্ধ করে দিলে চরকা ও তাঁতের সাহায্যে নারীরা দেশের বস্ত্রভাবের অবসান ঘটায়। ফরাসীরা সংবাদপত্র বন্ধ করে দিলে ভিয়েৎনামী স্ত্রী লোকেরা তখন গভীর অরণ্য হতে ছাপাতে থাকে কাগজ। শাসকেররা বন্ধ করে দিল শাসিতের সঙ্গে ফরাসী মুদ্রা পিয়েস্তারের লেনদেন। ওরা ভেবেছিল এইভাবে ঘটাবে অর্থসঙ্কট। সবই বৃথা হলো, নারীরা ছাপাতে শুরু করল নিজেদের নোট (ডং)। তাতে কৃতকার্য হল তারা, এখনও সেই নোটই চলছে উত্তর ভিয়েতনামে।"[১৯]

ইউরোপের মাটিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটলেও একটা সময় যুদ্ধ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পরে। সেই রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একমত হলেও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোন ঐক্য গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ভিয়েতনাম সেই সংকট থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ভিয়েতনামের জাতীয় বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ভিয়েতনাম সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদল ভিয়েতনামের সঙ্গে মিশে যায়। এদের সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলন ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তি এবং জাপানী ফ্যাসিবাদী শক্তি উভয়ের পক্ষেই বিপদজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। ২রা সেপ্টেম্বর হো চি মিন গণবিপ্লবের ঘোষণা করেন। ফলস্বরূপ সীমিত ভূখণ্ড হলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বহু আগে ভিয়েতনামীরা স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীন করতে সফল হয়েছিল। খণ্ডিত ভাবে কোন দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে তার পরিণতি কিরূপ ভয়ঙ্কর হয় তা ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভাজনে নিপীড়িত ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা আছে। ভারতবর্ষের মতোই ভিয়েতনাম উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর উদ্বাস্তু সমস্যার সম্মুখীন হয়। দক্ষিন ভিয়েতনাম থেকে দুই-তিনটি ছেলেপুলে নিয়ে উত্তর ভিয়েতনামে আসা এক উদ্বাস্তু ভদ্রমহিলা অজিত কুমার তারণের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বলেছিলেন যে, "মশাই, এ টাকা তো এখানে কেউ-ই নিচ্ছে না। তাছাড়া আমার কাছে উত্তর এলাকার টাকাও নেই, শিশুদের নিয়ে মহাবিপদে পড়েছি, পয়সা না হলে যে, আমাদের খাওয়াই মিলবে না, উপোস করতে হবে। কাল অবিশ্যি উদ্বাস্তু শিবিরে যেতে পারলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। আপনারা তো কমিশনের লোক, তাই দয়া করে যদি আজ আমাকে কিছু এদেশের নোট দিয়ে সাহায্য করেন তবে খুবই উপকার

হয়।”[২০] অবশ্য ভিয়েতনামের উদ্বাস্তু সমস্যার নেপত্রে শুধুমাত্র ভৌগলিক কারণ ছিল,ভারতবর্ষের মতো কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিভাজন ছিল না।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৫৩ সালের ২০শে নভেম্বর ঐতিহাসিক দিয়েন বিয়েন ফু-র জয় সমগ্র এশিয়া তথা বিশ্বের ঔপনিবেশিক অঞ্চলে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের জেনাভা সম্মেলন ভিয়েতনামের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছিল। ভারত শুধু ইন্দোচীনের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থনই করেনি, যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পর ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যে কমিশন গঠিত হয় ভারত ছিল সেই কমিশনের অন্যতম সদস্য। ১৯৫৪ সালের ৩১শে জুলাই এই কমিশনের তিন সদস্য ভারত, পোল্যান্ড, কানাডার প্রতিনিধিরা নয়াদিল্লিতে এক অধিবেশনে মিলিত হন। উক্ত সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু।[২১] বিংশ শতকে ইন্দোচীন ভ্রমণরত ভারতীয় তথা বাংলা পর্যাটকদের লিপিবদ্ধ স্মৃতি কথা অধ্যায়নে বহু মূল্যবান তথ্য উঠে আসে। ভিয়েতনামের ফরাসী ঔপনিবেশিকতা বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে যেমন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব ছিল তেমনি ভিয়েতনামের জনগণের একাংশ ভারতবর্ষে এম.কে. গান্ধীর নেতৃত্বে চলা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী লড়াইয়ের বিষয়েও আগ্রহী ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যেখানে সমাজতন্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ না হলেও ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিষ্ট দল ঐক্যবদ্ধভাবে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত করতে সফল হয়েছিল। তবে ভিয়েতনামের ফরাসী শাসন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের থেকেও ভয়ঙ্কর ছিল। আবার ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তির পরিনাম স্বরূপ ভিয়েতনাম উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হলেও ভারতবর্ষের মতো ধর্মীয় কারণে বিভক্ত হয়নি। অবশেষে একথা বলা যায় অল্প জনসংখ্যা হলেও সাধরণ ভিয়েতনামীদের ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী যে রাজনৈতিক চেতনা পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল তা পরবর্তীকালে কয়েক দশক ধরে চলা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে আরও ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

তথ্যসূত্র:

১. গাঙ্গুলী দেবারতী: ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যালোচনায় বিজন রাজ চ্যাটার্জির অবদান, ইতিহাস অনুসন্ধান ৩১, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০, পৃঃ ৯২২

২. Panikkar: K.M.: Asia and Western Dominance, George Allen & Unwin Ltd, London, 1953, page-34

৩. বাগচী শ্রী প্রবোধচন্দ্র: ভারত ও ইন্দোচীন, শ্রীকুন্দ ভূষণ ভাদুড়ী, ৯ নং রুস্তমজী স্ট্রীট, বালীগঞ্জ, প্রথম প্রকাশকাল ১৩৫৭, পিডিএফ https://granthagara.com, পৃঃ৩

৪. ঐ পৃঃ১৭

৫. চট্টোপাধ্যায় কুমার সুনীতি: দ্বীপময় ভারত, বুক কোম্পানি লিমিটেড, ৪-৩ বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টম্বর ১৯৪০, পৃঃ ৩০

৬. মজুমদার শ্রীরমেশচন্দ্র: জীবনের স্মৃতিদীপে, জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১১৯, লেনিন সরনি, কলিকাতা-৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯, পৃঃ ৬৮

৭. বিশ্বাস রামনাথ: ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর, শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, পি ডি এফ https://granthagara.com, পৃঃ

৮. ঐ পৃঃ ২৯

৯. ঐ পৃঃ ৬৪
১০. ঐ পৃঃ ২৩
১১. ROY M.N. : MEN I MET, LALVANI PUBLISHING HOUSE, CALCUTTA, First Published, 1968, page-141
১২. বিশ্বাস রামনাথ: ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর, শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, পি ডি এফ https://granthagara.com পৃঃ ১২২
১৩. বিশ্বাস রামনাথ: ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর, শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, পি ডি এফ https://granthagara.com পৃঃ ৬৬
১৪. ঐ পৃঃ ২৪
১৫. ঐ পৃঃ ৭৮
১৬. ঐ পৃঃ ১১৬
১৭. ঐ পৃঃ ১৬৫
১৮. মুখার্জি বিমল: দুচাকায় দুনিয়া, সম্পাদনা: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১-এ,ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন,কলকাতা-৭০০০১৯, তৃতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারী ২০০৬, পৃঃ ৩০২
১৯. তারণ কুমার অজিত: ইন্দোচীনের কথা, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ:আশ্বিন ১৩৬৫, পৃঃ ৬১
২০. ঐ পৃঃ ৬৯
২১. স্বাধীনতা পত্রিকা, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৪।

বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চায় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান

মোসাম্মৎ রোজিনা খাতুন
গবেষক, ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পবিত্র কুরআন বিশ্বমানবতার ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সফলতার প্রধান জ্ঞানের উৎস। আরবিতে নাযিল হলেও এর আবেদন সার্বজনীন। বাংলায় কুরআন অনুবাদ শুরু হয় ১৮০০-এর দশকে। প্রথমদিকের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলাভি ফার্সিতে কুরআন অনুবাদ করেন। বাংলায় এর প্রারম্ভ হয় আমীর উদ্দীন বসুনিয়ার মাধ্যমে, এবং গিরিশ চন্দ্র ১৮৮১-১৮৮৫ সালে প্রথম সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনায় জন্মগ্রহণকারী এই বহুভাষাবিদ ১৮টি ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে কাজ করেন। তাঁর উক্তি: "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি"। ১৯৪০-১৯৪৯ সালের মধ্যে ড. শহীদুল্লাহ পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে "মহাবাণী" ও "তেলাওয়াতে কুরআন" শিরোনামে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুবাদ সহজ, প্রাঞ্জল এবং ভাষার সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। এটি বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তৈরি করেছে। ড. শহীদুল্লাহ বাংলা সাহিত্য ও ইসলামী সংস্কৃতিতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তাঁর অনূদিত কুরআন বাংলা সাহিত্যের ইসলামী শাখায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সূচকশব্দ: ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অনুবাদ, আল কুরআন, তাফসীর, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা, ইসলামি সাহিত্য।

ভূমিকা:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হল আল্লাহ্‌র কিতাব। স্বয়ং স্রষ্টার বাণী। সৃষ্টি-রচিত কোন বই নয় এটা। স্বয়ং তিনিই অবতীর্ণ করেছেন এই অমূল্য বাণী হযরত মুহাম্মাদ সা.এঁর উপর মানব জাতি তথা জিন জাতির পথনির্দেশ হিসেবে। আল-কুরআন এসেছে আমার জন্য, আপনার জন্য তথা সবার জন্য। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল জাতির জন্য। আলিম, গায়ের আলিম, পণ্ডিত, মূর্খ, দ্বীনদার, বেদ্বীনদার সকলের জন্য। এটাই রবের শেষ চিঠি। এরপর কোন বার্তা নিয়ে আসমানী গ্রন্থ আসবেনা আর। পৃথিবীর মৃত্যু পর্যন্ত একমাত্র বার্তাবাহক এই মহাগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন হল বিশ্বমানব সমাজের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সর্ববিষয়ের সফলতা ও অসারতার সার্বিক জ্ঞানের প্রধান উৎস। আরবী ভাষায় নাযিল হলেও এই মহাগ্রন্থের আহ্বান ও আবেদন বিশ্বজনীন তথা সার্বজনীন। বঙ্গভূমিতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে আধুনিক গবেষণা অনুসারে আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে (৭৮৬-৮০৯)। আর এদিকে বাংলার বুকে আঠার শতক পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি কোন বঙ্গানুবাদ রচনায় কেউ এগিয়ে এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে হ্যাঁ, অনুসন্ধান চালিয়ে জানা যায়, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ ঊনিশ শতকের প্রথম দশকে আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদের সূচনা

হয় বাংলাদেশের রংপুর জেলার মুকুটপুর নিবাসী আমীর উদ্দীন বসুনিয়ার মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮১-১৮৮৫ খ্রি.) আল-কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার কৃতিত্ব ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভাই গিরিশ চন্দ্রের। বাংলা ভাষা বাঙালীদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আর একথা যে কোন ভাষাভাষী মানুষদের ক্ষেত্রেই বলা যায় যে, তাদের কাছে মাতৃ ভাষার কোন বিকল্প হয় না। "নানান দেশের নানান ভাষা/ বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা"। নিধু গুপ্তর (১৭৪১-১৮৩৯ খ্রি.) স্বভাষা ও স্বদেশ-প্রেমের এ গান অবশ্যই প্রনিধান যোগ্য। সুতরাং যেহেতু আল-কুরআনের অন্যভাষায় অনুবাদ থাকলেও বাঙালীদের জন্য মাতৃভাষা বাংলার বিকল্প হয় না, তাই বিলম্ব হলেও বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়েছে পবিত্র বাণী আল-কুরআন। তাই ঊনীশশতকের শেষের দশকের এমনই একজন পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদক, জ্ঞানতাপস, বহুভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক হলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর কর্ম প্রেরণা প্রতিভাত হয়েছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি, ও ধর্মীয় জীবনে। বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চায় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কতখানি অবদান রয়েছে সে সম্বন্ধে নীতিদীর্ঘ পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য নিবন্ধে।

ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগানা জেলার বসিরহাটের 'পিয়ারা' নামক গ্রামে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ জুলাই শুক্রবার (আষাঢ় ২৭, ১২৯২) জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর "আক্বীকার" সময় নাম ছিল 'মুহাম্মদ ইব্রাহিম'। শহীদে কারবালা আরবী ১লা মাস অর্থাৎ মুহার্‌ রাম মাসের চাঁদে মায়ের গর্ভে তিনি এসেছিলেন বলে শহীদ নামের সাথে মিলিয়ে মা পুত্রের নাম দিয়েছিলেন শহীদুল্লাহ। তাঁর পিতার নাম ছিল মুফিজুদ্দীন আহমদ ও মাতার নাম নুরুন্নেসা। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাল্যে গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করলেও আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় হাতে খড়ি হয় তাঁর স্বগৃহ থেকে। ১৯০৪ খ্রি. হাওড়া জেলা স্কুল থেকে 'এন্ট্রান্স' ও ১৯০৬ খ্রি. কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. (বর্তমান এইচ. এস. সি'র সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হুগলী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯১০ সালে সিটি কলেজ কলকাতা থেকে সংস্কৃতে বি.এ (অনার্স) পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাঙালি মুসলিম হিসেবে তিনিই বেদ সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি উক্ত বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত নিয়ে এম. এ. পড়তে চাইলে তথাকার সংস্কৃত বিভাগের কতিপয় অধ্যাপক মণ্ডলী তাঁর চরম বিরোধিতা করেন। অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্ণধার ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরমর্শে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম ও একমাত্র ছাত্র হিসেবে এম. এ (১৯১২) ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

যশোর জেলা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯০৮-০৯ খ্রি. কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯১১-১৯১৫ খ্রি. পর্যন্ত "বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি"র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খ্রি. তিনি বি. এল. পাস করার পর ১৯১৫ খ্রি. সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এবং এ বছরই তিনি "আল-এসলাম" পত্রিকার সম্পাদকও নিযুক্ত হন। তারপর তিনি ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ খ্রি. পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার বসিরহাটে আইন ব্যবসা করেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯২০ খ্রি. শিশু পত্রিকা "অঙ্গুর" এর সম্পাদনা ও ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯২৬ খ্রি. তিনি ফ্রান্সের (প্যারিসে) সরোবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ভাষার উপর গবেষণা শুরু করে ১৯২৮ সালে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। এর পাশাপাশি একই সময়ে

তিনি জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষা অধ্যয়ন করেন। উক্ত বছরে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই সময় হতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও রিডার হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখান থেকে ১৯৪৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর তিনি বগুড়ার সরকারী আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৩ - ১৯৫৫ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফরাসি ভাষায় খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগে যোগদান করে ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫১-১৯৬০ খ্রি. পর্যন্ত উর্দু ভাষার অভিধান প্রকল্পেও তিনি সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। পরে পূর্ব পাকিস্তানি ভাষার আদর্শ অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক হিসেবে বাংলা একাডেমীতে যোগ দেন। ১৯৬১-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের অস্থায়ী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক গঠিত বাংলা একাডেমীর পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। উপরন্ত তিনি মাসিক “The Peace”, “বঙ্গভূমি”, পাক্ষিক “তকবির” প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালনসহ ১৯৫১ খ্রি. ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানের সদস্য, পাকিস্তান লেখক সংঘ ও বাংলা একাডেমীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে বাংলা পঞ্জিকা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ পায়।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমিরিটাস অধ্যাপক পদ লাভ করেন। একই বছর ফ্রান্স সরকার তাঁকে সম্মান জনক পদক “নাইট অফ দি অর্ডারস অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স” দেয়। ঢাকা সংস্কৃত পরিষদ তাকে ‘বিদ্যাবাচস্পতি’ উপাধিতে ভূষিত করে। পাকিস্তান আমলে তাকে ‘প্রাইড অফ পারফরমেন্স’ পদক (১৯৫৮)ও মরণোত্তর ‘হিলাল ই ইমতিয়াজ খেতাব' প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে মরণোত্তর ‘ডি. লিট’ উপাধি দেয়। ১৯৮০ সালে মরণোত্তর (Life time achievement award) বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়। তিনি ‘চলন্ত শব্দ কল্পদ্রুম’ বলেও পরিচিত।

১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই ঢাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের পাশে সমাহিত করা হয়। ভাষা ক্ষেত্রে তাঁর অমর অবদানকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে ঐ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ঢাকা হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় “শহীদুল্লাহ হল”।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান

বহু ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও প্রাচ্যে অন্যতম সেরা ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান। জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ’র স্মরণীয় উক্তি ছিল: “আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য,তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী”। ভাষাবিদ শহীদুল্লাহ্ প্রায় ২৪টি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এর মধ্যে ১৮টি ভাষার ওপর তাঁর উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্য ছিল।এই উল্লেখযোগ্য ভাষাসমূহ হলো: “বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী, আরবী, ইংরেজি, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি, কাশ্মীরি, নেপালি, সিংহলি, পালি” প্রভৃতি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই দেশের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে বাংলা-কে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে যে ক-জন ব্যক্তি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর এই ভূমিকার ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ অনেকখানিই প্রশস্ত হয়। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত সাহিত্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এম.এ পাশ করার পরই তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির সম্পাদক হন। তাঁর সাহিত্য সাধনা তিনটি ধারায় প্রবাহিত- "বাংলা সংস্কৃতি", "ইসলামি ঐতিহ্য" ও "রবীন্দ্র তথা আধুনিক ঐতিহ্য"। তিনি প্রায় ৪৮ টির মত গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

- ভাষা ও সাহিত্য
- বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত
- দীওয়ানে হাফিজ
- রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম
- নবী করিম মুহাম্মাদ স.
- ইসলাম প্রসঙ্গ
- বিদ্যাপতি শতক
- বাংলা সাহিত্যের কথা (২ খণ্ড)
- বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
- ব্যাকরণ পরিচয়
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- মহররম শরীফ
- টেইল ফ্রম দি কুরআন
- Buddhist Mystic Songs (১৯৬০)
- Hundred Sayings of the Holy Prophet
- মহাবাণী (আল-কুরআনের বঙ্গানুবাদ)

বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চায় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান

২৬, ফিয়ার্স লেনে মেডিক্যাল কলেজের মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেলে অধীক্ষক থাকাকালীন সেখানে মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী ও বিশিষ্ট পীর মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের সাথে ভাষাবিদ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর পরিচয় ঘটে এবং তিনি তাঁদের সাথে আল-কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। এই সময় হতেই বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করার আগ্রহ তাঁর মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ:

> "কুরআন মাজীদের অনুবাদ যে ভাষাতেই হোক না কেন অসম্ভব। তবে অনুবাদে মূলের কিছুটা ছায়া দেওয়া যাইতে পারে। নূরজাহানের ছায়াতে কি নূর থাকতে পারে? কুরআন তো আল্লাহ্‌র কালাম, কিন্তু সাধারণ আরবী ভাষায়ও এমন শব্দ আছে যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় দেওয়া দুঃসাধ্য"।

তাঁর রচিত "কুরআন প্রসঙ্গ" নামক সংকলন গ্রন্থটিকে তাঁর কুরআন অনুবাদের ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে সংকলিত প্রবন্ধগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক:কুরআনের আলোকে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা। দুই:কুরআন, হাদীস, তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) ইত্যাদির আলোকে কুরআনের অনুবাদ অনুশীলন প্রভৃতি নিয়ম-নীতি নির্ধারন।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত এই 'কুরআন প্রসঙ্গে'র বিভিন্ন প্রবন্ধ সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ১৯১৫ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। অতঃপর তিনি ১৯৪০ খ্রি. থেকে

১৯৪৯ খ্রি. পর্যন্ত সূদীর্ঘ ১০ বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ কুরআন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম হন। তবে ড. আজহার উদ্দীন খাঁন বলেন: "দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাধনায় তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত করেন"। প্রথমে তাঁর অনূদিত কুরআন প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। অতঃপর তাঁর রচিত **"মহাবাণী"** ও **"তেলাওয়াতে কুরআন"** আখ্যায় পৃথক দু'টি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাঁর অনূদিত কুরআন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

(ক) "মহাবাণী"

তাঁর পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ হতে প্রথমে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ফীল পর্যন্ত মোট ১১ টি সূরার অনুবাদ "মহাবাণী" শিরোনামায় ধারাবাহিক ভাবে কলকাতার "জাগরণ" ও ঢাকার "যুগবাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর তিনি গ্রন্থাকারে কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে ইচ্ছা পোষণ করলে পুত্র মুহাম্মদ সাফিয়্যুল্লাহ টীকাটিপ্পনীসহ সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাকারা-র ৯৩ নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করেন। তবে ইতিপূর্বেই তিনি "মহাবাণী" শীর্ষক সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীরসহ সূরা ফীল পর্যন্ত সূরা গুলোর বঙ্গানুবাদ নিজেই প্রকাশ করেন। আজহারউদ্দীন খান ও অধ্যাপক আবদুল হাই মহাবাণী গ্রন্থটি ১৯৪০ খ্রি. প্রকাশিত হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এ তথ্য সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ ড. শহীদুল্লাহ এই "মহাবাণী" গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন ১৯৪৪ সালে বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করার পর। সুতরাং "মহাবাণীর" প্রথম সংস্করণ ১৯৪৪-১৯৪৫ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। অনুবাদটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০ আগস্ট ১৯৪৬ খ্রি.। অতঃপর পরিবর্ধিতাকারে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ "সংস্করণ" নামেই প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ খ্রি. মার্চ মাসে তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ ৯ বছর পর। এতে প্রকাশক মুহাম্মদ সফিয়্যুল্লাহ পিতার অনূদিত পাণ্ডুলিপি হতে আমপারা অংশের অবশিষ্ট ২৭ টি সূরা-র অনুবাদও সংযোজন করেন। উক্ত গ্রন্থে সূরাসমূহের শানে নুযূল লিখতে মাওলানা মুহীউদ্দীন, আলহাজ্ব আবদুল মুত্তাহীদ ও মাওলানা আবদুল বাতেনসহ শাহ ওয়ালী উল্লাহর আল-ফাওযুল কাবীর প্রভৃতি প্রামান্য গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছেন। তিনি এতে কিছু টীকাটিপ্পনীও সংযোজন করেছেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অনূদিত "মহাবাণী" হতে সূরা আল-ফাতিহার অনুবাদটি নমুনা স্বরূপ নিম্নে পেশ করা হলো:

সূরা:ফাতিহা [১]

(মক্কায় অবতীর্ণ:৭ বচন:১ অনুচ্ছেদ:২৭ শব্দ:১২২ অক্ষর)

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহের নামে আরম্ভ [২]

১. সকল প্রশংসা আল্লাহের যোগ্য, (যিনি) প্রতিপালক প্রভু (রব্‌ব) [৩] সমস্ত জগতের [৪]।

২. পরম দয়ালু [৫] দয়াময় [৬]।

৩. মালিক (শেষ) বিচার-দিনের [৭]।

৪. কেবল তোমারই আমরা আরাধনা (ইবাদত) করি [৮] এবং তোমারই কাছে আমরা সাহায্য চাই [৯]।

৫. চালাও [১০] আমাদিগকে সোজা পথে [১১]।

৬. তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ (নিআমত) দান করিয়াছ [১২]

৭. যাহারা নয় ক্রোধ (গর্ব) গ্রস্থ [১৩] কিংবা নয় পথভ্রান্ত [১৪]।

আমীন [১৫]

তিনি তাঁর অনূদিত কুরআনের প্রথমে সূরার ভাবার্থ লিপিবদ্ধ করার পরে বঙ্গানুবাদ করেছেন। অতঃপর সূরাটির অবতীর্ণের কারণ, নামকরণসহ শেষে সেই সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত টীকা রচনা করেছেন। তবে তাঁর অনুবাদের ভাষা সর্ব সাধারনের বোধগম্যের অধিকার লাভ করতে ব্যার্থ হয়। কারণ সংস্কৃত শব্দের প্রাবল্য। "নামায", "রোযা", "রুকূ", "সাজদা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারনত যে সব পরিভাষার প্রচলন রয়েছে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সে সব ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করলে অনুবাদ অনেকটাই দুর্বোধ্য হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য যে, তিনি "ইমাম" কে "আচার্য" ও "ধর্মাচার্য", "মুক্তাদী" কে "অনুবর্তী", "আয়াত'"কে "প্রবচন", "নবী"কে "সংবাদ বাহক" ও "নবুয়্যত" কে "প্রেরিত্ব", "সালীহ" কে "সাধু" ইত্যাদি শব্দ অনুবাদে ব্যবহার করেছেন।

(খ) "তেলাওয়াতে কুরআন"

বাংলা ভাষায় আল-কুরআন অনুবাদে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র আরও একটি অবদান হলো "তেলাওয়াতে কুরআন" নামক একটি খণ্ডিত অনুবাদ গ্রন্থ। এই অনুবাদের বিষয়বস্তু হলো বিভিন্ন অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বে পবিত্র কুরআনের যে যে আয়াত তিলাওয়াত করা সমোচীন ও বাঞ্চনীয় সেই সব নির্বাচিত আয়াতগুলোর সরল ও সাবলীল বঙ্গানুবাদ। এটি পবিত্র কুরআনের কোন ধারাবাহিক অনুবাদ গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পূর্ণ গঠন সংস্থার সহযোগিতায় ১৯৬৮ খ্রি.। প্রকাশনায় ছিল বাংলা একাডেমী:বর্ধমান হাউজ ঢাকা। এর মূল্য নির্ধারিত ছিল ১ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ভূমিকা ও সূচীপত্র ছাড়া এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। তেলাওয়াতে কুরআন থেকে হযরত মুহাম্মাদ সা. এর জন্মোৎসব সম্পর্কীত তেলাওয়াতযোগ্য সূরা আল-ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতটি নমুনা স্বরূপ নিম্নে উপস্থাপিত হল:

> ১৬৪. মুমিনদের জন্য তাদেরই একজন রসূল মনোনীত করে আল্লাহ তাদের প্রতি একটি অনুগ্রহ করেছেন। ঐ রসূল তাদের আল্লাহ্‌র বর্ণিত নিদর্শনগুলি পড়ে শোনান, তাদের চিত্ত শুদ্ধি করেন এবং তাদের কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। নিশ্চয় তারা এর আগে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছিল।

ভাষাচার্য মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অনূদিত কুরআন সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি নিম্নরূপ:

১. জনাব আজহারউদ্দীন স্বীয় গ্রন্থে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র অনুবাদ সম্পর্কে বলেন: "তাঁর পূর্বের সমস্ত অনুবাদক হতে তাঁর অনুবাদ সর্বোৎকৃষ্ট"।
২. অধ্যাপক আবদুল হাই তাঁর অনুবাদ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বলেন: "তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হলে বাংলা কুরআন শরীফের অনুবাদ শাখা আরো সমৃদ্ধ হবে"।
৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বলেন: "ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অনূদিত এই পূর্নাঙ্গ পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষায় কুরআন সংক্রান্ত সাহিত্যে যে একটা অনবদ্য অবদান সংযোজিত হবে এতে সন্দেহ নেই"।
৪. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ বলেন: "এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় একটি ভাষা বিজ্ঞান সম্মত অনুবাদ সংযোজিত হবে"।

দুই বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের খ্যাতনামা মনীষী ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি বহু পদে অধিষ্ঠিত থেকে দায়িত্বশীলতার সাথে অতি নিষ্ঠাভরে যেমন কর্তব্য পালন করেছেন অন্যদিকে ঠিক তেমনই সমানতালে নিরলসভাবে সাহিত্য সেবাও করেছেন। তাঁর এমনই সাহিত্য সেবার মধ্যে ইসলামী সাহিত্যের এক অনবদ্য

রচনা হল পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ ৩০ পারার বঙ্গানুবাদ। তাঁর রচিত বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর অনুবাদের ভাষা সাবলীল ও প্রাঞ্জল। এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যের ইসলামী শাখায় বিভিন্ন প্রতিশব্দ যুক্ত, ভাষা বিজ্ঞান ও আলঙ্কারিক ভাষা সম্মত পবিত্র কুরআন অনুবাদের এক অভিনব দিকের সূত্রপাত হত। এমন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির কর্মপ্রতিভা যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় তার জন্য আমরা তাঁর রচিত পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ব্যাপক অবদান রয়েছে অনুবাদ শাস্ত্রের। তরজমা বা অনুবাদ না থাকলে পৃথিবীর মানুষকে এভাবে মুগ্ধ ও মোহিত করতে পারতো না রচনাসম্ভার। আমরা বেখবরই থেকে যেতাম পৃথিবীর মানুষের নানা জীবনযাত্রা সম্পর্কে। তরজমা বা অনুবাদ যে আমাকে আপনাকে তথা সারা বিশ্বকে এনে দিয়েছে গোটা পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কৃষ্টি কালচারের একটা সূচি তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সূত্র নির্দেশ:

১. আল-বাকারাহ: ৮৯, আল-ইমরান:৭, আল-আনফাল: ৬৮, ইউনুস: ৯৪।

২. আল-নিসা: ৮৭।

৩. ড. মহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* (ঢাকা: বাংলাদেশ আল্ কুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, জুলাই ২০০৯), পৃ. ১১৬।

৪. Benglanews24.com, dated. 02.02.2018.

৫. ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় "আক্বীকা" বলা হয় "নবযাতক শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সপ্তম দিনে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হালাল পশু যবেহ করা"।

৬. আজহারউদ্দীন খান্, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৬৮), পৃ. ১৯; ডক্টর মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, *ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* (ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০) ২য় সংস্করণ, পৃ. ১।

৭. মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, *ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ২।

৮. আজহারউদ্দীন খান্, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ২১।

৯. ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৬৭-৪৭৭; আবদুল অদুদ, *বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ২৪৫।

১০. শামসুজ্জামান খান (ও) সেলিনা হোসেন, *চরিতাভিধান,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২০০।

১১. মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, *ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ৩-৪।

১২. আজহারউদ্দীন খান্, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ৩৮।

১৩. শামসুজ্জামান খান (ও) সেলিনা হোসেন, *চরিতাভিধান,* পৃ. ২০১।*"এক নজরে কলেজ"। ahcollege.gov.bd। সংগ্রহের তারিখ ১৩ জুন ২০১৫।*

১৪. আজহারউদ্দীন খান্, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ৪৫।

১৫. মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, *ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ৪-৫।

১৬. আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,*পৃ. ২৪৬; আজহারউদ্দীন খান্, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,*পৃ. ৩৯।

১৭. শামসুজ্জামান খান (ও) সেলিনা হোসেন, *চরিতাভিধান,* পৃ. ২০১; মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ. ৪৭৭; বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স।

১৮. মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ. ৪৭৭।

১৯. ঝাঁপ দাও:*জাফরআলী, মো. (১০ জুলাই ২০২০)। "ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কৃতিত্ব ভোলার মতো নয়"। প্রথম আলো। সংগ্রহের তারিখ ১ জানুয়ারি ২০২১।*

২০. আজহারউদ্দীন খান্‌, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ১৭-১৮; ঝাঁপ দাও:*জাফরআলী, মো. (১০ জুলাই ২০২০)। "ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কৃতিত্ব ভোলার মতো নয়"। প্রথম আলো। সংগ্রহের তারিখ ১ জানুয়ারি ২০২১।*

২১. ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩।

২২. মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ. ৪৮৬।

২৩. আজহারউদ্দীন খান্‌, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ৩৮, ৯২।

২৪. মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ. ৪৮২।

২৫. হুমায়ন আযাদ, *মুহাম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী,* (ঢাকা: বাংলা একডেমী, ১৯৯৪), ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০৬; আজহারউদ্দীন খান্‌, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,* পৃ. ৯২।

২৬. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত মহাবাণী আখ্যায় শুধু সূরা ফাতিহার অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীরটি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

২৭. মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ. ৪৮২-৪৮৪।

২৮. আলহাজ আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *মহাবাণী,* (ঢাকা: ১৯৭৭), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৪।

২৯. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *তেলাওয়াতে কুরআন,* (ঢাকা: ১৯৬৪), পৃ. আখ্যা পত্রের পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. আজহারউদ্দীন খান্‌, *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,*পৃ. ৯১-৯২।

৩২. আবদুল অদুদ, *বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ২৪৯।

৩৩. মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা,* পৃ. ৪৮৬।

৩৪. আবদুল অদুদ, *বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* পৃ. ২৪৯।

কুকুর উপকথা ‘লুব্ধক’ - উপন্যাসের ভিন্নপাঠ

সেখ মোফাজ্জাল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সামসী কলেজ, সামসী, মালদা

সারসংক্ষেপ: একুশশতককে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবত্বের নতুন সৃজন নিয়ে উপস্থিত হলেন কথাসাহিত্যিক নবারুন ভট্টাচার্য। প্রতিটি উচ্চারণ, সামাজিক উচ্চারণ এই মতাদর্শ নিয়েই তার সাহিত্যসম্ভার। তাই তার এই উপন্যাসে মানব অস্তিত্ব সংকট, সমস্যার সম্মুখীন হয়েও বাস্তব পটভূমিতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। নানান বৈজ্ঞানিক তথ্য যুক্তি সংলাপের মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক এক কাল থেকে মহাকালের দিকে যাত্রার আলোকপাত করেছেন। যাকে বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতারূপেও চিহ্নিত করেছেন। বিপ্লব আনে পরিবর্তন, আর এই চেতনাকেই জনগনের মধ্যে বাষ্পর মতো ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন শিল্পী। কারণ এখানে পরিবেশও এক অস্তিত্ব, আর এই অস্তিত্বর সংকট মানে মানব জাতির সংকট, তাই টিকিয়ে রাখার জন্য সমগ্র সমাজের ওপর দায় বর্তায়, অথচ পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব যার হাতে, সেই ব্যক্তি দ্বারাই বনসৃজন ধ্বংশ, সেই মানবের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ লেখ্য সৃজনীর দ্বারা লেখক শর নিক্ষেপ করেছেন। আর এই সত্যরূপ প্রকাশের জন্য তিনি পুরাণ , রূপকথা জগতকে বর্তমানের আলোয় আলোকিত করলেন। এই উপন্যাসে লেখক যেন নিজেই নিজেকে বিনির্মাণ করেছেন দ্বিরালাপের মাধ্যমে। উপন্যাসের পরিসর শহর কেন্দ্রিক হলেও, শহুরে সভ্যতার জনগণ এর মধ্যে যে আত্মসচেতনার অভাব রয়েছে, সেই অভাব দূর করার জন্য তিনি স্বয়ং এপথের পথপ্রদর্শক। আর এই মহামূল্যবান তথ্যকে সত্যরূপে উপহার দিলেন লুব্ধক নামক উপন্যাস সমকালীন প্রেক্ষিতে।

মূলশব্দ: উষ্ণায়ন, লাইকা, ডিকনস্ট্রাকশন, হরিবংশ, পিজরাপোল, প্রতিবাদ ও প্রতিকার।

মূল আলোচনা:

একবিংশ শতাব্দীর মানুষ সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষে গর্বিত। সে আজ পৃথিবীকে বলে global village সে ইচ্ছে করলে জ্যোৎস্না-স্নাত তাজমহল দেখে দুপুরের বাজারটা নিউইয়র্কে সেরে সকালে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে পারে। মহাকাশে মানুষ হেঁটে এসেছে, সৌরজগতের উৎপত্তির আদি প্রক্রিয়া পরীক্ষাগারে সে পরীক্ষা করে দেখছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে শক্তি দিয়েছে প্রকৃতিকে জয় করার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাক ক্ষতি নেই কিন্তু প্রশ্ন এখানেই ওঠে 'জয়' লাভ তখনই হয় যখন কেউ বিজিত হয়—যখন কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম বাধে। এখানে প্রতিপক্ষটা কে? প্রকৃতি? যদি প্রকৃতিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তবেও আরেকটি কথা রয়ে যায়। সেটি হল, মানুষ কি প্রকৃতির বহির্ভূত কিছু? তা তো নয়, তাহলে। যদি ধরে নিই মানুষের এই জয় হল, অজানাকে জয় করা, তবুও তো দেখি মানুষ তার এই অজানাকে জানার যুদ্ধের নেশায় যেমন আঘাত হানছে প্রকৃতির বুকে, তেমনি অন্যান্য পশু-প্রাণী-জীব-জগতে। যত সভ্য হচ্ছে ততো মানুষ হারাচ্ছে প্রকৃতি সংলগ্নতা, ততো সে হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক। যে প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন অনুষঙ্গকে স্থান দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বর হিসেবে, তার জায়গা গ্রহণ করতে চলল বিজ্ঞান। আর যে মানুষ বিশ্বাস করত তারা সবাই

কোনো না কোনো এক জন্তু বা গাছের উত্তরপুরুষ, সেই মানুষ বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে কত জীবজন্তুর উপর যে নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব নেই।

একথাগুলো আসে 'লুব্ধক' (২০০৬)-এর প্রসঙ্গে। যাকে লেখক 'কুকুর উপকথা' বলে অভিহিত করেছেন। যার মূল বক্তব্যটা লেখকের ভাষায়—

> "প্রাণমণ্ডলের অধিকার একা মানুষেরই নয়, সকলেরই। এই অধিকারের মধ্যেই নিহিত আছে প্রাণ ও মৃত্যুর নিয়ত ভারসাম্যের এক সমীকরণ যাকে বিঘ্নিত করলে মানুষের লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"[১]

ইতিমধ্যে এই ভারসাম্যে মানুষ যেভাবে ক্ষতি করেছে তাতে বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং মানুষের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন এসে গেছে। পৃথিবী জুড়ে উষ্ণায়ন (global worming) যে একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সৃষ্টিকর্তা তো মানুষই। অবিচারে গাছ কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানী ব্যবহার থেকেই এ সমস্যার সৃষ্টি। আর এর ফলে নিকট ভবিষ্যতে পৃথিবীর প্রায় সব বড়ো শহর গ্লেসিয়ার গলা জলে ডুবে যেতে পারে। নিজের অস্তিত্ব যে এই জীব- জগতের সঙ্গে, এই প্রকৃতির সঙ্গেই সম্বন্ধ যুক্ত তা ভুলে গিয়ে মানুষ নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনছে। মানুষের এই আত্মধ্বংসী পদক্ষেপ রোধ করার জন্যে, তাদের সচেতন করার জন্যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 'লুব্ধক'-এ এই চেষ্টাই করা হয়েছে একদম নতুন এক ধরনে। যেহেতু সাহিত্যের আবেদন সবসময়ই মানুষের কাছে বেশি এবং অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না, সেহেতু মানুষকে সচেতন করার জন্যে সাহিত্যে উঠে আসে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাও। তবে 'লুব্ধক'কে নতুন এবং ব্যতিক্রমী ধরনের বলতে হয় কারণ এই উপন্যাস কুকুরদের নিয়ে লেখা। অভিজিৎ মুখার্জি এ সম্বন্ধে লিখছেন—

> "লুব্ধক একটা উপন্যাস — মানুষের লেখা, কুকুরদের নিয়ে। কিন্তু একটা উপন্যাস যদি একটা চেতনার অভিব্যক্তি হয়, এক্ষেত্রে সেই চেতনাটাকে যে মানুষী নয় তা খুব জোর দিয়ে স্পষ্ট করে জানানো হচ্ছে বেশ ক'বারই। উপন্যাসটাই মানুষের থেকে একটু তফাতে থাকছে। নিজের সম্বন্ধেই বলছে, "কুকুর-উপকথা 'লুব্ধক' চারপায়ে নতজানু হয়ে লাইকাকে (ছায়াকুকুরদের দলপতি) প্রণাম জানাচ্ছে।" ডিকনস্ট্রাকশনের কোনো বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই বোঝা যায় যে আধুনিক মানুষ ও তার বিজ্ঞানকে এখানে কেন্দ্রের থেকে সরিয়ে স্থান নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে একটি অবিমিশ্র আপদ হিসেবে। একেকটা প্যারাগ্রাফ শেষ হচ্ছে 'ঘেউ-ঘেউ' উচ্চারণ করে, বারবারই মনে করিয়ে দিয়ে যে একটা সম্ভাব্য নির্বিরোধী বিকল্প অস্তিত্বের কাছে আজকের মানুষের আধুনিকতা, বিজ্ঞান কত অবাঞ্ছনীয়, অগৌরবের, ত্রাসের ভূমিকা নিয়ে বসে আছে।"[২]

এ আখ্যানে মোটামুটিভাবে একটি কাহিনি আছে। খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে যা দাঁড়ায়, তা হল, কলকাতাকে তিলোত্তমা করে তোলার জন্যে সব অবাঞ্ছিত ফালতুদের কলকাতা থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই অবাঞ্ছিত হিসেবে প্রথমেই কোপ পড়েছে কুকুরদের উপর। বিভিন্ন পদ্ধতি বাছ বিচারের পর স্থির হল কুকুরদের ধরে পিজরাপোলে রেখে অনাহারে হত্যা করা হবে। সেই অনুযায়ী কুকুর নিধন চলতে থাকে। ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে কুকুর তারা লুব্ধক কলকাতার প্রতি একটি গ্রহাণু ছুঁড়ে দিয়েছে। কলকাতার ধ্বংস অনিবার্য তাই

কুকুরদের প্রতি আগেই নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতা ছাড়ার। তারা একসঙ্গে হাজারে হাজারে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছে কারণ কলকাতা ধ্বংস হবে। এই আগামী ঘটনার সাত ঘন্টা আগে উপন্যাস শুরু এবং শেষ হচ্ছে। ঘটনার বর্ণনায় flash back এবং বর্তমান দুই-ই পাশাপাশি চলেছে। আর এখানে কাহিনি আছে বললেও, বলব না যে সহজ সরল কাহিনি রয়েছে। এই কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে অনেকটা সুতোয় লেগে যাওয়া জটের মতো। অর্থাৎ অনেক ক'টা অনুযঙ্গ একসঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে আছে যেগুলোকে খুলে আলাদা আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। আলগা হাতে সুতোর মতোই প্রসঙ্গগুলো টেনে টেনে দেখা যেতে পারে, কিন্তু খুলবেই যে জট এমন কোনো কথা কেউ দিতে পারবে না। বরং টুকরো হয়ে গিয়ে আরো মুখের সৃষ্টি করতে পারে বা আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে। লেখকের লেখার পর পাঠক সেখানে নিজের মতো করে অনুষঙ্গের যোগ বা বিয়োগ দুই-ই করে অর্থ বের করতে পারেন। কারণ রলাঁ বার্তকে উদ্ধৃত করে বলা যায়
একটি লেখা যেমন-

> "... not a line of words releasing a single theological meaning (the message of an Author God) but a multidimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash." (Image Music Text. p. 146)"[৩]

তেমনি বর্তমানে একটি পাঠের উদ্দেশ্য—

> "to conceive, to imagine, to live the plurality of the text, the opening of its significance."[৪]

নবারুণ ভট্টাচার্য আখ্যায়িকার প্রারম্ভে ভূমিকাতে উপন্যাসটি রচনার কারণ ব্যক্ত করেছেন। তবে তার সঙ্গে মানব চরিত্রের নিষ্ঠুরতার যে দিক তাও খুব স্বাভাবিক ভাবে তুলে ধরেছেন। মানুষের সভ্যতার একদম প্রাথমিক ধাপগুলো যে প্রাণীদের সাহায্যে তাদের জীবনযাত্রা সহজতর হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রধান কুকুর। যে সময়টাতে মানুষ শিকার করে জীবনধারণ করত সেই সময় শিকারে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হত কুকুর। কুকুর যে টোটেম হিসেবে ব্যবহৃত হত তার প্রমাণ 'হরিবংশ' বলে একটি বই-এ একটি অধ্যায়ে কুকুর বংশের বর্ণনা আছে। মহাভারতেও অজস্র জীবজন্তুর মতো কুকুরের নামও ব্যবহৃত হয়েছে মানুষের পরিচয় হিসেবে। প্রকৃতি সংলগ্ন প্রাচীন সেই মানুষেরা নিজেদের নামকরণও করত জন্তুর নামে। একজন ঋষির নাম পাওয়া যায় শুনক—অর্থাৎ কুকুর, আর একজনের নাম শুন্য শ্বেপ অর্থাৎ কুকুরের লেজ। কুকুর সেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষের সঙ্গী হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে প্রমাণ করেছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা। অন্যদিকে মানুষ পেছনে ফেলে গেছে তার প্রকৃতি সংলগ্ন তথাকথিত অসভ্যতার সময়টুকু। সে সভ্য হয়েছে, অর্জন করেছে সভ্যতার নানা সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফল। সে মস্তিষ্কের সাহায্যে ক্ষমতার চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে। আজ সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পৃথিবীতে কে থাকবে, কে থাকবে না। কেবল অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধেই নয়, মানুষ সম্বন্ধেও ক্ষমতাবান অন্যান্য মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার যেন তৈরি করে নিয়েছে। নবারুণ উল্লেখ করেছেন-

> "... ব্রেজিলের বড় বড় গয়নার দোকানের মালিকেরা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোকদের দিয়ে একটি দল বানিয়েছিল, যাদের কাজ ছিল রাতের রাস্তায় ঘুমন্ত ভিখারি শিশু ও বালক-বালিকাদের গুলি করে মারা। এর পেছনে একটা গভীর ও সারবান যুক্তি ছিল। আজকে যারা ছোট লুম্পেন তারাই কিন্তু কাল দামড়া হয়ে ডাকাবুকো গুণ্ডায় পরিণত হবে এবং গয়নার দোকানে ডাকাতি করবে"।[৫]

কিংবা,

> "অসউইৎজ (বিরকেনাউ)-এ চারটে মড়া পোড়াবার চুল্লি ছিল যেগুলো বানিয়েছিল এরফুর্তের জে. এ. টফ্ অ্যান্ড সন্স। এর মধ্যে বড় দুটি চুল্লি প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৬৫ মড়া পোড়াতে পারত। এই দুটি চুল্লি ১৮ মাস একনাগাড়ে চলেছিল অর্থাৎ ১৮,০০,০০০ মড়া পুড়েছিল। এটা পুরো হিসেব নয়। পুরো হিসেব হল ৪ মিলিয়ান বা ৪০,০০,০০০। ... মাত্র ২৯ বছর বয়সী এস.এস. অফিসার অটো মল অশউইৎজ- এ দহন খাদের নক্সা করেছিল। নর্দমা দিয়ে যখন মানুষের ফুটন্ত চর্বি বয়ে যেত তখন অটো মল তার মধ্যে বাচ্চাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলত।"[৬]

মানুষেরই প্রতি মানুষ যখন এতো নির্মম-নিষ্ঠুর, তখন অন্য জীবজন্তুর প্রতিও সে কতটা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে পারে তার অনুমান করা যায়। আরো একটা বিষয় হল মানুষের প্রতি অত্যাচারের শাস্তি তাকে পেতে হতে পারে, এমন সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু পশুর প্রতি অত্যাচারের ক্ষেত্রে তাও থাকে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কেবল মজার জন্যেও জীবজন্তুর জীবন নিয়ে খেলা চলতে পারে, একদম এমনি, কোনো কারণ ছাড়াই। লেখক এরকম কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এখানে একটি উল্লেখ করছি—

"রোদ্দুরের তাতে ঝলসাতে ঝলসাতে সাদা একটা অ্যাম্বাসাডার, ডব্লিউ. বি. ওয়াই. স্টিয়ারিংটা নম্বরের, কম করে ষাট কিলোমিটার গতিতে আসছিল এবং সাদাটে তখন রাস্তা পেরোচ্ছিল। সাদাটে ছিল রোগা, হাড় জিরজিরে, নিরীহ ও রাম ভীতু। ..... বাঁদিকে সামান্য একটু কাটালে এটা হত না। এমনও নয় যে বাঁ-দিকে কোনও গর্ত বা গাড়ি বা সাইকেল কিছু ছিল। একটা ছোট্ট মোচড় যদি স্টিয়ারিং-এ পড়ত তাহলে গাড়িটার সামনের ডানদিকের বাম্পার থেকে সাদাটের মাথার দুরত্বটা ফুট দেড়েক বেড়ে যেত।... কিন্তু সাদাটে যে ডানদিক থেকে রাস্তা পেরিয়ে আসছে সেটা তো অনেক দূর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। সাদাটে যে গতিতে আসছিল সেটা মোটেই দ্রুত নয়, অতএব বেশ কিছুটা সময় ধরেই তাকে দেখতে পাওয়ার কথা।

গাড়িটার ওজন ও গতি গুণ করলে যা হয়, তার সঙ্গে সাদাটের ভীতু ও সর্বদাই নিচু মাথাটির ধাক্কা খাওয়ার শব্দটি, দুষ্টু বুটের চাপে ফাঁকা ফ্রুটির বাক্স ফাটার মতোই। গাড়িটা এত জোরে চলে যায় যে, অত সুন্দর মোমপালিশ করা গায়ে ঘিলু বা রক্ত ছিটকে লাগল কি লাগল না বুঝেই ওঠা গেল না। উঁচু, বাঁধানো রোড- ডিভাইডারের ওপারে ছিটকে গিয়েছিল সাদাটের দেহ।"[৭]

এই যে অকারণ হত্যা, নির্বোধ অত্যাচারের চিত্র এটা হয়তো লেখকের কল্পনা, কিন্তু কষ্টকল্পনা নয়। —এমনটাই তো হয়। একসময় তাই মনে হয়, আধুনিক মানুষ ও তার বিজ্ঞান মানেই হয়তো এমন হত্যা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা। এরই আরো একটা উদাহরণ যেন কুকুর সাফাই

পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন উপায়। যেগুলো রীতি মতো চিন্তাভাবনা করে যুক্তি, তথ্য সহযোগে উপস্থাপিত হচ্ছে। অথচ সেগুলোর মধ্যে লুকিয়ে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ও বর্তমানের নানা কলঙ্ক। হিটলারের নাৎসী বাহিনী বা ব্রাজিলের পথশিশু হত্যার ঘটনা ছেড়ে দিলেও বর্তমানে সম্পদের অসমবন্টনের জন্যে কত মানুষ ঠিকমতো খাবারই পায় না, তার চিত্র ফুটে ওঠে পরিকল্প প্রস্তাব'-২ এর 'বিরুদ্ধ মত-এ-

> "ওই বিষাক্ত মাংস যে শুধু কুকুররাই খাবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে বিশ্বের সামনে কলকাতাকে হেয় হতে হবে এবং নিন্দুকেরা অনেক কিছু মুখোমুখি বা সোজাসাপটা বা কথায় কথায় বলার সুযোগ পেলে যাবে। আর একটি সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিনা পয়সায় পাওয়া বিষ যদি ভেজাল হয়, তাহলে উদ্দেশ্য তো চরিতার্থ হবেই না, উপরন্তু কুকুরেরা বাড়তি শক্তি পেয়ে যাবে।"[৮]

চেয়ারে বসে, নিশ্চিত ভঙ্গিতে তুলে ধরা হচ্ছে বুভুক্ষ মানুষের এক শহরের কথা। আবার অন্যদিকে মানুষের চরিত্রহীনতার কথা। সম্রাট নীরো যখন তার সাম্রাজ্য জ্বলছিল তখন নাকি বেহালা বাজাচ্ছিলেন—এই পণ্ডিত ব্যক্তিরা এর চেয়ে কিছু কম নন যেন। নিরুত্তেজক ভঙ্গিতে, তথ্যমূলক প্রতিবেদন উপস্থাপনের এই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে কিন্তু শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মধ্যে। যাঁদের সব কথা যুক্তিনির্ভর। এক্ষেত্রে মনে পড়ে মিশেল ফুকো পল রাবিনোকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

"আমরা যে যুক্তির কথা বলি এটা কী? এর ঐতিহাসিক ফলাফলগুলো কী? আর এর সীমা ও ঝুঁকিগুলোই-বা কী? যুক্তিবাদী প্রাণী হিসেবে আমরা কী করে বেঁচে থাকব? (কপালগুণে পাওয়া) যুক্তি -চর্চার সম্ভাবনাগুলো তার ভেতরকার ভয়ানক বিপদের (মন্দভাগ্য) সঙ্গে কী করে জড়িয়ে পড়েছে? এই প্রশ্নগুলোর যত কাছাকাছি সম্ভব লোকের তাই থাকা ভালো, আবার এত স্মরণ রাখতে হবে যে, মূল সমস্যা এটাই আর সমাধান খুবই কঠিন। আগ বাড়িয়ে কেউ যদি বলে যে, যুক্তি হলো শয়তান, যেটাকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে—এ কথা খুবই বিপজ্জনক একইভাবে যুক্তিবাদ নিয়ে যে কোনো সতর্ক নিরিখ অযৌক্তিক দিকে আমাদের ফেলার ঝুঁকি রাখে। লোকের ভুলে গেলে চলবে না, সামাজিক ডারউইনবাদের স্মার্ট যুক্তি, যার ঔরসে বর্ণবাদ পয়দা হয়েছে আর নাৎসিবাদের স্থায়ী শক্তিশালী উপাদান এখান থেকেই এসেছে। কথাগুলো আমি এজন্য বলছি না যে, শুধু যুক্তিবাদকে সমালোচনা ও তিরস্কার করার জন্যে; বরং বিষয়গুলো যে কতটা ধোঁয়াটে তা মেলে ধরবার জন্যে। আর সমাজে যত বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে নাৎসিবাদ প্রাণবস্তু ও শক্তিশালী উপাদান হিসেবে পাকাপোক্ত হয়েছে। কথাটা শুনে অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু বিষয়টার মধ্যে একইভাবে আর যাই হোক যুক্তির অংশ আছে ...।"[৯]

যুক্তি দিয়ে যেভাবে হিটলার তাঁর কার্যকলাপ, তাঁর মানবহত্যার পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তেমনি এখানেও যুক্তির নিক্তিতে যাচাই করে কুকুর মারার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কুকুরদের মারা হবে বৃটিশদের নির্মিত পিজরাপোলে রেখে অনাহারে। যাতে করে শুকিয়ে মরা কুকুরদের মৃতদেহ খুব বড়ো কোনো অনিষ্ট ঘটাতে পারবে না। সেই অনুযায়ী মসৃণভাবে কাজ চলতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পর অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। সব অঞ্চলের বৃদ্ধ কুকুরেরা স্বেচ্ছায় ধরা দিতে লাগল। তাদের একটা নির্দিষ্ট পিজরাপোলে রেখে তাদের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ খোঁজার চেষ্টা শুরু হল। এমনকি তাদের খাবার জল দেওয়া হল বিজ্ঞানের স্বার্থে। সেই বিজ্ঞানের নাম ব্যবহার করে

ক্ষমতার তাণ্ডব নৃত্য চালানো। বিজ্ঞান সম্বন্ধে দু'জন প্রখ্যাত চিন্তাবিদের ভাবনা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। বিজ্ঞানী ফ্রয়েড বলেন যে, বিজ্ঞানকে নিয়ে একটি ভ্রান্ত ধারণার তৈরি হয়েছে যে বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কিছু সূত্র বা ধারণা। আর বিজ্ঞানকে এভাবে তারাই বিশেষভাবে দাবি করে যাদের একটা ক্ষমতার কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়। সেই ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে তারা কখনো ব্যবহার করে ধর্মকে, কখনো বিজ্ঞানকে।

ফ্রয়েড যে বিজ্ঞান ও ক্ষমতার সম্বন্ধের কথা বলেছেন তা আরো স্পষ্ট করে আমাদের জানান ফুকো। তাঁর মতে—

> "মানব-বিজ্ঞানগুলো পর্যবেক্ষণ করলে, জ্ঞানের এই বিভিন্ন শাখাগুলোকে কোনো- ভাবেই ক্ষমতা প্রয়োগের থেকে পৃথক করা যাবে না।... সমাজ, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে, যা মানুষের আচরণের বেলায় যেমনটি হয়েছে—একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে এসে, সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সমাধান করতে হবে, সবই একসূত্রে বাঁধা। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতার কলাকৌশল দিয়ে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে, অবশ্যই, বিশ্লেষণ করা যাবে বস্তু (সমাজ, মানুষ ইত্যাদি) যে সমস্যাটা সমাধানের জন্য দিয়েছিল। ফলে মানব-বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং ক্ষমতার নতুন মেকানিজসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবার লক্ষ্যে হাত ধরাধরি করে চলছে।"[১০]

স্বাভাবিকভাবেই, তাই এই উপন্যাসের মানবিক চরিত্রের অকারণ নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি আরেকটি দোষ তুলে ধরা হচ্ছে যা হল ক্ষমতার অপব্যবহার। সেই ক্ষমতার অস্ত্র হিসেবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবহৃত হয়। ভাই নবারুণ তাঁর উপন্যাসে দেখাচ্ছেন বিজ্ঞানের নামে আসলে ক্ষমতা কত প্রকারের অমানবিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। লেখকের ভাষায়-

> "প্রচণ্ড গরমের মধ্যে (৯৫, ১১৩ ও ১২২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) কুকুরদের ট্রেডমিল ব্যায়াম করিয়ে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। আরও যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা কুকুরদের ওপরে চালানো হয়েছে তা বিভিন্ন ফাইলের শিরোনাম দেখলেই বোঝা যাবে -
>
> Accleration, Aggression, Asphyxiation, Blinding, Burning. Centrifuge, Compression, Concussion, Crowding. Cnshing.... Stress Thirst... — এই তালিকার কোনও শেষ নেই। আর আছে চিমটে দিয়ে শরীরের কোনও অংশ ছিঁড়ে নেওয়া, খ্যাৎলানো, হাতুড়ির বাড়ি মারা, ঘুরন্ত ড্রামের মধ্যে গড়ানো, গুলি করা, ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করা ইত্যাদি। সবই বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান করার জন্যে।"[১১]

এগুলোকে অমানবিকই বা বলা যায় কী ভাবে, এ ধরনের ঘটনা তো মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর দ্বারাই সম্ভব নয়। লেখক এ সূত্রে আবার উল্লেখ করেছেন নাৎসী বাহিনীর অত্যাচারের কথা এবং জানিয়ে দিয়েছেন এরকমটা মানুষের সঙ্গেও হয়। আর এভাবেই উঠে আসছে আখ্যানটির আরেকটি দিক আধিপত্যবাদের পীড়নে নিপীড়িত শ্রেণির কথাও। আর তারই প্রতিবাদ ব্যক্ত হয় দীর্ঘ অত্যাচারের বর্ণনার পর লেখা ছোট্ট একটি বাক্যে 'বিজ্ঞানের জয় হোক'।

> "এই বাকভঙ্গি, বলা ভালো বাক্‌চাতুর্য, যেন 'And Brutus is an honourable man' এর নবারুণীয় সংস্করণ।"[১২]

ব্যঙ্গাত্মক এই উচ্চারণ বুঝিয়েই দেয় যেন আসল বক্তব্য নিপাত যাক এমন সভ্যতা ও বিজ্ঞান।

কলকাতার সব কুকুরের ভাগ্যে যে নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে তার কথা লুব্ধক' হলেও সঙ্গে অনেকগুলি কুকুরের স্বতন্ত্র কাহিনিও রয়েছে। এদের মধ্যে জিপসি কোনো এক বাড়ির পোষা কুকুর ছিল, যাকে বুড়ো হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা কি ভারতবর্ষে হুহু করে বেড়ে চলা বৃদ্ধাশ্রমের কথা মনে করিয়ে দেয় না। যে মানুষ নিজের বৃদ্ধ পিতামাতাকে নিজের জীবন থেকে বিতাড়িত করছে, তার পক্ষে খুবই সাধারণ কথা বাড়ির কুকুরকে বুড়ো হয়ে গেলে তাকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা। বৃদ্ধ পিতামাতা যেমন বৃদ্ধাশ্রমে বসে নিজের অবস্থার জন্যে ভাগ্যকে দোষারোপ করেন তেমনি জিপসিও তার অবস্থা ভাগ্যের ফের বলেই মেনে নিয়েছে। আবার সে যেহেতু 'ভদ্দরলোক'-এর বহুদিনের পুষ্যি ছিল, তাই তাকে গল্প বলতে বলা হলে সে যখন 'এক মস্ত বড়ো রাজা ছিল' বলে শুরু করল তখন অন্য এক কুকুরের উচ্চারণ- উফ্, ফের সেই রাজা গজা। আমাদের কি এই উচ্চারণ থেকে মনে হয় না যে, এ কোনো অত্যাচারিত প্রান্তিকায়িতের উচ্চারণ। তবে এ কথাও সত্যি এখানে কুকুরদের দিক থেকেই মূলত আখ্যানটি রচিত কিন্তু মানবীয় চেতনাকে বাদ দিয়ে নয়। তাই যুক্ত হয় এরকম নানা অনুষঙ্গ।

আইনস্টাইনের সূত্র হল প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া থাকে। দীর্ঘ অত্যাচারের গর্ভ থেকেই জন্ম নেয় প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, প্রতিকারের ইচ্ছা। কুকুরদের মধ্যে প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল আত্মরক্ষা, আর কিছু চালিয়ে গেছে প্রার্থনা। যে কুকুরদের শক্তি ছিল তারা বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে পড়েছিল এবং সেসময় তারা পালন করে গেছে আশ্চর্য সহাবস্থান নীতি। সাধারণত এক এলাকার কুকুরকে অন্য এলাকার কুকুরেরা বরদাস্ত করে না, কিন্তু এই সময়টাতে তারা সবাই যূথবদ্ধ। আর বয়স্ক সব কুকুরেরা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। তাদের সবাইকে একসঙ্গে পিজরাপোল- ১ এ রাখা হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে। তারা কুকুরমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে ছিল—

> "সন্ধান-আলোয় দেখা গেছে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়টা ওদের মুখটা একটু হাঁ করে থাকছে এবং জিভগুলো থরথর করে কাঁপছে। ওরা কি কোনও প্রার্থনা জানাচ্ছে? কুকুররা কি প্রার্থনা জানাতে পারে?"[১৩]

কথা হল, কুকুরেরা প্রার্থনা করতে না পারলেও মানুষ তো পারে। এ উপন্যাসে নিপীড়িত মানুষ ও কুকুরদের কখনো কখনো একই পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বিশেষত, এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ছান্দ্যোগ - উপনিষদের একটি গল্প। গল্পটিতে বলা হচ্ছে, বক দালভ্য বা গ্লাব মৈত্রেয় নামে এক ব্যক্তি বেদজ্ঞানের সন্ধানে পথে বেরিয়েছেন। তাঁর সামনে একটি সাদা কুকুর প্রকটিত হল। অন্য কুকুরেরা সেই সাদা কুকুরকে বলল, তাদের ক্ষিদে পেয়েছে, তাদের অনলাভার্থে গান দিতে। সাদা কুকুর পরের দিন তাদের সেই জায়গাতেই সমবেত হতে বলল। বক দালভ্য কী হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকলেন। পরদিন সকালে কুকুরেরা সেখানে সমবেত হল এবং বহিস্পবনান স্তোত্র' পাঠের সময় যেভাবে পরস্পর সংলগ্ন হতে হয় সেভাবে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে গান করতে লাগল। গানটিকে জাদু বা মন্ত্র বা প্রার্থনা যে কোনো একটি নামে অভিহিত করা যায়। এখানে যাদের কুকুর বলা হয়েছে তারা আসলে মানুষ। 'লুব্ধক'-এর কাহিনি বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে তাতে অত্যাচারিত মানুষ এবং কুকুর, বর্তমান সময় এবং মহাসময়, ক্ষুদ্র পরিসর ও মহাপরিসর সব মিশে গেছে।

লেখক ইচ্ছে করেই যেন এরকম একটা বিভ্রমের অবকাশ তৈরি করেছেন। লেখক পাঠকের বিভ্রমকে আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে পাঠককে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তৈরি করে দেওয়ার জন্যেই হয়তো আরো যোগ করেন ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ এর একটি মন্তব্য—

> “মানুষ আর কুকুরের মধ্যে স্নায়বিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে আমার মনে হয় না যে, মানুষের পক্ষে এটা অপমানজনক বলে মনে হবে। আজ জীববিদ্যায় আমরা যে শিক্ষালাভ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে কেউই এর তুলনা টানার বিরুদ্ধবাদী হতে পারে না।”[১৪]

আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। অত্যাচারিত হতে হতে কুকুরদের মনে প্রশ্ন জাগে--

“আমাদের ওপরে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে তা বন্ধ করার কি কোনও উপায়ই নেই? বুদ্ধদেব, ইন্দু, মাতালি অথবা অন্য কেউ কি আমাদের হয়ে একটাও কথা বলবে না?”[১৫]

আর অত্যাচারের প্রতিকারও হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষের উপর নেমে আসে মহাজাগতিক শাস্তির তরবারি। খবর ছড়িয়ে পড়ে অনেক কিছু হচ্ছে এবং হবে। 'ছায়া—কুকুরেরা এবার দৃশ্যমান হবে'। 'বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে অনুবিস'। অনুবিস হল মিশরীয় বিশ্বাস অনুযায়ী আত্মার অভিভাবক, শৃগালরূপী দেবতা। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন—

> “পোড়ামাটির রঙ তার গায়। তার প্রতীক হল পাথরের শবাধার বা কাঠের কফিন। অনুবিস হল সেই মিশরীয় হাউণ্ড যে এ-পৃথিবী থেকে পরবর্তী বিশ্বে যাতায়াত করতে পারে। অবশ করে দেওয়ার জাদু সে জানে। সে হারানো জিনিস খুঁজে দিতে পারে। আত্মা বা 'বা'-কে সে রক্ষা করে। রহস্য উন্মোচনকারী নপথিস বা বিচারক ওসাইরিসের কাছে সে প্রার্থীকে নিয়ে যায়।”[১৬]

আর সেই দেবতার উপস্থিতিতে অনুবিস মৃত আত্মার সম্পর্কে বিধান দেয়। এখানে অনুবিস বার্তা নিয়ে এসেছে, কুকুরদের অবিচারের বিরুদ্ধে বিধান নিয়ে এসেছে। মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটে যাওয়া এই মানুষগুলোর জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে মৃত্যু। এভাবেই সে হারিয়ে যাওয়া বিচারের বাণীকে খুঁজে ফিরিয়ে এনেছে। আমরা এখানে মনে করতে পারি ভারতীয় মহাকাব্য 'মহাভারতে' আছে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের সময় স্বয়ং ধর্মরাজ কুকুরের রূপ ধারন করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়েছিলেন। এবং ধর্মরাজ মূলত মৃত ব্যক্তির আত্মার স্থান নির্ধারণ করেন তার পাপ পুণ্য অনুসারে। অনুবিসের প্রসঙ্গে সে কথাও যেন দু'লাইনের মধ্যের শূন্যতায় লেখা হয়ে যায়। আখ্যানের সময় বিস্তৃত হয়ে ছুঁয়ে নেয় পৌরাণিক কালকেও। বাদ যায় না প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসরদের ধ্বংসের সম্ভাব্য কারণগুলির সবচেয়ে জোরালো যুক্তির কথাটাও--

> “৬৫ মিলিয়ন বছর আগে ১০ কিলোমিটার মাপের একটি গ্রহাণু বা অ্যাস্ট্রোয়েড পৃথিবীর ওপরে আছড়ে পড়েছিল এবং সেই মহাবিস্ফোরণে ডাইনোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।”[১৭]

এ অধ্যায়ে শেষ পর্যন্ত জানানো হয়েছে যে কুকুরদের প্রতি কেন শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে লুব্ধক। কারণ অত্যাচারের ফল কলকাতাবাসী ভোগ করবে। কলকাতা ধ্বংস হয়ে যাবে। গ্রহাণুর আছড়ে পড়ার প্রতিক্রিয়ায় হিমরাত্রিতে ঢেকে যাবে চারিদিক। কারণ শোষণের শাস্তি মৃত্যু—প্রাণের বদলে প্রাণ। কিন্তু এই প্রতিকার তো সত্যিকারের পৃথিবীতে ঘটছে

না। আক্রান্তের অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতার যথার্থ প্রতিকার কোথায় সম্ভব হচ্ছে এই সময়ে! সবজায়গাতেই প্রতাপের আধিপত্য। অন্ধকার এসময়ে হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে একটু আশার আলোর জন্যে। কথাকারকে যেতে হয়েছে উপায়ের খোঁজে বৃহত্তর সময়ে, বৃহত্তর পরিসরে ও বিচিত্র বিকল্পে। সকাল কোথায়। পৃথিবীতে কবে সেই সুন্দর দিন আসবে যেখানে সব প্রাণীর সমান বেঁচে থাকার "অধিকার স্বীকৃত হবে। অকারণ জীবনের অপচয় ঘটবে না, সম্পদের পুঁজিকরণ ঘটবে না। সকাল আসে যায়, কিন্তু এমন দিন আসে না। এভাবে নিপুণ ব্যবহার করেন লেখক কবিতাকে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে, তাঁর গদ্যের সঙ্গে।

এই আখ্যানে এছাড়া যোগ করা হয়েছে মহাভারত থেকে কিছু পংক্তি। পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গারোহণকালে সবাই যখন একে একে রাস্তায় পড়ে যান, তখন শেষ পর্যন্ত কেবল যুধিষ্ঠির গিয়ে স্বর্গদ্বারে উপনীত হন। আর তাঁর পেছন পেছন যায় একটি কুকুর- যে ছিল আসলে ছদ্মবেশী ধর্মরাজ। যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করার জন্যে স্বর্গদ্বারে তাকে আটকে দিলেন ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র স্বর্গের পথে কুকুর নিয়ে আসার জন্যে। এখানে যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণের মধ্যে হওয়া উক্তি-প্রত্যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং ঠিক তার পরেই বর্ণনা করা হয়েছে তিন নম্বর পিজরাপোলে কুকুরদের করুণ অবস্থা। বিন্যাসের এই দ্বিমেরুতা পরিস্থিতিকে আরো প্রকট করে তোলে।

আর এসবকিছুর প্রতিকার খুব সহজে না করতে পারলেও প্রতিবাদ তো করাই যায়। লেখক নবারুণের উদ্দেশ্য তো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে আখ্যানে ভাষা দেওয়া। সে ভাষা যে চিরাচরিত ভাষার মতোই হতে হবে তা কে বলেছে আর বললেও কি মানতে হবে? মানলেই তো আবার প্রতাপের গোলামী স্বীকার করা। তবে আর তাতে বিদ্রোহের ভাষা কোথায় ফুটে উঠবে। তাই 'কুকুর উপকথা' 'লুব্ধক'-এ কুকুররা মানুষের ভাষায় কথা বলে। কিন্তু যেখানে কোনো একটা ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেখানেই ব্যবহৃত হয়েছে 'ঘেউ ঘেউ!' আবার কোথাও মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিবাদী সভার সবরকমের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে লড়াই করে খাবার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে ধ্বন্যাত্মক শব্দটি। কুকুরদের উপর যেসব বীভৎস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় বিজ্ঞানের বিবরণ দিয়েই প্রথমবার লেখা হয়েছে "ঘেউ ঘেউ!" তারপর আরো দু'জায়গায় বিজ্ঞানের পরীক্ষার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এই শব্দটি। যেমন—

> "বাতাসের চাপ কমাতে থাকলে মানুষের কী হয় তা জানার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটি করেছিল নাৎসি ডাক্তারেরা। অতএব মানুষ যে শুধু কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীদের ওপরেই পরীক্ষা চালিয়েছে এমন নয়। বিজ্ঞানের জয় হোক। ঘেউ! ঘেউ!"[১৮]

একবার কান-গজানোর উপর অ্যাসিড ঢালার ঘটনার প্রতিবাদ 'ঘেউ ঘেউ!' আর এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবীণ কুকুরেরা তাদের ছানিপড়া চোখগুলো মেলে অন্তরীক্ষের বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছে তাদের প্রতিবাদ, প্রতিকারের আবেদন। আর অত্যাচারীরা যদি নিজেদের সূর্যের মতো ক্ষমতাশালী ভেবেও নেয় তাদের জানা উচিত (যদিও তারা জানে না) যে ছোটো হলেও প্রতিবাদী স্বর হতে পারে অনেক বলিষ্ঠ। আর যদি তারা একত্রিত হয়ে পড়ে তবে তা ক্ষমতাসীনদের গুড়িয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে। আর এছাড়াও নিপীড়িত এই কুকুরদের নাকি জনতার একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া কিছুই নেই হারাবার মতো। তাই তারা সেই ক্ষমতার প্রতিটি অনুষঙ্গকে লাথি মেরে চলে যাচ্ছে। এখন কেবল যৌবন নয় কৈশোর, শৈশবও সদম্ভে নিজের কথা বলার মতো সাহস রাখে। তাই কুকুররা যখন কলকাতা

ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেই কুকুর সমুদ্রের মধ্যে থাকা বাচ্চা কুকুরদের ভাবনা এভাবে আসছে আখ্যানে-

"বড় বড় বাড়ি, বুটজুতো পরা পা, গাড়ির রাক্ষুসে চাকা, কোনওদিনও ওপারে পৌঁছোন যাবে না এমন রাস্তা, ট্রাক, বড় বড় আলোওয়ালা দোকান যার সামনের হাতে জিনিস ভর্তি লোকেরা খালি মাড়িয়ে দেয়, সাইকেল, হিংস্র মোটরবাইক, মিনিবাস—এই সবকিছু, যার মধ্যে পরতে পরতে ভয় মিশে আছে, যা সবসময় বুঝিয়ে দেয় যে তোরা ফালতু, দুবলা, ভীতু, তোদের চোখে ভয়ের পিচুটি— সেই ভয় দেখানো সবকিছু কেমন চুপ, কোণঠাসা ও অচল হয়ে পড়েছে। কাউ! কাউ এই তো আমরা ছোট ছোট গলাতেই ডাকছি। হ্যাঁ, সবকিছু আজ আমাদের দখলে। .....আমরাই চলে যাচ্ছি। তবে মাথা নিচু করে নয়। সসম্মানে। তোমরা বসে বসে আমাদের প্রত্যাখ্যানে অভিশপ্ত শহরে অন্ধ যথের মতো এবার তোমাদের ধন-সম্পদ আগলাও। ... তোমাদের নিষ্ঠুরতা, অবজ্ঞা, তোমাদের নির্মমতা, তোমাদের লোভ, তোমাদের অজ্ঞতা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে বুঝতে পারছ না? হ্যাঁ, যাওয়ার সময়ে সগর্বে মাথা উঁচু করে বলে যাচ্ছি কথাগুলো..... হাতে ওয়াকিটকি, কোমরের হোলস্টারে রিভলভার, চোখে কালো চশমা, পা ফাঁক করে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সার্জেন্ট, তুমি খিলান বা দরজার মতোই দাঁড়িয়ে থাকো। নড়লেই আমাদের পায় পা লাগবে। এবং ঘটনাটা যদি একবার ঘটে তাহলে আজ কেন, আর তোমার কখনই বাড়ি ফেরা হবে না। মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, ফল, কোল্ড ড্রিংকস্ বোঝাই যত লরি আটকে গেছে তার চালকেরা সাবধান। একটা চাকাও যদি একটুও গড়ায় তাহলে এই বিশাল শান্ত সমুদ্র কিন্তু একটা বিরাট হাঙর হয়ে হাঁ করবে যার মধ্যে প্রবেশ করলে আর বেরোবার রাস্তা নেই। হেডলাইটগুলো নিভিয়ে দাও। আমাদের চোখে লাগছে। কাউ! কাউ!"[১৯]

আখ্যানটির পুরো পাঠ নিয়ে মনে হয় এই কথাগুলিই আমাদের চূড়ান্ত বক্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে। মহাজাগতিক প্রতিকার লেখকের কল্পনা হতে পারে কিন্তু জনতার শক্তি দ্বারা যে প্রতিকার হতে পারে তা কথাকারের কল্পনা নয়, এই সত্য— ঐতিহাসিক সত্য। জনতা চাইলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিটি অবিচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে পারে। আর নবারুণ তো এই সুপ্ত জনশক্তিকে জাগানোর চেষ্টাতেই তাঁর লেখনী ধরেন।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, নবারুণ. লুব্ধক, অভিযান পাবলিশার্স, বারাসাত, কল- ১২৪, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা-৫।
২. সরকার, নীলকমল. সম্পাদিত (সংখ্যাটির সম্পাদনা রাজীব চৌধুরী), অক্ষরেখা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৬০
৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর. আখ্যানের সাতকাহন, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-৭২১১০১, জানুয়ারি
২০০৫, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর. প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-৭২১১০১, ফেব্রুয়ারি
২০০২, পৃষ্ঠা-৮৬।
৫. ভট্টাচার্য, নবারুণ. লুব্ধক, অভিযান পাবলিশার্স, বারাসাত, কল-১২৪, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ২০-২১।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪-২৫।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫-১৬।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০।

৯. হোসেন, পারভেজ. সম্পাদিত, মিশেল ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা, সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৭৭-৩৭৮।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৫-৩৮৬।
১১. ভট্টাচার্য, নবারুণ. লুব্ধক, অভিযান পাবলিশার্স, বারাসাত, কল-১২৪, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা-৪৭।
১২. সরকার, নীলকমল. সম্পাদিত (সংখ্যাটির সম্পাদনা - রাজীব চৌধুরী), অক্ষরেখা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৪৫।
১৩. ভট্টাচার্য, নবারুণ. লুব্ধক, অভিযান পাবলিশার্স, বারাসাত, কল-১২৪, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা-৪৫।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮।
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১।
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬২।
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭ ।
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬-৫৭।

ভূমি ও কুসুম : ‘ব্রাত্য’ মানুষের আখ্যান

সংহিতা মাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ‘ভূমি ও কুসুম’ উপন্যাসটি সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে ছিটমহল সম্পর্কিত প্রথম উপন্যাস। দেশভাগের পর বিতর্কিত Radcliff line এর ফলে সৃষ্টি হয় ছিটমহল সংক্রান্ত জটিলতা। তার ফলে এখানে বসবাসকারী মানুষদের নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাদের কোনো ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অধিকার ছিল না। সেলিনা হোসেন নিজে ছিটবাসীদের সংস্পর্শে এসে এই সমস্ত মানুষদের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে পাই এই উপন্যাসে।

মূল শব্দ: দেশভাগ, Radcliff line, ছিটমহল, ব্রাত্য, দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, পরাধীনতা।

মূল আলোচনা:

দেশভাগ, দুই বাংলার মানুষের কাছে এক ট্র্যাজিক পরিণতি। এই দেশভাগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কত মানুষের আবেগ, নিজেদের শিকড় হারানোর যন্ত্রণা, অনিশ্চয়তা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় Radcliff line এর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করা হয়, যথা, ভারত ও পাকিস্তান। অতর্কিত এই সীমান্ত রেখার ফলে জটিল সংকটের মধ্যে পড়ে এই সীমান্ত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করা মানুষগুলি। এই ভৌগোলিক অবস্থানে বসবাস করা মানুষগুলির জীবনে নেমে আসে চরম বন্দি দশা। দেশভাগের প্রথম দিকে ছিটমহল সমস্যা এতটাও মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সীমান্ত পেরিয়ে মানুষের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমান্তে যত কড়াকড়ি শুরু হয়, ছিটমহলে বসবাস করা মানুষগুলির সমস্যা তত বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রনৈতিক এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে ছিটমহলে বাস করা এই ‘ব্রাত্য’ মানুষগুলি।

ছিটমহল বলতে বোঝায় একটি রাষ্ট্রের সেই অংশকে যা অন্য একটি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইংরেজিতে যাকে 'Enclave' বলা হয়। যেমন ভারতের কিছু কিছু ভূখণ্ড বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে তেমনি বাংলাদেশের বেশ কিছু ভূখণ্ড ভারতের মধ্যেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ভারতের ছিটমহলগুলিকে ভারতীয় ছিটমহল বলা হয়। তেমনি অন্যদিকে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহলগুলিকে বাংলাদেশী ছিটমহল বলা হয়।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ছিটমহল বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজে ঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামবাংলার চিত্র। কিন্তু এই আপাত শান্ত পরিবেশের পিছনে লুকিয়ে আছে দুই দেশের টানাপোড়েনে বঞ্চিত কিছু মানুষের অসহায় আর্তনাদ। কিছু মানুষের খামখেয়ালি মর্জির পরিণতি ‘ব্রাত্য’ এই মানুষগুলি জীবন সীমারেখা এবং কাঁটাতারের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অসহায় এই মানুষগুলি চরম দুর্বিষহ জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন সেলিনা হোসেন তাঁর ‘ভূমি ও কুসুম’ উপন্যাসে। না ভারত না বাংলাদেশ দুই দেশের কারোর কাছেই স্বীকৃতি না পাওয়া এই মানুষগুলির আখ্যান হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসটি। এই উপন্যাস রচনা

প্রসঙ্গে সেলিনা হোসেন একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন-"আমার একটি উপন্যাসের নাম 'ভূমি ও কুসুম'। এটি ছিটমহল নিয়ে লেখা। আন্তরাষ্ট্র সম্পর্কের পটভূমিতে লিখিত। ভারতের অংশের মধ্যে আমাদের ছিটমহল পাটগ্রাম [?]- দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা মাঝে বড় রাস্তা জলপাইগুড়ি-কোচবিহারকে যুক্ত করেছে। আন্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এখানকার বাসিন্দাদের জীবন। আমি দেখেছি ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা ছিটের মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়। তিস্তা নদীতে চর জাগলে এপারে দাঁড়িয়ে জমির মালিকানা পাওয়ার আনন্দ অনুভব করতে পারে না এখানকার জনগোষ্ঠী। কারণ সেখানে যেতে চাইলে বাসিন্দারা ভারতীয় রক্ষীর বন্দুকের নলের সামনে পড়ে। ফলে মানুষের মধ্যে ক্রোধ জাগতে থাকে। ক্রোধ ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংক্রমিত হয়। কাহিনীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উপন্যাসের পরিণতিতে আমি দেখিয়েছি, দহগ্রামের একজন মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে শহীদ হন; যাঁকে কবর দেওয়া হয় রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস সীমান্ত ওপেন ছিল। কিন্তু এক বছর পরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রিয়তম স্ত্রী স্বামী হারানোর বেদনায় কিছুটা অ্যাবনরমাল; সে লাউ-কুমড়ো থেকে শুরু করে অনেক প্রকারের বনফুল দিয়ে ডালি সাজিয়ে নিয়ে কবরে ফুল দিতে যাওয়ার সময় দেখে অনুমতি নেই সেখানে পৌঁছানোর। সীমান্তে তাঁর বুকের কাছে বন্দুকের নল উঁচিয়ে আছে ভারতীয়রা। এই বন্দুকের নল আন্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে। একদিকে শহীদের প্রতি সম্মান জানানো, অন্যদিকে স্বাধীন দেশ বলেই যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি-এ উভয় দিক বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই দুই রাষ্ট্র এ জনজীবনের চলাচলের নির্দেশাবলী তখনো নির্ধারণ করতে পারেনি। ফলে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। জীবনের সঙ্গে এভাবে অন্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নতুন মাত্রা দিয়েছে উপন্যাসটিকে। যোগাযোগের নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠিত হলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগের নিয়ম-রীতি রক্ষা কারার তাগিদ থেকে রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসটিতে অভিব্যক্ত। (মিল্টন বিশ্বাস কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, শিলালিপি, কালের কন্ঠ, ঢাকা, ১৪. ১২.২০১২, পৃ. ১০-১১)"[১] উপন্যাসটি রচনা করার উদ্দেশ্যে সেলিনা হোসেন দীর্ঘদিন এই মানুষগুলি সঙ্গে মেলামেশা করেন। ফলে তার প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতার ফসল হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসটি।

এই উপন্যাসটি বৃহদায়তনের এক পরিব্যপ্ত ক্যানভাসে রচিত হয়েছে। এর ব্যাপ্তি ১৯৪৭ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দু-তিন বছর সময় পর্যন্ত। এই বিস্তৃত সময়কালে মানুষের জীবন, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সময় এবং একটি বিশেষ জনপদ প্রতিনিধিত্ব করছে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। ছিটমহল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের জীবনের নানা সমস্যা, যন্ত্রণা, সংকট, তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ সমস্ত কিছু এই উপন্যাসের উপাদান হয়ে উঠেছে। দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা ভূখণ্ডে বন্দি মানুষদের জীবনচিত্রকে যেমন তুলে ধরেছেন একদিকে তেমনি অন্যদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা চিত্রকেও সেলিনা হোসেন চিত্রিত করেছেন এই উপন্যাসে। সুবিস্তৃত পরিসরে পরিব্যাপ্ত এই উপন্যাসটিতে বহু চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটলেও প্রতিটি চরিত্র আলাদা আলাদা ভাবে তাদের নিজস্ব সত্ত্বায় উপনীত হয়েছে।

এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মনজিলা ও গোলাম আলির কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। গোলাম আলি 'বাঁজা' স্বামী পরিত্যক্তা মনজিলার কন্যা সন্তান হওয়ার কথা বলে। সেই শুনে মনজিলার এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়- "এমন আকস্মিক অবিশ্বাস্য কথায় মনজিলার বুকের ধুকপুকানি স্তব্ধ হয়ে যায়। ও কোনদিকে তাকাবে বুঝতে পারেনা। দহগ্রামে গাঢ় অন্ধকার ভর করেছে। একহাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাম আলি পর্যন্ত এখন আর মানুষ নয়- অন্য দানব,

অন্ধকারের পিচাশ। নাকি ফেরেশতা? মনজিলাকে একটি মেয়ে হওয়ার কথা বলে ওর ভেতরে হাজার হাজার জোনাকির আলো দিয়েছে - দহগ্রামের সবটুকু দিনের আলো এখন ওর বুকের ভেতর!”[২] আসলে নিজেদের দেশের সাথে সাথে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী মেয়েদের জীবনগুলিও আবদ্ধ হয়ে পড়ে নির্দিষ্ট সংসারের বেড়াজালের মধ্যে। সেই জন্যই বাঁজা অপবাদে মনজিলাকে স্বামীর ঘর ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু গোলাম আলি যখন তার ‘কালা কুচকুচা’ কন্যাসন্তানের কথা বলল তখন সে এক নতুন স্বপ্ন বোনা শুরু করে। কিন্তু তার সঙ্গে একটা বিয়ের ভা ভাবনাও তাকে মনে আনতে হয়। হয়তো তা ছিল নিছকই সাময়িক। কারণ একটা ভাঙা বেড়াহীন খড়ের চালের নিচে অনাগত সন্তানের স্বপ্নে বিভোর মনজিলার সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা অরবিন্দকে শাস্তি দিতেও সে পিছপা হয়না। তার নাক কামড়ে রক্তাক্ত করে দেবার পরও তার কোনো অনুতাপ হয়না – “মনজিলা বুঝতে পারে, ওর কোন তাড়া নেই। ও ধীরে সুস্থে নিজেকে তৈরি করে। শাড়িটা ঠিকমতো পরে। আঁচলে বাঁধা সওদাগুলো কোমরে পেঁচিয়ে নেয়। ওর ভাবতে ভালো লাগছে না। ওর একটুও কান্না পাচ্ছে না। যা- কিছু ঘটে গেছে। তার জন্য ওর কোন অনুতাপ নেই। ও ভালোই আছে এবং ভালো থাকবে।”[৩] দূর থেকে ভেসে আসা ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগানের মধ্য দিয়ে যেমন এক নতুন আশা সঞ্চারিত হচ্ছে তেমনি মনজিলার জীবনেও এক নতুন আশার বীজ বপন হয়।

ছিটমহলে বন্দি মানুষগুলোর জীবনও থেমে থাকে না। সময়ের প্রবাহে এগিয়ে যায় তাদেরও জীবন। এ সম্পর্কে গোলাম আলির পুরনো কথা মনে ভেসে ওঠে- “এখানকার মানুষের দিনগুলো হাঁটে না, গড়ায়। দহগ্রামে যে দিনের সূর্যোদয় হয় সে-দিনের পা নেই। এখানকার সমাজটা তাই কঠিন না, যে কঠিন সমাজ ওর মাকে তাড়া করেছিল। মায়ের সঙ্গে গোলাম আলিও তাড়া-খাওয়া শেয়ালের মতো ছুটছিল - এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে।”[৪] জোতদার বাড়ির দাসী আয়েশা নিজের অবৈধ সন্তানটিকে একটি সুস্থ স্বাভাবিক মুক্ত জীবন দেওয়ার উদ্দেশ্যে বারবার এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। বারবার বদলেছে পিতৃপরিচয়হীন গোলাম আলির বাবার নাম। কিন্তু এই যাঁতাকলে অকালেই বন্ধ হয়ে যায় মেধাবী গোলাম আলির পড়াশোনা। এমনকি বিসর্জন দিতে হয় প্রেমিকা নমিতা বাগদি ও দুই সন্তানকে। দহগ্রামের স্থায়ী হওয়ার পর নমিতার সঙ্গে তার এক নতুন জীবন শুরু সম্ভাবনা দেখা গেলেও পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে তা বিনষ্ট হয়। শিক্ষিত গোলাম আলিকে দহগ্রামবাসী করে তোলে অভিভাবক। তাদের কাছে সে হয়ে ওঠে তাদের বটবৃক্ষ, ওদের বিচারক। ছিটের অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর, তাদের বিপদে আপদের ভরসা স্থল হয়ে ওঠে গোলাম আলি। তাইতো ছিটের মানুষগুলো তাকে বরণ করে নেয় নিজেদের রাজা হিসেবে-“লোকেরা তখন চেঁচিয়ে বলে, আজ থেকে আপনি আমাদের রাজা। রাজা? গোলাম আলির শরীর কেঁপে ওঠে। ও প্রথমে ভয় পায়। তারপর সাহস সঞ্চয় করে। রাজা! এই ছিটমহলের রাজা মানে তো সুখে-দুঃখে-শাসনে-দুঃশাসনে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। রাজার কোন প্রজা থাকবে না। সবাই বন্ধু হবে।............ আমাকে তো মানুষের পাশে দাঁড়াতেই হবে। নইলে কে ওদের দেখাশোনা করবে, যেখানে সীমানার চারপাশে অন্য একটি রাষ্ট্র, সেখানে থাকবে প্রতিদিনের মুখোমুখি সংঘর্ষ সীমান্তরক্ষীদের বিপরীতে সাধারণ মানুষ-রাইফেলের বিপরীতে নিরস্ত্র মানুষ।........ আশ্চর্য সুন্দর মানুষটির বয়সী শরীরে একজন রাজার জ্যোতি ফুটে ওঠে। লোকজন সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে, আজ থেকে আপনি আমাদের বীরযোদ্ধা।”[৫]

মনজিলার শরীরে গর্ভলক্ষণ ফুটে উঠলে তীব্র আক্রমণ আসে সমাজ থেকে। সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়, নিজের পরিবারে সর্বোপরি নিজের মায়ের কাছে। নির্বাসিত হয় নিজের বাড়ি থেকে। কারণ স্বামী ছাড়া কোন মেয়ের গর্ভবতী হওয়া আমাদের সমাজ মেনে নেয় না। কিন্তু সে আশ্রয় পায় ছিটের অসহায় প্রৌঢ়া নমিতার কাছে। জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হার না মানা এই দুই নারী গড়ে তোলে এক সংসার। আর তাদের মাথার উপর থাকে গোলাম আলি। মনজিলা কামনা করে তার সন্তানটি যেন একটি কন্যা সন্তান হয়। তাই সে নমিতাকে বলে- "গোলাম দাদু আমাকে বলেছে, আমার মেয়ে হবে। মেয়ে হলেই আমি বেশি খুশি হবো। আমি ছেলে চাই না। আমি মেয়ে, আমার বংশধরও মেয়ে হবে।"[৬] শেষ পর্যন্ত মনজিলারই স্বপ্নপূরণ হয়। তার কন্যা সন্তানই হয় আর তার নামকরণ করে স্বয়ং গোলাম আলি। অবশ্য মনজিলার সন্তান জন্মের বহু পূর্বেই গোলাম আলি এই মেয়ের নামকরণ করে রেখেছিল। একদিকে ছিটের জীবন অন্যদিকে সন্তানকে নিয়ে এক একক মায়ের জীবনচিত্রের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক।

এই উপন্যাসে একদিকে যেমন দহগ্রামের 'পাঁচশো তিনজন' মানুষের জীবনের জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত আছে তেমনি অন্যদিকে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার সমাবেশ। যার প্রথম আঁচ আমরা পাই ১৯৪৭ সালের দেশভাগের মধ্য দিয়ে। যার মধ্য দিয়েই শুরু হচ্ছে ছিটবাসী মানুষগুলির অনিশ্চিত জীবনযাপন। ছিট কার? এই নিয়ে ভারত বাংলাদেশের টানাপোড়েনের সূচনা, যা বিধ্বস্ত করেছে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষগুলোকে। এই জীবন কোনো স্বাভাবিক স্বপ্ন নিয়ে গড়ে ওঠা জীবন নয়। পরিবর্তে প্রত্যেক মুহূর্তে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে হয় এইখানে বসবাসকারী মানুষগুলিকে। প্রতিমুহূর্তে সীমান্ত রক্ষীদের রাইফেলের ভয়ে জীবনধারণ করা মানুষগুলি যখন প্রতিবাদ করে ওঠে তখন তাদের কপালে জোটে হয় অসহ্য নির্যাতন না হয় মৃত্যু, আর তার ছবি আমরা দেখি সুরেন ঢুলির মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে- "সুরেন ঢোলে বাড়ি দিয়ে লাফিয়ে উঠে বলে, ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমরা কি তোমাদের রাইফেলকে ভয় পাই? একটুও ভয় পাই না। একদম না। সুরেন ধমাধম ঢোল পেটায়, গোলাম আলি হাত উঠিয়ে সুরেনকে থামতে বলার আগেই একটি বুলেট ফুটো করে দিয়ে যায় সুরেনের বুক।"[৭] শুধু সুরেন নয় সীমান্তরক্ষীরা সুরেনের স্ত্রীকেও ছাড়ে না। অকথ্য নির্যাতনের সাত দিন পর সীমান্তের ধারে ক্ষতবিক্ষত অচৈতন্যভাবে ফেলে রেখে যায় তাকে। শত চেষ্টা করেও তাকে নিয়ে কোন ডাক্তারের কাছে পৌঁছাতে পারে না গ্রামবাসীরা তার কারণ একমাত্র সীমান্ত। পাটগ্রাম ছাড়া ডাক্তার পাওয়া যাবে না, আর পাটগ্রামে যেতে গেলে ভারতের সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে। যেখানে যাওয়ার কোন অনুমতি নেই। তাই একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মারা যায় মালতি। চারিদিক থেকে সরকারিভাবে বন্দি হয়ে পড়া মানুষগুলি না আছে কোন পরিচয়পত্র না আছে ভোট দানের অধিকার। শুধু তাই নয় নেই কোন শিক্ষাব্যবস্থা, থানা, পুলিশ বা আইন। যে যেমন ভাবে পারে এই অঞ্চলের মানুষগুলির উপর তাদের আইন চাপিয়ে দেয়। ইচ্ছামত যে যেমন খুশি ব্যবহার করে। আর এর ফলে দমবন্ধকর হয়ে ওঠে ছিটের পরিবেশ। কাঁটাতারের আগলে আবদ্ধ এই মানুষগুলিকে সাহায্য করার জন্যও কেউ এগিয়ে আসে না। তাই অকারনে মারধর বা বেঘোরে মৃত্যু হয়ে উঠেছে রোজকারের ঘটনা। অন্যদিকে ভারতের দাশিয়ারছড়ার ছিটমহলে বসবাস করা মানুষগুলিও ভারত-বাংলাদেশের টানাপোড়েনে ক্রমশ যেন 'পোকা'য় পরিণত হয়ে পড়েছে। কোন দেশের কোন সরকারই তাদের খোঁজখবর নেয় না। পোকাদের যেমন কোনো দেশ নেই তেমনি তাদেরও কোনো দেশ নেই, নেই কোনো পরিচয়। সত্যিই এই অসহায় মানুষগুলোর কেউ নেই- "কাগজে-

কলমে আমরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানার মধ্যে আছি। আমরা ভারতীয়। হা-হা-হা........... আমাদের পঞ্চায়েত অফিসঘর আছে। স্কুল আছে। আমাদের গ্রামরক্ষা বাহিনী আছে। বিচারের জন্য আদালত আছে। আমরা পঞ্চায়েতের নির্বাচন পরিচালনা করি। আমাদের ছিটে ভারতের পতাকা ওড়ে। ওই পতাকাই বলে দেয় আমরা ভারতীয়। আমাদের দেশের পরিচয় আছে। পতাকাই আমাদের সব। আমাদের আকাশে পতাকা ওড়ে, বাতাসেও। আমরা পতাকা ছুঁতে পারি না। সম্মান করি। শুধু আমাদের হাঁড়িতে পতাকা নেই। কারণ রাষ্ট্রের খোঁজ নেয় না। রেশনের ব্যবস্থা নেই। আমাদের কষ্টে পতাকা নেই। আমাদের চোখে পতাকার রং নেই। বাঁশের মাথায় উড়তে-থাকা পতাকার দিকে তাকালে আমরা রং দেখতে পাই না।”[৮] সত্যিই তাই এ যেন এক অদ্ভুত পরিবেশ। এই ‘দেশের ভিতরে বিদেশ’ সম্পর্কে অমর মিত্র বলেন- “কী নিরুপায়, নিরাবলম্ব জীবন যাপন করতেন ছিটমহলের বাসিন্দারা। খুব অপমান, খুব কষ্ট। আতঙ্ক তাঁদের পিছু ছাড়ত না। চারিদিকে দেশ, তাঁদের কোনো দেশ নেই। ভারতীয় গ্রামের ভিতরে বাংলাদেশের গ্রাম, তার ভিতরে আবার ভারত।”[৯] দুই দেশের ছিটের মানুষগুলি এমনভাবে নিজেদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে যে তাদের মধ্যে ভারত বা বাংলাদেশ যে ছিটেরই হোক না কেন কোনো কিছুই প্রভাব ফেলে না। কারণ তাদের সবারই অবস্থা একই রকম। অন্য জায়গা থেকে ছিটে এসে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার ঘটনাও বিরল নয়, যেমন বাশার। সে তার প্রেমিকা জোহারার খোঁজে এসে থেকে যায় দহগ্রামে। এখানে এসে সে তার প্রেমিকা মৃত জোহারার বাচ্চার মায়ায় থেকে যায়। জোহারার সতীনকে নিয়ে বিয়ে করে সংসারে স্থিতু হলেও সে সুখ ও তার সয়না। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের আগুনে পুড়ে মারা যায় তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীসহ সন্তানেরা। মনজিলার প্রেমিক বাশার শেষ পর্যন্ত মনজিলার স্বামী হয় এবং ছিটের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। ছিটের বাইরের খবর ঢাকা থেকে দহগ্রামে বহন করে আনে বাশার। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের জলোচ্ছ্বাস, আওয়ামী লীগের বিজয়ের কথা। বাইরের লোক হয়েও বাশার যেন আজন্ম লালিত ছিটের মানুষ হয়ে ওঠে।

মনজিলার মেয়ে বর্ণমালা, যার জন্মের পূর্ব থেকে এই উপন্যাসের আখ্যান শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে তার প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায়। বর্ণমালার জীবন পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই যেন ক্রমপরিণতি পেয়েছে এই উপন্যাসটি। মেধাবী, বুদ্ধিমতী বর্ণমালা ছিটের অবরুদ্ধ জীবন যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে পারে। সে ছিটের প্রকৃতি, পশুপাখির সান্নিধ্য ভালোবাসে। জীবনকে সে দেখে ভিন্ন ভাবে। তাইতো সে বহু দিনের অপূর্ণ ভালবাসার পরিণতি দেয়, মুসলিম গোলাম আলির সঙ্গে বিয়ে দেয় হিন্দু নমিতা বাগদির। তাকে সাক্ষী রেখেই সকলের অলক্ষ্যে বিয়ে হয় এই দুটি মানুষের। আসলে পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে বুঝিয়ে দেয় কিভাবে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। তাইতো এই কাঁটাতারের শৃঙ্খলে বদ্ধ থেকেও সে তার শুভবোধ, বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি। আসলে এই বর্ণমালাই হয়ে ওঠে ছিটের মানুষদের আগামী বিপ্লবের উত্তরসূরি।

‘ব্রাত্য’ অবহেলিত মানুষগুলি সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও দেশের বিপদের আগুন থেকে কখনই বাঁচতে পারেনি এই অবরুদ্ধ ছিটবাসী। দেশভাগ পরবর্তী সময় সবচেয়ে বড় বিপদ আসে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে। আর তার প্রভাব পড়ে এই অসহায় মানুষগুলির উপরে। আসলে দুর্বল জায়গা দিয়ে আঘাত করলেই আঘাতটা সবচেয়ে বেশি যেমন হয় তেমনই হয়তো সেই আঘাতের খোঁজ ও কেউ রাখে না। ঠিক তেমনি হয়েছিল এই মানুষগুলির সঙ্গে- “সে-রাতেই দাউদাউ জ্বলে ওঠে ছিটের ঘরবাড়ি। সীমান্তরক্ষীরা যুদ্ধ শুরু

হওয়ার সাত দিনের মাথায় আক্রমণ করে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা। মানুষজন এলোপাতাড়ি ছুটতে থাকলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মনজিলা বুঝে যায় যে, এটা কোন যুদ্ধ নয়। একতরফা আক্রমণ, লুটপাট এবং মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া। যারা ছোটাছুটি করছিল তাদের অনেককেই ধরে ফেলেছে সেপাইরা। ওদের আর্তচিৎকার শোনা যায়।"[১০] মাত্র সতেরো দিনের মাথায় এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায় এই ছিটের মাটিতে। আগুনে পুড়ে মারা যায় বাশারের নতুন পরিবার, মনজিলার ভাই তাহের ও সরমার দুটো সন্তান আর নব দম্পতি গোলাম আলি ও নমিতা-"পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে দুজন মানুষ। পাশাপাশি পড়ে আছে দুজনের পুড়ে-যাওয়া দেহ।"[১১] এর পরবর্তী বড় ধাক্কা মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের খবরে চঞ্চল হয়ে ওঠে ছিটের মানুষগুলি। তারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদানে উৎসাহি হয় এবং যোগদানও করে। সবাই ফিরে আসলেও বর্ণমালার স্বামী আজমল শহীদ হয়। দহগ্রামে আর ফিরে আসা হয় না। পরিবর্তে ফিরে আসে তার রক্তমাখা কাপড়। ছিটের মানুষদের কাছে আজমল পায় শহীদের সম্মান। ছিটের মানুষদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ তারা বাংলাদেশকে নিজের দেশ মনে করত। আর তাইতো নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও সেই দেশকে রক্ষা করতে তারা পিছপা হয়নি। কিন্তু সেই দেশ কি তাদের কথা মনে রেখেছিল? নাকি তাদের আপন করে নিয়েছিল? না এর কোনটাই করেনি- "বছর ফুরিয়ে যায়। শীত শেষে বসন্ত আসে। গাছে নতুন পাতা গজায়। কিন্তু তিনবিঘা হস্তান্তর আর হয় না। মানুষ হতাশ হয়ে যায়। ওরা শুনতে পায় ভারতের সাংবিধানিক ও আইনগত বিতর্কের কারণে এ-সমস্যার সমাধান হতে সময় লাগছে। এতকিছু বোঝার সাধ্য ওদের নেই। ওরা শুধু বোঝে, ওরা আগে যেমন বন্দি ছিল এখনো তেমন বন্দি আছে। ওরা স্বাধীন হয়নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের নাম বদল হয়েছে। পতাকা বদল হয়েছে, কিন্তু ছিট ছিটই আছে। ছিটের কিছুই বদলায়নি।"[১২] সত্যিই তাই তাদের অবরুদ্ধ জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাইতো কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সীমান্ত পেড়িয়ে স্বামীর কবরে ফুল দিতে যেতে পারে না বর্ণমালা। কারণ তার জন্য প্রয়োজন সরকারের অনুমতির। সময় এগিয়ে যায়, বর্ণমালার জন্মের পূর্বে ছিট আজও সেই একই রকম থেকে যায়। আজ বর্ণমালা প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায়, তিন সন্তানের জননী। কিন্তু ছিটের মানুষ আজও অবরুদ্ধ। স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অধিকারটুকুও তারা পায়নি। আর এভাবেই কেটে যাচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। অবরুদ্ধ জীবনে অসহ্য হয়ে ওঠা বর্ণমালা একদিন ভোরবেলা স্বাধীন ভূখণ্ডের মুক্তির আকুতি নিয়ে মিলিটারিদের বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে চিৎকার করে বলে- "আমি ছিটের মানুষের স্বাধীনতা চাই। আমাদেরকে বন্দি করে রাখতে পারবে না।"[১৩] সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে এক নারীর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। লেখক বর্ণমালার এই বিদ্রোহী সত্ত্বার মধ্য দিয়ে যেন এক আশার সঞ্চার করেছেন।

দেশভাগ পরবর্তী ছিটমহল নিয়ে লেখা সেলিনা হোসেনের এই উপন্যাসে স্বাধীনতা পাওয়ার পরও মানুষ কিভাবে আবার নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় তারই ছবি তুলে ধরেছেন। শুধু আবদ্ধ নয়, সেই শৃঙ্খলিত জীবন তাদের জন্য ঠিক কতটা যন্ত্রনাময়, কতটা অসহ্য পীড়াদায়ক তা লেখক তার এই উপন্যাসের প্রতিটি লাইনে তুলে ধরেছেন। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই মানুষগুলি তাদের নিজেদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য কতটা উন্মুখ কতটা মরিয়া তা আমরা এ উপন্যাসে শেষে বর্ণমালার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। একা বর্ণমালার প্রতিবাদ যেন সমগ্র ছিটবাসী অসহায় 'ব্রাত্য' মানুষগুলির সম্মিলিত প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে। ছিটমহলের মানুষদের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে

তাদের বঞ্চনা, বেঁচে থাকার ইচ্ছে ,সংগ্রাম ও জীবনধারণের চিত্রকে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। ছিটবাসীদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে ১লা আগস্ট ২০১৫ সালে রাত ১২:০১ মিনিটে দুই দেশ ঐতিহাসিক মুজিব ইন্দিরা চুক্তির আওতায় থাকা ভারতের মূল ভূখণ্ডে থাকা ৫১টি বাংলাদেশী ছিটমহল ভারত লাভ করে অন্যদিকে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে থাকা ১১১ টি ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশ লাভ করে। কিন্তু এরপরেও থেকে যায় বেশ কিছু বেশ কিছু অমীমাংসিত সমস্যা।

তথ্যসূত্র:

১. আনোয়ার চন্দন, (২০২০) সেলিনা হোসেনের সাহিত্য কীর্তি পাঠ ও মূল্যায়ন, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/4 বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ:৩৫৫
২. হোসেন সেলিনা, (২০১৩), ভূমি ও কুসুম, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতায়-৭৩ পৃ:৭
৩. তদেব, পৃ:১৫
৪. তদেব, পৃ:৯০
৫. তদেব, পৃ:১০৩
৬. তদেব, পৃ:৫২
৭. তদেব, পৃ:১২৪
৮. তদেব, পৃ:২৩৫
৯. মিত্র অমর, (২০১৭), কুমারী মেঘের দেশ চাই, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ:৮
১০. হোসেন সেলিনা, (২০১৩), ভূমি ও কুসুম, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতায়-৭৩ পৃ:৩২২
১১. তদেব, পৃ:৩২৩
১২. তদেব, পৃ:৩৭৬
১৩. তদেব, পৃ:৩৭৭।

সম্পর্কের রসায়ন : ত্রিপুরার মহারাজা ও রবীন্দ্রনাথ

শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

সারাংশ: রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব বন্দিত কবি। মনে প্রাণে চিন্তায় কর্মে দুঃখে সুখে জীবনে মরণে কবি রবীন্দ্রনাথ জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সন্তান। ঠাকুর পরিবারের এই বিশ্ববন্দিত কবির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের এক মধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কি ভাবে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়? রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি যেমন দেশীয় বিদ্যা ও ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, পৈতৃক জমিদারী পরিচালনাসূত্রে স্বারকানাথ ঠাকুর জমিদারী সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন কানুন সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এর ফলে তিনি বহু বিখ্যাত জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তির আইন বিষয়ক পরামর্শ দাতা হয়ে উঠেছিলেন। তাই গুরুতর রাজনৈতিক সংকটের সময়ে বীরচন্দ্রের পিতা মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি যথাযথ ভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং মহারাজা কৃষ্ণকিশোর সেই সংকট থেকে রক্ষা পান।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রথম সম্পর্কের সূত্রপাত মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময় থেকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে এই যোগসূত্রকেই রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় করে রেখেছেন পরবর্তীকালে। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ত্রিপুরার রাজপরিবার। এই রাজকুলের উৎসাহ ও দাক্ষিণ্য পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সম্পর্কের সূচনা ১৮৮২ সাল থেকে। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ও রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ কবি ও রাজার সেতুবন্ধন। কবি ও রাজার মহামিলনের ইতিহাস ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কবি কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিদের কাব্যচর্চা রাজানুগ্রহেই সমৃদ্ধ হয়েছিল।

ত্রিপুরার রাজাগণ ছিলেন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষক। ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরে সঙ্গীত, নাটক, কাব্য চিত্রকলা সমেত সাহিত্য সংস্কৃতির বহুবিধ চর্চা হত। মাণিক্য বংশের রাজাগণ শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্টপোষক ছিলেন, ছিলেন রসজ্ঞ ও যোদ্ধা। আবার অনেকে শ্রষ্ঠাও ছিলেন। পরিবেশ, জীবনচর্যা, মানসিক গঠন আলাদা হয়েও সংস্কৃতিই কবি ও রাজাদের মধ্যে সেতু বন্ধন ঘটায়।

সূচক শব্দ: মহারাজা, ত্রিপুরা, রবীন্দ্রনাথ, মধুর সম্পর্ক, সেতু বন্ধন, অভ্যর্থনা, অভিনন্দন, সংবর্ধনা।

মূল আলোচনা:

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য তথা পরম ভক্ত ছিলেন ত্রিপুর রাজবংশের চতুর্থ পুরুষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, সমাজ সচেতন, প্রজা বৎসল, সাহিত্য প্রেমী এবং প্রবল বিদ্যানুরাগী। এককথায় তিনি হলেন আধুনিক ভারত গড়ার মহান

রূপকার। তাঁর পিতা ছিলেন বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য। আর তাঁর পিতা হলেন রাধাকিশোর মাণিকা। রাধা কিশোর মাণিক্যের পিতা বীরচন্দ্র মাণিক্য। বীরচন্দ্র মাণিক্যের তিন রাণীর মধ্যে প্রথম মহারাণী ছিলেন ভানুমতী দেবী। ভানুমতী দেবী অকালে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। এর কিছুদিন পর কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে নিজের লেখা 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সাহিত্য প্রেমী বীরচন্দ্রমাণিক্য এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। সেই সময় তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে বিশ্বজয়ী প্রতিভার সূচনা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বীরচন্দ্রমাণিক্য। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষকে কোলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন কবিকে অভিনন্দন জানাতে। বিশ্বকবির বিশ্ববিমোহন প্রতিভা সেদিনই সর্বপ্রথম রাজসম্মানে ভূষিত হয়েছিল। এ যেন ত্রিপুরাবাসীর কাছে প্রচন্ড গৌরবের।

এরই সূত্র ধরে ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল। ত্রিপুরার রাজাদের কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় এসেছিলেন একবার নয় সাতবার। রবীন্দ্রনাথের এই শুভ পদার্পণ ত্রিপুরাকে বিশ্বের দরবারে সগর্বে যুক্ত করে দিয়েছিল। ত্রিপুরার রাজকাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি (উপন্যাস), 'বিসর্জন' ও 'মুকুট' (নাটক) লিখেছেন। যা বিশ্ববিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথের এই অমর সৃষ্টি সম্ভারের মধ্য দিয়েও ত্রিপুরা বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। এই গৌরবে ত্রিপুরাবাসী অবশ্যই গৌরবান্বিত। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজের হৃদয় মন্দিরে ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছিলেন। এমন কোন দেশ বা রাজ্য নেই রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা বা অভিনন্দন জানায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজাদের অভ্যর্থনার কথা, অভিনন্দনের কথা বিভিন্ন জায়গায় সগর্বে ঘোষণা করেছেন এই বলে-"আমি বহুদেশ হইতে সম্মানিত হইয়াছি, বহু মণীষী আমার খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু যখন আমি কবি বলিয়া লোক সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত তখন বাংলার এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা আমাকে যে অভিনন্দন ও স্নেহাশীষ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখিব।"[১]

১৮৯৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর মহারাজা বীরচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনাবসানের পর ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র আরও দৃঢ় হয়। রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজোর সম্পর্ক ধীরে ধীরে সুদৃঢ় ও ঘনিষ্ট হয়। রাধাকিশোর মানিক্যের রাজ্যাভিষেক হয় ১৮৯৭ সালের ৫ই মার্চ। কেননা তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসনে বসেই কবিগুরুকে ত্রিপুরায় আসার জন্য আহ্বান জানান। তারই অঙ্গ হিসাবে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) কবিগুরুর আগরতলায় প্রথম শুভাগমন ঘটে। তখন ছিল বসন্তকাল। কিন্তু কবিকে সংবর্ধনা ও আপ্যায়ন জানানোর জন্য তখন আগরতলায় সর্বত্র সাজ সাজ রব পরিলক্ষিত হয়। আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ছিল লক্ষ্য করার মতো। ত্রিপুরার আদিবাসীদের টং ঘরের আদলে বাঁশ বেত দিয়ে সুদৃশ্য একটি মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল আগরতলার কুঞ্জবনে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার মণিপুরী শিল্পীরা বাসন্তী রঙের পোশাক পরে মাথায় বাসন্তী রঙের পাগড়ী বেঁধে তাঁদের ঐতিহ্যপূর্ণ বাদ্য মৃদঙ্গ সহযোগে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গীতে নৃত্য-গীত পরিবেশন করেছিলেন। বসন্তকালে বাসন্তী রঙের পোশাকে সজ্জিত মণিপুরীদের নৃতা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বাসীর আন্তরিকতা এবং রাজার মহানুভবতা কবি মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে প্রচন্ডভাবে মুগ্ধ করেছিল। একথা

কবি অনেকবার তাঁর সাহিত্যে উল্লেখ করেছেন। কবি সেই সময়ে 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থটি রাধাকিশোর মাণিক্যের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এই সময়ে আগরতলা অবস্থান কালে একদিন কবি খুব সকালে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাণীমা তখনও ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। লজ্জিতা রাণীমাকে নিয়ে কবি এক গান রচনা করেন,-

"কেন যামিনী না যেতে জাগালে নাথ
বেলা হল মরি লাজে।"

আমরা সবাই জানি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর নিজস্ব একটি বিজ্ঞানাগার তৈরী করার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চাঁদা সংগ্রহে বের হয়েছিলেন। রাধাকিশোরমানিক্য তখন কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন। কবি রাজার কাছে এলেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে নিয়ে। তখন রাধাকিশোর মাণিক্য বললেন- "এ বেশ আপনার সাজে না কবি। বাঁশি বাজানোই আপনার কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করবো।"[২] ২৭ শে মার্চ ১৮৯৯ ইং ত্রিপুরায় প্রথম আসেন রবীন্দ্রনাথ। এদিনই ত্রিপুরায় বসন্তোৎসব পালিত হয়। ত্রিপুরার বসন্তোৎসব এর নাম অপরিবর্তিত রেখেই শান্তিনিকেতনে ১৯২৩ সালে বসন্তোৎসব চালু হয়। সেই সময় কর্নেল মহিম ঠাকুরের বাসভবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। কারণ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়েছিল। প্রথমবার যখন রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় আসেন তখন মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই সমস্যায় জর্জরিত। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের শান্তিনিকেতন গড়ে তোলা, জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান, দু-ব্যাপারেই মহারাজার উপদেশ ও সাহায্য প্রয়োজন। আবার রাজকুমারদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রজাদের জন্য দক্ষ চিকিৎসক নিয়োগ বিষয়েও কবি উপদেশ ও সুপরামর্শ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর মিলিত প্রয়াসে অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ বসু মোক্ষদাকুমার বসু যুবরাজদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কবি হেমচন্দ্র ১৮৯৭ সালে দৃষ্টিশক্তি হারায়। মহারাজা রাধাকিশোর হেমচন্দ্রকে তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত ৩০ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি এবং চিকিৎসার জন্য এককালীন ২০০ টাকা দিয়েছিলেন। রাজা দানকে রাজকর্তব্য ভেবেছেন এবং গোপন রেখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজার এই মহানুভবতা দেশবাসীকে জানিয়েছেন। সেই সময় রাজার ছেলে যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মনের বিয়ে স্থির হয়ে গেছিল। রাধাকিশোর মাণিক্য তাঁর পুত্রবধূর কিছু অলঙ্কার কমিয়ে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে বিজ্ঞানাগার তৈরীর জন্য টাকা দিয়েছিলেন। 'বসু মন্দিরের' উদ্বোধনের সময় জগদীশ চন্দ্র বসু রাজার এই অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন।

১৯০০ ইং সেপ্টেম্বরে রাজাকিশোর মাণিক্য কিছুদিন দার্জিলিং এ কাটান। মহারাজা কবিকে তাঁর সঙ্গী হওয়ার অনুরোধ জানান। কবি সম্মত হন। রবীন্দ্রনাথ ও রাজার এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক শিল্পসংস্কৃতি ও মানবিক বিদ্যার বিকাশে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। বাং ১৩০৬ বঙ্গাব্দে 'কাহিনী' কাব্যটি করি মহারাজা রাধাকিশোরকে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯০১ ইং ৭ই মার্চ বীরেন্দ্র কিশোরের বিয়ের দিন। বিয়ে উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত ছিলেন। যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর এর বিয়ের পর তার সহচর সচিব ও যুবরাজের সহচরী শিক্ষিকা নির্বাচনের ভার রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়েছিল। এর পর কবি শিলাইদহে চলে যান। ১০ই ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজার কোলকাতার বাড়িতে যান। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯০১ কোলকাতার ভারত সঙ্গীত সমাজ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সম্বর্ধনার আয়োজন করে। এ উপলক্ষে 'বিসর্জন' নাটক অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন।

রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার রাজা হন বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর। ১৯১৩ তে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য কবিকে আগরতলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কবি ১৯১৯ এর নভেম্বর মাসে আগরতলায় আসেন। এটা ছিল কবির ষষ্ঠ বারের জন্য ত্রিপুরায় আগমন। কুঞ্জবন মালঞ্চ নিবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কবির সঙ্গে রাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য একান্তে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য কবিগুরুর হাতে সেই সময়ে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক তুলে দিয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জানুয়ারি শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মহাসমারোহে বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি সফর করে ব্রজেন্দ্র কিশোরের (লালুকর্তা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে উনার বাসভবনে রাস পূর্ণিমার সময়ে আগরতলায় আসেন। এটা ছিল কবির শেষ তথা সপ্তম বারের জন্য ত্রিপুরায় আগমন। রাজা বীর বিক্রম তখন নাবালক, মাত্র ১৬ বৎসর বয়স। সেই সময়ে লালুকর্তার বাসভবনে কবিগুরুর সঙ্গে কিশোর বীর বিক্রমের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের মধ্যে শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা ছিল দীর্ঘদিনের। তাঁদের এই অনুরাগ লক্ষ্য করে কোলকাতার গুণীজনেরা ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কবিগুরুর সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করতে। কোলকাতার টাউন হল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র শিল্প প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য। তিনি সেদিন সমবেত গুণীজনদের সামনে ঘোষণা করেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি- ভারতের কবি-বিশ্বকবি। আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।"[৩] অনুষ্ঠানে আগের দিন মহারাজের নির্দেশে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র দত্ত মহাশয় জোড়াসাঁকোতে কবি ভবনে গিয়ে কবিকে লিখিত ভাষণটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। ভাষণটি শুনে কবি খুবই প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন,-"বেশ হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। উত্তর পুরুষের মনে বেঁচে থাকার কামনা মানব মনেরই স্বভাব ধর্ম, মহারাজকে বলবে ওর লেখা দেখে অতীতের অনেক সুখ স্মৃতি আজ আমার মনে পড়ছে। ত্রিপুরার সুখ সৌভাগ্য ও মঙ্গল কামনা আমি নিরন্তর করি।"[৪] এরই সূত্র ধরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যকে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মহারাজা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে পারিষদ সহ ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মহারাজার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ ভবনে। কবি সেখানে স্বয়ং উপস্থিত থেকে রাজাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে মহারাজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহারাজার সম্মানে 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয়েছিল। এই নৃত্যনাট্য দেখতে দেখতে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের মনে হয়েছিল তিনি যেন প্রাচীন শ্রাবস্তীতে অনাথপিন্ডদের শৌখিন উদ্যানেই বসে আছেন। সেখানে সঙ্গীত ভবনের জন্য একটি বিরাট রঙ্গমঞ্চ তৈরী করার ইচ্ছা ছিল কবিগুরুর। মহারাজা কবিগুরুর এই একান্ত ইচ্ছা পূরণের জন্য সেই সময়ে বিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। সেই সময়ে বীর বিক্রম কিশোর মাঙ্গিদের মাতা অরুন্ধতী দেবী পরলোকগমন করেন। এত কিছু বিপর্যয়ের মধ্যেও মহারাজা ঠিক করেন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরুর আশিতম জন্ম জয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করবেন। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশিতম জন্মদিনটি বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। সেইদিন মহারাজ পারিষদবর্গকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে দরবারে এসে আসন গ্রহণ করেন এবং স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করেন। এক বিশেষ ঘোষণাপত্রে বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য স্বাক্ষর দান করে বিশ্বকবিকে 'ভারতভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ত্রিপুরাধিপতি সেদিন ঘোষণাপত্রে লিখেছিলেন-"এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে 'ভারত ভাস্কর' আখ্যায় ভূষিত করা যায় এবং শ্রীভগবান তদীয় আশীর্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।"[৫]

এই সম্মানসূচক অভিজ্ঞানপত্র সমর্পণ করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে নানাবিধ রাজখানদানি, স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে কবির নিকট শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে হুইল চেয়ারে করে উত্তরায়ণে আনা হয়। সেখানে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মহারাজা প্রদত্ত 'ভারত ভাস্কর' উপাধি কবিগুরুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেদিনটি ছিল ৩০ শে বৈশাখ ১৩৪৮। রাজকীয় সম্মানের প্রত্যুত্তরে কবির লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। কবি সেদিন বলেছিলেন-"ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলুম, আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এরকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন এই বলে যে, তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছিলেন, সেদিন এই কথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমান কম এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রুপ করত। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি মনে ভাবলুম এই মৃত্যুতে রাজবংশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসুত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তা হয়নি। কবি বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিছিন্ন রয়ে গেল। এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ যখন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠল ঠিক সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজার জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্বল, আমার ক্ষীণকণ্ঠ, সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনিতে কবি জীবনের অন্তিম শুভকামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহা নৈঃশব্দের মধ্যে শান্তিলাভ করুক।"[৬] ইতি- ৩০ বৈশাখ ১৩৪৮ শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি এখানে বলেছেন যে" আমার বয়স অল্প.........বিদ্রুপ করত।" এই কথাগুলি হয়তো সম্পূর্ন সতা নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২১/২২ বছর। তাঁর অনেক

লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং বেশ প্রশংসাও পেয়েছেন। ‘কবি কাহিনী’, (প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ) (প্রথম কাব্য) ‘বনফুল’, ‘বাল্মিকী প্রতিভা’, ‘কাল মৃগয়া’, ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’, ‘করুণা’ (প্রথম উপন্যাস) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিপুর থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া তিন-তিনটি সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রতি ভাষণ নির্মাণের ক্ষেত্রে কবির নিজের প্রতি তুচ্ছ মানবিকতা বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক সুবিমল রায় যথার্থই লিখেছেন, “নিজেকে তুচ্ছ, অকিঞ্চিত করে প্রকাশ করার মানসিকতা, তার সঙ্গে মিশেছে প্রথাগত বিনয়, নিজেকে সম্মান প্রাপ্তির অযোগ্য, অভাজন ঘোষণা করে সংবর্ধনা প্রদানকারীকে গৌরবান্বিত্ত করা।”[৭]

এর মাত্র ২ মাস ২২ দিন পর ২২ শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে কোলকাতার চারদিক অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বোম্বাই থেকে 'চেম্বার অব প্রিন্সেস' এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা শেষ করে ট্রেনে করে ব্যাঙ্গালোর আসছিলেন। আসার পথে গুন্টাকল জংশন স্টেশনে তিনি জানতে পারেন যে, কবিগুরু আর বেঁচে নেই। এই খবর জানতে পেরে মহারাজা গভীর শোকাহত হন। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে কবিগুরুর আত্মার সদগতি কামনা করে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে শোক পালনের জন্য নির্দেশ দেন।

১৮৯৭ থেকে মহারাজার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। সিংহাসনে আরোহণের আগে এবং পরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিক নানা সমস্যা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্য। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন এবং রাজার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে রবীন্দ্রনাথ 'কোটিল্যের মতো' (খগেশ দেববর্মণ এর কথায়) রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করেছিলেন। প্রশাসনিক সংস্কার, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে পরিবর্তন, মন্ত্রী নিয়োগ, রাজকুমারদের শিক্ষাদানের শিক্ষক নিয়োগ, পারিবারিক কলহ সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সুপরামর্শ দিয়েছেন। বীরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল স্নেহের। আর রাধা কিশোরের সঙ্গে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে কবির ছিল আত্মার বন্ধন। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য থেকে বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য পর্যন্ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্কের যে এক অবিচ্ছিন্ন ধারা চলছিল তা কবির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরদিনের জন্য ছিন্ন হল। শুধু রয়ে গেল মধুর স্মৃতি যা বিশ্ব সাহিত্যের পাতায় আজও অম্লান।

এক নজরে বিভিন্ন সম্ভাব্য তথ্য থেকে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা ভ্রমণ :

১। ১৮৯৯ সালের ২৭ মার্চ ত্রিপুরায় প্রথম বার।

২। ১৯০১ সালের নভেম্বর দ্বিতীয় বার।

৩। ১৯০৫ এর জুলাই মাসে তৃতীয় বার।

৪। ১৯০৫ এর নভেম্বরে চতুর্থ বার।

৫। ১৯০৬ এর এপ্রিল মাসে পঞ্চম বার।

৬। ১৯১৯ এর নভেম্বর মাসে ষষ্ঠবার।

৭। ১৯২৬ এর ফেব্রুয়ারী সপ্তম বার।

পাদটীকা :

১। ত্রিপুরা রাজমালা- কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত পারুল প্রকাশনী- চতুর্থ সংস্করণ ২০০২ – পৃষ্ঠা- ১৩২

২। তদেব পৃষ্ঠা- ১১৫

৩। তদেব পৃষ্ঠা- ১২৮

৪। আধুনিক ত্রিপুরা- প্রসঙ্গ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী প্রথম প্রকাশ ২০০৮, অক্ষর, পৃষ্ঠা- ১২২

৫। ত্রিপুরা রাজমালা- কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত পারুল প্রকাশনী- চতুর্থ সংস্করণ ২০০২ – পৃষ্ঠা- ১৩২

৬। তদেব পৃষ্ঠা- ১৩৩

৭। রবীন্দ্রনাথ মহারাজা বীরচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা লগ্নে সুবিমল রায় প্রথম প্রকাশ ২০১৫, মৌমিতা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৪৭।

আধা-মিলিশিয়া : সুন্দরবনে নারীশক্তির উজ্জীবন, তেভাগা আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস

শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, গোপীবল্লভপুর-২, ঝাড়গ্রাম

সার-সংক্ষেপ : দেশ-মাটি-জমিন যখন কোন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, তখন মানুষ শৃঙ্খল মোচনের জন্য বিদ্রোহের ঝান্ডা ধরে - বিশ্ব ইতিহাসের এ এক অমোঘ সত্যি। দক্ষিণ বাংলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষ যখন সার্বিক পরাধীনতার ছোবলে যন্ত্রণাকাতর, তখনই খাঁড়ার মতো তাদের বুকে নেমে এসেছিল জমিদার-জোতদার-মহাজনি অত্যাচার, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনেক পূর্ব থেকেই। সুন্দরবনের জঙ্গল চিরে জমিন তৈরি ও আবাদ পত্তন করেছে হাভাতে মানুষ। রুটি রুজি আর মাটির টানে হিংস্র জন্তুর সামনে নির্দ্বিধায় জীবন পেতে দিয়েছিল তারা। কিন্তু তাদের সেই আশা বাস্তবায়িত হয়নি। জমিদার জোরদার নায়েবদের অত্যাচারে জর্জরিত এই মুক্তিপিয়াসী মানুষ অর্গলমুক্ত হতে চেয়েছিল। তাই ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে সুন্দরবনের অগুনতি কৃষক ও কৃষক রমণী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল,চল্লিশের দশকে। দিয়েছিল প্রাণও। সুন্দরবনের মৃত্তিকাতে অহল্যা- উত্তমী- বাতাসি-সরোজিনী-অশ্বিনী-দেবেন-গণেশ-গজেন-কংসারি হালদারদের রক্তের দাগ মননশীল ব্যক্তিবর্গকে ভারাক্রান্ত করেছে। সলিল চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,রাম বসুরা যেমন কবিতার পাতায় তেভাগা সংগ্রামীদের অমর করেছে, তেমনি আব্দুল্লাহ রসুল, শিশির দাস, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়রা উপন্যাসের জগতে তাদের ঠাঁই দিয়েছেন। সুন্দরবনের তেভাগা আন্দোলন নিয়ে রচিত হয়েছে একের পর এক উপন্যাস। আমাদের আলোচনা অগ্রসর হবে শিশির দাসের 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা' (১৯৬৬), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' (১৯৯৪) ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদী মাটি অরণ্য' (তৃতীয় খণ্ড-তেভাগা পর্ব-২০০১) উপন্যাসের নিরিখে - যেখানে নারীশক্তির উজ্জীবনের ভিন্নতর বীক্ষণকোণ প্রকাশিত।

সূচক শব্দ: সুন্দরবন, তেভাগা আন্দোলন, নারীশক্তি,জমিদার-জোতদার, কমিউনিস্ট, রাষ্ট্রশক্তি, আধা মিলিশিয়া, গণ-আন্দোলন।

মূল আলোচনা :

১.

উপন্যাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রূপে তেভাগা আন্দোলন ও সুন্দরবন

হ্যাঁ, 'তেভাগা' - স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলায় সংঘটিত গণআন্দোলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী এক কৃষক আন্দোলন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এই আন্দোলন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আকার ধারণ করে। কাকদ্বীপ, বুধাখালি, চন্দনপিঁড়ি, লয়ালগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, নোয়াখালী - বাংলার এক বৃহৎ অঞ্চলের চাষাভূষা মানুষ কৃষিতে উৎপন্ন ফসলের বন্টন নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করে। ময়মনসিংহের 'টংক আন্দোলন', দিনাজপুরের 'অধিকার' আর সুন্দরবনের 'তেভাগা' - এই ত্রিমাত্রিক চেহারা নিয়ে কৃষক ও ভূমি-আন্দোলন বিশিষ্টতা লাভ করে। ফসলের 'আধিপ্রথা'র বিরুদ্ধে 'তেভাগা'ই ছিল সুন্দরবন তথা বাংলার তেভাগা

আন্দোলনের মৌল উদ্দেশ্য। উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগ - এক ভাগ কৃষকের, এক ভাগ জমির মালিকের, আর এক ভাগ কৃষক পাবে জমির খরচা বাবদ - এই হল তেভাগা।

বাংলায় কৃষক আন্দোলনের পশ্চাৎপট একটু দেখে নিতে হয়। কৃষক আন্দোলনের নেতা বঙ্কিম মুখার্জি 'সারা ভারত কিষাণ সভা'র (১৯৩৬) অংশ হিসাবে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতি' (১৯৩৯) গঠন করেন এবং বাংলার চাষিদের মধ্যে জঙ্গিপনা চারিয়ে দেন। যাইহোক, কৃষকসভার মূল দাবি ছিল - জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও কৃষকদের হাতে জমি ন্যস্ত করা। কৃষকদের ন্যূনতম দাবি ছিল - কর্জ খারিজ,অসাশ্রয়ী জমির উপর ভূমিরাজস্ব কর প্রত্যাহার, কৃষকদের উপর করের বোঝা কমানো,ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দাবিগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে চারিত করার জন্য কৃষকসভার পক্ষ থেকে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় এবং মৌল দাবিগুলি শ্লোগানের আকারে লিফলেটের মাধ্যমে বিলি করা হয় :

'নিজ খামারে/খোলানে ধান তোল'
'আধি নাই তেভাগা চাই'
'কর্জ ধানের বাড়ি নাই'
'বেআইনী আদায় নাই'
'দল বেঁধে ধান কাটো'
'ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলো'
'জান দেব তবু ধান দেবো না'

তেভাগার এই রণধ্বনিকে কৃষকরা সংযুক্ত করে নিয়েছিল সেদিন। সুন্দরবন তাতে বাদ যায়নি। সুনীল চট্টোপাধ্যায় এর সভাপতিত্বে কাকদ্বীপের ডাকবাংলো মাঠে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে হাজার হাজার কৃষক লাল ঝান্ডার তলায় হাজির হয়। সমগ্র ভারতভূমি যখন স্বাধীনতার আস্বাদনে আস্বাদিত তখন সুন্দরবনের মানুষ এক ব্যতিক্রমী মানসিকতায় ঋদ্ধ হয়ে আরও সংগ্রামমুখী হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার দিনই কাকদ্বীপের চাষিরা লাল ঝান্ডা উঁচিয়ে জমি আর বাঁচার লড়াই হাজার গুণ জোরদার করার সংকল্প নেয়। কংসারি হালদার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

'১৯৪৬ সালে ফসল কাটার সময় বঙ্গীয় কৃষক সভা যখন তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেয়, কাকদ্বীপের মাটিতে কৃষক সমিতির লাল পতাকা ওঠে।... কাকদ্বীপে যে আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৬-৪৭ সালের ফসল কাটার সময় থেকে, তা চলতেই থাকে যখন বাংলার অন্যত্র তেভাগা আন্দোলন তুলে নেয়া হয়েছে। ১৯৪৭-৫০ পর্যন্ত পুরো সময় ধরেই কাকদ্বীপে আন্দোলন চলছে। যদিও সে আন্দোলন সবসময় একই রাস্তায় হাঁটেনি। কাকদ্বীপ আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখতে হবে।'

তাই বলতে হচ্ছে অখণ্ডতা ও বিপুল অন্ধকারের মধ্যে জেগে থাকা সুন্দরবনের নর-নারীরা স্বাধীনতার পরেও চূড়ান্ত পরাধীন হয়ে নতুন উদ্যমে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা দেশের মধ্যে চূড়ান্ত ব্যতিক্রম হয়ে রয়ে যায় সুন্দরবন।

১৯৪৮ সালের ৬ই নভেম্বর নবনির্মিত স্বাধীন কংগ্রেস সরকার পাঁচশো সশস্ত্র পুলিশ পাঠায় চন্দনপিঁড়িতে। নায়েব পরেশ দাস ও রাইচরণরা পুলিশের পথ প্রদর্শনকারী। চোদ্দজন কৃষক রমণীর সঙ্গে ছত্রিশজন রাইফেলধারী গোর্খা পুলিশের সেই অসম লড়াই আজ ইতিহাস। সুন্দরবনের কৃষক রমণীরা বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের উপর। নারী বাহিনীর মেয়েদের হাতে ঝাঁটা বটি দা। অহল্যা পরেশ দাসের মুখে ঝাঁটা মারে। উত্তমী বাতাসিরা পুলিশের ঘাড়ে দা'এর কোপ বসায়। মুখে তাদের লালঝান্ডার জয়ধ্বনি। শত্রু সংহারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তারপর

দেখা গেছে পুলিশি বর্বরতার এক চূড়ান্ত পরিণাম। সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'তেভাগা সংগ্রাম' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন পুলিশের বর্বরতা ও অহল্যা উত্তমী বাতাসিদের সেই মর্মান্তিক কাহিনি। পুলিশের গুলিতে একে একে ঝাঁজরা হয়ে যায়। আমরা সেদিন দেখেছি গর্ভবতী আহল্যার মৃত্যু,এক নিদারুন ইতিহাস তৈরি করে যায়। অহল্যা মায়ের অনাগত সন্তানকে নিয়ে কবি বিনয় রায় লিখেছেন:

'আহল্যা মা, তোমার সন্তান জন্ম নিল না
ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা
শত কংস ধ্বংস করে যে শিশু জন্মিবে
মাঠে মাঠে তারই জল্পনা।'

চন্দনপিঁড়ি তৈরি করেছে সংগ্রামের এক নতুন ইতিহাস। বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে সশস্ত্র শত্রুর সঙ্গে ভয়লেশহীন এক সংগ্রাম - সুন্দরবনের ভূমিহীন কৃষক-রমণীদের এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম - বীরত্ব আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস - জীবন্ত ইতিহাস। এই জীবন্ত ইতিহাসকে ধারণ করেই রচিত হয়েছে শিশির দাসের 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদী মাটি অরণ্য' (তেভাগা পর্ব) এবং ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' উপন্যাস।

২.

শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা : ইতিহাসের কক্ষে জীবনের পরিক্রমণ - মোহিনী গান্ধারী - নারীশক্তির পরাকাষ্ঠা

সুন্দরবনের তেভাগা আন্দোলনের এক অনালোকিত ইতিহাসের ঐতিহাসিক দলিল শিশির দাসের শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা (১৯৬৬)। উপন্যাসটি ১৯৩০-৫০ এই তিরিশ বছরের সুন্দরবনের মাটির টানে ও নোনা হাওয়ার ঘ্রাণে সঞ্জীবিত মানুষদের মর্মকথন। রাষ্ট্র তথা জোরদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখাভুখা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির স্ফুরণ এই উপন্যাসে আমরা দেখেছি। ব্ল্যার্ব এ বলা হয়েছে :

‘কাকদ্বীপ - সুন্দরবন তেভাগা আন্দোলনের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত কুড়ি বছরের ভয়ঙ্কর কালের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের এই প্রথম এক তথ্যনিষ্ঠ মূল্যবান সম্পূর্ণ দলিল।'

সুন্দরবনের মাটি,অরণ্যের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আর সে মাটি আর মানুষের ঘাম ও ইতিহাসসম্পৃক্ত বাস্তব জীবনের ঐতিহাসিক বিনির্মাণ এই উপন্যাস।

হ্যাঁ, 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা' ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও তা ইতিহাস সমর্থিত। ঔপন্যাসিক বোধ হয় বাস্তব চরিত্রনাম আড়াল করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, উপন্যাসের বৃন্দাবন ঘোষ আসলে রাসবিহারী ঘোষ, মধু হালদারই কংসারি হালদার, বিদ্যুৎ বোস আসলে অশোক বসু, বিশ্বনাথ মাইতি হল জগন্নাথ মাইতি আর সর্বোপরি গজেন মালি হয়েছেন গণপতি হালদার। গণপতি হালদারই এই উপন্যাসের মূল চরিত্র। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের সূত্র ও ঐতিহাসিক চরিত্রনাম নির্দ্বিধায় স্বনামাঙ্কিত করা যায়, সেখানে ঔপন্যাসিকের কেন এতটা আড়াল? প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। আসলে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী হলেও অবলীলায় শিশির দাস দেখিয়ে দেন তেভাগা আন্দোলনে কমিউনিস্টের দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি, নেতৃবৃন্দের মতবিরোধকে। তাই হয়ত কিছুটা নামের আড়াল করতে হয়েছে কিংবা ছদ্মনামের (বিদ্যুৎ, মধু) আশ্রয় নিতে হয়েছে।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্যই গণপতি। তার অসামান্য মনুষ্যসত্তাকে আলোকপাত করতে ঔপন্যাসিক তাকে মেদিনীপুর থেকে এনে হাজির করিয়েছেন সুন্দরবনে। জঙ্গল কেটে আবাদ পত্তন, পরিণামের জমি পাবে - এই আশায় ১৯৩০ সালে চলে আসে মনুষ্যবর্জিত সুন্দরবনে। তারপরে একে একে তার চোখের সামনে উন্মোচিত হয় সুন্দরবনের জোতদার জমিদার নায়েবি অত্যাচারের চালচিত্র। মহিম ঘোষাল, লক্ষ্মান বারিক, অনন্ত শাসমলদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, নিপীড়ন এবং তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানায় গণপতি। গণপতির মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক তৈরি করেন তেভাগা আন্দোলনের ভিত।

উপন্যাসে বহুরৈখিক স্বরে প্রতিভাত হয়েছে গণপতির প্রতিবাদী সত্তা। মার খাওয়া কৃষকদের অন্তরে প্রতিবাদের বীজ উপ্ত করতে চায় গণপতি। ব্যাঘ্রসম মহিম ঘোষালের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে ভয় পায় না। পরিণামে তাদের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবুও দমার পাত্র নয় গণপতি। আসলে শিশির দাস গজেন মালির চরিত্র সঞ্চারিত করেছেন গণপতি মাধ্যমে। তাই গণপতি হয়ে ওঠে এক বলিষ্ঠ সংগ্রামী নেতা, গজেন মালির মতোই। উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে আমরা দেখি গণপতির বিদ্রোহী সত্তার স্ফুরণ, বাঁচার মতো বেঁচে থাকার আহ্বান:

'অপমান সহ্য করে কুকুরের মত বাঁচার চেয়ে লড়ে মরাই ভালো। কিছু না বলে বলে জমিদার, জোরদার,নায়েব,গোমস্তাদের অমন সাহস বেড়েছে। রুখে দাঁড়ালে শুয়োররা সোজা হয়ে দাঁড়াবে'। (পৃ.৪০)

কিংবা 'জান দেব তবু মন দেবো না- এই যদি ভাবতে পারি তবেই আমরা বাঁচবো, না হলে দুদিন পরে গরুর গাড়িতে জুতবে আমাদের'। (পৃ.৭৫)

বলিষ্ঠ প্রতিবাদী জননেতার মতই কথা। কোন 'বাদ' বা 'ism'এর বশবর্তী হয়ে নয়; বাঁচার তাগিদে লড়াইয়ের আহ্বান। উপন্যাসের তেভাগার ইতিহাসের সমান্তরাল বিন্যাসে উঠে এসেছে এই মানুষ গণপতি। সে যেমন ইতিহাসের মানুষ তেমনি ভূমিহীন অসংখ্য কৃষকের দোসর। সুন্দরবনের নিরন্ন নিরস্ত্র খেটে খাওয়া মানুষদের অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে। গজেন মালি তো এভাবে তেভাগা আন্দোলনে জমিদার নায়েব পুলিশদের ত্রাস হয়ে উঠেছিল। সেই ত্রাসরূপী গজেনের বাস্তব চিত্র উপন্যাসে গণপতির চরিত্রে এঁকেছেন লেখক। গণপতিই সর্বপ্রথম 'বাজে আবওয়াব' দিতে অস্বীকার করে। তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে একের পর এক চাষি জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধাচারণ করে। গণপতির আহবানে সাড়া দেয় সুন্দরবনের প্রত্যেক অঞ্চল। বুধাখালীর সাধুচরণ মাইতি, শিবনাথ মাইতি, শিবরামপুরের বিহারীলাল ঘোড়ই, চন্দনপিঁড়ির ইন্দ্র মাইতি, রাধানগরের ফরমান শেখ, সাঁওতালদের তরফ থেকে সুবল হাঁসদা। এ ঘটনা অবশ্যই ইতিহাস সমর্থিত। ঔপন্যাসিক ব্যক্তিনামগুলি পরিবর্তন করেছেন মাত্র। যতীন মাইতি, জগন্নাথ মাইতি ও গুণধর মাইতি - এই তিন মাইতি সুন্দরবনে তেভাগার ইতিহাসে 'তিন বিপজ্জনক মাইতি' নামে চিহ্নিত। উপন্যাসে এরাই সাধুচরণ মাইতি, শিবনাথ মাইতি ও ইন্দ্র মাইতি নামে দেখা গেছে। আর মঝঝুম শেখ হয়েছে ফরমান শেখ। নামের পরিবর্তনে ইতিহাস মিথ্যে হয়ে যায় না। ঔপন্যাসিক তেভাগার ইতিহাসকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন উপন্যাসে।

সুন্দরবনের কৃষক নেতারা গ্রামে গ্রামে রাতবিরেতে মিটিং করে চাষিদের ঐক্যবদ্ধ করে। কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় অফিস তৈরি হয় লায়ালগঞ্জ এ। মহিলা সংগ্রাম কমিটিও গঠিত হয়। নারীরা বর্শা চালাতে শেখে, লাঠি চালাতে শেখে। সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। ঔপন্যাসিক সেই আলোড়নের বহুমাত্রিক বিন্যাস রচনা করেন 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা'তে। গণপতি,

শিবনাথ চরিত্রের সমান্তরালে উঠে এসেছে মোহিনী গান্ধারীরা - যেখানে নারিশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। সুন্দরবনের এ এক বাস্তব ইতিহাস।

কৃষক সংগঠনের বিপ্রতীপে সুন্দরবনের জমিদার জোতদাররা তৈরি করে 'জোরদার অ্যাসোসিয়েশন', 'ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি' (V.D Party) এবং তার নাম দাঁড়ায় 'সেবাদল'। একদিকে পুলিশি সন্ত্রাস, অন্যদিকে সেবাদলের নারকীয় লীলার সাক্ষী থেকেছে গোটা সুন্দরবন। তাই নায়েব অবনী ব্যানার্জি অন্তঃসত্ত্বা ময়নাকেও রেহাই দেয় না। পালানকে রক্তাক্ত হতে হয়। পুলিশের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে ময়নার অকাল ভ্রূণ মাটিতে পড়ে রক্তারক্তি হয়। প্রতিবাদে গর্জে ওঠে নারীশক্তি - মোহিনী, গান্ধারীরা। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। চন্দনপিঁড়ির ভবেশ দাসের (পরেশ দাস) চক্রান্তে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। সরোজিনী অহল্যা উত্তমী বাতাসি অশ্বিনী গজেন ভূঁইয়াসহ ন'জন মারা যায় চন্দনপিঁড়িতে। রক্ত-প্লাবন বয়ে যায় সুন্দরবনের মাঠে-ঘাটে, ক্ষেত-খামারে। রক্তের বদলে রক্ত চাই - এই শ্লোগানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ঔপন্যাসিক মোহিনী ও গান্ধারী চরিত্রের মাধ্যমে নারীশক্তির উজ্জীবনকে দেখিয়েছেন। তেভাগা আন্দোলনের কৃষক নেতা তথা এই উপন্যাসের নায়ক গণপতির যোগ্য সহধর্মিনী মোহিনী,যে সুন্দরবনের নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়। মহিলা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বও দেয়। গণপতির প্রতিবাদী সত্তা সঞ্চারিত হয়েছে মোহিনীর চরিত্রে। তাই সে উপন্যাসে অসুর বিনাশিনী দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার এক রূপ হিসেবে প্রতিপন্ন। রাতের অন্ধকারে জমিদারের গুণ্ডাদের ঘায়েল করার অদম্য সাহস ও শক্তি সে অর্জন করে। মোহিনী তাই দেবী দুর্গার সঙ্গে সমীকৃত হয়ে যায় যেন :

'লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মোহিনী বুকে পা দিয়ে দাঁড়ালো সেই লোকটার, তারপর বল্লম দিয়ে তার বুকে মারল এক খোঁচা। নিজেকে তখন ওর মা দুর্গা বলে মনে হচ্ছিল, যেন ও অসুর নিধনে মেতেছে।' (পৃ. ৩০২)

মোহিনী ব্যক্তিত্বময়ী ও প্রখর বুদ্ধিমতী। তাই চাষিরা নিজের খোলানে মাঠের ধান তোলার সময় জমিদারের লেঠেল বাহিনী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে মোহিনী উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। শাঁখে ফুঁ দিয়ে আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস জানান দেয়। মুহূর্তেই মেয়েরা দা বটি লাঠি ঝাঁটা নিয়ে জমায়েত হয়ে জমিদারের লেঠেল বাহিনীকে ঘায়েল করে। নারীশক্তির এই উজ্জীবন সেদিন চাক্ষুষ করেছিল রাষ্ট্রশক্তি।

বিধবা গান্ধারীও কৃষক সমিতির সভ্য। বাঘিনির মতো অসীম সাহসিনী ও তেজস্বিনী। নায়েবদের বিরুদ্ধে তার তীক্ষ্ণ চিৎকার: 'এর শেষ দেখে নিতে হবে। ঐ অবনীকে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়তে হবে।' (পৃষ্ঠা ২৬৩)

সুন্দরবনের অত্যাচারী নায়েবকে সমুচিত জবাব দিতে বদ্ধ পরিকর। নায়েবের বিরুদ্ধে তার বিষোদ্গার :

চলো সব। এখন কাছারিতে পুলিশ নাই। খানকির ছাওয়াল ওই নায়েবটাকে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি। (পৃ.২৬৪)

হ্যাঁ, সুন্দরবনের তেভাগা আন্দোলনকে সর্বাধিক সমর্থন দিয়েছিল মেয়েরাই। অবশ্য তার পশ্চাতে সামাজিক কারণও আছে। কেননা তারা যেমন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করে, সংসারের ঘানি টানে এবং ঘরের পুরুষদের দ্বারা ঠ্যাঙানি খায় তেমনি জমিদার নায়েবদের কাছ থেকে হর হামেশাই লাঞ্চিত হয়। কেউ বা হয় ধর্ষিতা। ফলত তাদের মধ্যে

এক প্রতিবাদী সত্তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বেরিয়ে এসেছে। তাই তারা এতটা দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছিল সেদিন।

একথা সত্যি যে, সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলন গোটা বাংলার সমাজব্যবস্থার মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। এর মধ্যেই নিহিত ছিল জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের শঙ্খধ্বনি। গণপতিকে ঔপন্যাসিক ইতিহাসধৃত এক সামাজিক ব্যক্তিমানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। সুন্দরবনের কাদামাটির ঘ্রাণ আর ইতিহাসের প্রাণ - এই দু'এর সম্পৃক্ততায় 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা' শেষ অবধি ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পেরেছে,যেখানে সুচারু রূপে বিন্যস্ত হয়েছে ইতিহাসের কক্ষে জীবনের পরিক্রমণ ও সুন্দরবনের নারীশক্তির উজ্জীবন।

৩.

নদী মাটি অরণ্য : সুন্দরবনের তেভাগা ও ব্যঞ্জনাময় অহল্যা কথন - নারীশক্তির জাগরণ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসের **তৃতীয় খণ্ডটি (২০০১)**- অহল্যা ও লঙ্কা কাণ্ড - তেভাগা পর্ব। এর মৌল অবলম্বন হল ইতিহাস। স্বয়ং উপন্যাসকার বলছেন: 'তৃতীয় খণ্ডের পায়ে পায়ে ইতিহাস। অন্য দুটি খণ্ডে ইতিহাসের ভাগ কম, জানার জগৎ বেশি। তৃতীয় খণ্ডের শেষদিকে ইতিহাসই মূল আশ্রয়।'আর উপন্যাসটি রচনার মৌল প্রেরণা মহাশ্বেতা দেবীর লেখনী। মহাশ্বেতা দেবীর 'বর্তিকা'র 'কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলন' সংখ্যাটি পড়ে তৃতীয় খণ্ড লেখার কথা মাথায় আসে - এমনটা বলেছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসকে জীবনসম্পৃক্ত করে প্রকাশ করেছে ঔপন্যাসিক। ফলত তা 'ঐতিহাসিক রস' সৃষ্টির অনুকূল হয়েছে।

শুরুতেই বলে রাখি, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিলের পটভূমিতে রচিত 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসটি মহাকাব্যিক ফর্ম ও রামায়ণী চরিত্রমায়ার আদলে রচিত। আমরা জানি, রামায়ণের সাত কাণ্ড - বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর। তেমনি 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসেও তিনটি পর্ব ও সাতটি কাণ্ড - আদি, মন্থন, অগ্নিপরীক্ষা, অজ্ঞাতবাস, যযাতি, অহল্যা ও লঙ্কা। রামায়ণ যেমন আর্যসভ্যতার কৃষিভিত্তিক জীবনের প্রতীক, তেমনি 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাস সুন্দরবনের মুনিস কৃষকদের উত্তরণের শৈল্পিক উদ্ভাস। রামায়ণ বাঙালি জীবনাদর্শ ও ন্যায়নীতিপরায়ণতার কাহিনি, পক্ষান্তরে 'নদী মাটি অরণ্য' জমিদার নায়েব লাটদারের সঙ্গে সুন্দরবনের সংগ্রাম বিধ্বস্ত মানুষদের সংঘাত ও উত্তরণের কাহিনি। কাহিনির ভিন্নতা থাকলেও কলাকৌশল ও প্রকরণগত সাদৃশ্য আছে - রামায়ণের চরিত্রনাম ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসে, অবশ্য প্রেক্ষিত সম্পূর্ণই আলাদা।

১৯৪৬ সাল কৃষকদের ভূমি আন্দোলনের এক ক্রান্তিকাল। নায়েবরূপী রাবণদের হত্যা করতে এবং কৃষকরূপী হাজার হাজার সীতাদের উদ্ধার করতে রামচন্দ্ররা একে একে স্বর্ণলঙ্কায় প্রবেশ করে। যতীন মাইতি, কংসারি হালদার, কমলাকান্ত ভূঁইয়া, নগেন্দ্রনাথ বারিক, রামনগরের বিশ্বমিত্র, কুশধ্বজদের সঙ্গে আরও একাধিক রাম - হেমন্ত ঘোষাল, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ কৃষক নেতারা। সুন্দরবনের গণআন্দোলনের প্রকৃত অভ্যুত্থান হয় তারপর। চাষিরা এক আশ্চর্য শক্তি পেয়ে যায়। বুধাখালি লয়ালগঞ্জ রাজনগর চন্দনপিঁড়ির চাষি-মা-বোনেরা শপথ নেয় - ধান কেটে জমিদার নয় ; নিজের নিজের খোলানেই তুলবে। সুন্দরবনে বিপ্লবী সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের আগমন কৃষকদের প্রেরণাশক্তিকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। সুনীল চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং লিখেছেন :

'গত ৮ই নভেম্বর কাকদ্বীপে পৌঁছে বুধাখালি গ্রামে যাই। সুন্দরবনের সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক... সরকার জমিদার ও মহাজনদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। দাবি তুলেছে জমিদারদের খামারে ধান তুলবো না, দশ আনা চাষির, ছ'আনা জমিদারের, ভাগচাষির স্বত্ব স্বীকার করতে হবে'।

লয়ালগঞ্জ, হরিপুর, রাজনগরের চাষিদের মনে কমিউনিস্টদের 'লাল পতাকা' সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে, এভাবেই। কংসারি হালদার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় দিনবদলের ভার ন্যস্ত করেন চাষিদের উপর। ঔপন্যাসিকের লেখনীতে তা জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে:

'এ যুগের বাঘ তো শুধু জঙ্গলেই থাকে না, বাঘ থাকে লোকালয়েও।... সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই করে আপনারা এতদিন বেঁচে থেকেছেন। কিন্তু এই বেঁচে থাকা আসলে মরে বাঁচা।মানুষ যেভাবে বেঁচে থাকে, সেভাবে আপনারা কেউ বাঁচেননি।... এবারের সংগ্রাম কৃষকদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম'। (তৃতীয় খণ্ড, পৃ.২০২)

অতঃপর মৃত্যু ও রক্তস্রোত উপেক্ষা করে সেদিন সুন্দরবনের হাজার হাজার কৃষক পুরুষ ও কৃষক নারী তেভাগা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। চাষিদের ধান কাটা থেকে বিরত করতে না পেরে পুলিশ প্রতিবাদী গর্ভবর্তী পাখির (১৯ বছর) পেটে বন্দুকের কুঁদো মারে। 'একটা জীবন ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই রক্তে স্নান করে বিদায় নিল মায়ের গর্ভ থেকে'। নবনিযুক্ত সরকারের পুলিশের সেই পৈশাচিক উল্লাস আজও পীড়া দেয় প্রত্যেক বাঙালির মননে - 'অমন ডবকা বয়সে উঁচু পেট ভালো দেখাচ্ছিলো না, তাই ফিট করে দিলাম' - এ মন্তব্য আজও রোম খাড়া করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ১৯৪৮ এর ৬ নভেম্বর চন্দনপিঁড়িতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয় অহল্যা উত্তমী বাতাসি সরোজিনীরা। আর ৩১শে ডিসেম্বর বুধখালিতে ধান কাটতে গিয়ে আবারও পুলিশের সন্ত্রাসের বলি হয় সুরেন মণ্ডল, সুধীর ঘোড়ই,নীলকণ্ঠ সামন্তরা। ইতিহাসের এই চরম ও অস্থিবিদারক মুহূর্ত ঔপন্যাসিক অঙ্গীভূত করেছেন উপন্যাসে।

'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসে একাধিক অহল্যার সন্ধান দিয়েছেন ঔপন্যাসিক, যারা নারীশক্তির প্রতীক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়ে ঔপন্যাসিক একাধিক অহল্যার বিনির্মাণ করেছেন। পাষাণপ্রতিম অহল্যাদের ধ্যান ভাঙতেই টলে যায় সুন্দরবনের জমিদার নায়েব সহ রাষ্ট্রযন্ত্র। তেভাগা আন্দোলনের বীরাঙ্গনা অহল্যা, উত্তমী, বাতাসিদের পূর্বসূরি - হৃদয়ে বধ হয়ে যাওয়া একাধিক নারী উপন্যাসে ‘অহল্যা’ নামেই পরিচিত হয়েছে। আসলে 'অহল্যা' শব্দটিকে ঔপন্যাসিক শুধু ব্যক্তিনাম হিসেবেই ব্যবহার করেননি; এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ - নারীশক্তির উজ্জীবনকেই দ্যোতিত করেছেন এই নামে। উপন্যাসের অন্তঃর্গূঢ় পরাপাঠে আমরা 'অহল্যা' নামের চতুর্মাত্রিক ব্যঞ্জনা অনুধাবন করি।

ক. কঠিন আঘাতে বধ হয়ে যাওয়া হৃদয়।

খ. হতভম্ব-হতবাক-পাষাণ হয়ে যাওয়া হৃদয়।

গ. অবরুদ্ধ কষ্টের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া হৃদয়।

ঘ. শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর অপমানের প্রতিশোধে অবশেষে গর্জে ওঠা প্রতিবাদী হৃদয়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত সুন্দরবনের নারীদের ঔপন্যাসিক 'অহল্যা' নামাঙ্কিত করেছেন। উপন্যাসে তাই একাধিক অহল্যা আমরা দেখছি, যারা জর্জরিত হতে হতে পাষাণ হয়ে যায়। অবশেষে তাদের ঘুম ভাঙার মধ্য দিয়ে নারীশক্তির উজ্জীবনকে স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক।

১. প্রথম অহল্যা - বিয়ের দিনেই নৌকাডুবিতে স্বামীর মৃত্যু (বকা), অতঃপর বড়দা ইন্দ্রনারায়ণকে পুনর্বিবাহ করতে বাধ্য হওয়া এক নারী - নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে হৃদয়ে বধ হয়ে

যাওয়া পাষাণপ্রতিম নির্বিকার এক নারী - ঔপন্যাসিক অহল্যা নামেই নামাঙ্কিত করেন। বারো বছর ধরে স্বামীর প্রতীক্ষায় পাষাণ হয়ে যাওয়া কঠিন হৃদয়ের ঘুম ভাঙে চাষিদের অত্যাচার নিরসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়। নায়েব বনবিহারীকে সে হুকুম দেয় 'সঙ্গল পেরজারা যেন তাদের খলেনে ধান তোলে'। তার সেই প্রতিবাদী গর্জনে ঘুম ভেঙে যায় সুন্দরবনের কৃষকবধূদের।

২. দ্বিতীয় অহল্যা - রত্নাকর ও পাখির পাঁচ বছরের সন্তান দুব্বো। সুন্দরবনের এক সম্পন্ন চাষি রত্নাকর নিজ খলেনে ধান তোলায় নায়েব ব্যাঁকা মল্লিকের চাবুকাঘাতে জর্জরিত হয়। সেইসঙ্গে কেটো দিন্দার খুনের দায়ভার চাপানো হয় রত্নাকরের উপর। শারীরিক নির্যাতনে দেহ ফালা ফালা করে দেয়। সর্বাঙ্গে চাবুকের চাবকানি। পাখি প্রতিবাদ করে। কুশধ্বজের কাছে আর্জি জানায়। তাই নায়েব ব্যাঁকা মল্লিক তাকে জোর করে তুলে নিয়ে কাছারি বাড়ি সাতদিন আটক রাখে। গণধর্ষণে পাখির শরীর ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত করে দেয়। অতি ধর্ষণের আব্রু তার সর্বাঙ্গে। সাতদিন পর রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন মায়ের পড়ে থাকা দেখে পাঁচ বছরের কন্যা দুব্বোর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়। সুন্দরবনের সরল নিষ্পাপ এক শিশু কয়েকদিনের ব্যবধানেই গভীর নিষ্ঠুরতায় পাষাণ হয়ে যায়। পাষাণ হয়ে এই দুব্বোই কুশধ্বজের চোখে হয়ে ওঠে আর এক 'অহল্যা'।জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই অহল্যারও এক সময় ঘুম ভাঙে। বড় হয়ে তেভাগার সংগ্রামে নারীশক্তির প্রতীক হিসাবে সে নিজেকে উজাড় করে দেয়। এই অনৈতিহাসিক অহল্যাও ইতিহাসের অহল্যার সঙ্গে সমীকৃত হয়ে যায় তেভাগা আন্দোলনে।

৩. তৃতীয় অহল্যা - জমিদার মেঘনাদ সামন্ত কর্তৃক ধর্ষিতা কিরাত বেরার কিশোরী কন্যা, যে অবৈধ গর্ভসঞ্চারকে মেনে নিতে না পেরে গোবাদিয়ার জলে আত্মহত্যা করতে যায়। গোবাদিয়ার ঘূর্ণিজল থেকে বিশ্বমিত্রই তাকে উদ্ধার করে এবং কুশধ্বজের কাছারিতে স্থান দেয়। মেঘু সামন্তের এই পাশবিক অত্যাচারে সে পাষাণ হয়ে যায়। কুশধ্বজের কাছারিতে কন্যা স্নেহে জীবনযাপন করে। অবৈধ সন্তান প্রহ্লাদের জন্ম তার মনকে বিষিয়ে দেয়নি। বিশ্বমিত্র কুশধ্বজরা (ততদিনে বৃদ্ধ) প্রহ্লাদকে নাতির আদরে বড় করে। সেই প্রহ্লাদকেই খুন হতে হয় জমিদারের হাতে। তখনই অহল্যার পাষাণ হৃদয়ে ঘুম ভাঙে। হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে নারীর প্রতিবাদ। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য হয়ে কৃষক সভাতে যোগ দেয় এই নারী। ঘুম ভাঙে আর এক অহল্যার। সত্য ইতিহাসে স্থান পায় এই কাল্পনিক অহল্যা।

৪. চতুর্থ অহল্যা - চন্দনপিঁড়ির কৃষক বধূ, ১৯৪৮ এর পুলিশি সন্ত্রাসে নিহত বীরাঙ্গনা - ইতিহাস সমর্থিত বাস্তব চরিত্র। যে চব্বিশ পরগণার জেলা শাসক স্টুয়ার্টের কাছে 'বাপের জমি মিথ্যে দেনার দায়ে কেড়ে নিয়েছে জমিদারের নায়েব', এরই বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়।

অহল্যারা তাই ব্যক্তিনাম হারিয়ে সার্বিক হয়ে ওঠে। সুন্দরবনের অগণিত অসহায় বিধ্বস্ত, আর্ত-পীড়িত নারী-অধিমানসই অহল্যা - এ বোধ ঔপন্যাসিকের গভীর অনুধ্যানের পরিচায়ক।

নায়েব জমিদারের আগ্রাসী থাকা কিংবা পাশবিক অত্যাচারে সুন্দরবনের ঘরে ঘরে এক এক অহল্যার জন্ম হয়েছে। তাদের পাষাণ হয়ে যাওয়ার ইতিবৃত্ত বহুমুখী-

'কেউ পাষাণ হয়েছে বাবার সর্বস্বান্ত হওয়া দেখে, কেউ বা তার মাকে ধর্ষিতা হতে দেখে, কেউ নিজে ধর্ষিতা হয়ে, কেউ বা স্বামীর নিঃস্ব হওয়া দেখে।' (৩য়/পৃ. ২০৮)

সেই পাষাণ হৃদয়ের স্তব্ধতা ফেটে গিয়ে নতুন বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসে। মুক ও বধির হৃদয় থেকে বারুদের গোলা নিক্ষেপ হয়। তারা তেভাগার দাবি আদায়ের জন্য

সংগ্রামমুখর হয়ে ওঠে। সুতরাং এই উপন্যাস, 'অহল্যা' নামাঙ্কিত এক ব্যঞ্জনাময় শিল্পনির্মাণ যেন, যা নারীশক্তিকেই দ্যোতিত করছে।

৪.

স্বজনভূমি : রক্তের দাগে জীবনের ওম - নারীর আত্মত্যাগ - চন্দনপিঁড়ির আদ্যাশক্তি

জমিদার জোরদার,এককথায় মধ্যস্বত্বভোগীদের নিষ্ঠুর চক্রান্ত ও প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে 'সুন্দরিকা দোয়ানিয়া' পার্শ্ববর্তী কাকদ্বীপ-নামখানা-চন্দনপিঁড়ি- শিবরামপুর - ইত্যাকার এলাকায় সংঘটিত কৃষক মেহনতি মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের রক্তাক্ত অগ্নিদগ্ধ প্রতিবাদ'ই তেভাগা - যার মৌল দাবি - উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ বর্গাচাষির প্রাপ্য। অর্থাৎ তেভাগার ভিত্তিতে ধান বন্টন - একথা পূর্বেই বলেছি। ১৯৪৮ সালে সংঘটিত এই অনালোকিত ইতিহাসের এক অধ্যায়কে পটভূমি করে **ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়** রচনা করেছেন **'স্বজনভূমি'** (১৯৯৪), যেখানে জীবনের আবর্তে ইতিহাসের ঘূর্ণন আমরা দেখেছি।

ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে জীবনের গহনে প্রবেশ এবং জীবনের সিঁড়ি বেয়ে ইতিহাসে অবগাহন - এই দ্বিমুখী ভাবনায় এক আশ্চর্য বৃত্ত তৈরি করেছেন লেখক। এই দুইয়ের সম্পৃক্ততায় 'স্বজনভূমি'তে ফুটে উঠেছে এক ঐতিহাসিক আবেগ। বুধাখালি,চন্দনপিঁড়ি, শিবরামপুরের তেভাগাসংগ্রামী জীবিত মানুষ - অতুল কামিল্যা, কমলাকান্ত ভূঁইয়া, দেবেন মালি,রতিকান্তরা সেই ঐতিহাসিক আবেগের সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকে ঝড়েশ্বরের শিল্পভুবনে।

উপন্যাস বয়নে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন। তেভাগা আন্দোলনকারী জীবিত ও মৃত চরিত্রের একত্র সহাবস্থান এবং জীবিত চরিত্রের মুখে মৃতের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে 'স্বজনভূমি'তে। উপন্যাসের কাহিনি অংশ কম; চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অতুল কামিল্যা, কমলাকান্ত ভূঁইয়া, দেবেন মালি, খগেন মাইতি, নিতাই, গুণধর, মানিক, গুরুপদ, রতিকান্ত - এহেন তেভাগা সমকালীন জীবিত চরিত্ররাই কাহিনির প্রকৃত রূপকার। এই জীবন্ত চরিত্রগুলির স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয় - তেভাগা আন্দোলনে নিহত বীর-বীরাঙ্গনা - অহল্যা,উত্তমী, বাতাসি, সরোজিনী, অশ্বিনী, গজেন মালি, ভূপতি, ধীরেন্দ্র, মঝঝুম শেখরা। এহেন মৃত চরিত্রগুলি উপন্যাসে জীবিতদের আখ্যান রচনার সহায়ক হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে আধুনিক উপন্যাসের চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণ ও আত্মকথনের মাধ্যমে জীবন-জিজ্ঞাসার স্বরূপ উদ্ঘাটনই মুখ্য - 'স্বজনভূমি'তে তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় স্মৃতির পর স্মৃতির মালা গেঁথে ফ্ল্যাশব্যাকে উপন্যাসটির কায়া নির্মাণ করেছেন। জীবিত ও মৃতের সহাবস্থানের সে নির্মাণে একে একে এসে যায় তেভাগার চালচিত্র, চল্লিশের সুন্দরবনের সংগ্রামমুখর দিন ও সংক্ষুব্ধ যাপনচিত্র।

এভাবেই তেভাগা সমকালীন জীবিত চরিত্রদের মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক তেভাগার সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষণ,বেঁচে থাকার মরিয়া প্রয়াস এবং জেগে থাকা আর্তির কথা উপন্যাসে অঙ্গীভূত করেছেন। তাই উপন্যাসে ঐতিহাসিক আবেগের পাশাপাশি এসেছে তেভাগার বীরাঙ্গনার কথা। ইতিহাসের চূর্ণী ঘেঁটে সেই সব চরিত্রের কায়া নির্মাণ করেছেন। তবে ঔপন্যাসিক নন ; শহীদ পরিবারের আত্মীয়রা (মূলত সন্তানরা) আত্মকথনের মাধ্যমে জীবন্ত করছেন তাদের পূর্বপুরুষদের। এ এক অসামান্য শৈলী। কখনো পুত্র দেবেন মালির স্মৃতিতে তেভাগা আন্দোলনের কৃষকনেতা গজেন মালি, কখনো নিতাইয়ের স্মৃতিতে তার অন্ধ পিতা ভূপতি, কখনো গুরুপদর স্মৃতিতে তেভাগার শহীদ মাতা বাতাসি, আবার কখনো বা রতিকান্তের স্মৃতিতে আহল্যা মায়ের নিদারুণ আত্মত্যাগ ও তেভাগা আন্দোলনের পুলিশি সন্ত্রাসের চিত্রণ।

এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বাস্তব ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন।

২০ শে কার্তিক। পাকা ফসলে মাঠ ভর্তি। জমিতে ধান কাটা শুরু হয়েছে। এমন সময় সেনেদের কাছারির নায়েব পুলিশের আগমন - কৃষক সমিতির কমিউনিস্ট নেতা রাখাল জানাকে অ্যারেস্ট করতে। সংবাদ পাওয়া মাত্রই মেয়েরা ঝাঁটা বটি দা নিয়ে পুলিশের দিকে অগ্রসর হয়।উন্মত্ত জনতার চোখে পড়ে, সেনেদের কাছারির নায়েব পরেশ দাস পুলিশের পথপ্রদর্শক - সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক রাইচরণও।

আমরা দেখেছি,আঠারো-ঊনিশ বছরের বয়সের ঘটনা আজ পঁয়ষট্টি-ছেষট্টিতে উপনীত রতিকান্ত বলতে গিয়ে পারম্পর্য হারিয়ে ফেলে। হৃদয় উত্তাল। বুকে যেন জগদ্দল পাথর। কমলাকান্তের বাড়ির কাছে ১২ জন সশস্ত্র পুলিশ এগিয়ে আসে। লালমোহন ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেলের নলের উপর। সম্মিলিত জনরোষে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। ক্ষুব্ধ জনতা পরেশকে পাকড়াও করে। হঠাৎ দেখে কাকদ্বীপের দারোগা ৩২ জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে হাজির। পুলিশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জনতা।

দারোগার বাঁশি বেজে ওঠে- ফায়ার! ফায়ার! তৎক্ষণাৎ পুলিশের গুলিতে একে একে স্বজনভূমিতে ঢলে পড়ে অশ্বিনী- সরোজনী- উত্তমী-বাতাসি-অহল্যা-গজেনরা।

ইতিহাসের বালি-কাদা-স্রোত চাইয়ে রতিকান্ত উত্তরসূরিদের(সন্তান অঞ্জলি, উত্তম) সামনে ছেঁকে ধরে মর্মন্তুদ কাহিনির নির্যাস:

'ফটাস করে গুলি বিঁধলো অশ্বিনীর বুকে...। জল... জল দিচ্ছিল বোনে সরোজিনী কাদা থেকে আঁচল চুবিয়ে অশ্বিনীর গালে। সরোজিনীর পেট ফুটা করে দিলে।... উত্তমী বাতাসী... মা অহল্যারও। লাঠি হাতে ঝাঁপাইলে গজেন ভূঁইয়া...সেও শেষ।মা অহল্যা পেটে টোটার জ্বালা নিয়ে এক পাক দৌড়ায়...তারপর হাঁটে।গোপালের দোরকে লে যায়ে জল দিছি... দ্বীপের শেষ জল। তারপর বাবার কোলে মাথা.. আমার কোলে শুয়ে মা আবার... মাটির মতো ঠাণ্ডা। তিন মানুষে তিন ভাগ হইলুম।... তেভাগা'। (পৃষ্ঠা.১২৫/১২৬)

হ্যাঁ,ফসলের তেভাগার মত ব্যক্তিজীবনেও ত্রি-ধা বিভক্ত হয় রতিকান্ত। মাতৃহীন রতিকান্ত একভাগ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে। আর স্বজন হারানোর যন্ত্রণা মেটাতে বিশ্বাসঘাতক পরেশের দেহ টুকরো টুকরো করে সপ্তমুখীর নোনা পাঁক কাদার চরে পুঁতে ফেলে উন্মত্ত জনতা। ইতিহাসের এই সত্য ঐতিহাসিক রসমণ্ডিত হয়েই প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসে।

এটাই উপন্যাসের মূল বৃত্ত। স্বজনভূমি রক্ষার্থে আত্মবলিদান। স্বজনভূমিতে লেগে আছে রক্তের দাগ। মাটি সে রক্ত শুষে নেয়নি। কেননা, এই ভূমি, এই মাটি লাটদারের নয়;যে চষে, যে বাস করে, তারই।তাই লাটদারের ইজারাভুক্ত জমিতে সমাধি নয় ; রতিকান্তের পুকুরপাড়ে,বাজবরণ গাছের তলায় মা অহল্যাকে সমাধিস্থ করা হয়। কেননা,মৃত্যুর পরে স্বজনভূমির মাটিই তো পরম প্রাপ্তি।সে প্রাপ্তি পূরণ হয়েছে মা অহল্যার।

'স্বজনভূমি' উপন্যাসের শেষে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের জগত ছাড়িয়ে পাঠককে এক চিরন্তন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। নবীন ও প্রবীণের আদর্শগত সংঘাতের পাশাপাশি 'ফ্রিডম ফাইটার' ও 'তেভাগা সংগ্রামী'দের বিরোধাভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বিরোধ অনেকটা রাজনৈতিকও বটে। একদিকে পুত্রের মধ্যে পিতা দেখে উচ্ছেদের শক্তি, অন্যদিকে রাষ্ট্রের মধ্যে দেখে তেভাগা সংগ্রামীদের অবমাননার শৃঙ্খলা। 'ফ্রিডম ফাইটার' ভূষণ হালদার, নিত্য বাবুরা যেখানে মাসিক পেনশন পায় সাড়ে সাতশো টাকা, সেখানে তেভাগা সংগ্রামীরা পায় মাত্র তিনশো। তাই কামিল্যারা যেমন নতুন প্রজন্মের কাছে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠে, তেমনি

পুত্র শম্ভুর কাছেও বিরক্তির খোরাক হয়ে দাঁড়ায় : 'দুস!তেভাগাটা না করে যদি নিত্য বাবুদের মত ব্রিটিশ তাড়ানোয় থাকতে...'। পুত্রের নির্দয়তায় বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ পুত্রের মধ্যেই দেখতে পায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের সেই 'লাটদার' 'জোতদার'দের প্রতিচ্ছবি। তবুও আত্মসমীক্ষায় নিজের প্রাপ্যটুকু খুঁজে পায় কামিল্যারা:

'কত লোকে বলেছিল, কামিল্লা কি করছো? পরে বুঝবে কিছু লাভ হল নি। হয়নি? না হলে, আজ এই কাগজ বই দেখালে টাকা। খোদ গরমেন্টের ঘাড়ে দায়িত্ব পড়ে। পৃথিবী মানিয়ে নেয়... গুলি-বন্দুক ভাগচাষ, আগুনের ঘটনা...। আইন তো হইছে ফসলের তিনভাগ.. আইন তো হইছে পেনশন বিলের? তবে? খুব কি ভুল করেছি...।'(পৃ.১৪৮)

এই প্রাপ্যটুকুতেই পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে অতুলরা এখনও বেঁচে বর্তে থাকে 'কষ্টের নিজের অতীত'কে পাথেয় করে। ইতিহাসের তথ্য আর জীবনের সত্য - এই দুইয়ের সম্পৃক্ততায় 'স্বজনভূমি' রসমণ্ডিত হয়েছে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে তেভাগার মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ ছাড়িয়ে বেঁচে থাকা কতিপয় প্রাণের আবেগ- অনুভূতি ও আদর্শবাদকে মেলে ধরেছেন পরবর্তী প্রজন্মের সম্মুখে, যা অন্য কোন উপন্যাসকারের লেখনীতে আসেনি। একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখণ্ড 'সুন্দরিকা দোয়ানিয়া' পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং নির্দিষ্ট সময় শেষ অবধি সার্বজনীন হয়ে ওঠে ঝাড়েশ্বরের শিল্পগুণে। 'স্বজনভূমি'তে তাই ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ এর সন্ধান - খণ্ডকালেই মহাকালের প্রতিবিম্বন যেন।

৫.

সুন্দরবনে নারীশক্তির উজ্জীবন :'আধা-মিলিশিয়া' - অহল্যা-উত্তমী-বাতাসি-সরোজিনী-মোহিনী-গান্ধারী

এ কথা স্বীকার্য যে, তেভাগাসম্পৃক্ত উপন্যাসে সুন্দরবনের নারীশক্তির উজ্জীবনের প্রকাশ লক্ষণীয়। তেভাগার এহেন নারীরাই তো ভারতীয় শাস্ত্রের সেই আদ্যাশক্তি। কৃষকরা যদি হয় অন্নদাতা, তবে কৃষক রমণীরা হবে অন্নপূর্ণা। তাদের হাতেই ভাতের হাঁড়ি,সে জানে কত ধানে কত চাল। আর সেটা জানে বলেই হাতে তুলে নিয়েছে দা-ঝাঁটা-বটি-কুঠার। গঠনবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তেভাগার এই নারী বাহিনীকে পিটার কাস্টার্স 'আধা-মিলিশিয়া' আখ্যা দিয়েছেন। লিখেছেন:

'জনযুদ্ধের মিলিশিয়ার মতো নারী বাহিনীও স্থানীয় ভিত্তিক হত এবং এর প্রধান দায়িত্ব ছিল গ্রাম ও চাষের ক্ষেত রক্ষা করা।... এই আধা-মিলিশিয়ার অসাধারণ সাহস যেখানে সংঘটিত হয়েছে, সেখানেই নারী বাহিনী পুলিশী দমন পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে সফল হয়েছে।প্রায়ই তারা আগ্নেয়াস্ত্রধারী পুলিশের টহলদারি বাহিনী আটকে দিয়েছে, তাদের ব্যর্থ করেছে কিংবা বেইজ্জত করেছে'। (দ্র.তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী,পৃ.১৫৭/১৫৮)

সুন্দরবনের অহল্যা উত্তমী বাতাসি সরোজিনী মোহিনী গান্ধারীরা 'আধা মিলিশিয়া'র সঙ্গেই সমীকৃত বলে মনে করি। এই 'আধা মিলিশিয়া'রূপী নারীবাহিনী - অহল্যা- উত্তমী-বাতাসিদের প্রবল পরাক্রম, অসীম বীরত্ব ও করুণ আত্মত্যাগ - সুন্দরবনের তেভাগা সম্পৃক্ত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, বলতেই হয়।

হ্যাঁ, তেভাগাকে কেন্দ্র করেই হাজার হাজার গ্রামীণ কৃষক রমণীর সংগঠিত সংগ্রাম - আত্মত্যাগ - কৃষক আন্দোলনের নারী-বীরত্বের এক অধ্যায়ের জন্ম দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে, নারী কেবল অন্ত:পুরবাসিনী পর্দানশীন নয়; অধিকার

আদায়ের দাবিতে তারা এতদিনের গড়া ট্যাবু নিজেরাই ভেঙে সোচ্চার হয়েছে - যা নারী-স্বাতন্ত্র্যেরই দ্যোতক। রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সুন্দরবনের নারীশক্তির যে প্রতিরোধ-আখ্যান উপন্যাসে দেখেছি, তা প্যারা কমিউন এর নেত্রী লুইজ মিশেলের নেতৃত্বে প্যারির পথে ব্যারিকেড লড়াইয়ের সমতুল্য। আসলে এ কেবল সুন্দরবনের তথা বাংলার নারীদের ইজ্জতের সওয়াল ছিল না , দীর্ঘদিনের ইতিহাসজাত শ্রেণি-চেতনা ও শ্রেণি-ঘৃণার বিস্ফোরণও ছিল। সুন্দরবনের অবলা নারীরাই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই শেষাবধি হয়ে উঠেছিল সবলা সংহারিণী। তারা আত্মসম্মান রক্ষার পাশাপাশি অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পুরুষদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছিল তাদের নিজস্ব ক্যারিশমা ও বুদ্ধিমত্তায়।

তাই আমাদের বক্তব্য, তেভাগা কেবল ভাগ আদায়ের লড়াই নয়; কৃষক ও কৃষক রমণীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইও। এই আন্দোলনে পুরুষ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা না থাকলেও এই জয় ছিল তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সামাজিক জয়। তবে যে আন্দোলন সমগ্র ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক কৃষিবিপ্লবের রূপ নিতে পারত, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত ও সার্বিক নির্দেশনার অভাবে, তা কেবল তেভাগার সংগ্রাম হয়েই রয়ে গেল ইতিহাসে। হ্যাঁ,এই আন্দোলন দেশবিভাগ রোধ করে নতুন সমাজ রূপান্তরের বাহন হতে পারতো, কিন্তু তা আর হওয়া হলো না - পরিবর্তে নিজেই হয়ে গেল দেশবিভাগের বলি। এই আক্ষেপ নিয়েও তবু বলতে হচ্ছে, তেভাগা আন্দোলন নিঃসন্দেহে বাংলার কৃষক সভ্যতার ইতিহাসে ব্যাপক শক্তিশালী একটি গণআন্দোলন - নারীশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, যা উপন্যাসের রসদ যুগিয়েছে। আজও যোগাচ্ছে। সুন্দরবনের মানুষ আজও সেই গর্ব বুকে নিয়ে বেঁচে আছে।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. চৌধুরী, কমল : বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক, প্রথম খণ্ড, পত্রভারতী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯।

২. রায়, সুপ্রকাশ : তেভাগা সংগ্রাম, রাডিক্যাল কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১১।

৩. কোঙার, বিনয় : তেভাগা ও কৃষক আন্দোলনের প্রবাহ, পশ্চিমবঙ্গ: তেভাগা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৪।

৪. হালদার,কংসারি : কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলন, তেভাগা রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ।

৫. চট্টোপাধ্যায়, কুনাল : তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬।

৬. কাস্টার্স,পিটার : তেভাগা অভ্যুত্থানের নারী, অনুবাদক - কৃষ্ণা নিয়োগী, গণ সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২।

৭. সেন,মণিকৃষ্ণ : তেভাগা আন্দোলনে রংপুর, তেভাগা সংগ্রাম রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ।

৮. চট্টোপাধ্যায়, সুনীল : কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র, 'স্বাধীনতা', ১৬ ই নভেম্বর,১৯৪৬।

৯. গুহ, বিভূতি : তেভাগার লড়াই, তেভাগা আন্দোলন,সম্পাদনা - ধনঞ্জয় রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১০।

১০. মহাপাত্র, অনাদিকুমার : ভারতের জাতীয় আন্দোলন, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।

১১. হালদার, কংসারি : আত্মজীবনী www.google.com

১২. হালদার, কংসারি : কাকদ্বীপের অগ্নিযুগ, তেভাগার লড়াই।

১৩. ঘোষাল, হেমন্ত : তেভাগার লড়াই, পশ্চিমবঙ্গ: তেভাগা সংখ্যা,১৪০৪।

১৪. কুদ্দুস, গোলাম : বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তেভাগা সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ: তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪।

১৫. পাল, চিররঞ্জন (সম্পাদিত) : তেভাগার নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৬।

আকর গ্রন্থসমূহ :

১. শিশির দাস - শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা (১৯৬৬)। দ্বিতীয় মুদ্রণ,১৯৮৪, পরিবেশক, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

২. তপন বন্দ্যোপাধ্যায় - নদী মাটি অরণ্য, তৃতীয় খণ্ড, তেভাগা পর্ব, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১।

৩. ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, স্বজনভূমি,দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা,প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭।

ধর্ম ও নৈতিকতা

শুক্লা নাথ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ
আশুতোষ কলেজ, কলকাতা

সারাংশ: সভ্যতার আদিপর্ব থেকে অদ্যবদি যে বিষয়টি মানব জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ সম্পর্কে আবদ্ধ তা হল 'ধর্ম'। সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তার আমূল পরিবর্তন ঘটলেও, মানুষের জীবনে ধর্মের অবিচল গতি প্রত্যক্ষযোগ্য। নিরবিচ্ছিন্ন এই গতির প্রভাব পড়েছে জীবনযাত্রায়। কখন মানুষ হয়েছে কুসংস্কার আছন্ন। আবার কখনও সামাজিক কাঠামোকে নতুন করে পরিমার্জিত করেছে। মানব ইতিহাস ঘটনা বহুল। ঐতিহাসিক ঘটনা ধর্মের স্বরূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। ধর্ম- যা ধারণ করে রাখে। একাকী মানুষ বসবাস করতে পারেনা। তাই নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে, তারা সমষ্টিবদ্ধ হয়ে, সমাজে কিছু নৈতিক নিয়ম স্থাপন করেছে। ধর্ম ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষকে যেমন ধর্মীয় জীব বলা হয় তেমনি নৈতিক জীব বলেও চিহ্নিত করা হয়। কিছু স্বার্থলোভী মানষ যখন ধর্মের দোহাই দিয়ে অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়, তখনই তৈরি হয় ধর্ম ও নৈতিকতার বিরোধ। কিন্তু ধর্ম নীতিই নৈতিক নিয়মের পরিচালন শক্তি। ধর্ম, নৈতিক নিয়মের দ্বারাই সমাজকে ধারণ করে রাখে। তাই নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হলে 'ধর্ম' ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধর্ম ও নৈতিকতা মানব জীবনের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ। সাধারণ চিন্তায় মনে করা হয় এরা একে অপরের বিপরীতে দন্ডায়মান। কিন্তু প্রকৃত ধর্মের অর্থ যে নীতিতত্ত্বে নিহিত তা আজ সমাজের সামনে প্রমান করা আবশ্যক। কারণ মানবজাতি ধর্মের নামে ন্যায়পরায়নতাকে হারাতে বসেছে। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ ধর্মে ধর্মে বিভেদ, বর্তমানে মানুষে মানুষে বিদ্বেষের কারণ। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মতে, মনুষত্ব ধর্মই সর্বশ্রেষ্ট নীতিধর্ম, যা বিবাদ ঘুচিয়ে মানব মনে সৌভাতৃত্ব জাগ্রত্ব করে। প্রকৃত 'মান' ও 'হুঁশ' সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলে। ধর্ম কেবল প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস মাত্র নয়। ধর্ম মানুষকে এক সূত্রে আবদ্ধ করার উপায়। নৈতিক নিয়ম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। ভারতীয় সমাজে অস্তিত্বশীল প্রতিটি ধর্ম, নৈতিক নীতিরই উল্লেখ করে। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ধর্মে উল্লেখিত তত্ত্বের সাথে সমাজকল্যাণমূলক নৈতিকতার নিগূঢ় সম্পর্ক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ম থেকে নৈতিকতা বিযুক্ত হলে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সমাজ সংরক্ষণ, বিনষ্ট হয়।
সূচক শব্দ: ধর্ম, নৈতিকতা, কর্ম, স্থিতপ্রজ্ঞ, নির্বাণ, কর্তব্য, বিচ্ছিন্নতা।

মূল আলোচনা:
'ধর্ম' শব্দটির সঙ্গে আমরা কমবেশি সকলেই পরিচিত। একজন সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ কোনো-না কোনোভাবে ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। এমন ব্যক্তি জগতে বিরল যিনি এ বিষয়ে নঞর্থক উক্তি করবেন। তবে ধর্মের অর্থ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। সাধারন মানুষ ধর্ম বলতে ঈশ্বরবাদী ধর্মকে বোঝেন। যেমন- হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম ইত্যাদি। এই ধর্মগুলির মধ্যে নানা ভেদাভেদ আছে। কোনো ধর্ম আচার-আচরণ সর্বস্ব, কোনটি সম্পূর্ণ ঈশ্বর নির্ভর, কোনটি আবার ঈশ্বরের বানী নির্ভর। কোন ধর্ম বহুশ্বরবাদী, কোনটি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ধর্ম শব্দটিকে 'কর্ম' অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলেছেন।

কান্টের মতে কর্তব্য জ্ঞানে কর্মই ধর্ম। 'ধর্ম' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ যা ধারণ করে রাখে। মানবসমাজকে ধারণ করে রাখে, তাই ধর্ম।

এ প্রসঙ্গে বলা জরুরি, ধর্ম নৈতিকতাকে নির্দেশ করে। এই মতের সমর্থকরা মনে করেন ধর্মের সাথে নৈতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একে অপরের পরিপূরক। একটি মুদ্রার দুটি পিঠ। নৈতিকতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Ethics'। সহজরূপে ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে হয়, বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির নিরিখে কোনটি ঠিক বা ভালো বা উচিত – সমগ্র জীবনের কল্যাণমূলক, তা নির্ধারণ করে, কর্ম সম্পাদন। অর্থাৎ সকলের জন্য যা শুভ, যা মঙ্গলকারী তাই হল নৈতিক এবং সমগ্র পৃথিবীর জন্য যা হিতকর নয়- তা অনৈতিক কর্ম। এই প্রকার কর্ম নীতিবিদ্যা বর্জন করতে নির্দেশ দেয়। কারণ মানুষ রূপে আমরা সামাজিক জীব। সমাজের বাইরে আমরা একাকী বসবাস করতে পারিনা। প্রকৃতির প্রতিটি অংশেরই; জীব কিংবা জড় , অবদান অনস্বীকার্য। তাই বিবেকবান সত্তা রূপে সকলের মঙ্গল কামনার্থে কর্মই গ্রহণীয়। এটিই নৈতিক কর্ম।

যেহেতু কিছু নির্দিষ্ট নীতি নিয়মের দ্বারা নৈতিকতাকে সীমায়িত করা সম্ভব নয়, তাই নীতিবিদ্যার আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা দেওয়া যায়নি। তবে নৈতিকতা বলতে এমন কর্মকে বোঝানো হয় যেখানে জীব নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যানার্থে কর্মে নিযুক্ত হয়। একই ব্যাখ্যা স্থিতপ্রজ্ঞের ধারণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

হিন্দুধর্মের অন্যতম গ্রন্থ গীতা। অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রতিপক্ষে তাঁর পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে এবং তাঁদের হত্যা করা পাপ- এই চিন্তনে অস্ত্র ত্যাগ করতে উদ্ধত, এমন সময় তাঁর সারথী রূপী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন যা 'গীতা' নামে প্রসিদ্ধ। গীতাকার বলেন,

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।। ২/৪৭

আমাদের অধিকার কেবল কর্মে। একজন ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণেই অর্জুনের অধিকার। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে সমগ্র প্রজাবর্গের কল্যানসাধন, তাঁর অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। এর পরিবর্তে আত্মীয়-পরিজনের হত্যা ও মৃত্যুর আশঙ্কায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কখনোই তাঁর কাছে কাম্য নয়। কর্তব্য জ্ঞানে কর্মই ধর্ম। ক্ষত্রিয় বংশদ্ধভূত পান্ডব পুত্র অর্জুন, নিজ ভ্রাতাসহ তাঁর প্রপিতামহ ও প্রিয়জন হত্যা পাপ- এরূপ চিন্তা কর্মফল চিন্তা। গীতাক্তো বাণীতে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন, কর্মফল চিন্তা পরিত্যাগ করে কর্তব্যকর্মই ধর্ম। ফলের চিন্তায় কর্ম ত্যাগ অধর্ম। সকল কামনা-বাসনা ঈশ্বরে নিবেদন করে, যিনি কেবল কর্তব্যের জন্য কর্ম করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। কামনা মাত্রই সর্বতোভাবে আত্মকেন্দ্রিক তথা স্বার্থকেন্দ্রিক। স্বার্থত্যাগী, পরার্থপর কর্মযোগ, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। কর্মে মিত্র-শত্রু, প্রিয়-অপ্রিয়, রক্তের সম্পর্ক কোনো কিছুরই স্থান গ্রহণীয় নয়। সকল শর্ত এক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য। মানবরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এপ্রকার কর্মকেই 'ধর্ম' রূপে চিহ্নিত করে অর্জুনকে কান্ডিব ধারণের আহ্বান জানান। কারণ ফলের কামনায় কর্ম ত্যাগ পাপের সামিল।

অতএব, ক্ষত্রিয়রূপে যুদ্ধই অর্জুনের কর্তব্যকর্ম। হিন্দুধর্মে এ-প্রথা প্রচলিত। সনাতন হিন্দুধর্মে বর্ণ চারপ্রকার- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যদিও আদিতে এই চারপ্রকার বর্ণ কর্মানুসারে বিভাজিত ছিল। পরবর্তীকালে তা বংশপরম্পরায় পরিণত হয়। যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণের কর্তব্য শিক্ষকতা ও ধর্মাচারণ। ক্ষত্রিয়বর্ণ যুদ্ধ ও শাসনকার্যের সাথে যুক্ত, বৈশ্যরা কৃষিকাজ ও

বৈষয়িক কর্মে নিযুক্ত এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের সেবায় নিয়োজিত। এভাবেই সমাজ কল্যাণমূলক কর্মগুলি সকলের মধ্যে বিভাজিত ছিল। বর্নাশ্রম অনুসারে প্রত্যেক বর্ণের নিজস্ব কর্তব্য-কর্ম পালনই হল ধর্ম, যা নীতিগতভাবেও গ্রহণীয়।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট নীতিবিদ্যার আলোচনায় 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তিভেদে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এটি একটি সার্বিক নিয়ম বা নিঃশর্ত অনুজ্ঞা। মানুষ মাত্রই বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। বিবেক জ্ঞানেই, পশু তথা নিম্নতর প্রানীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্যতা। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষ বিবেক তাড়িত হয়ে কর্ম করলে তা হবে সার্বিক। যেহেতু নিঃস্বার্থ কর্মই নৈতিক কর্ম। অর্থাৎ প্রশংসা অথবা সকল স্বার্থচিন্তার কামনা উপেক্ষা করে, কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম নৈতিককর্ম। সকল প্রকার আবেগ অনুভূতির বশ্যতা অগ্রাহ্য করে, কেবল সদিচ্ছা প্রনোদিত কর্মই কর্তব্য। উক্ত নিয়মই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই কর্তব্য-কর্ম সর্বজন স্বীকৃত।

কেবল হিন্দুধর্ম বা পাশ্চাত্য ব্যাখ্যায় নয়, নিরীশ্বরবাদী ধর্মেও, ধর্ম এবং নৈতিকতার সহাবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় রূপে অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দেওয়া হয়। যেখানে বলা হয়েছে, এই আটটি মার্গ অনুসরণই যথেষ্ঠ নয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গী ব্যক্তির একই সাথে নৈতিক সংস্কার প্রয়োজন। যা ওই ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের সহায়ক হবে। কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধি না-ঘটলে নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। গৌতম বুদ্ধের মতে প্রতিটি মানুষের মধ্যে এক শক্তি উপস্থিত যা আমাদের আত্মবলে বলীয়ান করে। যাকে আমরা বারংবার 'বিবেক' বলে উল্লেখ করছি। এই শক্তি আমাদের স্বনির্ভর করে। তাঁর বক্তব্যে এটি স্পষ্ট, যেহেতু দুঃখের কারণ আমরা তখন তাকে নিবারণ ঘটাতে আমরাই সক্ষম। এবং এজন্য অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা, এমনকি ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী হওয়াও অযৌক্তিক। বিবেকের শক্তি দ্বারা; আমরা কোন কর্ম করব, তা নির্বাচনের অধিকার আমাদের আছে। ফলতঃ ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রয়োগ করে কোন কর্মে নিবৃত্ত হব অথবা দুঃখকে বেছে নিয়ে স্বার্থন্বেষী কর্ম করে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হব কিনা তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আমাদের ওপর। আমরা যদি অনৈতিক বা মন্দকর্ম করি তবে মন্দ ফল উৎপন্ন হবে, যা দুঃখের নামান্তর। অন্যদিকে নিঃস্বার্থভাবে মানবতা ধর্মে বা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির দুঃখ মুক্তি ঘটে। বৌদ্ধ পরিভাষায় যা নির্বাণ-চিরআনন্দময় অবস্থা। বৌদ্ধদর্শনে হিংসা, দ্বেষ, মোহ, লোভ স্বমূলে পরিত্যাজ্য। এখানে বলা হয়, অহিংস পথে জীবন নির্বাহ করে মানুষকে নৈতিক জীবনে অগ্রসর হতে হবে। এপ্রকার নৈতিক কর্মই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করবে। সমগ্র মানবকূলের যৌথ প্রয়াসে শুভকর্ম, মঙ্গলদায়ী ফল উৎপাদন করবে; যা সমাজকে নৈতিকতার বেদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। এভাবে তিনি ঐক্যবোধকে জুড়ে দিয়েছেন নৈতিক নিয়মের সঙ্গে।

বৌদ্ধদর্শনের সমসাময়িক অপর নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় জৈন। জৈনদর্শন মতে, আমাদের কর্মফলের উৎপাদক আমরাই। কর্মের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের ধর্ম নির্বাচন করি। যদিও আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত। কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ কর্মপুদগলের মাধ্যমে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। বন্ধনের পথ দুটি- ভাব-বন্ধন ও দ্রব্য-বন্ধন। আর এই বন্ধন মুক্তির নিমিত্তে জৈনধর্মে ত্রিরত্নের উল্লেখ আছে। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ জ্ঞান, ও সম্যক্ চারিত্র- এই তিনটি জৈন ধর্মাবলম্বীদের নৈতিক জীবনের পথ প্রদর্শক। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ জ্ঞানের মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা নিষ্কাম কর্ম জৈন দর্শনের মূল লক্ষ্য। চিত্ত শুদ্ধি ভাব-বন্ধনের পথ রুদ্ধ করে। ভাব-বন্ধন থেকে মুক্তি দ্রব্য-বন্ধন মুক্তির পথ প্রসস্থ করে। লক্ষ্য পূরণের জন্য জৈনধর্মের পাঁচটি মহাব্রতের উল্লেখ করা হয়।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। অহিংসা ব্রতই মুখ্য বাকি চারটি অহিংসার নামান্তর মাত্র। অহিংসার অর্থ- দৈহিক, মানসিক কিংবা বাচিক কোনপ্রকার কর্মের দ্বারা অপরকে, জীব অজীব নির্বিশেষে, আঘাত থেকে কেবল নিজেকে বিরত রাখা নয়, একইসঙ্গে অন্যকেও বিরত রাখা বা অন্যকে এই অনৈতিক কর্মে প্ররোচনা না দেওয়া। জৈন মতে জীব ও জড় উভয়ই সমভাবে মূল্যবান। এরা একে অপরের পরিপূরক। অহিংস নীতির অনুসরণ নৈতিকতার দোত্তক। হিংসার উৎপত্তি ঈর্ষা থেকে এবং এর দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ অনৈতিক নিম্ন প্রবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। তার জন্য দায়ী একমাত্র ওই কর্মের কর্তা। আমাদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ। পরিবেশবাদীরা বর্তমান সমাজকে পরিবেশ সংরক্ষণের ডাক দিচ্ছেন, তবে এর উল্লেখ বহু বছর পূর্বে বেদে, মুনি-ঋষিদের উক্তিতে আমরা পেয়ে থাকি। প্রাচীন যুগে বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক শক্তি, পাহাড়-অরণ্য ইত্যাদি পূজার্চনার উল্লেখ আছে। সে-সময় এভাবেই পরিবেশ সংরক্ষিত হতো। নানান উদ্ভিদ থেকে ভেষজ ওষুধ তৈরি করা হতো, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির রোষের ভয়ে পূজা করা হতো। কিন্ত বর্তমানে আমরা বুঝেছি শুধু নিজেদের স্বার্থে নয়; সমগ্র জড়জগৎ ও জীবজগৎ সংরক্ষণ আমদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাদের নিজস্ব স্বীয় মূল্যের জন্য তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে- সংরক্ষণ করতে হবে। প্রাচীন মতে পূজা করে কিংবা উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে। জৈনদর্শন একই পথে ব্যাখ্যা না দিলেও, এ বিষয়ে একমত যে জীব ও জড় উভয়ই সমমর্যাদ জ্ঞানে রক্ষা বা শ্রদ্ধা- মানুষত্ব ধর্ম যা নৈতিক মঙ্গলকে স্বনির্ভর করে।

তুলনামূলকভাবে নবীনতম দুই প্রত্যাদৃষ্ট ধর্ম- খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম। খ্রিষ্টানধর্ম প্রধানত ইহুদীধর্ম থেকে উৎপন্ন হলেও পরবর্তীকালে যীশুখ্রিষ্টের সময় থেকে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কারণ যীশুখ্রিষ্ট স্বয়ং কাঁটার মুকুট ধারণ করে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছেন, ওই অন্যায়কারীদের যেন ‘God’ ক্ষমা করেন। নিজের জীবন দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগের নিদর্শণ আজও আমাদের সমাজে আদর্শের পরাকাষ্ঠা। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন হিংসার প্রত্যুত্তরে প্রতিহিংসা; দ্বন্দ্ব, বিরোধ বৃদ্ধি করে। তার পরিবর্তে ক্ষমা, মিত্রতা, ঐক্য মানুকে সঠিক পথে চালিত করে যা একই সঙ্গে নৈতিক কর্ম। যীশুখ্রিষ্টের মৃত্যুর পর তাঁর অনূসারীরা তাঁকেই ঈশ্বরের পুত্ররূপে ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। কারণ স্বরূপ বলা হয়, খ্রিষ্টানধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম- পিতারূপে ঈশ্বর (শ্রষ্ঠা), পুত্ররূপ ঈশ্বর (যীশু) এবং পবিত্র আত্মারূপে ঈশ্বর(মানুষ); একই পরমাত্মার তিনটি ভিন্ন প্রকাশ। মানুষ ঈশ্বরের সুপ্ত রূপ। ফলতঃ মানুষ ঈশ্বরের অংশ হয়ে একে অপরের সাথে যুক্ত। তাই অন্যকে হিংসা করে অন্যের ক্ষতি সাধন নৈতিক কিংবা ধর্মীয় কোনো দিক থেকে স্বীকার্য নয়। নীতিবিদ্যাও অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত।

ইসলামধর্ম আর একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম যা হযরত মহম্মদ দ্বারা প্রবর্তিত। বলা হয়, হযরত মহম্মদ আল্লাহার বাণী শ্রবণ করেছেন। জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং মহম্মদ তাঁর অন্যতম দূত, তাঁর কাজ জগতে আল্লাহার বাণী প্রচার করা। ইসলাম ধর্মের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভ-কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত এবং হজ। কলেমার অর্থ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় (বেদান্ত দর্শনেও স্বীকৃত) এবং মহম্মদ তাঁর রসূল। প্রথম স্তম্ভ মানুষকে উপলব্ধি করায়, তারা এক আল্লাহার সন্তান। নামাজের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মীরা তাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে একই সূত্রে বাঁধা পরে। রোজা পালন মানুষের দারিদ্রতার কষ্ট, তাদের ওপর হওয়া অন্যায় অত্যাচার অনুভব করায়। এটাই প্রমাণ করে ধনী-দরিদ্রের ভেদ মনুষ্য সৃষ্ট। এই ধর্ম বিভেদের সমাধান স্বরূপ চতুর্থ স্তম্ভের উল্লেখ করে। জাকাত অনুসারে অতিরিক্ত সম্পদ বন্টনের নির্দেশ আছে। যা অর্থ বৈষম্য ঘোচাতে সহায়ক। আর শেষতঃ হজ এক ঈশ্বরে আস্থা রেখে নির্দিষ্ট সময় সকলে

বিশেষ স্থানে সমবেত করার পথ। তাদের শিক্ষা দেয় এক ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। যা আমাদের মধ্যে হিংসাত্মক অভিপ্রায়কে দমন করে নৈতিকমার্গ প্রশস্তকরে।

ধর্ম ও নৈতিকতা আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক উল্লেখ না করলে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমসাময়িক যুগে ধর্ম ও নৈতিকতাকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা হয়। এযুগের অন্যতম পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ উজ্জ্বল নক্ষত্ররা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন সরব কণ্ঠে। স্বামীজির মতে ব্রহ্ম, জীবাত্মা রূপে জগতে অধিষ্ঠিত। আমাদের মধ্যেই তাঁর বাস। সমগ্র ভেদাভেদ ছিন্ন করে মানুষই এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মার অংশ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত সুপ্ত ব্রহ্মাংশ আমাদের প্রচেষ্ঠাতেই প্রস্ফটিত করা উচিত, নিঃস্বার্থ মানব সেবার মাধ্যমে। ঐচিত্যের প্রসঙ্গ নৈতিকতার অন্যতম বিশেষণ। আবার বিশ্বকবির নানান রচনায় মানবতা ধর্মের উল্লেখ পাই। তিনি 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, মানুষ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন পূর্ণসত্তা। তার পরিপূর্ণ বিকাশ তখনই সম্ভব; যখন সে পারস্পরিক বৈষম্য মুছে ফেলে অপরকে কাছে টেনে নেবে, অন্যজনও আমার মতো মানুষ এমন চিন্তার উদয় হবে। এটিই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত গান্ধীজিও তা সমর্থন করেন। তবে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, অহিংস পথে সত্যকেই ঈশ্বর জ্ঞানে, সমস্ত বৈরিতা পরিত্যাগ করে নিজ কর্তব্য পালনই নৈতিক কর্ম।

নানান ধর্মের পর্যালোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করতে পারি, ধর্মে ধর্মে আচরণ পদ্ধতিগত ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে সকলে একমত যে, ঈশ্বর জ্ঞানে মানব সেবাই তথা জীব ও জড় নির্বিশেষে শ্রদ্ধা- প্রকৃত নৈতিক কর্ম। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তফাৎ কেবল রীতিগত। আচার-আচরণ, রীতিনীতিকে পাথেয় করে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ধর্মকে ব্যবসায়িক মুনাফা লাভের যন্ত্রে পরিণত করেছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ এই যুক্তিহীন নিয়ম পালন করেই ধর্মাস্বাদন করছেন, যা ধর্মের নামে ভন্ডামী। আচার-আচরণকে মূখ্য প্রতিপন্ন করে যখন কোনো মানুষ ধর্মাচারণ করেন তখনই তৈরি হয় ধর্মে ধর্মে বিভেদ। নিজের ধর্মের ধ্বজা সর্বোচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত- তা প্রমাণের লক্ষ্যে যুদ্ধ দাঙ্গার সূচনা হয়। কিন্তু স্বামীজি বলেছেন, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদুয়ারা, মন্ত্র, রীতি ইত্যাদি সকল কিছু গৌণ; তবে এগুলি ধর্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করার সোপান মাত্র। মূখ্য বিষয় হল ধর্মের সারসত্তা আমাদের মন মন্দিরে স্থাপিত। শ্রী রামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে উপলব্ধি করেছিলেন, সকল ধর্মের সারকথা 'ঐক্য'। তাকে প্রতিষ্ঠা করতে মানুষকে ভাতৃত্ববোধে আপন করতে হবে।

আদর্শ নীতিবিদ্যা পারস্পরিক সহায়তাকে সমর্থন জানায়। অন্যায় কখনই আমাদের পূর্ণ শান্তি-আনন্দ দিতে পারেনা। নীতিবিদ্যা আমাদের শিক্ষা দেয় প্রত্যেক প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রকৃতি সকলই বিশ্বব্রহ্মান্ডের অপূরণীয় অংশ। তাই সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একে অপরকে সহায়তা করতে হবে। সাময়িক সুখ অস্বীকার করে জগতের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব একান্তভাবে আমাদের। ধর্ম একই পথের নির্দেশ দেয়। যুক্তিপূর্ণভাবে মানবধর্ম পালনই প্রকৃতধর্ম। তাকে উপেক্ষা করে নামস্বর্বস্য ধর্ম পালন, ভষ্যে ঘি ঢালা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে তা সুখদায়ক হলেও প্রকৃত অর্থে তা ধর্মীয় পরিভাষায় পাপের সামিল। তাই আমাদের উচিত বিবেকের দ্বারা নৈতিকতার বিচার করে ধর্ম পালন। যা সুন্দর আনন্দস্বরূপ দীর্ঘস্থায়ী শান্তিময় জীবন আমাদের উপহার দেবে। সমাজের ধারক শক্তি, মানব কল্যাণ তথা নৈতিকতার পূজারী। সেখানেই ধর্মের

নিহিতার্থ। ধর্মই পারে বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ করতে। ধর্ম ভেদাভেদ, বিচ্ছিন্নতা মুক্ত; শ্বাশত ও সনাতন। প্রতিটি ধর্মের উদ্দেশ্য- সত্য সুন্দর ও কল্যাণ- যা নীতিবিদ্যার পরিভাষায় পরমকল্যাণ।

তথ্যসূত্র:

১. গুপ্ত, দীক্ষিত। (২০১৭। নীতিশাস্ত্র। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতাঃ পশ্চমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

২. ঘোষ, গোবিন্দ চরণ। (২০২০)। সমকালীন ভারতীয় দর্শন। প্রথম মুদ্রণ। কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৩. চক্রবর্তী, অরবিন্দ বসু ও নিবেদিতা। (২০২০)। ধর্মদর্শন পরিচয়। তৃতীয় মুদ্রণ। মিত্রম।

৪. চ্যাটার্জী, অমিতা। ভারতীয় ধর্মনীতি। এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড।

৫. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। (২০০৯)। সাম্মানিক নীতিবিদ্যা ও ধর্মদর্শন। প্রথম মুদ্রণ। কলকাতাঃ বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

৬. বসু, রাজশেখর। সারানুবাদ। (১৪১৪)। কৃষ্ণদ্বৈপায়ত ব্যাস কৃত মহাভারত। দ্বাদশ মুদ্রণ। কলিকাতাঃ এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ।

ক্ষমতা ও রাজনীতির আবর্তে তিনজন নারী : একটি সাধারণ পর্যালোচনা

সুরজিৎ মজুমদার
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ

সারসংক্ষেপ: পৃথিবীতে সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রবাহকে জারি রাখতে নারী ও পুরুষ – উভয়েরই প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কিন্তু আদিম সাম্যবাদী সমাজ পেরিয়ে এসে দেখা গেছে, নারী ক্রমাগত গৃহের মধ্যে পুরুষ কর্তৃক আবদ্ধ হয়ে গেছে। এর কারণ **সিমোন দ্যা বোভোয়ার** তাঁর **'দ্য সেকেন্ড সেক্স'** গ্রন্থে বলেছেন, আবির্ভাবের সময় কেউ নারী কিংবা পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বরং তার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ পুরুষকে পুরুষ এবং নারীকে নারী হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়। যার নেপথ্যে অবশ্যই একটা ক্ষমতার রাজনীতি সদা সর্বদা কাজ করে ফিরেছে।

ইংরেজিতে যাকে 'পাওয়ার' বলে বাংলায় তার প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'ক্ষমতা'। যেকোন নারী কিংবা পুরুষ এই ক্ষমতা যেসকল মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তার মধ্যে রয়েছে তাদের— (ক) সামাজিক/পারিবারিক অবস্থান (খ) শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার এবং (গ) রাজনৈতিক ক্ষমতার মানদণ্ড সমূহ।

সামাজিক এবং পারিবারিক একটা উচ্চতর উত্তরাধিকার নিয়ে ভারতবর্ষে যিনি একদা প্রধানমন্ত্রী শুধু নন; চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারিনী হয়েছিলেন, তিনি **ইন্দিরা গান্ধী।** জওহরলাল নেহেরুর উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। তাঁর আমলে ভারতবর্ষের নানামুখী সংস্কার, টানা-পোড়েন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা নারীর ক্ষমতায়নের একটি উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশ। আমেরিকায় অধ্যাপনা, অর্থনৈতিক স্বাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যিনি 'ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন' বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী নারীর সত্তায় উপনীত হয়েছিলেন, তিনি **কন্ডোলিসা রাইস**। বিশেষত তিনি আমেরিকার দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক যুদ্ধ এবং সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিলেন। তবে নারীর ক্ষমতায়নে যে একটা নারীবাদী ক্ষেত্র রয়েছে, তিনি সেই কনসেপ্টকে বদলে দিতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। যার একটি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব ভারতীয়দের কাছে আছে। এই দেশটিকে সমাজতান্ত্রিক একটা সু-শাসনে যিনি বৌদ্ধ ধর্ম এবং সিংহলি ভাষার সমন্বয়ে একটা আদর্শ দেশ গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি **সিরিমাভ বন্দরনায়েক**। ইতিহাস বলে, সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষমতার ইতিহাসে তিনি প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে সিরিমাভ বন্দরনায়েক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ক্ষমতার রাজনীতির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এদের হাতে রাজনীতি এবং ক্ষমতায়ন যেন এক সাথে বাঁধা পড়েছে।

সূচক শব্দ: নারী, ক্ষমতা, রাজনীতি, অধিকার, সাম্যবাদ, আন্তর্জাতিক, অর্থনীতি, স্বাধিকার।

মূল প্রবন্ধ :

।।এক।।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছিল সম্পূর্ণ মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে গৃহবন্দী করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সেই প্রচেষ্টা সারা পৃথিবীব্যাপী এতটাই প্রবল যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিধানকর্তা, পুরোহিতেরা, দার্শনিক, লেখক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরাও এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন নারীর এই অধীনতার ব্যাপারটা স্থিরকৃত হয়েছে স্বর্গে। এবং এটা মর্ত্যে সুবিধাজনক ভাবে প্রয়োগ করতে ধর্মগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে ধর্মীয় আবেগ দিয়ে নারীদেরকে অধীনস্থ রাখবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই বিষয়টি নারী মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সিমন দ্যা বোভেয়ার লক্ষ্য করেছিলেন তার নিজের দেশে। তাইতো তিনি তার 'দ্যা সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'পুরুষের উদ্ভাবিত ধর্মগুলোতে প্রতিফলিত হয় আধিপত্যের এ-বাসনা। হাওয়া ও প্যান্ডোরার উপকথায় পুরুষ নারীর বিরুদ্ধে নেমেছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তারা ব্যবহার করেছে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে, যা দেখা যায় আরিস্ততল ও সেইন্ট টমাস থেকে উদ্ধৃতিতে। প্রাচীন কাল থেকেই ব্যঙ্গকারেরা ও নীতিবাগীশেরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ ক'রে এসেছে নারীর দুর্বলতা দেখিয়ে দেখিয়ে। ফরাশি সাহিত্য ভ'রে নারীর বিরুদ্ধে যে-বর্বর অভিযোগ করা হয়েছে, তার সাথে আমরা পরিচিত। এ-বৈরিতা কখনো কখনো হয়তো সত্য, এবং অধিকাংশ সময়ই ভিত্তিহীন; তবে এগুলো কমবেশি সফলভাবে গোপন ক'রে রাখার চেষ্টা করে নিজেকে ঠিক ব'লে প্রতিপন্ন করার বাসনা।'[১]

প্রাচীন রোমের দিকে তাকালে দেখা যায় নারীর অধিকারকে খর্ব করবার জন্য বলা হয়েছিল, নারীর মূঢ়তা ও স্থিতিহীনতার কথা। এক্ষেত্রে তারা এটা বেশ ভালো করেই জানতো নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, পুরুষ উত্তরাধিকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে চিরকাল নারীকে অভিভাবকের অধীনে রাখবার জন্য সেন্ট আগস্টানের প্রতি আনুগত্য দেখানো হয়েছিল। কারণ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, একলা নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই। সেক্ষেত্রে ফরাসী মতেঁইন নারীর পক্ষে যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু ১৮ শতকে এসে দিদরো খুব জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন যে পুরুষের মতো নারীও মানুষ। স্টুয়ার্ট মিলকেও দেখা গেছে ঐকান্তিকভাবে নারীদের পাশে এসে দাঁড়াতে। শিল্প-বিপ্লবের কালে উৎপাদনমূলক শ্রমে নারী প্রবেশ, তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। নারীও তাদের রাজনৈতিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ভোটদানের ক্ষেত্রে নিজেদের দাবীকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকে।

আধুনিক বিশ্বে নারীর অন্যান্য ক্ষমতায়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতা এবং ভোটদানের অধিকার তাকে একটা বিশেষ ক্ষমতায়নে উত্তীর্ণ করে, যেখানে তারা দেশের শাসক এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় একদা ইউরোপের বেশ কয়েকটি গণতন্ত্রে নারীদের ভোটদান থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। তবে উনিশ শতকে এসে নারীদের ভোটদানের অধিকার একটা সামগ্রিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। যে ইস্যুতে নারীদের সংগ্রাম বিশেষত গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকাতে প্রবল রূপ ধারণ করেছিল।

তবে বিশ শতকের প্রথম দিকে নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার স্থানীয় নির্বাচনে নারীদের ভোট দেবার অধিকার বলবৎ করা হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখলে নারীর এই ভোটদানের অধিকারের সূত্রে সারা পৃথিবীতে নারীরা ক্রমশ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ শুধু নয়, নিজেরাও ক্রমশ সেই ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে থাকে। এবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক বিভিন্ন লড়াই দেখে চোখ ফিরিয়ে ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যায়, নারীর ভোটাধিকারসহ নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবিধান রচনা করবার ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক কৌশিক সাউ তার একটি নিবন্ধে জানিয়েছেন—

> 'স্বাধীনত্তোরকালে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায়, মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক কর্তব্য প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেমন: আইনের চোখে সকলে সমান (14 নং ধারা), জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকলেই সমান [15(1) নং ধারা], সুযোগের সমতা (16 নং ধারা), সকলের জন্য সমবেতনের সুবিধা এবং ন্যায্য কাজে ন্যায্য প্রাপ্তি (39 নং ধারা), নারী মর্যাদা রক্ষা (51-A নং ধারা) প্রভৃতি। এগুলি ব্যাতীত নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুসারে (1997-2002) নারী সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীতে 30% ব্যায়, 'মহিলা সমৃদ্ধ যোজনা', 'বালিকা সমৃদ্ধ যোজনা' প্রকল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং 2001-এ 'নারী স্বাধীকার বর্ষ' উপলক্ষে একাধিক নারী কল্যাণ কর্মসূচী গৃহীত হয়।'[২]

তবে ভারতবর্ষে এই রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ **১৯১৭** সালে INC-এর প্রথম মহিলা সভাপতি অ্যানি বেসান্তকে দিয়ে শুরু হয়। তারপর সমাজসেবায় পন্ডিতা রমাবাই, সরোজিনী নাইডু, **১৯৪৭** সালে অমৃত কাউরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হওয়া, **১৯৫৩**-তে United Nations general assembly-এর প্রথম মহিলা সভাপতি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। এছাড়াও **১৯৬৩**-তে সুচেতা কৃপালিনীর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এবং **১৯৬৩** সালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা লাভ, এদেশে নারীর ক্ষমতায়নের একটা উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডমার্ক স্বরূপ।

।।**দুই**।।

বাংলাদেশের নারীর রাজনীতি এবং ক্ষমতায়নের প্রশ্নে বাঙালি নারীদের যোগদান একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্র বটে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তারা বিভিন্ন সময় জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়ে কংগ্রেসের রাজনীতি, বিপ্লববাদ-শ্রমিক-কৃষক-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায় তার 'ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলন ও বঙ্গনারী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—

> 'ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন মঞ্চে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা গেলেও বিপ্লববাদী রাজনীতির সংগে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বৈপ্লবিক রাজনীতির সংগে মহিলার যুক্ত থাকার প্রথম সম্মানের অধিকারী হলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীচৌধুরাণী। 'ভারতী'

> পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি একদিকে বঙ্গীয় যুব-সম্প্রদায়কে শরীরচর্চা ও স্বদেশ সাধনায় ব্রতী হবার আহ্বান জানালেন...১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা থেকে কলকাতায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন করতে এলে সরলা দেবীর সংগে যোগাযোগ করেন এবং 'সর্বতোভাবে' তাঁর সাহায্য লাভ করেন। ১৯০২ সালে বাংলায় প্রথম বিপ্লববাদী কেন্দ্র 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হলে সরলা দেবী এর একজন 'inner circle'-এর সদস্যা হন।'[৩]

স্বাধীনতা পূর্বকালে এমন বহু নারীরা রয়েছেন, যারা কখনো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাদের যতটুকু ক্ষমতা, সেইটুকু দিয়েই দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছেন। এদের কেউ কেউ স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন কিংবা দেননি। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের সংবিধান প্রদত্ত সাম্যের অধিকার, নারী-পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্যকে সরিয়ে দিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। সংবিধান এবং ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে, তাদের ক্ষমতায়নের নেপথ্যে আরো যে বিষয়গুলি কাজ করেছে, তাদের মধ্যে অবশ্যই তাদের শিক্ষা এবং পারিবারিক উত্তর আধিকারেরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে জওহরলাল নেহেরুর কন্যা **ইন্দিরা গান্ধীর** জীবন এবং কর্ম লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভারতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার শীর্ষে উপনীত হবার প্রশ্নে তার শিক্ষা এবং উত্তরাধিকার একসঙ্গেই সমন্বিত হয়েছে।

ইতিহাস বলে, ১৯৪৭ সাল থেকে জওহরলাল নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বের কাল অর্থাৎ ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন জওহরলাল নেহেরুর নিকটতম সহকারিনী। আর এই সহকারিনী হয়ে উঠবার নেপথ্যে ছিল জওহরলাল নেহেরুর চূড়ান্ত অবদান। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে যখন জেল বাস করছেন, তখন তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে যে সকল চিঠিপত্রগুলি লিখেছিলেন, কিংবা তার 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' ইন্দিরা গান্ধীকে ক্রমশ তার উপযুক্ত এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী করবার পক্ষে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল। বেশ কয়েকবার তিনি জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতায় হাতে-কলমে তিনি তখন রপ্ত করেছেন ভারতবর্ষের বিদেশ নীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলি। তবে প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠবার আগে ইন্দিরা গান্ধীর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি যথাক্রমে—

- ১৯৫৯ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন।
- জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যসভার সাংসদ এবং তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এবং
- লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের সংসদীয় নির্বাচনে তিনি মোরারজি দেশাইকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আসনে আসীন হন। যেটা ক্ষমতার রাজনীতি এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে একটা বড় রকমের দিক চিহ্ন হতে পারে।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কে. কামরাজ ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা এবং তার প্রয়োগের বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু তখন অন্যান্য কংগ্রেসের বহু নেতার যে একটা ধারণা ছিল, সেই ধারণাটি সম্পর্কে Michael A. Genovese লিখেছেন—

> 'Congress President Kamaraj smoothed over Mrs. Gandhi's election to the post of Prime Minister, because he thought

> that Mrs. Gandhi was both weak enough to be controlled by Kamaraj and other regional party leaders, and strong enough to defeat [her political rival] Desai, as her father was a highly respected man...A woman was the ideal instrument for the syndicate.'[৪]

ইন্দিরা গান্ধী মোট বেশ কয়েকটি পর্যায়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এবং প্রথম পর্যায় (১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭)-এ তিনি প্রমাণ করেছিলেন, আর যাই হোক কংগ্রেস নেতাদের হাতের পুতুল তিনি নন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে এমন এক প্রাধান্য বিস্তারকারী নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন যে কংগ্রেস সভাপতি ডি. কে. বড়ুয়া 'ইন্দিরাই ভারত ও ভারতই ইন্দিরা'[৫] কথাটির প্রবর্তন ঘটান।

।।**তিন**।।

আধুনিক কালে বিশ্বায়ন এবং নারীবাদ – এই দুটি বিষয় কখনোবা সমন্বিত হয়ে নারী অধিকার ও নারী মুক্তির ক্ষেত্রে একটা নতুন কনসেপ্ট তৈরি করেছে। যা নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বটে। তবে নারী মুক্তি এবং নারীবাদ এ আলোচনায় মুন্সী মহম্মদ ইউনুস লিখেছেন—

> 'নারীবাদের আলোচনার ভরকেন্দ্রে থাকা এই নারীকেই ছুঁয়ে আছে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য উপাদানগুলি। নারীবাদী তত্ত্ব দাবি করে নারীবাদ আদতে অর্থনীতি ও মনস্তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা লক্ষ্য করেছেন, নারীকে সর্বদা এক ধরনের সমাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়। বলা বাহুল্য, এই বৈষম্য প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা থেকে পুরুষবাদী সমাজ পরিকাঠামোয় পরিবর্তনের সময়ে নারী একদিকে যেমন ক্ষমতার সম্পর্কে তথা রাজনীতিতে 'শোষিতে'র ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছে তেমনই সামাজিকভাবে প্রান্তবাসী হয়ে 'ওরা'য় পরিণত হয়েছে।'[৬]

কিন্তু নারীমুক্তি ও নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ঈপ্সিতা চন্দ মনে করেন, নারীর সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রগুলি সরব হয়ে উঠতে পারে তাদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সম্পন্নতার সঙ্গে সঙ্গে। এই শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সম্পন্নতাকে হাতিয়ার করে নিয়ে শুধু ভারতবর্ষ নয়; ভারতবর্ষের বাইরেও নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে যারা বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে মার্কিন কৃষ্ণকায় নারী **কন্ডোলিসা রাইস** (Condoleezza Rice) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যিনি শুধু তার দেশের রাজনীতি নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও মার্কিন প্রশাসনের অন্যতম একজন শক্তিশালী নারী হিসেবে সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হয়ে আছেন।

সেক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের পর মেধাবী কন্ডোলিসা রাইস তার পেশা হিসেবে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। যা তাকে আর্থিক সঙ্গতি দান করেছিল। পরবর্তীকালে তিন কলিন পাওয়েলের পর আমেরিকার মন্ত্রিসভায় আফ্রো-আমেরিকান ব্যক্তিত্ব হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব অসাধারণ দক্ষতার পালন করেছেন। যেখানে তার ক্ষমতা এবং রাজনীতি একই সঙ্গে সমন্বিত হয়ে, নারীর ক্ষমতায়নের ইতিহাসে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমী নারী।

যাকে নারীবাদী আন্দোলনে সামিল যারা, অবশ্যই একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে করে থাকে।

ইতিহাস বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবার পর, কন্ডোলিসা রাইস তার সেই দক্ষতার উৎকর্ষের ফলে তিনি সেই সময়কার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের মুখ্য-উপদেষ্টার পদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকেন্দ্রীকরণ এবং দুই জার্মানির একত্রীকরণের ক্ষেত্রে তার কূটনৈতিক সক্রিয়তা, তাকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে একজন শক্তিশালী নারীর অভিধায় উত্তরিত করে দিয়েছিল। তবে তার এই ক্ষমতায়ন এবং তার প্রয়োগ কখনোই সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। এই প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে—

> ‘পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে রাইস তার কার্যক্রম শুরুর সময় তিনি ট্রান্সফর্মেশনাল ডিপ্লোমেসি নামক একটি নতুন কূটনৈতিক নীতির সূচনা করেন, যা মূলত বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের দিকে আলোকপাত করে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রতি তার সমর্থনের কারণে হামাস নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হওয়ার পরেও চাপের মুখে পড়ে। এছাড়া হামাসের প্রতি চাপ ছিলো বিভিন্ন ইসলামি সামরিক সংগঠন, সৌদি আরব, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোর।’[৭]

সুতরাং কন্ডোলিসা রাইস তার শিক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার আবর্তে যে ভূমিকা পালন করেছেন, সন্দেহ নেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে তিনি তার কূটনৈতিক সক্রিয়তায় যেভাবে আমেরিকার সঙ্গে অন্য দেশগুলির স্বার্থ এবং সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাতে করে তার প্রেক্ষিতেই তাকে রাজনীতি এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক একজন এক্সপার্ট হিসেবে সারা পৃথিবী মনে রাখতে পারে।

ভারতবর্ষে যখন পঞ্চায়েত রাজের কল্যাণে তৃণমূল স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতি ও তার নানা ক্ষেত্রগুলিতে নারীর যোগদানের বিষয়টি প্রসারিত হচ্ছে; ঠিক তখন ভারতবর্ষের দক্ষিণে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিহাসে বিপুল মহিমায়ে প্রসারিত হয়ে আছেন, তিনি সিরিমাভ বন্দরনায়েক। যিনি সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম কোন নারী, যিনি একটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদে আরোহন করেছিলেন। সেক্ষেত্রে বলা চলে ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রবেশ করে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শে একটি রাষ্ট্রকে তার সমগ্রিক উন্নয়নের পথে চালিত করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তবে ইন্দিরা গান্ধী যেমন তাঁর পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন; ঠিক তেমনি করে সিরিমাভ বন্দরনায়েকের রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটেছিল তার স্বামীর সূত্রে। ইতিহাস বলে, ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সলোমন, একদা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় শ্রীলঙ্কাকে চালিত করতে চাইলে তার সরকারের পতন ঘটে। এবং তিনি জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আক্রমণে নিহত হন। আর তার সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসেন স্ত্রী সিরিমাভ বন্দরনায়েক। সেক্ষেত্রে তার ক্ষমতার অঙ্গনে প্রবেশ করবার স্তরগুলি নিম্নরূপ—

- ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি ভেঙে গেলে ইউনাইটেড ফ্রিডম পার্টির সক্রিয় সদস্য হন বন্দরনায়েক।
- এম.পি. ডি. জয়সা সিনেট থেকে পদত্যাগ করলে বন্দরনায়েক সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন এবং

- ১৯৬০ সালে ফ্রিডম পার্টি তার নেতৃত্বে জয়লাভ করলে তিনি সিনেটর থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদে আরোহণ করেন।

সুতরাং ক্ষমতার রাজনীতি এবং সেখানে নারীর অনুপ্রবেশ সন্দেহ নেই একটা বিপ্লবাত্মক ঘটনা বটে। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনীতিতে দেখা গেল ইন্দিরা গান্ধী এবং শ্রীলঙ্কার সিরিমাভ বন্দরনায়েকের ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করবার নেপথ্যে তাদের শিক্ষা এবং পারিবারিক উত্তরাধিকার কাজ করেছে। কিন্তু অপরপক্ষে আমেরিকায় কন্ডোলিসা রাইসের উত্থান এদের থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী বলা যেতে পারে। আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে গণতন্ত্রে জনগণ শেষ কথা বললেও রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে উত্তরাধিকার একটা বিশেষ সহায়কের কাজ করে সন্দেহ নেই। কারণ জহরলাল নেহেরু যেভাবে তাঁর সমস্তটা দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে গড়ে তুলেছিলেন, তাতে করে ভারতের জনগণ নেত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীকে তাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। বন্দরনায়েকের ক্ষেত্রেও সেই বিষয়টা সত্য। কিন্তু কন্ডোলিসা রাইস, রাজনীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ-এশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান ইন্দিরা গান্ধী এবং সিরিমাভ বন্দরনায়েকের থেকে অনেকখানি ব্যতিক্রমী – এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র:

১. সিমন দ্যা বোভেয়ার, দ্বিতীয় লিঙ্গ, অনুবাদ - হুমায়ুন আজাদ, ২০১২, আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা – ২৪।

২. কৌশিক সাউ, ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে নারী ক্ষমতায়নের একাল ও সেকাল, নারী প্রগতি নানা ভাবনায়, সম্পাদনা – শকুন্তলা দাস, ২০১৯, এবং মুশায়েরা, পৃষ্ঠা – ৬৬।

৩. জীবন মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলন ও বঙ্গনারী, নারী প্রগতি নানা ভাবনায়, সম্পাদনা – শকুন্তলা দাস, ২০১৯, এবং মুশায়েরা, পৃষ্ঠা – ২২-২৩।

৪. Genovese, Michael A., ed. Women As National Leaders. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1993. P. 110.

৫. Ghosh, P.S., 1999. Whither Indian Polity?. Economic and Political Weekly, P. 334.

৬. মুন্সী মহম্মদ ইউনুস, নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : একটি নিবিড় পাঠ, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, সম্পাদনা – নবেন্দু সেন, অক্টোবর ২০১২, রত্নাবলী, পৃষ্ঠা – ৪১৭।

৭. bn.wikipedia.org/wiki/কন্ডোলিৎসা রাইস।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা : পরিবেশ ভাবনার নিরিখে

সুরজিৎ প্রামাণিক
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কে.ডি.কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্য নিসর্গ জারিত।বাংলা সাহিত্য প্রারম্ভকাল থেকেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু কয়েকদশক ধরে এই নিসর্গ প্রকৃতি প্রায় ধ্বংসের পথে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা পরিচালিত মানব সম্প্রদায় জীবনের লোভ লালসাকে চরিতার্থ করতে গিয়েই যথেচ্ছভাবে অরণ্যচ্ছেদন নগরায়নের ভীড়ে পরিবেশকে সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে। এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকেই সচেতনপূর্ণ নৈতিক আচরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিকমানের বিভিন্ন নীতি,চুক্তি বৈঠক আয়োজন হয়েছে, হচ্ছে। সুতরাং সেখানে সাহিত্যিকরাও চুপ করে থাকেননি, তাঁদের শৈল্পিক দায়বদ্ধতা স্বরূপ পরিবেশ ভাবনা বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেন পাঠক সাধারণের সচেতনতার উদ্দেশ্য বিপন্ন পরিবেশের কথা তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যে কবিদের মধ্যে অনেকেই এই পরিবেশকে কবিতার বিষয়বস্তুর করেছেন তাঁদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ অন্যতম, তাঁর কবিতায় কীভাবে প্রকৃতি চেতনা ও পরিবেশ ভাবনা ধরা দিয়েছে তাই আলোচনা করা হবে।

সূচক শব্দ: কবিতা, শঙ্খ ঘোষ, প্রকৃতি, পরিবেশভাবনা, সচেতনতা।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যের সেই প্রাচীন নিদর্শন থেকেই আমরা লক্ষ্য করে এসেছি সাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাদান হিসেবে প্রকৃতি-পরিবেশের অপরূপ সৌন্দর্য্য সাহিত্যিকদের কাছে বরাবরের জন্যই গ্রহনীয়।বাংলা সাহিত্য নিসর্গজারিত।বাংলার নদী, পাহাড়, অরণ্য মুক্ত আকাশ-বাতাস প্রভৃতি নিয়ে বাঙালি কবিরা নিসর্গ প্রেমে মগ্ন। কিন্তু বর্তমান সময়ে সাহিত্যতে প্রকৃতি-পরিবেশকে শুধুমাত্র নান্দনিকতার বা সুন্দরের উৎস ভূমি রূপে দেখার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা পরিচালিত মনুষ্য সম্প্রদায় তাদের জীবনযাত্রায় মাত্রারিক্ত প্রয়োজন ও লোভ -লালসাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর যে নির্মম খড়্গাঘাত হানছে। তার ফল স্বরূপ প্রকৃতির ভারসম্য নষ্ট হয়ে চলছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে চরম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে যেটা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতারই সংকট। আর এই সংকট থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের প্রথম শ্রেণির কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের নৈতিক আচরণ করতেই হবে। পরিবেশের যত্ন ও সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়। ফল স্বরূপ বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মধ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব অর্পিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এই পরিবেশ চর্চা বা পরিবেশ ভাবনা পৃথিবী ব্যাপী আন্দোলনের রূপ ধারণ করে।যা শুধুমাত্র বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাহিত্যেরও বিষয়বস্তু হয়ে উঠে। আর সাহিত্যিকরাও তাঁদের শৈল্পিক দায়বদ্ধতা স্বরূপ পরিবেশ ভাবনা বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেন।কারণ পরিবেশের বিপন্নতা স্পর্শ করেছে তাঁদের চেতনাকেও। পরিবেশবিদদের মতো তাঁরাও সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।পাঠককে সচেতন করছেন সমসাময়িক পরিবেশ-কেন্দ্রিক সমস্যা সম্পর্কে। সৃষ্টি হয়েছে

পরিবেশবাদী সাহিত্যের।এই পরিবেশকে বিষয়ের কেন্দ্রে রেখে সাহিত্যিকরা যখন প্রকৃতি, সমাজ, ও ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে সাহিত্যের উপাদান রূপে ধারণ করে তখন সাহিত্য ও পরিবেশের এই অন্তরঙ্গ পাঠকে ইকোটেক্সট্ বলে আর এর থেকেই জন্ম নিচ্ছে ইকোক্রিটিসিজমের মতো সমালোচনা তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি বেশি পুরানো না। ১৯৬২ সালে জীব বিজ্ঞানী রিচেল কার্সন তাঁর 'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থে আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার পর থেকেই এই পরিবেশবাদী চিন্তা সাহিত্য পাঠের নতুন প্রস্থান হিসেবে তৈরি হয়েছে। কবি সাহিত্যিকরা সুপরিকল্পিত ভাবে পরিবেশের সমস্যা গুলোকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলছেন যখন তখনই সৃষ্টি হয়েছে 'eco-text', 'eco-novel', 'Ecopoetry', এর মতো এই পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব গুলি।

আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার ধারায় একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হলো ইকোপোয়েট্রি বা ইকেপোয়েটিক্স যা কবিতার নন্দনতত্ত্বের একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যে ইকো-কবিতার যাত্রা আনুমানিক ভাবে শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে। আমেরিকায় এই ইকোপোয়েট্রির ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত রয়েছে চেরিল গ্লোটফেল্টি ও হ্যারল্ড ফ্রমের গ্রন্থ 'ইকো ক্রিটিসিজম রিডার: দ্য ল্যান্ড মার্ক ইন লিটেরারি ইকোলজি' (১৯৯৬)। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে ইকোপোয়েট্রি প্রসারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে জোনাথন বেট এর ‘রোমান্টিক ইকোলজি’ (১৯৯১) ও ‘সং অব দ্য আর্থ’ (২০০১) বই দুটি। মূলত সাহিত্য প্রতিবেদনে যখন পরিবেশ বিপন্নতার ধারাবিবরণীর প্রকাশ মাধ্যম কবিতা হয় তখন তাকে ইকোপোয়েট্রি। এছাড়াও ইকোপোয়েট্রি বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট করে আলোচনা করেছেন John Shoptaw তাঁর 'Why Ecopoetry' (২০১৬) প্রবন্ধের। তাঁর মতে ইকোপোয়েট্রির বিষয় মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশের বিপন্ন সময় ও সময়ের বিপন্নতাকে বা পরিবেশের ভয়ংকর রূপকে শুধু তুলে ধরা নয়। সচেতন ভাবে পরিবেশের জড় ও অজড় উপাদানের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা ও মধুর একাত্মতার সম্পর্ককেও চিত্রণ করা ইকোপোয়েট্রির বিষয় হতে পারে। সুতরাং পাশ্চাত্য সাহিত্যের মতোই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়ও এই তত্ত্বের প্রভাব পড়েছে তা মনে করা যেতেই পারে। কারন কবিরা যখন প্রকৃতিকে যুগের অভিশাপে ম্লান হতে দেখে, তখন তাঁদের সহৃদয় কেঁপে ওঠে। তাঁদের শিল্পবোধে জাগে এক নতুন দায়িত্ব যা পরিবেশকে রক্ষা করার প্রয়াসে সচেতনতা ও প্রতিবাদ।ইকোপোয়েট্রি তত্ত্বের উৎপত্তির পূর্বে এবং পরবর্তী কালে বাংলা কাব্য সাহিত্যের কবি লেখকেরা নিজেদের কাব্য বিষয়বস্তুতে এই ধারণাটি নিয়ে কতখানি সজাগ ছিলেন? এবং শিল্প রূপে তাঁদের কবিতা ঠিক কতখানি সার্থক, তার অনুসন্ধান করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আগেই উঠে আসবে। বাণী বন্দনা কাব্যের কবিতা বা সভ্যতার প্রতি ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতা গুলি পরিবেশ ভাবনায় জারিত হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নয় রবীন্দ্র সমসাময়িক ও রবীন্দ্র পরবর্তী কবির কবি তাতেও পরিবেশ ভাবনার একছত্র প্রতিফলন লক্ষণীয় বিষয় হয়ে আছে।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইকো-পোয়েট্রি তত্ত্বের সচেতনমূলক প্রয়োগ ঠিক কবে এই নিয়ে অনেক মতান্তর কাজ করে। যদিও এ তত্ত্বের আগেই অপরিকল্পিত ভাবেই পরিবেশের অবক্ষয় নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকরা বিচলিত হয়েছিলেন। যেটা কবি হৃদয়ের প্রধান শর্তও বটে কেননা শিল্পী মানেই সহৃদয় সহানুভূতিশীল। তাঁরা সমাজ,মানবতার অবক্ষয় নিয়ে যেমন ভেবেছেন ঠিক তেমনি প্রকৃতির অবনমন নিয়েও চিন্তিত হয়েছেন। তবুও মোটামুটি পাঁচের বা ছয়ের দশকের পরবর্তী সময়কালকে সামনে রেখে এগোলে পরিবেশবাদ চেতনা সম্পন্ন দুজন কবি অলোকরঞ্জন

দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষকে পেয়ে যাব। আমাদের আলোচ্য বিষয় পাঁচের দশকের অন্যতম স্বাতন্ত্র্য-স্বর বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ। তাঁর চিন্তাচেতনার ধারাবাহিকতায় যেমন উঠে এসেছে বাংলার নিরন্ন মানুষের হাহাকার, মানুষের নীতিহীনতা, মানবিক অবক্ষয়, স্বাধীনতা, দেশভাগের যন্ত্রণা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যেই তিনি পরিবেশের সংকটের কথাও তুলে ধরেছেন। জীবন সংঘাতে ও সভ্যতার সংকটে কবি বরাবরের জন্যই চিন্তিত। পরিবেশের অবক্ষয় কবির চেতনাকে ঠিক কতখানি নাড়িয়েছিলো তার প্রমাণ আমরা ২০১৪ সালের সমর সেন স্মারক বক্তৃতার মধ্যে টের পায় –

> "শুকিয়ে আসছে জল,দূষিত হচ্ছে বাতাস, ঋতুমণ্ডলে বিপর্যয় ঘটিয়ে ধ্বংস নিয়ে ছুটে আসছে কেবল তাপপ্রবাহ যেন আগুনের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। এরও পর বিশ্ব আবার জেগে উঠবে কি না, কারণ আমারাই থাকবো না আর!"

সুতরাং আমরা তাঁর কবিতায় প্রবেশ করলে দেখতে পাবো কীভাবে পরিবেশ কেন্দ্রীক চিন্তন এসেছে ঘুরেফিরে। রবীন্দ্র গবেষক শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর চিন্তা, চেতনায়, অনুভবে পরিবেশভাবনাকে বহন করেছেন, যার সাক্ষ্য অম্লানভাবে গাঁথা রয়েছে তাঁর কবিতাগুলিতে। কবিতার বিভিন্ন স্তরে নানান পার্থিব-অপার্থিব চিন্তায় পরিবেশ ভাবনার বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা গেছে। যেমন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিন গুলি রাত গুলি' (১৯৫৬) 'আকাঙ্ক্ষার ঝড়' কবিতায় শেষ কয়েকটি পঙক্তিতে আক্ষেপ ও আকাঙ্ক্ষার সুরে —-

> "ভীষণ মধুর লগ্নে দুঃসহ বজ্র হয়ে ভেঙে পড়ে তার আকাঙ্ক্ষার মেঘ
>
> ---
>
> তার পর ভিজে এলোমেলো ভাঙা পৃথিবীর আবর্জনা সরিয়ে সুন্দর, ঠাণ্ডা মমতাময়ী সকাল"

আমাদের জন্ম মৃত্যুর ও জীবনচক্রের সবকিছুই আভাসিত হয় প্রকৃতি ও পরিবেশের অনুষঙ্গে। তাই মানুষ ও প্রকৃতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্যও অত্যাবশ্যক। তাই কবি শঙ্খ ঘোষ বলেন ----

> "আমার জন্য একটুখানি খবর খোঁড়ো সর্বসহা
> লজ্জা লুকাই কাঁচা মাটির তলে —
> গোপন রক্ত যা কিছুটুকু আছে আমার শরীরে, তার সবটুকুতেই শষ্য যেন ফলে।
> কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এ সমস্ত দিন
> নিচে কি তার একটুকুও নেই ভিজে?
> ছড়িয়ে দেবো দু'হাতে তার প্রানাঞ্জলি বসুন্ধরা,
> যেটুকু পাই প্রাণের দিশা নিজে।" (কবর, দিনগুলি রাতগুলি)

প্রকৃতি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সার্থক কিন্তু লোভ মেটাতে কখনোই পারবে না। মানুষসহ সমস্ত জীবের চারণভূমি এই প্রকৃতি। সুতরাং এই প্রকৃতিকে রক্ষা করা আমাদেরই কর্তব্য নয়তো আমরাই আমাদের আশ্রয় থেকে চ্যুত হয়ে পড়বো।কিন্তু সময়ের করাল গ্রাসে পড়ে প্রকৃতি যখন বিরূপ হবে সেদিন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতোই বলতে আমারা বাধ্য হবো--

> "কোথায় লুকোবে? ধু-ধু করে মরুভূমি;

ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।"

(উটপাখি)

পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রতিধ্বনি যখন চারপাশে সংকটদীর্ণ রূপ ধারণ করেছে,যে সংকট জীবনের সংকট, সভ্যতার সংকট বলেই অনুধাবন করেছেন ঠিক তখনই তিনি পৃথিবীকে ভালোবেসে, আগামী প্রজন্মকে ভালোবেসে উন্মত্তভাবে উচ্চারণ করেছেন

"এ কোন দেশ?
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িত মুখে
শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার
ক্ষীণকায় শিবিরের বজ্র - আলিঙ্গনে হুতাশী জনসংঘের গুরুসংখ্যা –
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িত মুখে
আমার রাত্রি আমার দিন তার কটাক্ষে বিপন্ন দয়িত
এ কোন দেশ?" (শিশু সূর্য, দিনগুলি রাতগুলি)

প্রকৃতির প্রতি নির্মম অত্যাচারের ফল স্বরূপ ক্লাইমেট চেঞ্জ হতে বসেছে কখনো খরা কখনো বন্যা বা অতিরিক্ত তাপমাত্রার দাবদাহে পৃথিবী পুড়ছে এর দায় মানুষেরই,যেভাবে নির্বিচারে গাছপালা কেটে যাচ্ছে তা সত্যিই চিন্তার বিষয়, তাই কবি তাঁর একটি কবিতার মধ্য দিয়ে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন সচেতনতার উদ্দেশে ––

"অগ্নিজোড়া তেপান্তরে ধূ ধূ বালুর মাঠ--
সেইখানে সে একলা হাঁটে, সেইখানে সে কাঁদে.
গ্রীষ্ম এলো শূন্য কাঁখে-পোড়া এ তল্লাটে
কপাল খুঁড়ে মরল,ও মেঘ বর্ষা দে বর্ষা দে--
বর্ষা দিলো না:
চক্রবালে চক্রবালে তৃষ্ণা দিল পা" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, ঐ)

সময়ের সাথে সাথে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতা যেভাবে কমে আসছে দ্রুত তাঁর প্রমাণ নগরমুখী, নগরায়ণ। নগরায়নের যুগে প্রকৃতির মূল্য সম্পর্কে উদাসীন। যান্ত্রিক জীবনযাপনে তারা অভ্যস্থ। যান্ত্রিক জীবনের নাগপাশে মানুষ নিজেই নিজেদের সঁপে দিয়েছেন।ছায়া সুনিবিড় সুশীতল প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, পরিত্যাগ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। ঠিক এরকমই এক প্রতিচ্ছবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় উঠে এসেছে ––

"আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না,
কলকাতায় থাকে।" (বাস্তু)

এ বিশাল আক্ষেপের সুর এ সংকটজারি পঙক্তি মনে করিয়ে দেয় আমাদের কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন গুলো। যেখানে বহুকাল আগেই তিনি সভ্যতার সংকটের সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নগর ও যান্ত্রিক জীবনযাপনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত করেন––

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী
দাও সে তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশী।

(সভ্যতার প্রতি, চৈতালি)

প্রকৃতির উপাদান হিসেবে মনুষ্য সভ্যতার মজ্জা হিসেবে নদীর অবদান শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন সভ্যতা থেকে আধুনিক সভ্যতার গঠনগত এককে নদী মেরুদণ্ডের মতোই। কিন্তু বর্তমানে তৃতীয়বিশ্বের আদলে নিজেদেরকে গড়তে গিয়ে প্রকৃতির কোনো উপাদানকেই আমার ছাড় দেয়নি। বায়ু আকাশ, মাটির মতো জলকেও দূষিত করে ফেলেছি।তাই পরিবেশ অবক্ষয়ের অন্যতম সমস্যা হিসেবে নদীর দূষণ যা নিয়ন্ত্রণ করা দ্রুততম আবশ্যক। তাই কবি নদীর প্রতি উদাসীনতার একটি চিত্র তুলে ধরেন——

"এখন নদীর দিকে ভালোবাসা প্রতিহত হয়" (খাল)

— এছাড়াও শঙ্খ ঘোষের অনেক কবিতায় এসেছে জলের অনুষঙ্গ।দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জলছবি ফোটে উঠেছে তাঁর কবিতায়।

কবি শঙ্খ ঘোষ বারেবারে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এ সভ্যতার গতিশীলতায় সভ্যতার সংকটের মূল কারণ না হয়ে দাঁড়ায় চারিদিকে হু হু করে বেড়ে উঠছে বড়ো বড়ো শহর যেখানে ছিল গাছপালা পুকুর সব চাহিদার ঘেরাটোপে এসে লুপ্ত হয়ে পড়ছে, নিরুপায় কবি মনে করেন এ যেন বিপন্ন পরিবেশের সূচী যা তিনি ব্যক্ত করেছেন নিজের ভাষায় —

"আমার চতুর্দিকে শহর, চতুর্দিকে আলো,
আমি তখন মধ্যদুপুরবেলা।" (মধ্যদুপুর, নিহিত পাতাল ছায়া)

'নিহিত পাতালছায়া ' কাব্যে এরম অনেক কবিতায় কবি শঙ্খ ঘোষ সমকালের ভিড়ে সামাজিক সমস্যা গুলোর মাঝেই জীবন রেখায় প্রকৃতিকে যোগ করে কত কী আশা, আকাঙ্খা আর্তনাদ সহজে টেনে এনেছেন।

"নষ্ট আমি কিছুই আমার নিজস্ব নয়, ডালে ডালে
পাতায় পাতায় স্বাদু আহারে বিষ অথবা বাঁচার আগুন
ধরে ব্যাপক মাটি —"(দ্বা সুপর্ণা, ঐ)

পরিবেশের আর একটি বড়ো অবক্ষয় হলো মাটি দূষণ। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রাম বাংলার মানুষ কৃষি নির্ভর জীবনযাপন করে এসেছে।মাটিই বাংলা ও বাঙালির কাছে মায়ের স্বরূপ। কিন্তু পৃথিবীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে এসে অত্যধিক কীটনাশক ও সারের প্রয়োগে মাটির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে।কবি অনুমান করেছেন হয়তো এমন এক সময় আসবে মাটির ফসল উৎপাদন করার ক্ষমতা তলানিতে পৌঁছাবে সেদিন আমরা বুক ফেটে কাঁদলেও নিরুপায় —

"বৃষ্টিহীন দুই হাত উঠে এসেছিলো খরা বুকে
এখন সমাজ
কার নাম বলে আর? কাকে দিতে চায় সব ভার?
মাটির ভেতর জমে অন্ধকার, মাটি নিজে আজ জানে না ফসল
তোমার চোখের জলে ভরে ওঠে ছোটো ছোটো ফল"। (খরা, তুমি তো তেমন গৌরী নও)

শঙ্খ ঘোষ সামাজিক দায়বদ্ধতার কবি।সমকালের সমাজকে প্রেক্ষাপটকে তিনি যেভাবে তুলেছেন প্রকৃতি ও পরিবেশকেও তেমনি। তাঁর কবিতায় মৃদু অথচ সুগভীর চিন্তার ছাপে প্রকৃতি মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠেছে। তাঁর আলোচ্য কবিতা গুলি পরিববেশ ও সাহিত্যের যোগসূত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। পরিবেশের নানাবিধ অভিমুখ থেকে তাঁর কবিতার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা যথার্থ। যা পাঠকের কাছে পরিবেশের অবক্ষয় ও সচেতনতার দিককে স্পষ্ট করে

দিয়েছে। ইকো-কবিতার ধারণার স্পষ্ট হয়ে উঠে তাঁর কবিতাতে। তিনি শুধু কবিতার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের ভয়াবহ পরিস্থিতিকেই তুলে ধরেননি। একজন আশাবাদী কবি হিসেবে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও মধুর সম্পর্কের কথাও বলেছেন।

তথ্যসূত্র:

সহায়ক গ্রন্থ :

১) ঘোষ শঙ্খ, কবিতা সংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ:পৌষ ১৩৬৭ কলকাতা ৭০০০৩৭

২) সেনমজুমদার জহর, বাংলা কবিতা : 'মেজাজ ও মনোবীজ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮

৩) পাণ্ডা বিশ্বজিৎ, বিপন্ন পরিবেশের আখ্যান, সোপান, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০২২

৪) মণ্ডল সুশান্ত (সম্পাদনা), 'ইকোক্রিটিসিজম ও বাংলা সাহিত্য, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২১

৫) Greg Garrard: Eco criticism : The new critical idiom,Rutledge 2014

৬) Greg Garrard, Eco criticism, Rutledge, 2012

পত্র-পত্রিকা :

১) পাল, সুশান্ত (সম্পাদনা) অভিক্ষেপ, (প্রকৃতি ও পরিবেশ) উৎসব সংখ্যা ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২) স্বারান্ত, (পরিবেশ ও প্রকৃতি ; বিজ্ঞান-দর্শন-সমাজ-রাজনীতি) শীত, ১৪২৯, জানুয়ারী ২০২৩।

রক্তকরবী : মুক্তির আকাশে যাত্রা

দেবাশিস ঘোষ
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

'রক্তকরবী' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রূপক সাংকেতিক নাটক। মানুষের প্রবল লোভ কীভাবে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে মানুষকে নিছক যন্ত্রে ও উৎপাদনের উপকরণে পরিণত করেছে এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ কী রূপ ধারণ করছে তারই রূপায়ণ এই নাটকে। নাটকটি ১৩৩০ সনে রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৩৩১ সনে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নাটকটি। রক্তকরবীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী – যক্ষপুরীর রাজার রাজধর্ম প্রজাশোষণ; তার অর্থলোভ দুর্দম। তার সে লোভের আগুনে পুড়ে মরে সোনার খনির শ্রমিকরা। রাজার দৃষ্টিতে খনি শ্রমিকরা মানুষ নয়, তারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র, তারা যন্ত্রকাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গঁমাত্র, মানুষ নয়, তারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র, মানুষ হিসেবে তাদের কোন মূল্য নেই। এখানে মনুষ্যত্ব, মানবতা এ যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমাননায় পতিত। জীবনের প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে – প্রেম ও সৌন্দর্য, নন্দিনী চরিত্রটি তার প্রতীক।[১]

এ নন্দিনীর আনন্দস্পর্শ যক্ষপুরীর রাজা পাননি, তার লোভের মোহে, সন্ন্যাসী পাননি তার ধর্ম সংস্কারের মোহে, মজুররা পাননি অত্যাচার ও আবিগরের লোহার শিকলে বাঁধা পড়ে, পণ্ডিত পাননি দাসত্বের মোহে। যক্ষপুরীর লোহার জালের বাইরে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক নন্দিনী সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকল; এক মুহূর্তে মুক্ত জীবনানন্দের স্পর্শে যেন সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। রাজা নন্দিনীকে পেতে চাইলেন যেমন করে তিনি সোনা আহরণ করেন, শক্তি বলে কেড়ে নিয়ে। কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্যকে এভাবে লাভ করা যায় না। তাই রাজা নন্দিনীকে পেয়েও পাননি। একইভাবে মোড়ল, পণ্ডিত, কিশোর, কেনারাম সবাই প্রাণ প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচার জন্য ব্যাকুল হয়ে জালের বাইরের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু নন্দিনী রঞ্জনকে ভালোবাসে তাই তার মধ্যে প্রেম জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু রঞ্জন যক্ষের বন্ধনে বাঁধা। এ যন্ত্র তার প্রেমকে জীবন থেকে বিছিন্ন করে দিল – এটাই যান্ত্রিকতার ধর্ম এবং কবি তা বিশ্বাস করেন। নন্দিনীর প্রেমাস্পদ যান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে নিঃশেষিত হলো এবং আবার যেন প্রেমকে ফিরে পাওয়া যায় সে লক্ষ্যে জীবন জয়ী হলো। এই দৃষ্টিভঙ্গিঁ রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায়, গানে, নাটকে, গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে। কবি রক্তকরবী নাটকটিতে জড়যান্ত্রিকতা ও জীবনধর্মের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য সন্ধান করেছেন।[২]

যক্ষপুরীতে পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে বিপ্লবী সংস্কৃতির প্রতিভূ হয়ে উঠেছে রঞ্জন। যক্ষপুরীতে খোদাইকরদের শ্রমিক জীবন ছিল 'ঠাস দাসত্ব'। কিন্তু যেই রঞ্জন এল তার সান্নিধ্যে এসে শ্রমিকরা গেল বদলে। রঞ্জনের কর্মকাণ্ডের কথা সর্দারের কাছে বিবৃত করেছে মোড়ল। সে জানিয়েছে রঞ্জন শ্রমিকদের "......... মাতিয়ে তুললে, বললে, 'আজ আমাদের খোদাই নৃত্য হবে।' "খোদাই-নৃত্য শুরু হতেই, "তালেতালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি! বড় মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা?' রঞ্জন বললে, 'কাজের রাশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।' পুঁজিবাদী উৎপাদন

ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বিরোধ সেখানে তীব্রতর হ। শ্রমিকদের খোদাই করে আনা সোনার পিণ্ড দিয়ে লোফালুফি করেন শুধু রাজা । পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা যেখানে শ্রমিকদের অধিকার থাকে তাদের শ্রমজাত উৎপাদনে, শ্রমের প্রতি শ্রমিকদের বিরাগ তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা ন্যূন। শ্রমিকদের সেই উজ্জীবিত উৎপাদনকর্ম রবীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জিত করেছেন 'খোদাই-নৃত্য' রূপে। সেখানে শ্রমশক্তি ও প্রাণশক্তির সম্মিলিত বিচ্ছুরণ শোষণমুক্ত শ্রমিকজীবনের ইঙ্গিত বহন করে। শোষণ ব্যবস্থার সংস্কৃতির সঙ্গে মুক্ত জীবনের সংস্কৃতির আরেকটি তুলনা রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে উপস্থাপিত করেছেন ধ্বজাপূজা এবং অস্ত্রপূজার উৎসব উপলক্ষে যক্ষপুরীতে নাচগানের ব্যবস্থা হয়েছিল। উৎসবের প্রস্তুতি সম্পর্কে সর্দারকে অবহিত করতে মেজো সর্দার জানিয়েছে – "নাচওয়ালি আর বাজনাদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।" যক্ষপুরীতে নৃত্যগীতের চর্চা প্রচলিত থাকলেও নন্দিনী যখন "ভালোবাসি ভালোবাসি" গানটি ধরেছিল তখন রাজা নন্দিনীকে গান থামাতে বলে। নন্দিনী গান থামায় না, রাজা পালিয়ে যায়।[৩]

রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – 'কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকেও টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে।' 'রক্তকরবী'-র যক্ষপুরীও এক অতিকায় অজগরের ন্যায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত ক্ষুদ্র মানবাত্মাগুলিকে গ্রাসে গ্রাসে তাহার গহ্বরের মধ্যে চালান করিয়া দিতেছে, তাহাদের বাহিরে আসিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। পতঙ্গ যেমন বহ্নির রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিয়া বসে, পল্লীর স্বাধীন কৃষিও তেমনি আপাত লোভনীয় ধনকণার আকর্ষণে নিজেদের রক্তলোভী যন্ত্রদানবের কাছে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে।' রবীন্দ্রনাথ মদম ও বস্তুশক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। "মুক্তধারার মধ্যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর 'রক্তকরবী'-র মধ্যে প্রতিবাদ রহিয়াছে, পুঞ্জীভূত ধনের বিরুদ্ধে।"[৪]

শিল্প বিপ্লবের পর হইতে সমগ্র বিশ্বজগতে যন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ হইতেছে বলিয়া মৃত্তিকাপ্রাণ মানুষ ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক সত্তার দ্বারা অধিগত হইতেছে ব্যক্তি মানুষ।

শ্রেণী মানুষে পরিণত হইতেছে। বর্তমানে যাঁহারা, মানুষের মুক্তি চান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মানুষের অর্থনৈতিক সত্তাকে পুরোপুরি আঁকড়াইয়া ধরিয়া অর্থের উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যেই আমূল পরিবর্তন আনিতে চাহেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি অর্থনৈতিক চেতনা হইতে মানুষের প্রাণকে মুক্তি করিতে চান – সোনার খনি হইতে দূরে, ধূম্রশ্বসিত কারখানার বাহিরে যেখানে মাটির পরে সোনার আসন পাতা, কারখানার ধোঁয়া যেখানকার আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘে পরিণত, সেখানে মানুষকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। এই পথ হয়ত কাহারও নিকট পশ্চাদপসারী ও প্রতিক্রিয়াশীল মনে হইতে পারে, কিন্তু তবুও কবির পথ ইহাই তাহা অস্বীকার করা চলে না।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ অর্থবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইয়াছেন বটে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অর্থকে কেবল অনর্থ বলিয়াও ভাবেন নাই। মানুষের প্রয়োজনে অর্থ, অর্থের প্রয়োজনে মানুষ নহে – ইহাই কবির মত। সোনার থলি যতক্ষণ মানুষের হাতে থাকে ততক্ষণ মানুষের কল্যাণ, কিন্তু সেই থলি যখন বোঝা হইয়া মানুষের ঘাড়ে চাপে, তখন হইতে শুরু হয় মানুষের দুর্গতি। এই দুর্গতি যক্ষপুরীর রাজার। যখন যক্ষপুরীর বন্দীশালা ভাঙ্গিয়া পড়িল আর রাজা বাহির হইয়া আসিলেন মুক্তিপথে তখনই হইল এই দুর্গতির অবসান। তখন ধানের ক্ষেতে আর শিশিরভেজা

রোদের আঁচলে। তখন রাজার দানব – সত্তার মৃত্যু হইল আর নির্জিত মানবসত্তা পুনর্জন্ম লাভ করিল। ধনতন্ত্রী অভিশাপ হইতে মানুষ বাঁচিল বটে, কিন্তু বাঁচার জন্য আবার মরিতে হইল মানুষকে । যুগে যুগে এভাবে মানুষকে বাঁচাইতে মানুষ মরিয়াছে। যন্ত্রের হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইতে অভিজিৎ মরিল আর স্বর্ণের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে রঞ্জন ও নন্দিনী প্রাণ দিল।"[৬]

"সমাজকে সুস্থ করার জন্যই নন্দিনীর সৃষ্টি" – সেই এই নাটকের প্রধান চরিত্র। তাই কবি বলেছেন – রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।[৭]

রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র মানবকে আঘাত করার জন্যে যে নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন নন্দিনী তাদের মধ্যে প্রধান। যেমন সংকীর্নতার পীড়নে হাসিতে, অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে, নন্দিনীতে তেমনি উছ্বসিত হয়ে পড়েছে। এ যেন গেটের –

'The eternal womanly
That draw us above'

নন্দিনী সৌন্দর্যের প্রতীক, নন্দিনী রাঙ্গা আলর মশাল । সেই আলোতে সে যক্ষপুরীর সমস্ত অন্ধকার দূর করতে চায়। অধ্যাপকের ভাষায় -

"সকালের ফুলে বনে যে আলো আসে, তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেওয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এককথা। যক্ষপুরীতে তুমি সেই আচমকা আলো। ফলে তাকে বাঁধনে বাঁধা যায় না। অথচ বিশাল নীরস শূন্যতার মাঝে সে ক্ষুদ্র মধুর পূর্ণতা।
নন্দিনী আনন্দের সূর্যালোক, প্রীতির বর্ষণ স্নেহ করুণার স্নিগ্ধ ছায়া। 'সে নারী বিচিত্র বেশে' যক্ষপুরীতে উপস্থিত। তার আকাঙ্ক্ষা সমস্তই রুক্ষতা এবং নিষ্প্রাণতার মধ্যে প্রাণের

স্ফূর্তি। ছন্দ ও মুক্তির আনন্দ দান করে:
অবসাদ বন্ধ ভাঙা মুক্তির সে ছবি
সে আনিয়াদের চিত্তে
কলনৃত্যে
দুস্তর প্রস্তর ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দ
জাহ্নবী। (নাম্নী, মহুয়া)

অতএব সে মুক্তির দূতী "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়।" তার কপালের রক্তকরবীর গুচ্ছ 'প্রলয় গোধূলির মেঘের মতো' হয়ে উঠেছিল। যে চেয়েছিল রাজাকে জড়তার হাত থেকে মুক্তি দিতে। বস্তু সর্বস্বতা থেকে স্বর্গের দিকে পৌঁছে দিতে। সে চেয়েছিল রঞ্জন এবং রাজাকে এক দেখতে। কিন্তু মাঝে ছিল কালের ব্যবধান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজার মধ্যেকার অনুতপ্ত ব্যথিত সত্তাটিকে সে বাইরে নিয়ে এসেছি। রাজাও অভ্যস্ত জীবনপথ ত্যাগ করে নন্দিনীর হাতে হাত রেখেছিল। রঞ্জন তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই মুক্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারীর যে কল্যাণী মূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন নন্দিনী তার সার্থক প্রতিচ্ছবি – সে যক্ষপুরীতে এনেছিল মুক্তি।"[৮]

নাটকের প্রায় সূচনাতেই অধ্যাপকের সঙ্গেঁ নন্দিনীর সংলাপে আমরা শুনতে পারি – 'আজ রঞ্জন আসবে।' বিশুকে নন্দিনী জানায়, সকলেই নীলকণ্ঠ পাখির পালক উত্তরে হাওয়া

উড়ে এসে নন্দিনীর বিছানায় পড়েছে, সুতরাং রঞ্জনের আগমন অবধারিত। নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রায় শুভচিহ্ন আছে। নন্দিনী বলেছে, "রঞ্জনের জয়যাত্রার আমার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে।

তাই খুশিতে তার মন ভরে ওঠে।" সেই খুশি দিয়ে নন্দিনী রাজার ঘরে আঘাত করে। নন্দিনীর সঙ্গেঁ রাজার সংলাপে রাজার ঈর্ষায় অসন্তোষে ও নন্দিনীর উজ্জ্বল উচ্ছ্বাসে জানা যায়, 'রাজার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।' নন্দিনী বিশুকে, একটি দীর্ঘ সংলাপে রঞ্জনের প্রদীপ্ত যৌবনের একটি মানপত্র রচনা করেছে, -

"দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়, বুনো ঘোড়ার কেশব ধরে আমাকে বনের ভিতর ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে।"[৯]

রক্তকরবী নাটকের শুরু নন্দিনী আর কিশোরের সংলাপে। সঙ্গেঁ নাট্যকারের দেওয়া কিশোরের পরিচয়; 'সুড়ঙ্গ খোদাই কর বালক' হিসেবে। বয়সে সে বালক। বয়সোচিত বিশেষণে সে যে 'কিশোর তার পরিচয় মেলে কিশোরেরই এক সংলাপে -

'শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশি হয়ে সইতে পারব।'[১০]

"রঞ্জনের সঙ্গেঁ দেখা করার দায়িত্ব, বিশুর দেওয়া সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করে। যার প্রমাণ আমরা নাটকের একেবারে শেষ অংশে মৃত রঞ্জনের হাতে নন্দিনীর প্রেরিত রক্তকরবীর সেই গুচ্ছ দেখে বুঝতে পারি। যে রঞ্জনে নন্দিনীর আনন্দ, প্রেম, পূর্ণতা, যে রঞ্জনের প্রতীক্ষাতে যক্ষপুরীতে বিপ্লবের চেতনা, মুক্তির আহ্বানের সুর; সেই রঞ্জনকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিরোধিতার বাতাস বইছিল যক্ষপুরীতে, কিশোর যেন সেখানে নিজের প্রাণটুকু হেলায় বিসর্জন দিয়ে এক নিঃশব্দ প্রত্যক্ষ বিপ্লবের সূচনা করল। তার 'বুবুদের মত লুপ্ত হয়ে যাওয়া অতি-তুচ্ছ প্রাণটা যে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, কীভাবে সকলকে চালিত করে নিয়ে গিয়েছিল এক অনিবার্য শুভ সমাপতনের দিকে একথা আমরা সবাই জানি। রঞ্জনের মৃত্যু নন্দিনীকে ব্যক্তিগত দুঃখ শোকে বিলীন করেছিল; কিন্তু রাজার মুখ থেকে শোনা কিশোরের মৃত্যুসংবাদ নন্দিনীকে 'শোক' থেকে জাগিয়ে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে যেতে দিয়েছিল প্রেরণা। সমস্ত শক্তি নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা নন্দিনী মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পেরেছিল সেই জোরেই।"[১১]

"নন্দিনীর প্রতি নিজের বেপরোয়া আবেগের প্রমাণস্বরূপ দুর্লভ রক্তকরবী ফুল উপহার দিতে এসে কিশোর জানিয়ে গেল – "বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।"[১২]

নন্দিনীর প্রাণ আকুল করা সম্বোধনে বিশু হয়েছে 'পাগলভাই'। বিশুর 'ঘুম ভাঙ্গানিয়া বা দুখজাগানিয়ার মতো হৃদয় মথিত উচ্চারণে স্পন্দিত হয়েছে – 'O Breaker of my sleep.' 'O Waker of my grief.'[১৩]

রক্তকরবী নাটকের শেষ সংলাপ বলেছে বিশুপাগলই ফাগুলাল : আর ঐ দেখো, ধুলায় লুটছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু : তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল -- তার শেষ দান।
- দূরে গান -

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়
ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায় ।[১৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, রক্তকরবী নাটকে রাজা চরিত্রটি শক্তি মদমও এই মানুষটি কিন্তু অন্তরে মরুভূমির মতো রিক্ত – তাই সে নন্দিনীর মতো প্রাণের আরাম, মনের শক্তির দিকে হাত বাড়ায়, কিন্তু তাকে লাভ করার যোগ্যতা তার নেই। মকর রাজের মধ্যে ছিল আধুনিক মানুষের মতো দ্বৈত সত্তা - ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে সে প্রেমপ্রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রেণীগত রূপে সে রাজা, প্রাকৃতিক শক্তি তার করায়ত্ত। প্রাণের তৃপ্তি তার নেই, প্রাণহরণের নিষ্ঠুর তাতেই তার উগ্র সুখ। ভিতরের মানুষটি যখন নন্দিনীর দিকে এগিয়ে আসে তখন তার দানবসত্তা অন্তর্হিত হয়। ভাব – বিপর্যস্ত মকর রাজ্যের বিক্ষুব্ধ আধ্যাত্মিক সংকটই এই নাটকটির প্রকৃত নাট্যরস। এই সংকটের সমাধান হল রঞ্জনের মৃত্যুতে – মকররাজ উপলব্ধি করলেন আপন যন্ত্রের প্রতাপে যৌবনকে তিনি স্বয়ং হত্যা করেছেন। তাই জীবন – সুধার সন্ধানে তৎপর হয়ে রাজশক্তির প্রতীক ধ্বজাদণ্ডকে ভেঙে ফেলে। প্রলয়পথের দীপশিখা রূপিনী নন্দিনীর হাত ধরে মকররাজ অনন্তপথের যাত্রী হলেন।”[১৫]

“প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের আমানবিক সভ্যতার পরাজয় রূপেই কবি চিত্রিত করতে চেয়েছেন। অনুরূপ বিজ্ঞানকে নিজের হাতে ধ্বংস করেই রাজা নিজের মুক্তি খুঁজেছেন:

‘সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক – তাতেই আমার মুক্তি।’

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ও এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন এক অনবদ্য ভাষায় – ‘এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।’ সত্য শিব সুন্দরে সুগভীর আস্থাশীল কবি তথাকথিত বিজ্ঞানকে যে শক্তি মানবিক অকল্যাণের পথে নিয়োজিত করে, তার ধ্বংসের মধ্যেই মানবের মুক্তি দেখিয়েছেন। সম্ভবত রক্তকরবী নাটকে এই হল মূল বার্তা।”[১৬]

“আকাশের যে নীলিমায় আমাদের নিষ্পিষ্ট আত্মা মুক্তি চায়, প্রকৃতির যে লাবণ্য আমরা নিরুদ্ধ হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করতে চাই” ----- “ভালোবাসি ভালোবাসি” – প্রকৃতির বুকে মানুষের নিষ্ঠুরতা চরম হইয়া ওঠে / তাই -- / আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে / দিগন্তে কার আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।”[১৭]

সাধারন সূত্র নির্দেশ:

১) রায় নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০৭৩। পঞ্চম সংস্করণ – ২২ শে শ্রাবণ, ১৩৬৯। পৃঃ – ৩৩২

২) সমকাল, ৭ অক্টোবর, ২০২১

৩) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদনা) ‘রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী’ অন্তর্গত শুভঙ্কর রায়ের লেখা – রক্তকরবী : ‘রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা’, পৃঃ – ১২৭, দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯।

৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী নাটক (১৯৩০) প্রস্তাবনা অংশ থেকে গৃহীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

৫) ড: অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩। ২০১৮, (পৃ: ৩১০ – ৩১১)

৬) ড: অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩। ২০১৮, (পৃ: ৩১০ – ৩১১)

৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী নাটক (১৯৩০) প্রস্তাবনা অংশ থেকে গৃহীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

৮) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদনা) 'আবহমানকালের বাংলা সাহিত্য' বারুইপুর, কলকাতা – ১৪৪ / নিবন্ধ সংকলন, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, পৃঃ – ৬৪৪, ২০১৬।

৯) ড: অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩। ২০১৮, (পৃ: ৩১০ – ৩১১)

১০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, জৈষ্ঠ্য – ১৪১৫, পৃঃ ৮৭।

১১) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদনা) 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী' অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ - 'ওগো কিশোর আজি' .... 'রক্তকরবী'র কিশোর চরিত্র : একটি ব্যক্তিগত পাঠ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। পৃঃ – ৪৭, ২৫ বৈশাখ, ১৪২৪, প্রকাশক - দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯।

১২) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদনা) 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী' অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ - 'ওগো কিশোর আজি' .... 'রক্তকরবী'র কিশোর চরিত্র : একটি ব্যক্তিগত পাঠ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। পৃঃ – ৪৭, ২৫ বৈশাখ, ১৪২৪, প্রকাশক - দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯।

১৩) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদনা) 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী' অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ - 'ওগো কিশোর আজি' .... 'রক্তকরবী'র কিশোর চরিত্র : একটি ব্যক্তিগত পাঠ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। পৃঃ – ৪৭, ২৫ বৈশাখ, ১৪২৪, প্রকাশক - দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯।

১৪) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদনা) 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী' অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ - 'ওগো কিশোর আজি' .... 'রক্তকরবী'র কিশোর চরিত্র : একটি ব্যক্তিগত পাঠ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। পৃঃ – ৪৭, ২৫ বৈশাখ, ১৪২৪, প্রকাশক - দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯।

১৫) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদনা) 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'রক্তকরবী ও রামায়ন' প্রবন্ধের থেকে গৃহীত, পৃ: - ২১৯

১৬) চৌধুরী শীতল, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী পাঠ বিশ্লেষণ" (সম্পাদনা), গ্রন্থ বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, ২০২২, পৃঃ – ১১৬।

১৭) (সম্পাদনা), অজিতকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রক্তকরবী নতুন পাঠ, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রকাশ – নভেম্বর, ২০২১, পৃঃ – ৮৪।

কোম্পানির শাসন আমলে মালদা জেলায় কৃষক বিদ্রোহ (১৭৫৭-১৮৫৮ খ্রীঃ)

আব্দুল বাসির
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়, চুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান

ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্বে মালদা জেলার কোন আস্তিত্ব ছিলনা। ব্রিটিশ সরকারের আমলে ১৮১৩ খ্রীঃ মালদা একটি পৃথক জেলার মর্যাদা লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এই জেলাটি জলপাইগুরি ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জেলার নামকরণ নিয়ে মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিক প্রচলিত দুটি মত হল -এখানে মলদ নামে একটি উপজীবি গোষ্ঠীর বসবাস ছিল, এই উপজাতি গোষ্ঠীর নামানুসারে এই জেলার নাম হয় মালদা, আবার অন্য মতানুসারে ফারসি শব্দ মাল (সম্পদ) স্থানীয় শব্দ দহ, যুক্ত হয়ে জেলার বর্তমান নাম মালদহ বা মালদা ধারণ করেছে।[১] ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা তথা মালদা জেলা ঔপনিবেশিক বিরোধী কার্যকলাপের লিপ্ত ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষক আন্দোলন। বর্তমান যে মালদা জেলাতে সেখানে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহগুলি হল সন্ন্যাসী ও ফকির, ওয়াহাবি এবং সাঁওতাল ইত্যাদি।

সন্ন্যাসি ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০): ১৭৬৩ খ্রী বাংলা ও বিহারে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সূচনা হয়। বাংলায় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সূচনাকারী সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা ছিলো উত্তর ভারতের আধিবাসী, তারা বাংলা তথা মালদার ভূমিজ সন্তান ছিলো না। প্রথমত আমাদের জানতে হবে কারা ছিলেন সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা। মহঃ হুসেন লিখিত 'দস্তিবান' বই থেকে জানতে পারা যাই যে, এই সন্ন্যাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল মারাঠা সম্প্রদায়ভূক্ত গোসাই,শৈব সম্প্রদায়ভূক্ত নাগা, পুরবিয়া ও ভোজপুরি। যেসব ফকিরেরা এই বিদ্রোহে আংশগ্রহণ করেন তারা ছিলেন মাদারী সম্প্রদায়ভূক্ত ফকিরেরা। ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে সিরিয়া থেকে আগত সৈয়দ বাহাউদ্দিন মাদারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।তার উপাধি ছিল কুতুব উল মাদার।[২]বাহাউদ্দিনের শিষ্যরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।তার মধ্যে অন্যতম ছিল মাদারিয়া দেওয়ানগান,যারা মাদারী ফকির নামেও পরিচিত ছিল। মূলত এরাই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।এরাই মোগল শাসনের মধ্য ও শেষভাগে ভ্রাম্যমাণ জীবন ছেড়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস ও কৃষিকাজ শুরু করে।[৩] এরাই মূলত ব্রিটিশ শাসনের একেবারে প্রথম দিকে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হন। এইসব ফকিরেরা সারাবছর তীর্থ করে বেরাতেন।তারা এই দীর্ঘ যাত্রা তারা পথে ধারের লোকালয় থেকে জীবন ধারনের জন্য খাদ্যসামগ্রী ও অর্থ সংগ্রহ করতেন।তারা এই সময় বিশেষ সম্মান ভোগ করত ।তৎকালীন বাংলার শাসক শাহ সূজা ১৬৫৯খ্রিঃ ফরমানে মাধ্যমে ফকিরদের বিশেষ –সুবিধা দেন।[৪] সন্ন্যসীদের কাছে মালদা ছিল একটি গুরুত্বপূণ বাণিজ্য কেন্দ্র। মালদহে তাদের মূল আকর্ষণ ছিল উৎকৃষ্ট সিল্কের ও রেশম গুটি। তাদের হাতে ধরেই মালদার সিল্ক ও রেশম উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাড়ি দিত। উলিয়াম হারউড এর প্রতিবেদন থেকে জানতে পারি যে,মালদহের সিল্কের ব্যবসায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল।[৫] মালদা ও তার সংলগ্ন গোসাইটুলিতে দশনামী সন্ন্যসীদের দীর্ঘকাল বসবাসের উপযুক্ত প্রমাণ রয়েছে। মালদার মকদমপুর বাঁশবাড়ী এলাকায় দশনামী সন্ন্যাসীরা

এখনো বসবাস করে।তারা, তাদের পূর্ব-পুরুষের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে আংশগ্রহণ করার জন্য গর্ববোধ করে।[৬] মালদা জেলাতে বহু পীরের কবর ও দরগা কে কেন্দ্র করে বহু ফকিরদের সমাবেশ হত। এই ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম ছিল মাদারী সম্প্রদায়ভূক্ত ফকিররা। মালদার রথবাড়ী থেকে পশ্চিমে ঘোড়া শহীদ (লোকে মুখে প্রচলিত ঘোড়াপীর নামে) সেখানে যে দুটি কবর রয়েছে, তা মাদারী ফকিরদের। মাজারের মাটিতে ঘোড়া কুরবানী করা হত।[৭] তার শিষ্য ও অনুগামীদের সমাবেশ হত। শুধুমাত্র মুসলিমরা নন, বহু হিন্দু লোকজন ও তার শিষত্ব্য গ্রহন করে। সন্ন্যাসী ও ফকিররা বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই তারা বাংলা ত্যাগ করে চলে যেত।বাংলা ছিলস সমৃদ্ধশালী ও বৈদেশিক আক্রমণের উপদ্রব কম থাকায় তারা বাংলায় আসতেন। এখনকার আধিবাসিদের কাছ প্রতিরোধ মাত্রা কম থাকবে বলে লুঠপাট সহজ হবে বলে তারা বাংলায় সদলেবলে আসতেন।[৮] বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার প্রতিবাদি কৃষক সন্ন্যাসী ও ফকিররা বিদ্রোহের মাধ্যমে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই বিদ্রোহের আঁচ মালদাতেও ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের সাধারন কারন গুলি হল কৃষক ও কারিগরদের ওপর অত্যাচার, অতিরিক্ত কর আদায়, স্বাধীন ধর্মাচরণে বাধা, করম্যচূত সেনাদের বিদ্রোহ যোগদান। ১৭৬৩খ্রীঃ বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায় বিদ্রোহের সূচনা হয়। অতঃপর বিদ্রোহের আগুন বাংলার ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।এই বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল মালদা। মালদা জেলাতে আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরত্বপুরন ভুমিকা নেন এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মজনু শাহ, বিদ্রোহ সংঘটিত করার জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন, তার নেতৃত্বে মালদা জেলা এই বিদ্রোহের একটি দূর্বার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মালদা জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন ইংরেজ কুঠি ও জমিদারদের আক্রমণ করে অর্থ লুন্ঠণ করেন।[৯] এই সময় ফকিরের দলের সঙ্গে অনেক মানুষ যোগদান করলে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাই।মজনুকে ধরবার মালদাতে কয়েকটি ইংরেজ সেনা দল ছুটে আসে ,কিন্তু সেন্যদল আসার আগেই মজনু মালদহ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।[১০] ১৭৮৬খ্রিঃ মজনু শাহ ইংরেজ সাথে এক সংঘর্ষে তিনি অহত হন এবং ওই বছরই তিনি মৃত্যু বরন করেন।তার মৃত্যুর পর বিদ্রোহের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় তার ভ্রাতা মুশা শাহ এর উপর, কিছুদিন তার নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম চলতে থাকে। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর যোগদান বিদ্রোহকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এই জেলার অন্তর্গত পুচালির জঙ্গল, এই গোপন কেন্দ্র থেকে ব্রিটিশ সরকার প্রচুর পরিমানে আস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে।[১১] ১৭৯৩খ্রী; কোম্পানীর বাহিনীর সঙ্গে ফকিরদের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন ফকির মারা যান। মালদার পান্ডুয়া, বামঙ্গলা, দেওতলা ছিল ফকিরদের অন্যতম কেন্দ্র। সরকার ফকিরদের গতিবিধির ওপর নজরদারির জন্য বিদ্রোহ প্রভাবিত অঞ্চল্গুলিতে পুলিশ নিয়োগ করে। ১৮০০খ্রিঃ নাগাদ বাংলার ও বিহারের সাথে সাথে মালদায় এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

রেশম শিল্পীদের বিদ্রোহঃ (১৭৮০-১৮০০ খ্রীঃ) মালদা জেলা ছিল রেশম ও রেশম জাত পণ্য উৎপাদনে অন্যতম প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।রেশম জাত পণ্য উৎপাদনকারীরা দু ভাগে বিভক্ত ছিল- একদল গুটি থেকে সুতো উৎপাদন করত এবং অন্যদল সুতো থেকে রেশম জাত পণ্য উৎপাদন করত।অতি প্রাচীন কাল থেকে মালদাতে রেশম উৎপাদিত হত।প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্ধনের পুন্ডরীক নামে এক বণিক শাখার খবর মেলে। মালদা জেলাতেও এখনো ঐতিহ্যবাহী রেশম প্রতিপালনকারীরা পুন্ড্রীকাক্ষ বা পুন্ড্র বা পুড়ো বা পুঁড়া নামে খ্যাত। সংস্কৃত সাহিত্যে

রেশম কীটের নাম পুন্ডরীক।[১২] বাংলার সাথে সাথে মালদাতেও ১৭৮০ খ্রীঃ নাগাদ এই বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং চলে মোটামুটি ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। ইংরেজ কর্মচারীদের দাদন প্রথার বহূল ব্যবহার, অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়, অমানবিক শোষন ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মালদার তন্তুবায় শ্রেণী লৌহকঠিন সংগ্রমে অবতীর্ণ হয়। মালদার তন্তুবায় শ্রেণীর লোকেরা ইংরেজ সরকারকে জব্দ করার জন্য মালদার মংগলবাড়ীর অঞ্চলের প্রায় ৭০০ টি তন্তুবায় পরিবার তাদের বসতি ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি স্থাপন করেছিল।[১৩] তবে ১৮০০ খ্রীঃ নাগাদ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করেছিল।

ওয়াহাবি আন্দোলনঃ ওয়াহাবি কথার অর্থ হল – নবজাগরণ ।আব্দুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে আষ্টাদশ শতকে এই আন্দোলন আরব দেশে শুরু হয়।ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত নাম হল তারিখ –ই –মুহম্মদীয়া – বা মহম্মদ প্রদর্শিত পথ।[১৪] ভারতে এই আন্দলনের সূচনা করেন দিল্লির সূফি সন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার পুত্র আজিজ। এই আন্দোলন ছিল মূলত পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। তবে ভারতে এই আন্দলের প্রকৃত সূচনাকারি উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহমেদ ও শাহ ইসমাইল শাহিদ।[১৫] এই আন্দলোন ধর্মীয় আবরণে কৃষক আন্দলোন। সৈয়দ আহমদ ভারতে আন্দোলন কে শাক্তিশালী করে তুলবার জন্য চারজন খলিফা নিযুক্ত করেন। তারা হলেন বিলায়েত আলি, ইনায়েত আলি, মহম্মদ আলি ও ফারহত হুসেন।[১৬] তবে বাংলায় এই আন্দোলন শুরু করেন চব্বিশ পরগণার মীর নিশার আলি বা তিতুমীর। ১৮৩১ খ্রীঃ বালাকোটের যূদ্ধে ওয়াহাবি নেতা সৈয়দ আহমদ শিখদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।প্রায় একই সময়ে বাংলার ওয়াহাবি অন্যতম নেতা তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে নিহত হন। এই দুই নেতার মৃত্যুর পর ভারত তথা বাংলায় এই আন্দোলন কিছূতা দুর্বল হয়ে পড়ে। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় ইনায়েত আলি ও বিলায়েত আলির উপর, তাদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন ভারত তথা বাংলায় নতুন প্রান পাই।[১৭] ডঃরমেশচন্দ্র মজুমদার এর তথ্য থেকে জানতে পারি যে, মালদায় এই আন্দলোনের সূচনা হয় ১৮৪০ খ্রিঃউত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল মালদা। ১৮৪০ খ্রীঃ উত্তরপ্রদেশ নিবাসি মোলভী আব্দুল রহমান মালদায় এসে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি মালদাতে মাদ্রাসাহ চালানোর পাশাপাশি ওয়াহাবিদের শারিরীক ও সামরিক শিক্ষা দিতেন থাকেন।[১৮] তার দক্ষ নেতৃত্ব ও অন্যান্য ওয়াহাবি নেতাদের সহযোগিতায় মালদা হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্ব ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। রফিক মন্ডল ছিলেন একজন দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে-সঙ্গে একজন দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ আদায়ের জন্য মালদাকে কয়েকটি রাজস্ব এককে বিভক্ত করেন।রফিক মন্ডল মুসলমানদের কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে যাকাত আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য কর আদায় করতেন। সেগুলি হল –ঊষর, মূঠি ইত্যাদি। মালদা, মুর্শিদাবাদও রাজশাহীতে তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এসব অঞ্চলগুলি থেকে তিনি বছরে প্রায় ২০০০০ হাজারেরও বেশি কর হিসেবে আদায় করতেন এবং তা সীমান্তবর্তী অঞ্চগুলিতে পাঠিয়ে দিতেন।[১৯] ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপ লিপ্ত থাকার অভিযোগে ১৮৫৩খ্রি রফিক মন্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে থাকা অবস্থায় মালদায় আন্দোলন চালানোর ভার অর্পিত হয় তার পুত্র মৌলভী আমিরুদ্দিনের উপর।তার নেতৃত্বে মালদায় ওয়াহাবি আন্দোলন জনগণের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে।মালদা জেলায় ওয়াহাবি আন্দোলন মূলত বাদিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত মুসলমানদের দ্বারা। তারা কিন্তু মালদহের আদি অধিবাসি নন। বাদিয়াদের মালদাতে আগমন সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মত প্রচলিত আছে ।তার মধ্যে অধিক প্রচলিত দুটি

মত হল। প্রথম মত হল- তারা শেরশাহের গৌড় আক্রমনের সময় সৈন্যবাহিনীর অঙ্গ হিসেবে মালদায় আসেন এবং দিত্বীয় মত হল তারা শেরশাহবাদ থেকে অভিবাসিত হয়ে মালদায় আসেন।[২০] পরবর্তীতে তারা মালদাতেই থেকে যান। পরবর্তিতে তারা শেরশাহ বাদিয়া নামে অধিক পরিছিত লাভ করে। মূলত তারা নদী তীরবর্তি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে শুরু করে। এদের মূল জীবিকা ছিল চাষ বাস ও কায়িক শ্রম নির্ভর কাজ। তারা যেসব গ্রামগুলিতে বসতি স্থাপন করেন সেগুলি হল তালশুর, বেলশুর, কুমেদপুর, সুজাপুর, খরবা, আদিনা, রশিলাদহ, মানিকচক।[২১] বর্তমান হরিশ্চন্দ্রপুর, পুখুরিয়া ও রতুয়া থানাতে আদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। মালদা জেলার বিস্তীর্ণ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিশিষ্ট গবেষক অরুণকান্তি ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ জানা যে, মালদা জেলার যেসব স্থানে ওয়াহাবি আন্দোলনের গুপ্ত ঘাঁটি গুলি গড়ে ওঠেছিল সেগুলি হল -

থানা গুপ্ত ঘাঁটি

হরিশ্চন্দ্রপুর তালগ্রাম, কুমেদপুর, বেলশুর, মালিওর ও ইসলামপুর।

খরবা গোয়ালপাড়া, চন্দ্রাপাড়া, খরবা, রাইখা দীঘি।

অবিভক্ত রতুয়া সামসী, কান্ডারণ, সম্বলপুর, বাটনা, মহারাজপুর।

কালিয়াচক সুজাপুর, মোথাবাড়ি, কমলাপুর (বাবলা) শেরশাহি, হোসেনাবাদ, বাকারাবাদ।

গাজোল দেওতলা, বাবুপুর, একলাখি ও রাজদীঘি।

মানিকচক মাছূয়া কান্দর, চাদপুর,মালদা পাড়া, রাখালপুর, হাসপকুর, খুটাদাহ, কূশাদহ, পারহরি নগর, জগদলা।

হবিবপুর দাল্লা, মহেন্দ্রপুর, আইহো, বুলবুলচন্ডী।

পুরাতন মালদা ভাবুক, পান্ডুয়া, আদিনা, মহিষবাথানী।

মালদা জেলাতে ওয়াহাবিদের এইসব কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠার পিছনে ওয়াহাবি নেতা রফিক মন্ডল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রফিক মন্ডল যুক্ত ছিলেন।[২২]

মালদায় এই বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল নারায়ণপুর।রফিক মন্ডল ছিলেনে একজন দক্ষ সংগঠক ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।রফিক মন্ডল, ইব্রাহিম মন্ডল প্রমূখের উদ্যোগে গতিশীলতা ও বিস্তার লাভ করে। রফিক মন্ডল ছাড়াও এই আন্দোলেনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতারা হলেন ইব্রাহিম মন্ডল, মৌলভী আব্দুল রহামান, আমানাত মন্ডল, নাজির সর্দার ও আমিরুদ্দীন।[২৩] রফিক মন্ডললের গ্রেপ্তারের পর তার পুত্র আমিরুদিন মন্ডল এর ওপর মালদাও নারায়ানপুর কেন্দ্র পরিচালনার ভার অর্পিত হয়।বামনগলা থানাতে ওয়াহাবি আনদোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে মূখ্য ভুমিকা নেন আমানত মন্ডল এবং কালিয়াচাক থানাতে আন্দলন পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন নাজির সরদার। শুধুমাত্র মুসলিমরা এই আন্দোলনে মালদার হিন্দুরাও এই বিদ্রোহে আংশগ্রহণ করে। রাজমহল ট্রায়ালের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যে, চারজন হিন্দু নেতাও এই আন্দোলনে আংশগ্রহন করেছিলেন।তারা হলেন হীরামন ঘোষ, হাকিমণ ঘোষ, ফটিক ঘোষ ও তফি ঘোষ। ১৮৭০ খ্রীঃ মালদা- রাজমহল ষড়যন্ত্র মামলায় অধিকাংশই প্রথম সারির নেতা গ্রেফতার হলে মালদায় এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

সাঁওতাল বিদ্রোহঃ (১৮৫৫-৫৬): ইংরেজ আত্যাচারে জর্জরিত হয়ে “দামিন-ই-কোহ বা পাহাড়ের প্রান্তদেশ” তে বসবাসকারি সাঁওতালরা ১৮৫৫-৫৬ খ্রিঃ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।এই বিদ্রোহের প্রভাব সাওতাল পরগণা ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী মালদা জলাতে ছড়িয়ে পড়ে।অতি সহজ সরল ও নিরক্ষর সাওতালদের ওপর নানা অত্যাচার,শোষণ ও

জোর জুলুম সাওলতালদের বিদ্রোহী করে তোলে।কর আদায়ের ক্ষেত্রেগ ইংরেজ সরকার নির্ধারিত কর ছাড়াও বাড়তি বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করত।শুধুমাত্র ইংরেজরাই শোষন করত না, অর্থলোভী মহাজনরা তাদের একইহারে তাদের শোষণ করত। তাদের কাছে যে টাকা ধার নিত, সেই টাকা এক বছরের মধ্যে তা আসলের বেশি হয়ে যেত।[২৪] ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে, তাদের জমি বেদখল হয়ে যেত। আবার অনেক সময় রাজস্ব আদায়ের কর্মচারীরা তাদের ওপর অমানুষিক শোষণ করত। কেননা রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা ওজনের কারচুপি করত। তাদের কাছ থেকে পাওনা রাজস্বের অনেক বেশি আদায় করলেও বিশ সের আর হত না, কেননা তারা উনিশেই আঁটকে যেত। বিষ্ময় –ক্ষোভ ও হতাশায় সাওতালরা একবার বিশ বল বাবু।[২৫] এইসব কারনে সাওতালরা বিদ্রোহে ঝাপিয়ে পড়ে। তবে ১৮৫৬ খ্রীঃ মধ্যে এই বিদ্রোহ দমিত হয়,পরবর্তীতে মালদার সাঁওতালরা ১৯৩২ খ্রিঃ জিতু সাওতালের নেতৃত্বে জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হয়।

মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭): ১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন ১০০ বছরের মধ্যে এই মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে কারনগুলি ছিল-সামাজিক, অরথনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক এবং একইসময়ে এনফিল্ড রাইফেলের ব্যবহার ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয় বাংলায়। ১৮৫৬ খ্রীঃ ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১১নং নেটিভ ইনফ্রান্টিতে এবং ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুর সেনানিবাসে ৩৪ নং মঙ্গল পান্ডে বিদ্রহ শুরু করেন।[২৬] তার হাতে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী নিহত হন।এবং বিচারে তার ফাসি হয়।অনেকে তাকে বিদ্রোহের প্রথম শহীদ বলে গণ্য করেন।এগুলি ছিল একেবারেই বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ।

প্রকৃপক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৫৭ খ্রী; ১০ই মে মীরাটে এবং পরবর্তীকালে বিদ্রহের স্ফুলিঙ্গ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।তবে কেবলমাত্র অযোধ্যাতে এই বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে।এই বিদ্রোহের কয়েকজন বিখ্যাত নেতা হলেন –দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, বিদ্রোহীরা তাকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।[২৭] নানাসাহেব,তাতিয়া তোপী, ঝাসীর রাণী লক্ষীবাই এবং অযোধ্যার বেগম হজরত মহল প্রমূখ। সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রথম বাংলায় দেখা দিলেও, প্রকৃতপক্ষে বাংলায় এই বিদ্রোহের প্রভাব ছিল ক্ষীণ। বাংলার তৎকালীন সমাজের প্রভাবশালী অংশ জমিদার শ্রেণি এবং তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীত ছিল বিদ্রোহের বিপক্ষে ও সরকারের পক্ষে। তথাপি বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে মালদাতে এর ব্যতিক্রম হয়নি। মালদাতে বিদ্রোহে অংশগ্রহন করার জন্য মানুষকে আহ্বান করেন চমন সিং নামে একজন ব্রাক্ষ্মণ। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত থাকার জন্য বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এছাড়াও এই বিদ্রোহে অংশগ্রহন করার অপরাধে শেখ মিরজঙ ও শেখ জমিরুদ্দিন দীর্ঘকালীন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।[২৮] মোটামূটি ১৮৫৮খ্রীঃ নাগাদ মালদাতে বিদ্রোহের আগুন নিভে যায়।

মালদা জেলা অবস্থানগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই জেলা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ১৭৬৩খ্রীঃ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মাধ্যমে মালদাতে ব্রিটিশ সংগ্রামের সূচনা হয় এবং তার পরিনতি লাভ করে ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারত স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে।

তথ্যসুত্র:

১. প্রদ্যোত ঘোষ, মালদা জেলার ইতিহাস,২০০৪,পৃ- ১& ২ ।

২. Bhattacharya:Madari silsila:origin and Evolution :In the culcutta Historical Journal vol:26no:1 jan-june:2006 Page o.67-69.

৩. সুপ্রাকাশ রায়,ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠাঃ 20।

৪. আসিত নাথ,The Sannyasi Rebellion:রত্না প্রকাশন,কলকাতা,১৯৯৭,পৃ-১৫।

5. Anand Bhattacharya ,The Peripatetic Sannyasi:A Challenge to Peasant Stability and Colonial Rule,Page No:55.

6. Anand Bhattacharya, 'Oral Source for writting the History of the Sannyasi and Faqir Rebellion (1763-1800),Words aSilence,'The Journal of the International Oral History Association, Vol.6 No,2, P.5.

৭. এম আতাউল্লাহ, মালদা জেল গঠন:প্রেক্ষাপট,উতসারিত আলো,চতুর্থ বর্ষ ২য় সজ্খ্যা, ২০১৩, পৃ-৭৯

৮. আসিত নাথ,The Sannyasi Rebellion:রত্না প্রকাশন,কলকাতা,১৯৯৭,পৃ-১৫।

৯. সুপ্রাকাশ রায়,ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পৃষ্ঠাঃ৪৪।

১০. তদেব পৃ-৪৪।

১১. Anand Bhattacharya, The peripatetic Sannyasi:A Challenge to Peasant Stability and Colonial Rule, Page No:57

১২. নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোস,ষষ্ঠ দশভাগ,পৃ-৭৫২।

১৩. এন,কে সিনহা ইকনিম হিস্ট্রি অফ বেংগাল কলকাতা,১৯৭৮,পৃ-৩৯-৪০।

১৪. আধূনিক ভারতঃ জীবন মূখোপাধ্যায়ঃপৃঃ১২৪।

১৫. Jayanti Mitra:Muslim Politics in Bengal1855-1906 K.P& Bagchi Company,1984,P.11.

১৬. আধূনিক ভারতঃ জীবন মূখোপাধ্যায়ঃপৃঃ১২6।

১৭. তদেব,পৃ-১২৬।

১৮. শচীন্দ্রনাথ বালা ও ঋতব্রত গোস্বামী, সম্পাদিত,মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র,পৃ,১৩২।

১৯. R.C Dutta , British Paramountcy and Indian Renaissance, Page No-899.

২০. মালদা জেলার ইতিহাস চর্চা, সুস্মিতা সোম, দিপালী পাবলীশারস, পৃ-১১৯।

২১. শচীন্দ্রনাথ বালা ও ঋতব্রত গোস্বামী, সম্পাদিত মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র, পৃ, ১৩৪।

২২. অরুণকান্তি ভট্টাচার্য 'মালদহে ওয়াহাবি আন্দোলন' প্রকাশিত মালদার খবর পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ, ২০০৭।

২৩. শচীন্দ্রনাথ বালা ও ঋতব্রত গোস্বামী, সম্পাদিত, মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র।

২৪. তদেব,পৃ,২১১।

২৫. ডি বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পৃ,২১।

২৬. আধূনিক ভারতঃ জীবন মূখোপাধ্যায়ঃ পৃঃ১৫৫।

২৭. তদেব,পৃ১৫৬।

২৮. সুপ্রাকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৩ & ৩৬৪।

নারীমুক্তি অথবা আদর্শনারী নির্মাণ : উনিশ শতকে নারী প্রগতির স্বরূপ

সামিমা আক্তার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সঙ্গে পরিচয়ের ফলে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাধারায় এক পরিবর্তন দেখা দিল, তাঁরা নিজেদের সমাজব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। আর সমাজের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তাদের প্রথম চোখে পড়ল সমাজে নারীর হীনাবস্থা, কারণ মেয়েরা ছিল পিঞ্জরে বদ্ধ পাখি, বিভিন্ন কুসংস্কার ও ধর্মীয় প্রথার বলি, পুরুষের হাতের পুতুল। তাঁরা এটা অনুভব করেছিলেন যে সমাজের অর্ধাংশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন রেখে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, ফলে কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আপ্রাণ চেষ্টায় শুরু হয় নবজাগরণ যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারী। এঁরা সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, এই সমস্ত কুপ্রথার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও আইন করে একে একে নিরসন করেন। এরপরে নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে নানা উপায় অবলম্বন শুরু করলেন। যা ইতিহাসে 'নারী আন্দোলন' বা 'নারীমুক্তি আন্দোলন' নামে পরিচিত। উনিশ শতক নিয়ে অধিকাংশ মানুষের ধারণা নারীরা একটি নিস্ক্রিয় নিপীড়িত স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ছিল, যাদের 'মুক্তি' প্রগতিশীল পুরুষদের প্রচেষ্টায় ঘটেছিল। একথা স্বীকার্য যে নারী কয়েকটি কুপ্রথা থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং সীমিত রূপে হলেও শিক্ষার আলো পেয়েছিল। তবে সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি। তাহলে নারী প্রগতির স্বরূপটি কেমন ছিল?

একজন গবেষক হিসেবে আমার মনে হয়েছে যে উনিশ শতকের 'নারীপ্রগতি' বিষয়টিকে নারীদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত। আমার কাছে 'emancipation' বা 'মুক্তি' শব্দটি উনিশ শতকের নারী-আন্দোলনের প্রেক্ষিত থেকে যথাযথ মনে হয়নি, সেই সময় 'নারীমুক্তি'র ধারণাটি সীমাবদ্ধ ছিল মূলত সামাজিক ও ধর্মকেন্দ্রিকতার মধ্যেই। তা কখনই নারীর স্বাধিকার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল না। 'নারীমুক্তি' বলতে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং ব্যক্তিগতজীবনে পূর্ণ-স্বাধীনতা ও সমতা বোঝানো হয়। সমগ্র উনিশ শতকে এই বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়নি। উনিশ শতকের সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক এবং সেই সময়ের নারীমুক্তির ধারণা ছিল পুরুষের অধীনে থেকেই নারীর উন্নয়ন ঘটানো। আর আন্দোলনগুলি ছিল অনেকখানি পুরুষের জয়গান তার মধ্যে নারীর স্থান অত্যন্ত সংকুচিত ছিল অথবা ছিল না। তাই উনিশ শতকের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে 'নারীমুক্তি' কথাটি নতুন করে ভাবায়। মেয়েদের মেয়েলি করে রাখবার জন্য শিক্ষা থেকে শুরু করে মেয়েদের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করেছিল পুরুষেরা, যদি মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সমস্ত সুযোগ বঞ্চিত করে পুরুষের তৈরি ছাঁচে বড়ো করা হয় তাহলে তা 'নারীমুক্তি' কীভাবে হতে পারে? আসলে এই সময় 'নারীমুক্তি' আন্দোলন মূলত নারীদেরকে সমাজের উপযোগী আদর্শ নারী রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশে পরিচালিত। তাদেরকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যাতে আদর্শ নারী হিসেবে তাঁরা ভালো মা, ভালো গৃহবধূ, ও পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী হতে

পারে। পাঠ্যবিষয় গুলি সেইভাবে নির্ধারিত হয় যাতে নারীসুলভ গুণাবলি বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীত্বের চিরন্তন আদর্শ বলতে সীতা ও সাবিত্রী আদর্শায়িত রূপটি তুলে ধরা হয়েছে, আর নারীকে এই মডেলে গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে। এই রূপটি আরও প্রকটিত হতে শুরু করে, যখন সাতের দশকে বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পরে। জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করতে নারী চরিত্র গুলোকে ত্যাগের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, নারীরা হয়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। নারীকে মহিমান্বিত করা হয়েছে সতীত্ব ও পাতিব্রতের আদর্শ রূপে। সমসাময়িক সাহিত্যে চোখ রাখলেই নারীর এই আদর্শায়িত রূপটি ফুটে উঠে। বর্তমান প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: নারীমুক্তি, স্ত্রীশিক্ষা, আদর্শ নারী, পতিব্রতা, সতীত্ব, প্রগতি, রক্ষণশীলতা।

মূল আলোচনা:
ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা বাঙালিদের একটি ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির আস্বাদ এনে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালিরা নিজেদের ধর্মীয়-সামাজিক-প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাচীন রীতিনীতির বর্বরতা সম্পর্কে সচেতন হন এবং সামাজিক রীতিনীতির বিশ্লেষণ এবং পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বোঝা গিয়েছিল যে পুরনো সঞ্চয়, পুরনো বিশ্বাস নিয়ে দিন অতিবাহিত করার সময় ফুরিয়ে গেছে। এক নতুন আলোর স্ফুরণ ঘটল, যার রশ্মি অন্দরমহলের ভেতরে গিয়েও পড়ল। বিদেশি সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে ভিনদেশি সমাজে মেয়েদের অপেক্ষাকৃত উন্নত স্থান বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিদেশিরা যারা এদেশে এসেছিলেন তাঁদের লেখাতেও এদেশের সমাজে মেয়েদের দুরবস্থার ওপর ব্যাপক আলোকপাত ঘটেছিল। যারফলে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে মেয়েদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করলেন, দেখলেন যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথা জর্জরিত মেয়েরা ছিল পিঞ্জরে বদ্ধ পাখি। কতিপয় হিন্দু, ব্রাহ্ম, এবং খ্রিস্টান সমাজ সংস্কারেরা এই সব প্রথার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও আইনের মাধ্যমে একে একে নিরসন করে। এরপরে নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নানা উপায় অবলম্বন করতে শুরু করলেন। যা ইতিহাসে "নারী আন্দোলন" বা "নারীমুক্তি" আন্দোলন নামে পরিচিতি। উনিশ শতকের বহুল আলোচিত বিষয়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, প্রমুখ সংস্কারক পদদলিত মহিলাদের অবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বনে চেষ্টা করে গেছেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত সমাজে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে নারীর যে হীনবস্থা ছিল, উনিশ শতকে এসে নারীর অবস্থার পরিবর্তন হয়। তবে সম্পূর্ণভাবে নারীর মুক্তি ঘটেনি। সেই সময় নারীমুক্তি আন্দোলন ছিল মূলত সামাজিক ও ধর্মকেন্দ্রিক। নারীর স্বাধিকার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নারীশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হলেও এ শিক্ষা সবার জন্য অবারিত হয়নি এবং অবরুদ্ধ নারীরা সেভাবে ঘর থেকে বের হতে পারেনি। স্ত্রীশিক্ষা বা অন্যান্য নারীকেন্দ্রিক যে আন্দোলন গুলি চলে তা ছিল অনেকাংশে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত, সমাজে সর্বস্তরে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। আর সমাজ সংস্কার অনেকখানি পুরুষের জয়গান, তার মধ্যে নারীর স্থান অত্যন্ত সংকুচিত ছিল বা

ছিলই না। নারীদের জন্য গঠিত আইন এবং বিচারবোধ পুরুষের স্বার্থকেই জোরালো করে, নারীকেন্দ্রিক পরিবর্তনে নারীর মতামতের কোনো পরিসর ছিল না।

গোটা উনিশ শতক জুড়ে সমাজ সংস্কারকদের আলোচনার সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও তার আনুষঙ্গিক দিকগুলি। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো, যাতে পরিবারের মধ্যেই স্ত্রী ও মা হিসেবে তাঁরা উন্নততর ভূমিকা পালন করতে পারে, যে শিক্ষাটি ছিল পুরোপুরি পুরুষ কল্পিত নারী মডেল, তাঁরা পরিবারের মধ্যে নারীর শুদ্ধ, সতী, পতিব্রতা, কল্যাণী মূর্তির প্রথাগত ভূমিকায় আস্থাশীল ছিলেন। পুরুষেরা সীমায়িত ও নিয়ন্ত্রিত স্ত্রী শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন। কেউ কেউ চেয়েছিলেন এমন শিক্ষিত সহধর্মিণী যারা স্বামীর বশবর্তী ও উপযুক্ত সঙ্গিনী হতে পারে। উনিশ শতকের নারীরা ততটা পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে যতটা পুরুষ চেয়েছে। নারী পরিসরের লক্ষণ গণ্ডি ছিল পুরুষের হাতে, উনিশ শতকের প্রথম দিকে নারীশিক্ষার যে ধারাটি বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের হাত ধরে শুরু হয় তা ক্রমশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তা একটি খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীরা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমেশচন্দ্র দত্ত, অঘোরনাথ গুপ্ত, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, প্রমুখরা মনে করতেন নারীরা যাতে ধর্মপরায়ণ, নীতিপরায়ণ, সুমাতা, সুগৃহিনী, হয়ে উঠতে পারেন, এমন স্ত্রী-জনোচিত শিক্ষা দেওয়াই উচিত। ১৮৬৯ এ প্রকাশিত 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন ঘোষ লেখেছেন – স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এই গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালন ও সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিধবা হলে স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করে জীবনধারনের উপযুক্ত শিক্ষাই নারীদের জন্য প্রকৃত শিক্ষা।[১] কেউ কেউ আবার নারী শিক্ষাকে পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নারীদের দুঃখ মোচন ও অন্তপুরে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'বামাবোধিনী' পত্রিকা। নারীর উন্নতি সাধনে পরিচালক মণ্ডলীর এরূপ ভাবনা অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু উনিশ শতকে 'বামাবোধিনী' সুগৃহিনীর যে আদর্শ রূপটি তৈরি করেছে সেখানে দেখা যায় সংসার পরিচালনায় নারীর দায়িত্ব সর্বাধিক। নারী হবে শান্ত, ধীর-স্থির, ক্ষমাশীল, সুশীতলা, অতিথিবৎসল, মিতব্যয়ী, সহনশীল,নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিধিকে খর্ব করে দেবীত্বে উন্নীত করেছে। 'বামাবোধিনী' পত্রিকা উল্টালে অধিকাংশ রচনা শিরোনাম দেখলেই পত্রিকার উদ্দেশ্য সহজবোধ্য, যেমন- 'স্ত্রী জাতির আদর্শ', 'আদর্শ সতী স্ত্রী', 'সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম', 'রমনীর কর্ত্তব্য'। 'বামাবোধিনী'র বিশ্বাস ছিল নারী সতী-সাধ্বী হবে, পতিব্রতা হবে। লেখাপড়া শিখে নারী যাতে সরল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে সেই আদর্শেই নারীকে ছোট থেকে গড়ে তুলতে হবে। সতী নারী কেমন হবে সেই প্রসঙ্গে বামাবোধিনীর বক্তব্য- যিনি নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে পিতা, ভ্রাতা, বা সন্তানের ন্যায় নির্মল চোখে দেখেন, যাঁর হৃদয় সব সময় ভক্তি, প্রেম, ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ থাকবে তিনিই সতী।[২] স্বামী যদি কুরূপ, নির্গুন, দরিদ্র হন তাহলেও তিনি স্ত্রীর কাছে পূজনীয়। পতি যদি কোনো অন্যায় করেন তাহলেও তা ক্ষমার চোখে দেখতে হবে, স্বামী যদি পাপী বা অসাধু হন তাহলেও তাঁকেই স্ত্রী জীবনের পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করবেন।[৩] এরমধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সুরটি স্পষ্ট। পুরুষের হাজার দোষ স্বীকার করে নেওয়া নারী জীবনের আদর্শ, সংসার সুখের উপায়। সেই সময় নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ধারণা মনের মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে নিয়েছিল যে প্রচলিত বিশ্বাস থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারেনি। বিদ্যাসাগর যিনি তাঁর সাহিত্য ও কর্মের মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তি আহ্বান জানিয়েছেন তিনিও কিন্তু

শকুন্তলা গ্রন্থে ভারতীয় নারীর গৃহ সংসারের আদর্শায়িত রূপটি অতিক্রম করতে পারেনি, মহর্ষি কন্ব শকুন্তলাকে উপদেশ দিচ্ছে – "স্বামী কার্কশ্য-
প্রদর্শন করিলেও রোষ-পরবশা ও প্রতিকুলচারিণী হইবে না ; মহিলাগণ এরূপ ব্যবহার করিলেই গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহারা বিপরীত ব্যবহার করে, তাহারা কুলের কন্টক স্বরূপ।"[৪]

যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যুক্তিবুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণে উনিশ শতকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল সেই তত্ত্ববোধিনী স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত বর্ননা করেছেন- "স্ত্রী ও পুরুষ-জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবত হৃদয়প্রধান এবং পুরুষ-প্রকৃতি স্বভাবত বুদ্ধিপ্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ, এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়প্রধান শিক্ষা নহে, অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।"[৫] জাতীয়তাবাদের ধারণা যত প্রবল হয়ে উঠেছে, নারীর উচ্চশিক্ষা, নারী প্রগতির ধারাটি তত সংকুচিত হয়ে গেছে, সনাতন হিন্দুধর্মের ধ্বজা ধারীরা বাঙালি নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ধারণাটিকে অস্ত্র বানিয়েছে। আমাদের নবজাগরনের মহান মানুষদের কাছে নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার মডেলটি ছিল আদর্শ সীতা-সাবিত্রীর মডেল।

উনিশ শতকে নারীদের জগৎ কেমন ছিল তা অনেক খানি ফুটে ওঠেছে সমসাময়িক সাহিত্যে। হিন্দু যৌথ পরিবার এবং গার্হস্থ্যের আদর্শমণ্ডিত বাংলা রচনায় মেয়েরা হয়ে ওঠেছে সংহতির প্রতীক। বিদেশিদের অনুকরণে গড়া প্রগতির জোয়ার থেকে সমাজকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র মেয়েরাই। প্রেমে বা মাতৃত্বে মেয়েদের আত্মত্যাগই তাদের একমাত্র মহিমা- এই জন্যই তাঁরা জাতীয় জীবনের প্রতীক। বঙ্কিম থেকে শুরু করে উনিশ শতকে প্রায় রচনাতে অন্তঃপুর ও গার্হস্থ্যের মধ্যে এই আদর্শায়িত সুসংহত রূপটি ফুটে ওঠে। আবার অন্য দিকে স্বদেশবাসীকে কী ভাবে দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায় এটি ছিল তৎকালীন সাহিত্যিকের কাছে বড়ো প্রশ্ন। তাঁদের প্রয়োজন হয়েছিল রোল মডেলের, স্ত্রী চরিত্রের জন্য নির্ধারিত রোল মডেল ছিল সীতা, সাবিত্রী, রানি পদ্মিনী, রানি অহল্যাবাঈ, শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ। সতীত্ব ও পতিব্রতা নারীর ধর্ম, নারীর আদর্শ। সতীপ্রথা বেআইনি ঘোষিত হলেও লেখকরা বেছে নিয়েছেন সতীপ্রথার আখ্যান। বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনসম্মত হলেও তাঁরা বিধবাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনকে সাহিত্য কীর্তিগুলির মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। লেখকদের কাছে জহরব্রত এক কাঙ্ক্ষিত ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়ায়। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপখ্যান কাব্যে স্বদেশপ্রীতিকে জাগ্রত করেছে নারীর আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে যবনের হাত থেকে রক্ষা পেত রানি পদ্মিনী জহরব্রত গ্রহণ করে সতীত্বরক্ষার ঘটনাটিকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। পদ্মিনীর উক্তি-

"সতীত্ব সকল ধর্মসার,
যার পর নাহি আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার।।
এতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে।

যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে।।"[৬]

১৮৭৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'সরোজিনী' নাটকে দেখতে পায় ধর্মরক্ষার ও কর্তব্য বোধের ভূমিকায় রাজকুমারী সরোজিনী এবং অন্যান্য পুরনারীরা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিচ্ছে সতীত্বরক্ষার্থে। উনিশ শতকের শেষ দুটি দশকে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরনের হাত ধরে বাঙালির জাতীয়জীবনে মুখ্য হয়ে ওঠে আরও দুটি সতী উপখ্যান- রামায়নের জনকনন্দিনী সীতার সতীত্বের কথা এবং মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের উপখ্যান। সেই সময় অনেক লেখার মধ্যেই বাঙালি নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রতের ধারণাটিকে ক্রমশ ছড়িয়ে দিতে থাকেন। যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহ লেখেন- 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক, হরিনাথ মজুমদার লেখেন- 'সাবিত্রী নাটিকা', রাজকৃষ্ণ রায় লেখন- 'পতিব্রতা' নাট্যগীতি। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন আর একখানি 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক। প্রতিটি লেখার উদ্দেশ্য ছিল পতিব্রতার শ্রেষ্ঠত্বকে দেখানো। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর সনাতনী গ্রন্থের ভূমিকায় স্বরূপ 'পূর্ব্ব পীঠিকায়' লিখেছেন- নারীর সতীত্ব শক্তি বা পতিব্রতা সনাতনী। ঐ টি অব্যাহত রাখিয়া নারীজাতির উন্নতি করিতে হইবে। অপরদিকে আদর্শ নারী হিসেবে, সীতার স্নেহাশীল বধূত্ব, মাতৃত্ব ও সর্বংসহা পাতিব্রতগুণের অধিকারী সীতা কাহিনী বাঙালির কাছে জনপ্রিয় ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন- 'সীতার বনবাস', 'সীতার বিবাহ', 'সীতাহরণ' নাটক। উনিশ শতকের পরিমণ্ডলে নারীর এই সতীত্বের চর্চা নারী উন্নয়নের একমাত্র পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

উনিশ শতকের সমাজ ছিল গভীরভাবে পিতৃতান্ত্রিক যেখানে নারীর স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুব সীমিত ছিল। নারীকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করা হলেও, তাঁদের মূল ভূমিকা ছিল সংসারের দেখাশোনা করা এবং পুরুষের সহায়ক হিসেবে কাজ করা। নারী স্বাধীনতা বা মুক্তি তখনও এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নারী আন্দোলনের মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সংস্কারের প্রভাব থেকে নারীরা সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পায়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর স্বাধীনতা এবং ভূমিকা নিয়ে যেভাবে চিন্তা করেছে, তা এই আন্দোলনের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। নারীরা শুধুমাত্র সামাজিক সংস্কারের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তাদের স্বকীয়তা এবং পূর্ণ স্বাধীনতা তখনো অধরা ছিল।

তথ্যসূত্র:

১. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব', অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪১৯

২. 'আদর্শ সতী স্ত্রী', 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১২৮০, শ্রাবণ, পৃ: ১১৭

৩. 'নারীজীবনের উদ্দেশ্য', 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১২৯০, মাঘ, পৃ: ৩১৯-৩২০

৪. 'শকুন্তলা', ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, সম্পাদিত। ম্যাকমিলিয়ান অ্যান্ড কো. লিমিটেড. ২৯৪ বড়োবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ১৯১৬

৫. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১৮৪০-১৯০৫, দ্বিতীয় খণ্ড, বীক্ষণগ্রন্থন ভবন, আগস্ট, পৃ.৪৬২-৬৫

৬. রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪১১, পৃ. ১০৮-১০৯

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গোলাম মুরশিদ, 'নারী প্রগতি আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা,২০০১.
২. গোলাম মুরশিদ, 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর' বাংলা একাডেমি, ঢাকা, অগ্রহায়ণ, ১৪০৭.
৩. ভারতী রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), নারী ও পরিবার-বামাবোধিনী পত্রিকা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০২.
৪. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি

সঞ্জয় বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সারসংক্ষেপ: যে কোন রাষ্ট্রে সংবিধানের একটা দার্শনিক ভিত্তি থাকে। ভারতের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। সাধারণত যে আদর্শ ও লক্ষ্যের দ্বারা সংবিধান প্রণেতারা প্রভাবিত হন সেই লক্ষ্য ও আদর্শই হলো সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি। ভারতীয় সংবিধান হলো রাষ্ট্রের মৌলিক আইন। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে এবং একটা সুন্দর এবং সাম্যের করার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান তৈরীর মাধ্যমে এই সদিচ্ছা অনুশীলনের চেষ্টা করা হয়েছিল, যে সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা মূলতঃ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিগুলির মাধ্যমে সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি রচিত করেছিলেন। এছাড়া ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির প্রতিফলন দেখা যায়। তাছাড়া সংবিধানের কার্যকরী অংশে এবং বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির প্রকাশ ঘটেছে। মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য, নির্দেশকমূলক নীতি প্রভৃতির মাধ্যমে সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির রচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে অন্যান্য কয়েকটি দেশের ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনা এবং ভারতের সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরা হবে এবং এর তাৎপর্য কতটা সুদূরপ্রসারী এবং সম্প্রীতি এর বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করা হবে।
সূচক শব্দ: রাষ্ট্র, সংবিধান, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ, মৌলিক কর্তব্য, মৌলিক অধিকার।

মূল আলোচনা:

ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক দিক আমাদের কাছে সুবিদিত। ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি মূলত তিনটি প্রধান নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বোঝানো হয় যাতে এটি জনগণের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রের উন্নয়নের লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ। ভারত একটি বহুজাতি ও বহুধর্মের দেশ। ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে যে রাষ্ট্র সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল এবং কোনো ধর্মকে অগ্রাধিকার দেয় না। ভারত রাষ্ট্র পরমতসহিষ্ণুতার উপর জোর দেয়। ভারতীয় সংবিধান গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণায় বিশ্বাসী। এখানে ভোটাধিকারের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় এর প্রতিফলন দেখতে পাই। ভারতীয় সংবিধানের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই তিনটি আদর্শ সংবিধানের মূল ভিত্তি এবং আমাদের চিন্তা ও চেতনার ও যে মূল ভিত্তি তা এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের নেহেরুর উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধানের দার্শনিক দিকগুলির খোঁজ পাওয়া

যায়। উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব শুধু নিছক একটা প্রস্তাব ছিল না, এটা ছিল স্বীকারোক্তি, প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সংকল্প, অঙ্গিকার যেটা সকলে মিলে ত্যাগ স্বীকার করার। ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ব্যক্ত হয়েছিল। যেকোনো রাষ্ট্রের সংবিধান তৈরির জন্য প্রথমে একটা সূচনা থাকে যার মাধ্যমে সংবিধানের দার্শনিক দিকগুলি তুলে ধরা হয়। ভারতীয় সংবিধান নেহেরুর উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধানের মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল। এটা সংবিধান প্রনেতাদের অনুপ্রেরণা ও নৈতিক দায়িত্বকে উন্মোচিত করেছিলো। এই প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনা এবং ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু সংবিধানের প্রস্তাবনায় এর প্রায় সব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির তাৎপর্য কতটা সুদূরপ্রসারী এবং সম্প্রীতি এর বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করা হবে।

অন্যান্য কয়েকটি দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (গৃহীত ১৭৮৭)

আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও ভালো ও সুন্দর ইউনিয়ন তৈরি করতে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, দেশে শান্তি নিশ্চিত করতে, সাধারণ সুরক্ষা দিতে, সাধারণ কল্যাণ বর্ধিত করতে এবং স্বাধীনতার আশীর্বাদ আমাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রতিষ্ঠা করছি[১] ("The Constitution of the United States: A Transcription")

ফ্রান্স (১৯৫৮)

ফরাসি জনসাধারণ ১৭৮৯ ঘোষণা দ্বারা সংজ্ঞায়িত জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতি ও মানুষের অধিকার, ১৯৪৬ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় যা সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং ২০০৪ সালের পরিবেশ সনদে যে অধিকার ও কর্তব্য সংজ্ঞায়িত হয়েছে, তার সঙ্গে নিজেদের সংযোগ ঘোষণা করছে। এই নীতি সমূহের দ্বারা এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের বলে বলীয়ান হয়ে এই প্রজাতন্ত্র ভিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যারা স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের সাধারণ আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত নয়া প্রতিষ্ঠানকে মেনে চলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং গণতান্ত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য ধারণ করে চলেছে, তাদের দিকে হাত বাড়াতে চায়।

অনুচ্ছেদ ১

ফ্রান্স অবিভক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক গণতন্ত্র হবে।আইন যাতে উৎপত্তি, জাতি ও ধর্মগত বিভাজন না করে সকলকে সমান চোখে দেখে তা নিশ্চিত করা হবে। সমস্ত বিশ্বাস কে মর্যাদা দেওয়া হবে। বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে একে গঠন করা হবে। সমস্ত নির্বাচনী দফতর ও পদে, সমস্ত পেশাদার ও সামাজিক দায়িত্বে নারী ও পুরুষ যাতে সমানাধিকার পান তা দেখা হবে[২]। (constituteproject.org)

রাষ্ট্রসংঘের সনদ (১৯৪৫)

আমরা রাষ্ট্রসংঘের জনগণ স্থির প্রতিজ্ঞ,আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করব যা দু দুবার আমাদের জীবৎ কালে মানবজাতির পক্ষে অবর্ণনীয় দুঃখের কারণ হয়েছে, এবং মৌলিক মানবাধিকারে, মানুষের মূল্য মর্যাদায়, নারী পুরুষের সমানাধিকারে এবং সমস্ত ছোট বড় দেশের প্রতি আমাদের বিশ্বাস পুনরুচ্চারণ করতে, এবং তেমন পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে যার আওতায় ন্যায়বিচার ও সমস্ত চুক্তির দায়বদ্ধতার প্রতি সম্মান ও আন্তর্জাতিক আইন

যাতে রক্ষা করা হয়, এবং সামাজিক প্রগতি, উচ্চতর জীবনচর্যা ও বৃহত্তর স্বাধীনতা কে বর্ধিত করতে,এবং আমাদের অন্তিম লক্ষ্যসহিষ্ণুতা পালন করা এবং সুপ্রতিবেশী হিসেবে একে অন্যের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করা, এবং.

— আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় আমাদের আমাদের শক্তি একত্রিত করা এবং

— নীতি ও পদ্ধতি মেনে যাতে সশস্ত্র শক্তি ব্যবহৃত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা, সাধারণ স্বার্থের জন্য রক্ষা করা এবং

— সমস্ত মানুষের আর্থিক ও সামাজিক প্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো কাজে লাগানো আমাদের যৌথ প্রচেষ্টার লক্ষ্য হিসেবে আমরা এগুলি নির্ধারণ করেছি।আমাদের সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি, তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সানফ্রান্সিসকো শহরে মিলিত হয়েছেন, যাঁরা সম্পূর্ণ ক্ষমতা যথা যোগ্যতায়, ভালো ভাবে প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা সকলে মিলে রাষ্ট্র সংঘের বর্তমান সনদে সম্মত হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন[৩](United Nations)।

সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি সমূহ

সাম্য, মৈত্রী. ও স্বাধীনতা

সংবিধানের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই তিনটি আদর্শ আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তি। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। এদের আলাদা করা যায় না। ড. বি.আর.আম্বেদকর ভারতের সংবিধান গ্রহণ করার একদিন পূর্বে এই তিনটি আদর্শের মধ্যে যে কত গূঢ় সম্পর্ক আছে তা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন “স্বাধীনতা কে সাম্য থেকে আলাদা করা যায় না, তেমনি সাম্যকে স্বাধীনতা থেকে, আবার সাম্য ও স্বাধীনতাকে মৈত্রী থেকে আলাদা করা যায় না ।যদি সাম্য না থাকে তবে স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় মানুষের হাত শক্ত করবে এবং আধিপত্য বিস্তার করবে সবল ও সম্পদশালীরা। আবার স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তিগত উদ্দ্যেগ ব্যাহত হবে, মানুষ কাজ করতে উ5সাহ হারাবে[৪]।

ধর্মনিরপেক্ষতা:

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি তা5পর্যপূর্ণ। ভারত কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্রের কোনো নিজস্ব ধর্ম নেই। এখানে রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। রাষ্ট্রের চোখে সব ধর্ম সমান মর্যাদা ও সম্মান দাবি করে। সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের সংযোজন একটা উল্লেখযোগ্য দিক।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একাত্মতা যে আমাদের আদর্শ সংবিধান প্রণেতারা বিস্রুত হননি। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, জাতি প্রভৃতি সম্বলিত রাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সংবিধান তৈরির ক্ষেত্রে। দেশভাগের দগদগে ক্ষত থেকে শিক্ষা নিয়ে সংবিধান তৈরির কাজটি খুব চ্যালেন্জিং ছিলো[৫]।

পন্ডিত জহরলাল নেহরু ১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ভারতের সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবে সংবিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য ও নীতি ব্যখ্যা করেছিলেন। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সূপ্রীমকোর্ট ও তার অভিমতে বলেছেন যে, ভারতের কিছু সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা ও বঞ্চনা আমাদের নতুন করে ভাবতেই হচ্ছে সংবিধানের আদর্শ ও নীতি কীভাবে রক্ষা করা যায়। সবাই আমরা একই মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ও ভারতের সার্বিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং সংবিধানের চতুর্থ অংশের নীতি

নির্দেশকমূলক রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে নির্দেশিত করে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি বিষয়ে নীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা ওই নীতি নির্দেশক অংশে উল্লেখ আছে। আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের থেকে গৃহীত এটা রাষ্ট্রের শাসকদের উদ্দেশ্যে একটা উপদেশ। সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন আদর্শ ও নীতি বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিন্তূ সেটা যথাযথ হয়নি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা আছে আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গনতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র গঠন করতে চাই। একই সঙ্গে এর নাগরিকদের "সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, বিশ্বাস, মতপ্রকাশের, আস্থা, উপাসনার স্বাধীনতা। মর্যাদা ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বোধ জাগানো দরকার।

গণতন্ত্র:

ভারতীয় সংবিধান জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, এবং জনগণের সরকার। গণতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ব্যক্তির পছন্দকে মর্যাদা দেওয়া হয়। ব্যক্তির স্বাধীনতার ভিত্তিতে পক্ষপাতহীন ভাবে এবং নির্ভয়ে জনগণকে শাসক নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়। এখানে সাম্যবাদী সমাজকে বিকশিত করার দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ভারতীয় সংবিধানটি আইনের দার্শনিক নিয়মকে তিনটি উল্লেখযোগ্য সম্পত্তিতে বিভক্ত করে একে অপর কে নিজস্ব উপায়ে সমান্তরাল সার্বভৌমত্ব এবং অহংকারবাদী আধিপত্য প্রয়োগের পরীক্ষা করে দেখাকে বাস্তবের দার্শনিক নিয়মের অনুবাদ করার জন্য একটি ম্যারাথন প্রচেষ্টা। নিখুঁত ঘনত্ব এড়ানোর জন্য শক্তির দুর্দান্ত বিভাজন ছাড়াও, ভারতের সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুটি প্রধান স্তরের – তৃতীয় স্তরের স্থানীয় সরকার গুলির সুষ্ঠু সুযোগের সাথে দুটি প্রধান স্তরের সরকারগুলির মধ্যে পৃথক ক্ষমতার আলাদা বিতরণ করার কথা বলা হয়েছে। যাইহোক, এই সিস্টেমের অপারেশনটি পুরুষদের এবং তাদের কৌশলগুলির সাথে বিপরীতভাবে আসে যার ফলে বিভিন্ন মতামত এবং উদাসীন বিকল্পের দিকে পরিচালিত হয়।ফলস্বরূপ অবক্ষয় যাইহোক না কেন, আইনের শাসন ব্যবস্থা সংবিধানিক নিয়মের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় যা বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সমাজে পরীক্ষিত ও বিশ্বাসযোগ্য সর্বোত্তম পরিচালন ব্যবস্থার কোডিং করে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংবিধানের উদ্দেশ্যটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। তার বিবৃতিটি ছিল "এইসংবিধানের (গণপরিষদ) প্রথম কাজটি হল একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে ভারতকে মুক্তি দেওয়া, অনাহারী মানুষকে খাওয়ানো এবং নগ্নকে পোশাক পরিধান করানো এবং প্রতিটি ভারতীয়কে তার সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেকে বিকশিত করার পূর্ণ সুযোগ দিতে"। এই প্রস্তাব প্রতিবিম্বিত হয়েছিল 22শে জানুয়ারী 1947 সালে। এই রেজুলেশনে পাস হয়েছিল এবং সংবিধানকে গতিশীল নথিতে রূপান্তরিত করে। এই রেজোলিউশনটি প্রস্তাবনার অভ্যন্তরীণ থিম, যা পড়া, উল্লেখ করা এবং মনে রাখা উচিত[৬]।

দার্শনিক ভিত্তির তাৎপর্য

সংবিধানের প্রস্তাবনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলে এই রকম হয়-আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার

;চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা; প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত ভাবে লাভ করেন; এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাসক ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয় তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় অদ্য, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।

আমরা, ভারতের জনগণ" বলতে ভারতের মানুষের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব বোঝায়। এখানে ভারতকে "প্রজাতন্ত্র" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা থেকে বোঝায় সরকার হবে জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য। এখানে উদ্দেশ্য হিসেবে "সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক কল্যানের" কথা বলা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে নেহরু বলেছিলেন, "গণতন্ত্রের কথা মুখ্যত আগে যা বলা হয়েছে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রে মুখ্যত সব মানুষের ভোটাধিকার রয়েছে।কিন্তু যেমানুষ একেবারে নিচে রয়েছে, বাইরে রয়েছে, ধরুন যে মানুষটা উপোসী, ক্ষুধার্ত, তার একটা ভোট তার প্রতিনিধিত্ব করেনা। রাজনৈতিক গণতন্ত্র যথেষ্ট নয়, যদি না এর মাধ্যমে কেবল অর্থনৈতিক গণতন্ত্র,সমতার ক্রমবর্ধমান তার পরিমাপ করা যেতে পারে, এবং যদি না জীবনের সুন্দর জিনিসগুলি অন্যদের কাছে ছড়িয়ে না দেওয়া যেতে পারে এবং মোটাদাগের অসাম্যগুলি দূর করা যেতে পারে।"

ভিখু পারেকের মতে, নেহেরু ভারতীয়দের জন্য একটা জাতীয় দর্শনের বা জাতীয় মতাদর্শের কথা বলেছিলেন। প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের একটা জাতীয় দর্শন বা জাতীয় মতাদর্শের দরকার যা ভারত রাষ্ট্রকে বেধে রাখতে পারে। ভারত এমন একটা রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের জনগণ ধর্ম, জাতি, ভাষা প্রকৃতির ভিত্তিতে বিভক্ত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক অনুন্নত। ভারত রাষ্ট্র আবার সামাজিক দিক থেকে স্থবির এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অনভিজ্ঞ। তাই ভারতের জন্য একটা জাতীয় দর্শন দরকার যেটা ভারতীয়দের একটা বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। নেহেরু জাতীয় দর্শন এর জন্য সাতটি জাতীয় উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন। এগুলি হল জাতীয় সংহতি, সংসদীয় গণতন্ত্র, শিল্পায়ন, সমাজতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং জোট নিরপেক্ষতা। এই আদর্শ গুলো মেনে চললে ভারত রাষ্ট্র তার সঠিক পথে চালিত হবে এবং আধুনিকতার পথে অগ্রসর হবে[৭]
(Bhikhu Parekh)।
"স্বাধীনতা", "সমতা" ও "সৌভ্রাতৃত্ব" আদর্শ ধরা হয়েছে। ড: বি.আর.আম্বেদকরগণ গণপরিষদে তাঁর অন্তিম ভাষণে বলেছিলেন, "রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সামাজিক গণতন্ত্র না থাকলে তা টিকে থাকতে পারে না। শুধূ এক ব্যক্তি একটি ভোট এর দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সামাজিক বিভেদ ও স্তরায়ন টিকে রেখে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র আসতে পারে না। (আম্বেদকররচনাবলী) গণতন্ত্র মানে কী? তার মানে এমন একটা জীবন যেখানে স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে এই তিনটি পৃথক নয়। এই তিনে মিলে একটি সংযুক্তি তৈরি হয় যার একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই গণতন্ত্র তার উদ্দেশ্য হারাবে। স্বাধীনতা কে সমতার থেকে আলাদা করা যায় না, সমতাকে পৃথক করা যায় না স্বাধীনতার থেকে।আবার সৌভ্রাতৃত্বের থেকে স্বাধীনতা ও সমতাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না[৮]"।

গৌতম ভাটিয়ার মতে, ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বর্তমান আছে এবং আগেই এটা ছিল। ঐতিহাসিক ভাবে কিছু জনসমাজকে তাদের জাতিগতভাবে আলাদাভাবে ভাবা

হতো এবং শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে তাদের জন্য সংবিধানের সংরক্ষণের ব্যবস্থা। সমতার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেখানে সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা অনগ্রসর তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা এবং চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৭] (Bhatia, 232)। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে'র জায়গায় 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' গৃহীত হয়েছে। সে সময়ে 'দেশের ঐক্য'-কে বদলে 'দেশের ঐক্য ও সংহতি' করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন সংবিধান হলো শুধু কিছু আইনের লিপিবদ্ধকরন, সেখানে নৈতিকতা ও মূল্যমান অনুপস্থিত। তাই সংবিধান মানে আইনমূলক আলোচনা, কোনো রাজনৈতিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর আলোচনা করা নিষ্ফল। এটা সত্য যে সব আইন-কানুন নৈতিক মূল্য নেই। কিন্তু অনেক আইনের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধ জড়িয়ে আছে। যেমন ভাষা, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যাতে ভেদাভেদ করা না হয় তার জন্য আইনগতভাবে বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু এটা সমতার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কেননা আমরা সাম্যকে মূল্যদান করি বলে এই বিধিনিষেধ এর উদ্ভব। তাই আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক আছে।

এখন আমরা ভারতের সংবিধানের রাজনৈতিক দর্শন ও নৈতিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করবো। দার্শনিক দৃষ্টিতে সংবিধানের বিচার বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসলে এই দার্শনিক দিকগুলি কী কী। তিনটি বিষয় এর আলোচনায় আনা যেতে পারে।

প্রথমত, সংবিধানের ধারণাগত কাঠামো জানা আবশ্যক। এর মানে কী? এর মানে হলো আমাদের জানতে হবে সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় সমূহ যেমন নাগরিকত্ব, অধিকার, সংখ্যালঘূ বা গনতন্ত্র এদের সম্ভাব্য মানে কী?

দ্বিতীয়তঃ সংবিধানের মূল ধারণাগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় আমাদের সুসংহত সমাজ ও শালীনতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। সংবিধানে বর্নিত আদর্শের সাথে আমাদের ভালো রকম উপলব্ধি থাকতে হবে। ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ আদর্শ ও নীতি যা উচ্চতর তাত্বিক বিষয় সেগুলো।

তৃতীয়ত: সংবিধানের মূল তদুপরি সংবিধানের মূল ধারণা গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সময় আমাদের অবশ্যই সুসংহত সমাজ ও শালীনতার বিষয়টি একটি সুসংগত আলোচনায় আনার চেষ্টা করতে হবে। সংবিধানে বর্নিত আদর্শের সাথে আমাদের আরও ভাল উপলব্ধি থাকতে হবে। আমাদের চূড়ান্ত বিষয়টি হল ভারতীয় সংবিধান গনপরিষদে আলোচিত বিতর্কের দিকগুলো অবশ্যই পড়তে হবে তা না হলে সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকা আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে বিষয়গুলো কে পরিমার্জিত ও উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। এর জন্য গণপরিষদে যে বিতর্ক হয়েছিল তার সাথে সম্মিলিতভাবে সংবিধান পড়তে হবে। যদি এর বিশদ যুক্তি সঙ্গতা সরবরাহ না করা হয় তবে এর দার্শনিক মূল্য অসম্পূর্ণ। সংবিধানের প্রণেতাগণ যখন বোঝায় তখন এর অর্থ কী যে সমস্ত সংবিধানে দর্শন রয়েছে? বা এটিই যে কেবলমাত্র সংবিধানেরই ভারতের সংবিধানের কাঠামোয় ভারতীয় সমাজ ও নীতিকে একটি মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত করার পথ বেছে নিয়েছিল, অবশ্যই এর সাথে সম্পর্কিত কারণ থাকতে হবে। তাদের মধ্যে অনেককেই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। সংবিধানের রাজনৈতিক দর্শনপন্থা এটিতে প্রকাশিত নৈতিক বিষয় বস্তুগুলি অনুসন্ধান করার জন্য এবং এর দাবির মূল্যায়ন করার জন্যই নয় তবে এটি সম্ভবত আমাদের রাজনীতিতে বহু মূল মূল্যবোধের বিবিধ ব্যাখ্যার মধ্যে সালিশ

করতে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এটা সুস্পষ্ট যে এর অনেক আদর্শই বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গনে, আইনসভায়, দলীয় ফোরামে, সংবাদ মাধ্যমে, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চ্যালেঞ্জ, আলোচিত, বিতর্কিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। এই আদর্শগুলি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং কখনও কখনও স্বচ্ছলভাবে স্বল্পমেয়াদী স্বার্থ অনুসারে কৌশলগত হয়। তাই আমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে সাংবিধানিক আদর্শ এবং অন্যান্য অঙ্গনে এর প্রকাশের মধ্যে মারাত্মক বিভেদ রয়েছে কিনা। কিছু সময় একই আদর্শকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে।আমাদের এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাগুলির তুলনা করতে হবে।

সংবিধানের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি

সংবিধান আমাদের জীবনকে পরিচালনা করার দলিল বিশেষ। ভারত স্বাধীনতার সাত দশকের বেশি পার করেছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান এবং তথাকথিত সর্ববৃহৎ গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষ্যতি অর্জন করেছে। সংবিধান প্রণেতারা যে মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য মাথায় রেখে এই মহান দলিল লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি। সংবিধান নানা ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। রা্ষ্ট্রের সম্পদের সুসম বন্টন তো হয়নি বরং অর্থনৈতিক অসামন্য বৈষম্য ক্রমবর্ধমান, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ লাগামহীন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধুলায় লুণ্ঠিত। স্বাধীনতার পর থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, ভারতের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তা করা সম্ভব নয়। কারন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না থাকার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা দিবাস্বপ্ন হয়েই রয়ে গেছে। জমিদারি প্রথা, রাজন্য ভাতা বিলুপ্ত হয়েছে, ভূমি সংস্কার, ব্যাঙ্ক জাতীয়করনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাগজে কলমে জমিদারি বন্দোবস্ত না থাকলেও প্রাক্তন জমিদাররা স্বনামে-বেনামে নানা কায়দায় বিপুল জমি নিজেদের হেপাজতে রাখতে সমর্থ হয়েছে অর্থাৎ সেই জমিদারি বন্দোবস্ত টিকে আছে। তাছাড়া জমিদারদের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল, তার দ্বারা প্রাক্তন জমিদারেরা নতুন উপায়ে গ্রামীন জনজাতিকে শোষন করতে শুরু করেছে। এইভাবে বুর্জোয়া-জমিদার শাসনে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষক আজ শোচনীয় অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৈষয়িক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচি ও নীতি নেওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। বরং নানা রকম নির্যাতনের ও লাঞ্ছনার স্বীকার হচ্ছে। সুদীপ্ত কবিরাজের মতে, হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠন ভারতের সংবিধানের ধর্ম-নিরপেক্ষ আদর্শকে উপেক্ষা করে। তারা কংগ্রেসের নীতিকে সংখ্যালঘু তোষণ নীতি বলছে। তাদের অভিযোগ হলো, হিন্দু আইন সংস্কার হচ্ছে কিন্তু মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের আইনের গুলো সংস্কার হচ্ছে না। তার ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিচ্ছে মসজিদ মন্দির নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকছে। এবং ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে[১০] (Kaviraj,96)। রাষ্ট্র শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলন করার অধিকার হারিয়ে বসেছে। মুনাফালোভি করপোরেটরা আজ শাসক দলের চালিকাশক্তি। শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা, নূনতম বেতনের ব্যবস্হা করতে শাসকদল অপরাগ। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও উন্মাদনা আজ রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। নারী ও শিশুদের দূর্দশা আজ সীমাহীন। স্বাধীনতার

দীর্ঘ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সব রাজ্যে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থ্যা প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। বেকারত্ব, দারিদ্র্যতা আজ লাগাম ছাড়া, সম কাজের জন্য সমান বেতন দিবাস্বপ্ন। গ্রামীন স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা আজ দূর্নীতি ও দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিনত। পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মহিলাদের পরিবর্তে তার স্বামীরাই পঙ্গায়েত পরিচালনা করেন।

উপসংহার: ভারতের সংবিধানে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে যে সমস্ত লক্ষ্য ও আদর্শের কথা বলা হয়েছে সেগুলো একান্ত ভাবে ভারতীয় নয়। এগুলি পাশ্চাত্য উদারনৈতিক গনতন্ত্র ও সনাতন ভারতীয় দর্শনের সংমিশ্রণ। যে গণতন্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের কথা আমরা সংবিধানে বলি সেগুলো থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছে। ভারত তার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি রক্ষা করতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। যে রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যান্য জনগণকে বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের একাত্মতা করেছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশী যারা শরণাপন্ন হয়েছে তাদের আপন করেছে, সেই ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতি দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায় পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তফশীলি-জাতি ও উপ-জাতিদের উপর বিভিন্ন ধরনের আক্রমন ও তাদের মানবাধিকার হরন করা হচ্ছে। সংবিধানের চালু হওয়ার অনেক বছর পরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হলেও গ্রাম অঞ্চলের মানুষ সমাজের প্রভাবশালীদের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। ন্যায় বিচার পাওয়া দিবাস্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে। মহিলাদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিদিন খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উদারনৈতিক, রাজনৈতিক আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যই দরকার যেখানে সবাই সমান সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। ভারত রাষ্ট্র তার পরমতসহিষ্ণুতার পথ পরিহার করলে সেটা ধ্বংসের দিকে চলে যাবে। তার জন্য সংবিধানের সংরক্ষণের দিকে নজর দিতে হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ যাতে দূর হয় তার জন্য রাষ্ট্রের উচিত সকলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। সংবিধানে বর্ণিত অধিকারগুলো যাতে সঠিকভাবে পেতে পারে তা রাষ্ট্রকে দেখতে হবে। এবং তার আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে আরো বেশি মজবুত করতে হবে।

গ্রন্থনির্দেশ:

(১) "The Constitution of the United States: A Transcription." National Archives, 30 Sept.2024, www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript.

(২) constituteproject. org. France's Constitution of 1958. 2008, https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=en (Accessed on 28/10/2020)

(৩) United Nations. "About Us | United Nations."UnitedNations, www.un.org/en/about-un. Accessed on 28/10/2020

(৪) Mukhopadhyay, Amal Kumar (2017), A Journey Across The Indian Constitution, Sreedhar Publication, P-34

(৫) http://hdl.handle.net/10603/105731 (Accessed on 21/10/2020)

(৬) Basu, D.D. Introduction to the Constitution of India, 18th Edition, p 24

(৭) Parekh, Bhikhu. "Nehru and the National Philosophy of India." *Economic and Political Weekly*, vol. 26, no. 1/2, 1991, pp. 35–48. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/4397189. Accessed 7 Nov. 2024.

(৮) Constituent Assembly Debates, 22nd Jan, 1947, Vol. II p 316

(৯) Bhatia, Gautam. "Equality under the Indian Constitution." *Imagining Unequals, Imagining Equals: Concepts of Equality in History and Law*, edited by Ulrike Davy and Antje Flüchter, 1st ed., transcript Verlag, 2022, pp. 231–54. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/jj.11425486.11. Accessed 7 Nov. 2024

(১০) Kaviraj, Sudipta. "Languages of Secularity." *Economic and Political Weekly*, vol. 48, no. 50, 2013, pp. 93–102. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/24479050. Accessed 7 Nov. 2024.

সাম্প্রতিক বিশ্বব্যবস্থায় আদর্শ 'বডি ইমেজ' এর প্রতিফলন : একটি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ

সায়ন দত্ত
অতিথি অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সহেলী মণ্ডল
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সাম্প্রতিক দশকে নারীদের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটলেও, সামাজিক রীতিতে এখনও নারীদের দৈহিক প্রকাশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গনমাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত সৌন্দর্যের মাপকাঠি নারীদের বিশেষত, যুবতীদের ওপর এবং 'বডি ইমেজ' সম্পর্কিত তাদের উপলব্ধির ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। নারীদের 'বডি ইমেজ' সম্পর্কিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হল বর্তমান উপভোক্তাকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন। বিশ্বজনীন বাজারব্যবস্থায় এবং বিনোদন শিল্পের জগতে একজন ব্যাক্তি কিভাবে নিজের দৈহিক গড়নকে উপস্থাপন করবে অথবা নারীসুলভ 'বডি ইমেজ'ই বা কি হওয়া উচিত,এই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। প্রত্যহ হাজার হাজার গণমাধ্যম নারীদের 'বডি ইমেজ' এর প্রতিকৃতিকে গণদর্শকের সামনে উপস্থাপন করে তাদের মধ্যে আদর্শ 'বডি ইমেজ' এর এক মায়াজ্বাল তৈরি করছে। এক্ষেত্রে যুবতীরাই সবথেকে বেশি গণমাধ্যমের দ্বারা তৈরিকৃত সেই 'বডি ইমেজ' প্রতিকৃতির শিকার হচ্ছে। এই আদর্শ 'বডি ইমেজ' এর জটিল নীতির পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাপকাঠিগুলি এমনভাবে 'আভ্যন্তরীণকরণ' হচ্ছে বা আমাদের মননজগতে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করছে যা শুধুমাত্র নারীর দৈহিক উপস্থাপনকেই নয় এমনকি নারীর উপস্থাপন সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাক্তিবর্গের ভাবধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে গবেষকদ্বয় বাস্তবতার কতগুলো দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেঃ প্রথমত, কিভাবে গণমাধ্যমগুলি আদর্শ 'বডি ইমেজ' এর একটা মায়াজ্বাল গড়ে তুলে নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে? দ্বিতীয়ত, নারীরাও কিভাবে এই আদর্শ 'বডি ইমেজ' এর জটিল নীতিতে প্রবেশ করছে এবং সাড়া দিচ্ছে? তৃতীয়ত, সমাজের প্রতিক্রিয়াই বা এক্ষেত্রে কি?
মূল শব্দ: বডি ইমেজ, বিশ্বব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণকরণ, গণমাধ্যম, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ।

প্রেক্ষাপট:

বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলির প্রভাব এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যেন সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি অনুভূত হয়। নতুন নতুন প্রযুক্তির সর্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা ও সামাজিক মাধ্যমগুলির অহরহ ব্যবহারের ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। তবে প্রশ্ন একটাই যে, গণমাধ্যমগুলি কি ধারাবাহিকভাবে সমগ্র বিশ্বের কাছে একটা ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে? বিশেষত, যখনই বডি ইমেজের প্রসঙ্গ আসে তখনই বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। দূরদর্শন, ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞাপনগুলিতে নারীর সুঠাম শরীরকে আদর্শ শরীর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তবে, এই ধারণাটি বাস্তবতা থেকে অনেকটা

দূরে অবস্থান করে। প্রত্যেকটি সমাজ তার নিজস্ব ভাবধারা অনুযায়ী সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ওপর বডি ইমেজের কিছু প্রথাগত নির্দেশিকা চাপিয়ে দেয়। কেউ ছিপছিপে, এর অর্থ এই নয় যে সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। আবার, কিছু কিছু সমাজে ছিপছিপে দৈহিক গড়ন খুব গ্রহণীয় এমনকি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে তাকে মান্যতাও দেওয়া হয়। তবে, গণমাধ্যমগুলি যেভাবে ব্যক্তির প্রতিকৃতিকে তুলে ধরে তাতে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পাশাপাশি, গণমাধ্যম কর্তৃক প্রদর্শিত দৈহিক গড়নকে কেন্দ্র করে নারীদের মধ্যে একধরনের নিম্ন আত্মসম্মান ও অসন্তুষ্টি গড়ে ওঠে।[১]

গণমাধ্যম কর্তৃক প্রদর্শিত আড়ম্বরপূর্ণ সৌন্দর্যের মাপকাঠিগুলি নারীদের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে, বিশেষত যুবতীদের ওপর। নারীদের নেতিবাচক বডি ইমেজ খুবই সাম্প্রতিক বিষয়। বিশ্ববাজারে অথবা বিনোদনের জগতে একজন নারীকে কেমন দেখতে হওয়া প্রয়োজন, এ এক তার্কিক বিষয়। বহু-আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি মুনাফা লাভের তাগিদে যেকোনো দ্রব্যকে বিক্রি করার উদ্দ্যেশ্যে কিছু কৌশল অনুসরণ করে, সেক্ষেত্রে তারা সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে এক অনুভূতি গড়ে তোলে। উত্তর আধুনিক যুগে ব্যক্তিবর্গরা, বিশেষত নারীরা হাজার হাজার প্রতিচ্ছবির বশীভূত হয়ে পড়ে এবং গণমাধ্যমগুলি বিশ্বের সামনে নারীদের আদর্শ 'বডি ইমেজে'র প্রতিকৃতিকে তুলে ধরে।[২]

এই প্রবন্ধে কতকগুলি গৌণ তথ্যের ভিত্তিতে (সহায়ক গ্রন্থ, গবেষণা পত্র) কতকগুলি বিষয়গুলিকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে: ১) নিজেদের আদর্শ বডি ইমেজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীরা কতটা গণমাধ্যমগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়? ২) এই উপলব্ধির সাথে নারীরা কতটা নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়? এবং ৩) আদর্শ বডি ইমেজের উপলব্ধি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলি কতটা ভূমিকা গ্রহণ করে?

নারীদের বডি ইমেজ এবং সামাজিক নির্মাণ:

লিঙ্গের আদর্শ বডি ইমেজের উপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সবচেয়ে প্রচলিত এবং পরিব্যাপ্তিশীল পরিবাহক হল গণমাধ্যম, যা আদর্শ পুরুষত্ব এবং নারীত্ব সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে।[৩] একজন মহিলার বডি সংক্রান্ত উদ্বেগের উপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়, পাশাপাশি বডি ইমেজ সম্পর্কে উপলব্ধি গঠনে এর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। আদর্শ নারী কাঠামো সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করার ক্ষেত্রে মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই 'গণমাধ্যম'-ই এমন ধরণের ভাবমূর্তি তৈরি করে যা জনসাধারণের কাছে সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই এই বডি ইমেজগুলি সহজেই সমাজে কাম্য হয়ে ওঠে। সমসাময়িক সমাজে, বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি সাধারণত শারীরিক আকর্ষণের উপর জোর দেয়, যে কারনে ব্যক্তিরা, বিশেষত মহিলারা তাদের বডি ইমেজের ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়। এইভাবে মহিলাদের মধ্যে অনাকর্ষণীয় বা বৃদ্ধ হওয়ার একটা ভীতি গড়ে ওঠে।[৪]

বডি ইমেজের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে, যার মধ্যে ব্যক্তির ধারণা, উপলব্ধি এবং অন্যের শারীরিক চেহারার প্রতি ব্যক্তির মনোভাব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। বডি ইমেজ ধারণার একটি উপলব্ধিমূলক উপাদান রয়েছে, যা একজনের দেহের আকার, ওজন, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, কর্মক্ষমতা এবং চাক্ষুষ উপলব্ধিকে তুলে ধরে, পাশাপাশি এর একটি মূল্যায়নমূলক উপাদান রয়েছে, যা মানসিক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত এবং একজনের ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব ফেলে।[৫] বডি ইমেজ বলতে কারো সম্পর্কে ব্যক্তির উপলব্ধি এবং তার শারীরিক চেহারার মূল্যায়নকে বোঝায়।

সময়ান্তরে, গণমাধ্যমগুলি মহিলাদের নিখুঁত দেহ কী বা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটা ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে।[৬] বর্তমানে সামজিক মাধ্যমগুলি আদর্শ বডি ইমেজ এই ধারণার উপর জোর দিয়েছে। উচ্চতা, ওজন, দেহের পরিমাপ এবং দেহের আকৃতি প্রভৃতি বডি ইমেজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং এগুলি গণমাধ্যম দ্বারা নির্মিত হয়েছে। সাধারণত মহিলারাই এই আদর্শ বডি ইমেজ এবং বিজ্ঞাপনগুলির লক্ষ্যবস্তু হন। তাদের শেখানো হয় যে তাদের অত্যন্ত ছিপছিপে হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে অনেকেরই পক্ষে এই আদর্শ বডি ইমেজে পৌঁছানো সম্ভব নয়।[৭]

জেন্ডারিং বডি ইমেজের তত্ত্বগত কাঠামো:

বডি ইমেজ ধারণার ওপর গণমাধ্যমের প্রভাবকে নিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন যুক্তিগুলি এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিবরণের উন্মোচন করেছে। প্রথমত, Festinger এর 'সোশ্যাল কম্প্যারিশন থিওরি' অনুসারে, সভ্য সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি অন্যের সাথে তুলনা করে নিজেদের মূল্যায়ন করে। এই তুলনাগুলি ব্যক্তির পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। যারা এই তুলনায় অংশগ্রহণ করে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।[৮] এটা দেখা গেছে যে, যেকোনো ধরণেরই তুলনা পুরুষ এবং মহিলাদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এটি প্রকাশিত হয়েছে যে, যেসমস্ত পুরুষ ও মহিলারা সামাজিক তুল্যমুল্যে ক্ষেত্রগুলিতে জড়িয়ে পড়ে তারা সাধারণত 'স্লিমনেসে'র নিয়ম সম্পর্কে বেশি সচেতন থাকে এবং তাদের মধ্যে এই নিয়মগুলিকে আত্মস্থ করার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।[৯] দ্বিতীয়ত, 'অবজেক্টিফিকেশন থিওরি' অনুসারে, মেয়ে এবং মহিলাদের শরীর ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকে, যে কারণে অনেক সময় তাদের মধ্যে শরীরের প্রতি অসন্তোষ জন্মায়, আবার কখনও কখনও তারা খাওয়ার ব্যাধিতে ভুগতে থাকে। বর্তমানে নিজের শরীরকে বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে, যেকারণে মহিলারা নিজেদের শরীরকে বস্তু হিসেবে তুলে ধরার জন্য অস্ত্রোপচার করছে। শুধু তাইই নয় এমনকি তারা বিভিন্ন খাদ্য পরিপূরকগুলিকে গ্রহণ করছে। সমস্ত মহিলারা কোনও না কোনও ধরনের শারীরিক অবজেক্টিফিকেশনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তবে এটি তাদের বয়স, শ্রেণী, যৌনতা এবং জাতিস্বত্ত্বার উপর নির্ভর করে। যখন কোনও মহিলার শরীর অবজেক্টিফিকেশনের শিকার হয়, তখন তারা একটা নজরদারির দ্বারা পরিচালিত হয়। নিজের 'শরীর' কে বহিরাগত হিসাবে দেখার ক্ষেত্রে নিজস্ব পর্যবেক্ষণকে 'দেহ নজরদারি' বলা হয়। আমরা প্রায়শই 'বডি শেমিং' এর কথা বলে থাকি। প্রকৃতপক্ষে 'বডি শেমিং' হল একটা অনুভূতি। একজন মহিলা তার নিজের শরীর আদর্শ 'বডি ইমেজ' এর নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা অনুভব করতে পারে।[১০]

আত্মসম্মান, উদ্বেগ এবং দৈহিক অসন্তোষ:

একজন ব্যক্তির আত্মসম্মানকে তার মূল্যবোধের বিষয়গত মূল্যায়নের নিরিখে বিচার করা যেতে পারে। এটি কোনও ব্যক্তির ওজন, শারীরিক আকর্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে সেই ব্যক্তির উপলব্ধিকেও প্রভাবিত করতে পারে।[১১] নিজের আত্মসম্মানের প্রতি ব্যক্তির দৃঢ় বোধ গণমাধ্যমের বিরূপ প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারে। আবার নিম্ন আত্মসম্মান বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গণমাধ্যমে উপস্থাপিত প্রতিকৃতির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।[১২] একাধিক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে উচ্চ মাত্রার আত্মসম্মান বিশিষ্ট মহিলাদের তুলনায় নিম্ন আত্মসম্মান বিশিষ্ট মহিলাদের সঙ্গে মহিলাদের ওজনের প্রতি উদ্বেগের একটি সম্পর্ক রয়েছে। একাধিক গবেষণায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে একটি আদর্শ বডি ইমেজের ধারণাটি যেকোনো ব্যক্তির আত্মসম্মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।[১৩]

একজন ব্যক্তির আত্মসম্মান এবং তার দেহের প্রতি গড়ে ওঠা আনন্দের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত মহিলারা, তাদের দৈহিক প্রকাশ সম্পর্কিত বিষয়গত উপলব্ধি এবং আবেগের মাধ্যমে একটা আত্ম-উপলব্ধি গড়ে তোলে। সমসাময়িক সমাজে, একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলারা তাদের দৈহিক প্রকাশকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। অসংখ্য গবেষণায়, আত্মসম্মান এবং দৈহিক সন্তুষ্টির মধ্যে গড়ে ওঠা পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি উঠে এসেছে। এই গবেষণাগুলি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, যত আত্মসম্মানের মাত্রা কমতে থাকবে তত দৈহিক অসন্তুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। Bessenoff এর (২০০৬) অনুসন্ধান অনুসারে, দৈহিক অসন্তুষ্টি এবং আত্মসম্মানের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং, এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে গণমাধ্যমগুলি দৈহিক সন্তুষ্টি এবং আত্মসম্মান উভয়ের উপরই উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। সাধারণত মহিলাদের মধ্যে দৈহিক অসন্তোষের মাত্রা বেশি দেখতে পাওয়া যায়, যা অনেক সময় সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে এবং এগুলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্ধারকগুলির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে।[১৪] গণমাধ্যমগুলি শুধুমাত্র মহিলাদের মধ্যে দৈহিক অসন্তোষই সৃষ্টি করে না এমনকি, এটি মহিলাদেরকে একটা নির্দিষ্ট ধরনের গণমাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। এটা দেখা গেছে যে, দৈহিক অসন্তুষ্টি এবং আত্মসম্মান উভয়ই মূলত একজন ব্যক্তি নিজেকে গণমাধ্যমের প্রতিকৃতির সঙ্গে কিভাবে তুলনা করছে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৫]

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থেকে বিশ্ব সমরূপতায় নারী দেহের প্রতিকৃতি:

নারীদেহের প্রতিকৃতি কি সাদৃশ্যতায় বিশ্বাস করে? বেশ কয়েকজন গবেষক যুক্তি দিয়েছেন যে, বডি ইমেজ সম্পর্কিত লিঙ্গগত স্টেরিওটাইপগুলি এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে এবং সময়ান্তরে পরিবর্তিত হয়। অতএব, একটি আদর্শ ফেমিনাইন বডি ইমেজ সম্পর্কিত উপলব্ধি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরণের হয়।[১৬] এটা লক্ষ্য করা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট সভ্যতার অন্তর্গত প্রতিটি সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি এবং অনুশীলনের মাধ্যমে ন্যূনতম কিছু নিয়ম নীতি তৈরি করেছে। নারীদের বডি ইমেজ সংক্রান্ত সৌন্দর্যের মাপকাঠিগুলি জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নারীদের আকৃষ্ট করে। সৌন্দর্য এর প্রতিচ্ছবিকে নিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অভ্যাস গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী শতাব্দী পর্যন্ত চীনে, নারী সৌন্দর্যের একটি সূচক ছিল ক্ষুদ্র পা, যেকারনে অল্পবয়সী মেয়েদের পায়ের বৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজ করা হত। এই প্রথাটি একটা মেয়ের জীবদ্দশায় তখনই শুরু হত যখন মেয়েটির বয়স হত চার থেকে সাত বছরের মধ্যে। এই প্রথাটি চীনে প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে চলে আসছে। আবার মায়ানমারে, সুদীর্ঘ ঘাড় হল সৌন্দর্যের প্রতীক। তেমনি আবার আফ্রিকার সংস্কৃতিতে মহিলাদের মেদবহুল শরীর সৌন্দর্য, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেগুলি আদর্শ বডি ইমেজকে তুলে ধরে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, ঐতিহ্যবাহী এশিয়া এবং আফ্রিকার সংস্কৃতিতে, অন্তত নারীদের সৌন্দর্যের মাপকাঠি হিসাবে সুঠাম গড়নের উপর জোর দেওয়া হয়নি।[১৭]

বিশ্বায়নের যুগে, পশ্চিমা রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিকীকরণের এজেন্ট গুলিকে গ্রহণ করার একটা প্রবণতা গড়ে উঠেছে, যেগুলি আদর্শ বডি ইমেজ ধারণাটির ওপর প্রভাব ফেলছে। অতএব, আধুনিক যুগে সৌন্দর্যের মাপকাঠিগুলি একটা স্থায়ী অবস্থায় পৌঁছেছে। বর্তমানে ইউরোসেন্ট্রিক বডি ইমেজের ধারণা ক্রমশ প্রচলিত হয়ে উঠছে, কারণ বিভিন্ন সামাজিকীকরণের

মাধ্যমগুলি ইউরোসেন্ট্রিক সৌন্দর্যের আদর্শকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তবে আদর্শ বডি ইমেজ সম্পর্কিত ইউরোসেন্ট্রিক ধারণাগুলি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে।[১৮]
যখন এশিয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা ইউরোসেন্ট্রিক বডি ইমেজের মাপকাঠিগুলিকে অনুসরণ করে তখন তাদেরও দৈহিক প্রতিকৃতি স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী একটি সুপরিচিত প্রপঞ্চ হল কসমেটিক সার্জারি। এই কসমেটিক সার্জারি একজনের দৈহিক প্রতিকৃতি এবং শরীরের ভাবমূর্তি পরিবর্তনের একটি জনপ্রিয় এবং কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত সহ বেশ কয়েকটি দেশ কসমেটিক সার্জারিতে উল্লেখযোগ্যভাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।[১৯] 'আমেরিকান সোসাইটি অফ প্লাস্টিক সার্জারি' (২০০৭) অনুযায়ী, ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১.৭ মিলিয়ন কসমেটিক সার্জারি এবং ননসার্জিকাল চিকিৎসার ঘটনা ঘটেছে। কসমেটিক সার্জারির ওপর একটি বিশ্লেষণ থেকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে উঠে এসেছে। এটা দেখা গেছে যে, ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে কসমেটিক সার্জারির হার প্রায় ৪৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে সমগ্র বিশ্বব্যাপী কসমেটিক সার্জারির জন্য প্রায় ১৩.২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এশিয়ার বহু সংখ্যক নারীরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাদের চিবুক, চোখ বা নাকের গঠন পরিবর্তন করতে কসমেটিক সার্জারি বেছে নিয়েছেন। লিঙ্গ ও সংস্কৃতির নিরিখে সৌন্দর্যের এই মাপকাঠি সমগ্র বিশ্বব্যাপী নারীদের সৌন্দর্যকে মেলে ধরার ক্ষেত্রে একটা সমরূপতা নিয়ে এসেছে। অনেকে এর কারণ হিসেবে আমাদের লিঙ্গভিত্তিক সমাজের ওপর প্রসাধনী শিল্পের প্রভাবকে দায়ী করেছেন।[২০]

পিতৃতন্ত্র, গণমাধ্যম এবং বডি ইমেজ:

বিশ্ব গণমাধ্যমগুলি নারী দৈহিক পরিচিতির জন্য আদর্শ কিছু মাপকাঠি তৈরি করেছে, যা কেবল অসম্ভবই নয়, এমনকি তা অনেক সময় অতিরিক্ত যৌনতাপূর্ণও (ওভার সেক্সুয়ালাইসড) হয়। এই কারণেই পুরুষরা মহিলাদের একটা যৌন বস্তু হিসাবে দেখে। আবার অপরদিকে যখন, গণমাধ্যম কর্তৃক উপস্থাপিত আদর্শ বডি ইমেজের মাপকাঠির সাথে নারীদের বডি ইমেজ খাপখায় না, তখন তাদের বডি ইমেজের মূল্যায়ন করা হয়। যেহেতু গণমাধ্যম হল একটি জনপ্রিয় যোগাযোগের মাধ্যম, সেহেতু যেকোনো গণমাধ্যমই অনুমান করে যে, নারীর দৈহিক গড়নকে যৌনতার নিরিখে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেইকারনে, এই যৌনতার মাপকাঠিগুলিকে সমর্থন করে গণমাধ্যমগুলি দৃঢ়ভাবে বলে যে পুরুষদের মহিলাদের দিকে তাকানো উচিত। প্রায়শই পুরুষরা মহিলাদের সঙ্গী, বন্ধু বা ভালোবাসার অংশীদার হিসাবে ভূমিকা পালন করে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং গণমাধ্যমের দ্বারা নির্ধারিত আদর্শ বডি ইমেজের মাপকাঠিগুলিকে অর্জন করার জন্য নারীদের ওপর জোর দেয়। ফলস্বরূপ, নারীত্বের প্রতি এই ধরনের মনোভাব নেতিবাচক বডি ইমেজের সৃষ্টি করে। পিতৃতন্ত্র নারীদের একটি যৌনবস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং মনে করে যে, সৌন্দর্যের এই মাপকাঠির সাথে নারীর শরীর সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২১]

সামাজিক মাধ্যম থেকে 'নিজস্বি': নতুন মিডিয়ার যুগ

সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনে শুধুমাত্র খুব মসৃণভাবেই নয়, নিষ্ঠুরভাবেও আধিপত্য বিস্তার করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে বিভিন্ন সঙ্গীসাথী, আত্মীয়স্বজন, অজানা ব্যক্তি এবং সেলিব্রিটিদের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। এই একক প্রকৃতির কারণেই সামাজিক মাধ্যম অন্যান্য মাধ্যম থেকে আলাদা। এই মাধ্যমটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সংযোগের মাধ্যমে সৌন্দর্যের মানদণ্ড সম্পর্কে আমাদের একটা উপলব্ধি গড়ে তোলে, পাশাপাশি এই সমস্ত মানদণ্ডগুলিকে আত্মস্থ করার সুযোগ প্রদান করে। অতীতে, প্রথাগত

গণমাধ্যমগুলি মানুষকে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করত, যে কীভাবে বিজ্ঞাপনদাতারা মডেল এবং সেলিব্রিটিদের আলোকচিত্রে উপস্থাপন করা হবে। তারা মূলত আদর্শ সৌন্দর্যের একটা অবাস্তবিক প্রতিকৃতিকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উপস্থাপন করত।[২২] কিন্তু বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা, বিশেষত নারীরা, অন্যপক্ষের কাছে তাদের দৈহিক প্রতিকৃতিকে প্রকাশ করে। তারা তাদের অনলাইনে নিজেদের প্রতিকৃতিকে বিভিন্ন উপায়ে উন্নত করে নিজেদের ভ্রান্ত আদর্শ প্রতিকৃতিগুলিকে নেটিজেনদের সামনে তুলে ধরে। সোশ্যাল মিডিয়া বা অনলাইন মিডিয়ার ব্যবহার এবং দৈহিক অসন্তুষ্টি মূলত কিশোর-কিশোরী ও যুবতীদের মধ্যেই বেশি মাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। এটাও দেখা গেছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি বন্ধু-বান্ধব, বাব-মাও বডি ইমেজ সম্পর্কে উপলব্ধি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একপ্রকার দায়ী।[২৩] আধুনিক যুগে মানুষ অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের দৈহিক প্রকাশ ঘটায়, যা আদর্শ বডি ইমেজের সাথে সম্পর্কিত। সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি সাধারণ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে প্রায় বেশিরভাগ বাড়িতে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করছে, আবার কিছু কিছু দেশে, শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা অনলাইন মাধ্যমকে তাদের যোগাযোগের প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করছে। যার ফলে, খুব সহজেই লিঙ্গ, বয়স নির্বিশেষে সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে নিজেদের ভ্রান্ত আদর্শ বডি ইমেজকে উন্মুক্ত সমাজে তুলে ধরছে। উদাহরণস্বরূপ, বহু ব্যক্তি, বিশেষ করে নারীরা স্মার্টফোনে একাধিকবার 'নিজস্বি' তোলেন, তারপরে, তারা হয় সেই ফটোগুলি পোস্ট করতে পছন্দ করেন যেগুলি অনলাইন দর্শক বা অনুগামীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে অথবা সেই ফটোগুলিকে পোস্ট করে যা বডি ইমেজ সংক্রান্ত মাপকাঠির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেক্ষেত্রে, তারা নিজেদের মুখের চেহারা উন্নত করতে ক্যামেরা ফিল্টার ব্যবহার করছে অথবা ফটো-শপ ব্যবহার করে সেগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছে।[২৪]

উপসংহার:

এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ওপর ভিত্তি করে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বডি ইমেজ সম্পর্কে নারীদের উপলব্ধি এবং গণমাধ্যমের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। গণমাধ্যমের উপস্থাপনা শুধুমাত্র আদর্শ বডি ইমেজের ওপর একটি তত্ত্ব গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় না, এমনকি গণমাধ্যমগুলি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আদর্শ বডি ইমেজ সংক্রান্ত আত্মমূল্যায়ন গড়ে তোলে। এখন, বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের আধিপত্যের কারণে, আমরা সুঠাম দৈহিক গড়নকে আদর্শ হিসেবে আত্মস্থ করে ফেলেছি। সেইকারণে, গণমাধ্যম দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাপের কারণে অনেক সময় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দৈহিক অসন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটে। আবার অনেক সংস্থার নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট রয়েছে যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ওয়েবসাইটগুলির সাথে যুক্ত হতে পারে। সুতরাং এটা বলা যায় যে, আধুনিক যুগে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন ধরণের মানুষের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ গড়ে তোলে। অনেক সময় গণমাধ্যমগুলি প্রায়শই ছবি, বিজ্ঞাপন, এবং ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সৌন্দর্যের মাপকাঠিকে তুলে ধরে। সৌন্দর্যের এই মাপকাঠি প্রথাগতভাবে নারীদেরকে নিজেদের লক্ষ্যবস্তু করে এবং তাদের বার্তা দেয় যে, সমাজে তাদেরকে এইভাবেই উপস্থাপন করতে হবে। সমাজ ও গণমাধ্যম কর্তৃক নির্দেশিত সৌন্দর্যের মাপকাঠিকে অনুসরণ করতে গিয়ে নারীরা প্রায়শই খাবার সংক্রান্ত ব্যাধি, হতাশা ইত্যাদির মতো বিপজ্জনক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সৌন্দর্যের এই মাপকাঠিগুলি প্রায়শই নারীদের সুঠাম দৈহিক গঠন, নিখুঁত বর্ণ এবং নিখুঁত শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরে। সুতরাং নারীত্বের প্রতি এইধরনের নিরেট

নির্দেশিকাগুলি নারীদের মধ্যে একটা নেতিবাচক বডি ইমেজের জন্ম দেয়। বাস্তবে, নারীরা অনবরত এই সামাজিক মাপকাঠিগুলির সাথে সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন কারণ তাদের কাছে এছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ নেই। বর্তমানে ফটোশপ, ফটো এডিটিং এবং অন্যান্য বিকল্প দ্বারা একজন ব্যক্তির একটি নতুন ইমেজ প্রতিফলিত হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে এই 'নতুন ইমেজে'র কোন অস্তিত্ব নেই। আমরা জানি না যে, ফটোশপ, ফটো এডিটিং এর মাধ্যমে আদৌ বডি ইমেজের উন্নয়ন ঘটানো যায় কিনা। সুতরাং, ব্যক্তিবর্গের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাবকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে ভবিষ্যতে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতিটি লিঙ্গের ওপর আরোপিত সামজিক চাপকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্যগুলিকে গভীরভাবে অধ্যায়ন করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজন সমাজ থেকে উঠে আসা চাপগুলি কীভাবে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদাভাবে প্রভাবিত করে তা খুঁজে বের করা।

তথ্য নির্দেশিকা:

১) UMKC Women's Center. (2019). Mass media and Body Image. Retrieved on 16th October, 2019 from https://info.umkc.edu/womenc/2019/03/02/mass-media-and-body-image/.

২) Pritchard, M., & Cramblitt, B. (2014). Media influence on drive for thinness and drive for muscularity. Sex Roles, 71(5/8), pp. 208-216.

৩) McCabe M.P., Butler, K., Watt, C. (2007). Media influences on attitudes and perceptions towards the body among adult men and women. Journal of Applied Biobehavioral Research, 12 (2), pp. 101-112.

৪) Ibid, pp. 115-116.

৫) Roosen, K, &Mills, JS. (2013). Body Image. Encyclopaedia of Critical Psychology. New York, Springer, pp. 175-185.

৬) Grogan, S. (2006). Body image and health contemporary perspectives. Journal of health psychology, 11(4), pp. 523-530.

৭) Pritchard and Cramblitt, op.cit., p. 217.

৮) Wykes, M., & Gunter, B. (2005). The media and body image. London, Sage Publication.

৯) Miller, E., & Halberstadt, J. (2005). Media consumption, body image and thin ideals in New Zealand men and women. New Zealand Journal of Psychology, 34(3), pp. 189-195.

১০) Fredrickson, B. L. and Roberts, T.A. (1997). Objectification Theory. Psychology of Women Quarterly, 21, pp. 173–206.

১১) Tiggemann, M. (2003). Media exposure, body dissatisfaction and disordered eating: television and magazines are not the same! European Eating Disorders Review, 11(5), p. 418.

১২) Posavac, S., & Posavac, H. (2002). Predictors of women's concern with body weight: The roles of perceived self-media ideal discrepancies and self-esteem. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 10(2), pp. 153-160.

১৩) Hawkins, N., Richards, P., Granley, H., & Stein, D. (2004). The impact of exposure to the thin-ideal media image on women. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 12(1), pp. 35-50.
১৪) Watson, R., & Vaughn, L. (2006). Limiting the effects of the media on body image: Does the length of a media literacy intervention make a difference? Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 14(5), pp. 385-400.
১৫) Aubrey, J. (2006). Exposure to sexually objectifying media and body self-perceptions among college women: An examination of the selective exposure hypothesis and the role of moderating variables. Sex Roles, 55(3), pp. 159-172.
১৬) Frith, K., Shaw, P. & Cheng, H. (2006). The construction of beauty: a cross-cultural analysis of women's magazine advertising. Journal of Communication, 55, pp. 56-67.
১৭) Soh, NL., Touyz, S. & Surgenor, L. (2006). Eating and body image disturbances across cultures: a review. European Eating Disorder Review, 14, pp. 54-65.
১৮) Frith et al., op.cit., pp. 68-70.
১৯) Haas, C.F., Champion, A. & Secor, D. (2008). Motivating factors for seeking cosmetic surgery: a synthesis of the literature. Plastic Surgical Nurses, 28, pp. 177-82.
২০) Hesse-Biber, S., Leavy, P., Quinn, C.E., & Zoino, J. (2006). The mass marketing of disordered eating and eating disorders: the social psychology of women, thinness and culture. Women's Studies International Forum, 29, pp. 208-224.
২১) Johnson, S., Edwards, K., & Gidycz, C. (2015). Interpersonal weight-related pressure and disordered eating in college women: a test of an expanded tripartite influence model. Sex Roles, 72(1), pp. 15-24.
২২) Mills, JS., Shannon, A., & Hogue, J. (2017). Beauty, Body image, and the Media. Retrieved on 12th October 2019 from https://www.intechopen.com/books/perception-of-beauty/beauty-body-image-and-the-media.
২৩) Van Den Berg, P., Thompson, JK., Obremski-Brandon, K., & Coovert, M. (2002). The Tripartite influence model of body image and eating disturbance: A covariance structure modelling investigation testing the mediational role of appearance comparison. Journal of Psychosomatic Research, 53(5), pp. 1007-1020.
২৪) Ho SS, Lee EWJ, Liao Y. (2016). Social network sites, friends, and celebrities: The roles of social comparison and celebrity involvement in adolescent's body image dissatisfaction. Social Media & Society, 2(3), pp. 53-57.

পশ্চিমবঙ্গের জীবন-জীবিকা শিউলীদের কথা : পূর্ব বর্ধমান জেলার অঞ্চল বিশেষে সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

রুদ্রনীল চোংদার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ
গুসকরা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা যে নলেন গুড়ের স্বাদ গ্রহণ করেনি, এমন মানুষ পাওয়া অতি বিরল। অগ্রহায়ন মাসের সংক্রান্তিতে সরুচাকলির বড়া পরব শুরু করে পৌষ সংক্রান্তীতে পিঠে পরব/পার্বন পর্যন্ত আমরা প্রায় প্রত্যেকেই নলেন গুড়ের আস্বাদ গ্রহণ করে থাকি। শুধু বড়া বা পিঠে নয়, নলেন গুড়ের স্বাদ শীতকালে পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি খাবারে অন্য মাত্রা এনে দেয়। আজকাল কেক বা আইসক্রীমেও নলেন গুড় ব্যবহার করা হচ্ছে। এই নলেন গুড় তৈরি হয় খেজুর রস থেকে, এই খেজুর রস যারা তৈরি করেন তাদের বলা হয় **'শিউলী'**। গাছ থেকে খেজুর রস নির্যাস করে খেজুর গুড় তৈরির পদ্ধতিটা মোটেই সহজ প্রক্রিয়া নয়। দীর্ঘ তিন মাস ধরে প্রচন্ড শীতে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেজুর রস তৈরি করে এবং তা থেকে গুড় তৈরি করে বিক্রি করে সামান্য লাভের আশায় বসে থাকে শিউলীরা। বছরের বাকি নয় মাস তারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকে।কারণ শীতকাল ছাড়া বাকি সময় বিশেষত বর্ষাকালে খেজুর গাছগুলি রস সংগ্রহ করে রাখে। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রামের অভিরামপুর ও দারিয়াপুর এবং মঙ্গলকোট থানার চাণক গ্রামের শিউলীদের সাথে আলোচনা করে দেখেছি এই কাজ অনেকটাই সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য। শিউলীদের দুশ্চিন্তার একটি বড় কারণ হলো খেজুর গুড় শিল্প ক্রমশ অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে আগের থেকে শিউলীদের সংখ্যা বা খেজুর গুড়ের চাহিদা অনেকটাই কমেছে। খেজুরগুড় বিক্রি করে তাদের লাভ্যাংশ বলে কিছুই থাকছে না। সর্বোপরি বাজারে কৃত্রিম গুড়ের অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণে মানুষ তার গুণমান বিচার না করেই সেগুলিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। আর এর সঙ্গে রয়েছে ঠান্ডার রকমফের। এখন কনকনে ঠান্ডা ১০-১৫ দিনের বেশি স্থায়ী হয় না। ফলে ভালো মানের গুড়ের চাহিদার অভাব থেকেই যাচ্ছে। শিউলিদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

সূচক শব্দ: নলেন গুড় বা খেজুর গুড়, শিউলী, নবাত / লবাত, Adulterated, রাঢ় বাংলা।

মূল আলোচনা: বেশ কিছু বছর আগে বাজারে যখন এতো মিষ্টির দোকান বা মিষ্টির চলছিল না বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গুড়ি ছিল সাধারণ গ্রামীণ মানুষের মিষ্টির প্রধান অবলম্বন। রান্না থেকে শুরু করে চা-শরবত প্রত্যেকটিতে গুড়ের ব্যবহার ছিল নিত্য প্রয়োজনীয়। গুড় সাধারণত দুই প্রকারের হতো ১) আখের গুড় এবং ২) খেজুর গুড়। এছাড়া বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া অঞ্চলে তালের গুড়ের প্রচলন ছিল। আখের গুড়ের ব্যবহার দোল পূর্ণিমার থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো কালীপুজো পর্যন্ত চলত। বাংলা অনেক গ্রামেই এখন আখের চাষ হয়। আর অগ্রহায়ণ মাস থেকে শুরু করে মাঘ মাস পর্যন্ত চলত খেজুর গুড়ের ব্যবহার। কেননা সেই সময়ে মানুষের চিনি সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে,চিনির থেকে গুড়ের উপকারিতা অনেক বেশি যেহেতু মুসলমানেরা চিনি তৈরি করত তাই পূজা পার্বণে চিনির ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বেড়েছে তাই মানুষ এখন মিষ্টির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন

হয়েছে। "এখন না আছে বাংলা,না আছে বাংলার গ্রাম,না আছে গুড়ের রমরমা, না দেখা যায় গুড়-খেকো সেই বেড়ালের প্রজাতি।"[১]

প্রথমে আখের গুড় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। প্রধানত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আখের গুটি বপন করে আখের গাছ লাগানো হয়।দীর্ঘ ৯-১০ মাস অপেক্ষা করার পর আখের গাছগুলি কেটে বর্তমানে ডিজিটাল চালিত আঁখ কাঠের মেশিন দিয়ে আখের রস নির্যাস করা হয়।রস বের করে ছাকনি দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে বড় পাত্রে ঢেলে রাখা হয়। রস জ্বাল দেওয়ার আগে ১৫-২০ মিনিট স্থির অবস্থায় রেখে রসটিকে একটি পাত্রে রাখা হয়। এরপর রসটিকে বড় কড়াইয়ে ঢেলে জ্বাল দেওয়া হয়। ঘন্টা দুয়েক জ্বাল দেওয়ার পর প্রচুর পরিমাণ ময়লা ভেসে ওঠে এবং এগুলিকে পরিষ্কার করে রসটিতে আঠালো ভাব আনার জন্য ভেন্ডি, ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা ও শ্যামাচাল ব্যবহার করা হয়। এরপর রসটি যখন ঘন লাল বর্ণ হয় তখন রসটিকে উনুন থেকে নামানো হয় এবং তাকে ঠান্ডা করার পর মাটির কলসি বা টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করে বাজারজাত করা হয়। আগে গ্রাম ঘরেই আখের গুড় বানিয়ে নেওয়া হতো।শীত পেরোতেই যেহেতু খেজুরের দিন যখন শেষ হয়ে আসতো। বর্ষাকালে খেজুরগাছ গুলি রস উৎপাদন করলেও তাতে টক ভাবটা বেশি থাকায় ভালো রস হতোনা। তাই গ্রীষ্ম-বর্ষা কালব্যাপী রাঢ় বাংলার গ্রামের মানুষ আখের গুড়ের ওপরই নির্ভর করত। আবার মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় তালের গুড়ের ব্যবহার দেখা যেত। তাল গাছের গায়ে বাঁধা হতো লম্বা বাঁশ।বাঁশের কঞ্চিগুলো একবারে গোড়া থেকে না কেটে সামান্য রেখে কাটা হতো।[২] ঐ বাঁশের গোড়ায় পা দিয়ে তাল গাছের মাথায় ওঠা হতো।তারপর হাঁড়ি বেঁধে রস বের করা হতো। খেজুরের থেকেও তালগাছের রসের পরিমাণ বেশি হয়। তালের হাঁড়ি গুলি নামানোর সাথে সাথে চুন মেশানো হয়। তারপর উনুন জ্বাল দিয়ে করায় বসিয়ে গুড় তৈরি করা হতো।বাড়ির বাইরে খেজুর বা তালপাতার ছাউনি দিয়ে সাময়িকভাবে গুড়শাল তৈরি করা হতো। রস ফোটানোর গন্ধে আমোদিত হতো চারিপাশ। এভাবেই তালের গুড় তৈরি হতো।

এবার আসা যাক এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় খেজুর গুড়ের কথায়। একাদশ-দ্বাদশ শতকে শ্রীধর দাসের 'সুদূক্তিকর্ণামৃত্ত' গ্রন্থে বাংলায় নলেন গুড়ের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে।[৩] সংস্কৃত 'খর্জুর' সাধু ভাষাজাত শব্দ। চলতি বা কথ্যভাষায় আমরা বলি খেজুর। হিন্দি, মারাঠি, অসমীয়া ভাষায় খেজুর গাছকে 'খজর গাছ' বলা হয়। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম 'Phoenix Sylvestris',[৪] নভেম্বরের শেষ দিকে উত্তরের হিমেল হাওয়া ও হাল্কা কুয়াশায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শীতের সাথে সাথে চলে আসে উৎসবের আমেজ। পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রতিটি গ্রামেই চলে নবান্ন উৎসব। মিঠে হাল্কা রোদ ও ধান ওঠার আনন্দে মেতে ওঠে পল্লী গ্রামগুলি। গ্রামের সাধারণ মানুষ এই সময় হয়তো সাধারণ মানুষ ধান ও সব্জি তোলার মাধ্যমে লাভের মুখ দেখতে পায়। কিন্তু যে কথাটি না বললে পল্লী গ্রামগুলি সৌন্দর্যতা পূর্ণতা পায় না, তা হল খেজুর গুড় বা নলেন গুড়ের আগমন। এই খেজুর গুড়ের স্বাদ মানুষকে এক প্রকার নেশায় মাতিয়ে তোলে। পিঠে বা সরু চাকলির বড়া তো আছেই সঙ্গে রুটি, লুচি, মুড়িতেও খেজুর গুড়ের ব্যবহার সমানতালে চলে। পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রাম ব্লকের অভিরামপুর, দীঘনগর, দ্বারিয়াপুর মঙ্গলকোট ব্লকের কাশেমনগর, চাণক, গোবিন্দপুর প্রভৃতি জায়গায় খেজুর গুড়ের প্রস্তুতকারী শিউলীদের দেখা মেলে। তারা সুদূর নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে এসে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত দীর্ঘ তিন থেকে চার মাস এখানেই শিউলীরা অতিবাহিত করে। খেজুর গুড়ের রস ফুটিয়ে তৈরি হয় নলেন গুড় থেকে ঝোলা গুড় এবং নবাত বা পাটালি। এই টানা কয়েক মাস

ধরে খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধা থেকে শুরু করে রস সংগ্রহ করা এবং জ্বাল দিয়ে গুড় বানানো পর্যন্ত পুরো কাজটাই শিউলীরা করে থাকেন।

শীতের খেজুর রস থেকে নলেন গুড়ের স্বাদ উপভোগ করেননি এমন মানুষ কমই আছেন। যারা খেজুর রস সংগ্রহ করেন তাদের বলা হয় শিউলী।এই জেলারই কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন *"সিউলি নগরে বৈসে, খাজুরের কাটিরসে গুড় করে বিবিধ বিধানে।"* শিউলীদের পেশাটি কিন্তু বংশানুক্রমিক পেশা নয়। কোন খেটে খাওয়া মানুষই শিউলী হতে পারেন। পূর্ব বর্ধমানের শীতকালে যে সমস্ত শিউলীদের দেখা মেলে তাদের বেশিরভাগই মুসলিম সম্প্রদায়ের। গ্রাম্য সমীক্ষা করতে গিয়ে বিভিন্ন মানুষ এবং তাদের বিভিন্ন পেশার দৃষ্টান্ত মেলে। এই বিষয়গুলি উপলব্ধি করা একটি নেশার মত। তাই যখনই সময় পাই টোটো করে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সৌন্দর্য দেখতে বেড়িয়ে পরি এবং গ্রামের মানুষদের সাথে সরাসরি কথা বলে বহু কিছু জানতে পারি। আমাদের পূর্ব বর্ধমান জেলা শীত হোক বা গ্রীষ্ম যখনই হোক গ্রামের প্রকৃতিও নিজেকে সময়ের সাথে মিলিয়ে চলে। যাইহোক এবার আসি শিউলীদের কথায়। শিউলিদের বেশিরভাগই হল দরিদ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায়। কেউ কেউ অন্য পেশার সাথে যুক্ত থাকে যেমন ইঁটভাটায় কাজ, ফুল গাছের কাজ ইত্যাদি। এরকমই একদল শিউলিদের সাথে দেখা হল ডোগরা গ্রাম নামে খ্যাত দ্বারিয়াপুরে। গুসকরা-মানকর রোডে রাস্তার ধারেই প্রায় ২৪ বিঘা জায়গা জুড়ে প্রচুর খেজুর গাছ লাগানো হয়েছে এবং একটি বড় পুকুরও রয়েছে। পুকুরটির নাম রাজার পুকুর। সম্ভবত পুকুরটির সাথে বর্ধমানের রাজাদের কোন সংযোগ ছিল। বর্তমানে এই বিশাল ২৪ বিঘা জায়গাটির মালিক দ্বারিয়াপুর নিবাসী শ্রী সুব্রত চ্যাটার্জী। এই খেজুর গাছ সংলগ্ন এলাকাটিতেই শিউলীরা এসে মাস চারেক ঘাঁটি গড়ে। নাম হলো যথাক্রমে সেলিম মন্ডল ও সঞ্জয় আনসারী। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেল তাদের বাড়ি হল নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার বিক্রমপুর গ্রামে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই তারা চলে আসে খেজুর গুড় বিক্রি করে লাভের আশায়। এরকমই চার-পাঁচ জনের একটি টিম ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে খেজুর গাছে হাড়ি বেঁধে রস সংগ্রহ করে এবং তারপর তা দিয়ে খেজুর গুড় ও নবাত বা পাটালি তৈরি করে। এরপর গিয়েছিলাম মঙ্গলকোট থানার চানকগ্রামে এখানকার প্রধান শিউলী হলেন শেখ নজরুল। তাঁর বাড়িও নদিয়া জেলার বেথুয়া থানার বীরপুর গ্রামে। তিনিও শীতকাল বাদে বাকি সময় ইঁটভাটায় কাজ করেন। বোঝায় যায় তাদের জীবন চলার পথটা মোটেই মসৃণ নয়।

বাঙালি মাত্রই নলেন গুড়ের স্বাদে মাতোয়ারা। শীত আসতে না আসতেই এই গুড়ের চাহিদাও বেড়ে যায়। তবে খেজুর গুড় বা নলেন গুড় নির্মাণ পদ্ধতিটি মোটেই সহজ নয়, বরং পরিশ্রম সাপেক্ষ। শীতের তাজা খেজুর রস থেকেই তৈরি হয় নলেন গুড়।[৫] আর এই কঠিন পরিশ্রমের কাজটি যারা সম্পন্ন করেন তারাই হলেন শিউলী।[৬] সেলিম মন্ডল, সঞ্জয় আনসারী বা শেখ নজরুলের মতো তরুণ তুর্কিরা ঘরবাড়ি ভিটে ছেড়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে খেজুর গাছের বাগান বিশিষ্ট এলাকায় তারা তাদের চাঁচ বা মাটি এবং খড়ের চালায় ছোট্ট ঘরটি ঘিরে লাভের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তবে সবসময়ই যে লাভ হয় তা নয়। শিউলিদের কাজ শুরু হয় অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিক থেকে। এর জন্য কতকগুলি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে চলে গাছ কাটা। এই গাছ কাটা মানে গাছ কেটে ফেলে দেওয়া নয়, আগাছা পরিষ্কার করা এবং আদৌ সেই গাছে রস হবে কিনা তা খতিয়ে দেখা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, যে খেজুর গাছগুলি থেকে রস সংগ্রহ করা হবে সেগুলিকে বেছে তার ডালপালা খানিক ছেঁচে রাখা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে, ছাঁচা অংশটি কিছুদিন পর নরম হয়ে গেলে রস নির্গত হওয়ার জন্য 'U' আকৃতির নির্গমন নল বা চ্যানেল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

চতুর্থ পর্যায়ে, যখন একটু শীত জাঁকিয়ে বসে তখন খেজুর রস আসতে আরম্ভ করে শুরু হয় রস সংগ্রহের পালা।

পঞ্চম পর্যায়ে, প্রতিটি গাছের জন্য একটি করে নতুন মাটির কলসি ভালো করে চুন জলে ধুয়ে রাখা হয় এবং গাছে সেটিকে বেঁধে দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ পর্যায়ে, সূর্যাস্তের আগে সেই কলসিটা নদীর মুখে রেখে বেঁধে আসতে হয়। সারা রাত ধরে সেখানে রস নির্গত হতে থাকে। তারপর কাক ভোরে উঠে সেই কলসিটিকে নিচে নামিয়ে আনা হয়।

সপ্তম ও শেষ পর্যায়ে, কলসি থেকে রস সংগ্রহ করে বড় একটি চৌকো টিনের পাত্রে ঢেলে জ্বাল দিয়ে ফোটানো হয়। রস গরম করার প্রথম অবস্থায় রসের উপরি ভাগে যে গাদ ভেসে ওঠে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছাকনি বা হাতা দিয়ে ফেলে দিতে হবে। তারপর রস ঘনীভূত হলে ঘনীভূত রস হাতা দিয়ে অল্প তুলে ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলে দেখতে হবে শেষের ফোঁটায় আঠালো ভাব এসেছে কিনা। এরপর রস জমাট বাঁধলেই সেখান থেকেই তৈরি হয় খেজুর বা নলেন গুড় এবং খেজুর গুড়ের পাটালি বা লবাত।

আবহাওয়া বা প্রকৃতি বিরূপ না হলে প্রতি সপ্তাহে একটি গাছে ৩ থেকে ৪ বার পর্যন্ত ভালো রস পাওয়া যায়। রসে যাতে শর্করার পরিমাণ বাড়ে এই কারণে সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে বিশ্রাম দিতে হয়। এক কেজি সুস্বাদু খাঁটি খেজুর গুড় তৈরি হতে ৮-১০ লিটার খেজুর রস ভালো করে জ্বাল দিতে হয়। বর্তমানে কেজি প্রতি এই গুড়ের দাম প্রায় ৩০০ টাকা। এছাড়া, ১০০-১৫০ টাকার মধ্যেও খেজুর গুড়ের রস পাওয়া যায়। সেগুলোতে সাধারণত চিনির রস মেশানো হয়। তবে খেজুর গুড় ভালোভাবে সংরক্ষিত রাখতে গেলে শুকনো কাঁচের বোতল বা জারে দিলে ৫ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত ভালো থাকে। সাধারণত নির্গমন নল বা চ্যানেল দিয়ে রস নির্গত হয় বলে খেজুরগুড়কে নলেন গুড়ও বলা হয়। শিউলীদের অন্যান্য জেলায় **'গাছি'** ও বলা হয়ে থাকে। একবার খেজুর গাছ কাটার পর পর তিনদিন রস পাওয়া যায়।প্রথম দিনের রসকে বলা হয় জিরেনকাট, এটি খুবই সুস্বাদু। চিরদিনের দশটিকে বলা হয় দো-কাট এবং তৃতীয় দিনের রসটিকে বলা হয় তে-কাট। শুধু নলেন গুড় বা নবাত তৈরি নয়, নলেন গুড়ের মিষ্টির চাহিদা এতটাই বেশি যে বড় বড় ব্যবসায়ী মোদকরা সময় সারা বছরের জন্য গুড় মজুত করে রেখে দেয়।

ঠান্ডা শুরু হতেই গ্রামবাংলায় চোখে পড়ে খেজুর গাছে ঝোলানো মাটির হাঁড়ি।[৭] নদীয়া জেলা থেকে ৯০-৯৫ কিমি দূরত্বে সোজা পূর্ব বর্ধমানের গ্রামগুলিতে ঘাঁটি গড়ে সেলিম, সঞ্জয় ও নজরুলের মত তরুণ পরিশ্রমী যুবকেরা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত শিউলীদের জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে না, শুনবে তারা গল্প-কথায়। আজকাল নলেন গুড়ের আইসক্রিম, কেক, মোয়া পর্যন্ত তৈরি হয় 'Adulterated' পদ্ধতিতে। হাতের সামনে এরকম সহজেই উপকরণ পেলে তাদের আর দোষ কোথায়? দোষ হল কর্মসংস্থানের অভাব। মানুষের আয় কমেছে কিন্তু বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য। তবে সম্প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নদীয়ার মাজদিয়ায় গাজনঘাটে তৈরি হয়েছে নলেন গুড়ের কারখানা এতে অবশ্য কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বস্তুত শিউলীদের জীবন সংগ্রাম বড় বড় কাহিনীকেও হার মানায়। শীতের ভোরে কনকনে যখন আমরা ব্ল্যাঙ্কেট বা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে ব্যস্ত, তখন তার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় শিউলীদের কর্মতৎপরতা। মিস্টার অমিতাভ বচ্চনের 'সওদাগর' মুভিতে (১৯৭৩) শিউলীদের জীবন সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। এই সিনেমাটি প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল। শিউলীদের জীবন নিয়ে কবীর সুমন লিখেছেন, *"এই ফাটকাবাজীর দেশে স্বপ্নের পাখি গুলি বেঁচে নেই/পেটকাটি, চাঁদিয়াল পেড়িয়ে কেমন আছে এই শীতের শিউলিরা?"* শিউলীদের কথায় খেজুর গুড় শিল্প ক্রমশ অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলেছে। দিন দিন শিউলীদের সংখ্যা কমছে কারণ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের তুলনায় প্রয়ো চাহিদা ক্রমশ কমেছে। বাজারে ভেজাল বা adultrated খেজুর গুড় আসায় বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি তাতেই কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। তাই শ্রম এবং মাইনে দিয়ে শিউলীদের লাভ বলে তেমন কিছুই থাকেনা। আবহাওয়া জনিত পরিবর্তন এবং করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের হাতে অর্থের ঘাটতি তো প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি শিউলীদের কাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। একদা ভিস্তিওয়ালাদের মতোই শিউলীদের কথা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। ইতিহাস হয়ে থাকবে তাদের কাজের শেষে রাতের ঠান্ডায় আগুন জ্বালিয়ে চারধারে বসে আঞ্চলিক ভাষায় তাদের সুখ-দুঃখের কথা।

পাদটীকা:

১) খেজুর গুড় বা নলেন গুড়: নলেন গুড় তৈরি করা হয় খেজুরের রস থেকে। কিন্তু তাহলে খেজুর গুড় না হয়ে এর নাম নলেন হল কেন? অনেকের মত, নতুন শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে নলেন শব্দের জন্ম। অন্য মত, খেজুর গাছের গায়ে নল কেটে এই গুড় সংগ্রহ করা হয় বলে একে নলেন গুড় বলা হয়। আবার অন্য মতে, দক্ষিণ ভারতীয় শব্দ নরকু থেকে এসেছে নলেন শব্দটি। এর আক্ষরিক অর্থ কাটা বা ছেদন করা।

২) শিউলী: 'সংসদ বাংলা অভিধান' ও রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা'য় উল্লেখ আছে শিউলি হল ফুলবিশেষ বা শেফালিকা ফুল। আর শিউলী হল যারা খেজুর রস সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে '***শিউলী*** 'বানানটি ব্যবহার করাই প্রযোজ্য।

৩) নবাত/ লবাত: খেজুর রস গাছ থেকে নামিয়ে রস গরম করার প্রথম অবস্থায় রসের উপরিভাগে যে গাদ ভেসে ওঠে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছাকনি বা হাতা দিয়ে ফেলে দিতে হয়। এরপর রস ঘনিভূত হলে তারপর সেই রস আঠালো হয়ে এলে, তা নামিয়ে গুড় তৈরি হয়। লবাত বা নবাত তৈরি করতে গেলে সেই ঘণীভূত গুড়কে পালিশ করতে হয়।

৪) Adulterated: Adulterated পদ্ধতি হল ভেজাল উপায়ে নির্মিত কোন খাদ্য বস্তু। যেমন- কোনো ফলের জুস্, নলেন গুড়, মিষ্টি, কেক, রান্নার মশালা ইত্যাদি। আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট স্বাদের জিনিস হাতের কাছে পাইনা। আর পেলেও সেই পরিমান অর্থ দিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয়না। তাই আমরা জেনে বুঝেই অনেক ক্ষেত্রেই Adulterated খাবার গ্রহণ করেই থাকি।

৫) রাঢ় বঙ্গ: ভাষাবিদ প্রভাত রঞ্জন সরকারের মতে 'রাঢ়' শব্দটির উৎস প্রোটো-অস্ট্রোএশিয়াটিক 'রাঢ় বা 'রাঢ়ো' শব্দ দুটি থেকে, যার অর্থ লাল মাটির দেশ বা ল্যাটারাইট মৃত্তিকার দেশ। যাইহোক রাঢ় বাংলার অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলি হল সম্পূর্ন বীরভূম জেলা, বর্ধমান জেলার মধ্যভাগ, বাঁকুড়া জেলার পূর্ব ও দঃ পূর্ব ভাগ ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলার পশ্চিমভাগ রাঢ়ের অন্তর্গত।

এছাড়া প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অংশ বিশেষ এবং হুগলি ও হাওড়া জেলার সামান্য অংশ রাঢ়ের অন্তর্গত।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা:

১) সঞ্জয় আনসারী- নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থেকে আগত শিউলী।

২) শেখ নজরুল- নদীয়া জেলার বেথুয়া থেকে আগত শিউলী।

৩) সেলিম মন্ডল- নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থেকে আগত শিউলী।

৪) পরেশ দাস- আমার সমীক্ষার সঙ্গী,রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের নিবাসী।

৫) পাপু হাজরা- আমার সহকর্মী গুসকরা মহাবিদ্যালয় এবং সমীক্ষার সঙ্গী।

তথ্যসূত্র:

১। বন্দোপাধ্যায়, সুজন (সম্পা.), ২০২৪, বাংলায় স্মৃতির পেশা ও পেশাজীবীরা, প্রথম খন্ড, সুপ্রকাশ, কলকাতা,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৯-১০৬।

২। বন্দোপাধ্যায়, সুজন (সম্পা.), ২০২৪, বাংলায় স্মৃতির পেশা ও পেশাজীবীরা, প্রথম খন্ড, সুপ্রকাশ, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৯-১০৬।

৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৮২, বাংলার লোক সংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, পৃষ্ঠা ১৩।

৪। রায়, নীহাররঞ্জন, ১৩৫৬, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২৬।

৫। নিজস্ব সংবাদদাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, অনলাইন সংখ্যা, ১১ই ডিসেম্বর ২০২০।

৬। চক্রবর্তী, অর্ণব, শীতের শিউলী ও অদ্ভুত রসের গপ্পো..., এই সময় অনলাইন পত্রিকা, ১৯শে জানুয়ারি ২০২০।

৭। মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, ১৯৭৮. গল্পমালা ১, গল্পের নাম রস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৬-৭৭।

চিত্র নিজস্ব।

মানিক দত্তর চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য

রঞ্জনা ভট্টাচার্য
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আনন্দ চন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি

সারসংক্ষেপ: চণ্ডীমঙ্গল বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম কাব্য যার সূচনা মানিক দত্তর হাতে। তিনি গৌড় বা বর্তমান মালদা অঞ্চলের কবি ছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। তিনি তাঁর কাব্যে মানিক দত্তর নামের উল্লেখ করেছিলেন বলে মানিক দত্তকে মুকুন্দের অগ্রবর্তী কবি বলা যায়। তবে মানিক দত্ত বা তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ড.সুশীলকুমার ওঝা তাঁর কাব্যটি মালদা অঞ্চলে গায়নদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মানিক দত্তর কাব্যে পালাগানের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি দেখা যায়। দিশা, লাচাড়ী, পদ ইত্যাদি ভাগে কবি কাব্যটি লিখেছিলেন। মঙ্গলবারের দিবাপালা থেকে শুরু করে পরবর্তী আটদিনের দিবাপালা ও নিশাপালায় কাব্যটি বিভক্ত। মানিক দত্তর কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ আলোচনাই প্রবন্ধের লক্ষ্য। চণ্ডীমঙ্গলে পৌরাণিক চণ্ডী ও অপৌরাণিক চণ্ডীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। গোটা কাব্যে দেবী চণ্ডী নামের চেয়ে দুর্গা নাম মানিক দত্ত বেশি ব্যবহার করেছেন যা অন্য চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় না। সেইসঙ্গে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসরণে দেবী দুর্গার অসুরদলনী রূপকেই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন।
সূচক শব্দ: প্রথম চণ্ডীমঙ্গলকাব্য, মানিক দত্ত, মুকুন্দ চক্রবর্তী, পৌরাণিক দেবী দুর্গা, অপৌরাণিক দেবী চণ্ডী।

মূল প্রবন্ধ:

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ইসলাম অধ্যুষিত বাংলায় ধর্মান্তকরণের বাতাবরণে সাহিত্য সংরূপটি গড়ে উঠেছিলো ঠিকই কিন্তু তাতে শুধু ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। প্রথমত, আখ্যানধর্মী কাহিনিগুলির আকর্ষণ ছিলো অমোঘ। সেই কাহিনিতে দেব-দেবী ও মানুষের সহাবস্থানের সামাজিক রূপ ধরা পড়েছে। তাছাড়া সমাজকেও তৎকালীন কবিরা পুরোপুরি উপেক্ষা করেননি। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সমাজের বাস্তবসম্মতরূপের অনুসন্ধান করা তাই সম্ভব হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা কাহিনিতে বাস্তবজগতের পাশাপাশি অদ্ভুত দক্ষতার অলৌকিক বিষয় সংযুক্ত করেছেন। এমনই বহুবিধ বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের অবয়ব।

সংস্কৃত পুরাণ থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি সঞ্জাত এমন প্রাথমিক ধারণা সমালোচকগণ বহন করে চললেও বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণ থেকে পুরোপুরি উদ্ভূত তা বলা যায় না। সুকুমার সেন বলেছেন,

> 'গ্রাম-দেবদেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপন উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাহিনী ও রূপকথা একত্রিত হইয়া যে গেয় আখ্যায়িকা কাব্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই ব্রতগীত-পাঞ্চালী বলিতেছি। তিন দেবতাকে লইয়া এই কাব্যগুলি লেখা হইয়াছিল। মনসাকে লইয়া মনসাবিজয় (মনসামঙ্গল), চণ্ডীকে লইয়া চণ্ডীমঙ্গল আর ধর্মকে লইয়া ধর্মমঙ্গল'।[১]

মঙ্গলকাব্যের গঠন সুনির্দিষ্টভাবে চার খণ্ডে বিভক্ত (বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তি, দেবখণ্ড, নরখণ্ড) – ধরাবাঁধা ছকে আবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ ছকে কবিদের কাহিনির স্বাতন্ত্র্য দেখানোর কোনো সুযোগ

ছিলো না। তা সত্ত্বেও মুকুন্দ চক্রবর্তী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ভারতচন্দ্রর মতো কবিরা অসামান্য প্রতিভাশালী ছিলেন বলেই নিজস্বতা দেখাতে পেরেছেন।

কে এই দেবী চণ্ডী ?

দেবী চণ্ডীর উদ্ভব প্রসঙ্গে ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'দ্রাবিড় ভাষাভাষী দৃশ্যত আদি-অস্ত্রাল (Proto-Astraloid) জাতীয় ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওঁরাও নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়।'[২] চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত অর্থাৎ কোনো জনজাতির ভাষা থেকে পরবর্তীকালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান পেয়েছে। আবার সুকুমার সেনের মতে,

> 'চণ্ডীমঙ্গল পাঞ্চালীতে যে দেবীর মহিমা গীত তিনি আসলে রুদ্রাণী চণ্ডী ছিলেন না, যদিও তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনার বহু শত বৎসর আগেই শিবভার্যার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছেন।'[৩]

চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী অরণ্যবাসী বা বিন্ধ্যবাসিনী, তিনি চণ্ডমুণ্ডমহিষাসুর বিনাশিনী নন, তিনি অভয়া। কিন্তু অধিকাংশ চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডের কাহিনি শিব-পার্বতীর পরিচিত পৌরাণিক কাহিনিকে তুলে ধরেছে। পশুগণের গোহারিতে অরণ্যবাসী চণ্ডীকে পাওয়া যায় যার বাহন গোধিকাকে ব্যাধ কালকেতু ঘরে নিয়ে যায়। আবার ফুল্লরা যে ষোড়শীকে ঘরে দেখতে পায় প্রকৃত রূপে তিনি পৌরাণিক দেবী চণ্ডী। এভাবেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবিরা অতি সুচারু দক্ষতায় পৌরাণিক ও অপৌরাণিক চণ্ডীর রূপকে বয়ন করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবী দুর্গা বাংলায় মুসলমান শাসনের অনেক আগে থেকেই বন্দিত কারণ তিনি পৌরাণিক দেবী। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম প্রধান সচিব হলায়ূধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে দেবী চণ্ডীর পুজোকে ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্মের অঙ্গ হিসেবে দেখিয়েছেন। ড.তপোধীর ভট্টাচার্য 'সংস্কৃত পুরাণ থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্য' প্রবন্ধে বলেছেন 'খ্রিস্টীয় বারো শতকে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি লোককথা হিসেবে যে প্রচলিত ছিল, তার ইঙ্গিত পাই 'ফুল্লরা' ও 'খুল্লনা' নাম দুটির ব্যবহারে।'[৪] তিনি আরো দেখিয়েছেন,-

> 'সঞ্চরমান এই সংশ্লেষণী ঐতিহ্যেরই প্রমাণ রয়েছে 'বৃহৎ ধর্মপুরাণ' নামক উপপুরাণের একটি শ্লোকে, যেখানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুটি প্রধান উপাখ্যানের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে
>
> ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি।
> যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।।
> শ্রীকমলবাহনৃপাদ বণিজঃ সসুনো।
> রক্ষেহম্বুজে করিয়েং গ্রসতী বনন্তী।।'[৫]

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলই সর্বাপ্রেক্ষা জনপ্রিয় হয়েছিলো তাই দুটি মঙ্গলকাব্যই সর্বাধিক কবির দ্বারা রচিত হয়েছিলো। মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের রচনাকাল ধরা যায়। এই দীর্ঘ কালপর্ব ধরে বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া আর কোনো সাহিত্য সংরূপ স্থায়িত্ব পায় নি। চারটি প্রধান মঙ্গলকাব্য (মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, অন্নদা) ছাড়াও অসংখ্য দেব-দেবীকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিলো।

কে পূর্ববর্তী - মানিক দত্ত না মুকুন্দ চক্রবর্তী ?

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় মানিক দত্তর কাব্যটিকে আদি কাব্য হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও মানিক দত্তর কাব্য রচনার সময় এখনো নির্ণয় করা যায়নি। তবে যেহেতু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে মানিক দত্তর নামোল্লেখ করেছেন তাই তাঁকে মুকুন্দের পূর্ববর্তী কবি হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। মুকুন্দর কাব্যে কবি-বন্দনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো -

মানিক দত্তরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।।
বন্দিলুঁ গীতের গুরু কবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া পিতামাতার চরণ।

মুকুন্দরামের কাব্যরচনা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বলে ধরা হয়। যদিও তাঁর কাব্যের সময় নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে। তাঁর কোনো বইতে কাল নির্দেশক একটি শ্লোক পাওয়া গেছে-

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় ১৪৯৬ শক অর্থাৎ ১৫৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু কাব্যে আছে মুকুন্দ যখন দেশভাগ করেন তখন মানসিংহ 'গৌড় অধিপ'। ইতিহাসের তথ্য অনুসারে ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানসিংহ বঙ্গের সুবাদার পদে ছিলেন। সেই হিসাবে মুকুন্দ এ সময় গৃহত্যাগী হলে তাঁর কাব্য রচনা কিছুকাল পরে হওয়ার কথা। আবার রঘুনাথ রায়ের রাজ্যাধিকারের সময় ১৫৭৩ খ্রি থেকে ১৬০২-০৩ খ্রি। তাহলে আবার বাঁকুড়া রায়ের সঙ্গে মুকুন্দের দেখা হয় না। সব মিলিয়ে মুকুন্দের কাব্য রচনার সময় নিয়েও সংশয় রয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের অধিকাংশ বই-এর মতো মুকুন্দের বই-এর কাল অনুমান করে নিয়েছেন পণ্ডিতরা। তাঁরা মুকুন্দকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের বলে মনে করা হচ্ছে। সেইসূত্রে মানিক দত্তর কাব্য মুকুন্দর কাব্যের পূর্ববর্তী এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। যদিও দীনেশচন্দ্র যেন মানিক দত্তকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখক বলে মনে করেছিলেন। আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি পুথির সন্ধান পান যেটি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। আর তিনি মনে করেন 'ইহার অন্তত একশত বৎসর পূর্বে পুথিটি রচনা হওয়া সম্ভব।' কিন্তু এটি ধরে নিলে মানিক দত্তর কাল মুকুন্দের পরবর্তী হয়ে পড়ে। তাই এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা যায়, পূর্ব সিদ্ধান্তটি বেশি গ্রহণযোগ্য।

মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল বইটি সুনীলকুমার ওঝা বইটি সম্পাদনা করেন। তিনি বই-এর ভূমিকায় পুথিটি সংগ্রহ করার ইতিহাস জানিয়েছেন।

> 'শুধুমাত্র মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল পালাগানের গায়ক মালদা জেলার মাত্র দুইটি থানার কিছু কিছু অঞ্চলে বর্ত্তমান দেখা যায়। থানা দুইটি যথাক্রমে হবিবপুর ও বামনগোলা। এইসব অঞ্চলের গায়কদের নিকট হইতেই আমি মৎকর্তৃক সম্পাদিত এই বই-এর অংশগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।'[৬]

এই অঞ্চলে যে মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের প্রচলন ছিলো (কারণ বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭ খ্রিঃ)। তিনি বই-এর ভূমিকায় জানিয়েছেন-

> 'ঐসব অঞ্চলের লোকেদের তথা রাজবংশী সমাজের একটি বিশেষ প্রচলিত নিয়ম এই যে বিবাহের সময় তাহাদের মঙ্গলচণ্ডী অর্থাৎ অষ্টমঙ্গলা গাহিতেই হইবে; তাহা না হইলে বিবাহ অমঙ্গলকর হইবে। এই প্রচলিত মতটিও আর সর্বত্র বর্ত্তমান নহে। যাঁহারা মোটামুটি সচল তাঁহারা পাড়া প্রতিবেশীর ধরিয়া গ্রামের নাম সঙ্কীর্তনের খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া দায়সারা মত এক আধপালা মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাহিয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন পাছে অমঙ্গল হইতে পারে এই আশঙ্কায়।'[৭]

মানিক দত্তের কাব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি একাধারে কবি ও গায়ন ছিলেন। তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে সেই প্রমাণ বর্তমান। নাচারী, দিশা, পদ এই তিনটি বিষয়ে কাব্যদেহ নির্মাণ করেছে। গ্রন্থোৎপত্তির অংশ থেকে জানা যায় কবির বাড়ি ছিলো ফুলফুল্যা গ্রামে, কবি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবীর আশীর্বাদে তাঁর পঙ্গুত্ব দূর হয়। দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন তাঁর প্রদত্ত শ্লোক পাঠ করে কবি যেন কাব্য রচনা করেন। কিন্তু প্রথমে কবি সেই স্বপ্নাদেশকে গুরুত্ব দেননি। দেবী তখন আবার দেখা দিয়ে তাঁকে কাব্য রচনা করতে বলেন। তখন কবি কাব্যরচনা করে বিভিন্ন অঞ্চলে পালাগান ছড়িয়ে দেন। কবি যে প্রথমে দেবীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করলেন, এর থেকে কি অনুমান করা যায় তখনো দেবী চন্ডীর পালা তেমন প্রচলিত হয় নি? এ কি প্রথম চন্ডীমঙ্গলের লক্ষণ?

মানিক দত্তর কাব্যের দেবী দুর্গার স্বরূপ :

সৃষ্টিপালা দিয়ে কাহিনি আরম্ভ হয়েছে যেখানে আদিদেব ও আদ্যাদেবীর জন্ম বৃত্তান্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যের অনুসরণে। কিন্তু মুকুন্দের কাব্যে বন্দনা অংশ বেশ বিস্তারিত। সেখানে গণেশ বন্দনা, সরস্বতী, শিব, লক্ষ্মী, রাম, চণ্ডী, শুকদেব ও চৈতন্য বন্দনা রয়েছে। চৈতন্য বন্দনা থেকেই অনুমান করা যায় গ্রন্থটি চৈতন্য-পরবর্তী। মানিক দত্তর কাব্যে এতো বিস্তারিব দেব-বন্দনা নেই। তাঁর কাব্যে দেবী এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু ব্রাহ্মণ তাকে হাঁড়িতে করে জলে ভাসিয়ে দেয়। হিমালয় তাকে নিয়ে এসে মেনকার কাছে দেন। মেনকা তাকে নিজের মেয়ের মতোই প্রতিপালন করতে থাকেন। গৌরী ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। পাঁচ বছরে তার কর্ণভেদ অনুষ্ঠান হয়। হিমালয় তাকে শিবপূজা করতে বলেন এবং দেবী পিতার আজ্ঞায় শিবপূজা করেন। এমন সময় তারকাসুর স্বর্গে নানাভাবে বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য শিবের পুত্র কার্তিকের জন্মের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিবের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য মদন বা কামদেব ভস্মীভূত হয়। রতিকে সরস্বতী বলেন কামদেব আবার সম্বর ধীবরের ঘরে জন্মগ্রহণ করবে।

দুর্গা শীত, গ্রীষ্ম তপস্যা করে শিবকে বিয়ের বর লাভ করেন। নারদ শিব-পার্বতীর বিয়ের ঘটকালি করে এবং হিমালয়ের কথানুসারে সব দেবতাকে নিমন্ত্রণ করে আসে। কিন্তু সকল দেবতারা শিব যেহেতু শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়, তাই বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। তারা শর্ত দেন যদি গঙ্গা শিবের ঘরে আসে তবেই তারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে। শিব তখন শান্তনুর কাছে গঙ্গাকে আনতে যান। শান্তনু তাকে গঙ্গাকে এক রাতের জন্য দিতে রাজি হন একটি বারের জন্য – 'রাত্র মধ্যে গঙ্গা আনিঞা দিহ তুমি/প্রভাত হইলে গঙ্গা না লইল আমি। 'কিন্তু নারদ বিয়ের রাতে ঝগড়া আরম্ভ করায় ভোর হয়ে যায় তাই শান্তনু আর গঙ্গাকে ফেরোত নিতে অস্বীকার করেন। 'দুষ্টা করিঞা গঙ্গা দিতে চাঅ মোর।/ আজি হৈতে গঙ্গা দিলাঙ তোমারে।।' অপবিত্র, স্বামী পরিত্যক্ত গঙ্গাকে শিব মাথায় আশ্রয় দেন।

এরপর শিব-পার্বতীর বিয়ের কাহিনি অতি পরিচিত ছকে এগিয়েছে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে। কেবল শিবের অধিবাসে দই, দুধ, কলা ইত্যাদি নারদ ও ভীম মিলে নিয়ে গেছে। রাস্তায় নারদের খিদে পেলে দুজনে মিলে অধিবাসের জিনিস খেয়ে নিয়ে তাতে কাদা, কলার খোসা ভর্তি করে দেয়। এই ঘটনা গ্রাম্য রসিকতাকে প্রশয় দিতে মানিক দত্ত সংযোজন করে থাকতে পারেন। এরপর কাহিনিতে মেনকার বুড়োশিবকে দেখে বিরাগ, শিবের মোহিনীরূপ ধারণ ইত্যাদি মোটামুটি শিবপুরাণ বা অন্যান্য পুরাণ কাহিনিকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে। মুকুন্দের কাব্যে

যা বিস্তারিতভাবে দেখা গেছে মানিক দত্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। এরপর গণেশের জন্ম ও শনি দ্বারা গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ এবং গজের মুণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয়।

পরের অংশে মানিক দত্ত মার্কেণ্ডয় পুরাণের মার্কেণ্ডেয় চন্ডীর রূপ ও কাহিনি অনুসরণ করেছেন।

একদিন বিষ্ণু কর্ণেতে হস্ত দিল।
কর্ণমূলে মধুকৈটভ অসুর জন্মিল।।
জন্মিতে ২ অনেক অসুর হৈল।
লেখা জোখা নাই অসুরময় হৈল।।

বিষ্ণু অসুর নিধন করতে গেলেন কিন্তু এক অসুরের রক্ত থেকে অজস্র অসুরের জন্ম হতে লাগল। তখন সকলে মিলে দেবী দুর্গাকে অসুর নিধন করার জন্য অনুরোধ করে।

অসুর মারিতে দুর্গা সাজিল জখন।
দুর্গাকে ত্রিশুল আনি দিল শূলপানি।।
...জমরাজ দুর্গাকে দিল জমদণ্ড।
সকল দেবের অস্ত্র পাঞা হইল প্রচণ্ড।।
ভঅঙ্কর মূর্ত্তি দুর্গা হইল প্রচণ্ড।
...দশ হস্তে দুর্গা মাতা দশ অস্ত্র লৈল।
মহিসাসুরের দুর্গা মুণ্ড কাটি নিল।।
তার মাংসে কত অসুর জন্মিল।।
দশ হস্তে দুর্গা মাতা দশ অস্ত্র ধরে।
ক্রোধিত হইঞা দুর্গা অসুর সংহারে।।

এভাবে দেবী শুম্ভ নিশুম্ভকেও বধ করেন। রক্তনদীতে যখন পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে এবং দেবী রণরঙ্গিণী চামুণ্ডা রূপে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে তুলেছেন তখন ব্রহ্মা শিবকে রণক্ষেত্রে গিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন কারণ নয়তো সৃষ্টি নাশ হবে। দেবী হুঙ্কার ছেড়ে শিবের বুকে চড়ে বসলেন এবং 'দন্তে জিহবা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল'। এভাবে কালিরূপ প্রাপ্ত হলেন দেবী।

বুধবারের দিবাপালাতেও দেবী অবলীলায় ধুম্রলোচনের মতো অসুরকে শিবের আজ্ঞানুসারে অবলীলায় ধ্রুমলোচন ও তার সঙ্গীদের বধ করেন।

মর্তে দেবী পুজো প্রচারের আশায় সুরথ রাজাকে স্বপ্না দেখিয়ে দেহরা নির্মাণ করে 'দশভুজা' দেবীর পশুবলিসহ পূজা প্রচারের নির্দেশ দেন এবং মানিক দত্তকেও স্বপ্নাদেশ দিয়ে কাব্য রচনা করতে বলেন। কবিকে তিনি একখানি তিনলক্ষ নাচাড়ীযুক্ত 'দুর্গামঙ্গল' নিয়ে কাব্য রচনা করতে বলেন। কবি তার মধ্য থেকে তিনশো পদ নিয়ে পদ, দিশা যোগ করে কাব্য রচনা করে গান করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর গানে সকলে এতোই মোহিত হয়ে গেলো যে সকলে রাজসভা যাওয়া ছেড়ে নিয়ে লাচারী শুনতে লাগলো। রাজসভা শূন্য দেখে সুরথ রাজা রেগে গিয়ে মানিক দত্তকে বন্দী করলো। তখন দেবী রাজার প্রতি রুষ্ট হয়ে 'বিকট বদন' রূপে আবির্ভূত হলেন।

বুকেতে বসিয়া কোপে দেবি মহামায়া
মূর্ত্তি ধরে বিকট বদন।
ষোলশত দৈত্য দানা সঙ্গেতো করিয়া
কোপে হইল চৌদ্দতাল।।

রাজাকে তুলিয়া মারে শেল ধরে বাম করে
ত্রাশে রাজা কাঁপে থর থর।।

রাজা দেবীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে পরিত্রাণ পেলেন ও দেবী পুজোর বন্দোবস্ত করলেন। রাজা দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন যে তিনি দেবীর পুজো করছেন কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় দেবীকে দেখলেন না। দেবী তখন তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য দশভুজা রূপে আবির্ভূত হলেন। রাজা তার দশ হস্তের কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেবী প্রতিটি হস্তের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন। বামহস্তে তিনি মঙ্গলবার যে পূজা করেন তার পূজা গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি কোনো হস্তে ভক্ততারিণী, কোনো হস্তে বিশ্বম্ভরী- মহিষাসুরের চুল ধরেছিলেন, কোনো হস্ত শাকাম্বরী। তেমনি দক্ষিণ হস্তে তিনি অস্ত্রধারিণী, সমরতারিণী, রিপুসংহারিণী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপের ব্যাখ্যা দেন দেবী।

মুকুন্দের কাব্যে শিবের বিবাহের পর শিব-পার্বতী মেনকার ঘরে বসবাস শুরু করে। এই নিয়ে মেনকা ও উমার মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। মেনকার অভিযোগ শিব কোনো কাজ না করে বসে বসে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করছে এমনকী উমাও সংসারের কোনো কাজ করে না। সখীদের সঙ্গে তাস-পাশা খেলে সময় কাটায়। পার্বতী মায়ের এই গঞ্জনা মেনে নেয় না। তার স্বামীকে বিবাহের সময় যে জমি যৌতুকে দেওয়া হয়েছিলো তা দিয়েই তাদের ভরণ পোষণ চলার কথা। তবু এই অপবাদ দূর করার জন্য স্বামীকে নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র সংসার স্থাপন করেন।

শিব-পার্বতীর আলাদা সংসারেও অশান্তি লেগে থাকে। কারণ শিব ভিক্ষা করে তেমন কিছু রোজগার করে না কিন্তু তাঁর আহারের ফর্দ বিশাল। এই নিয়ে শিব-পার্বতীর কলহ লেগেই থাকে। তার উপর গণেশের ইঁদুরের যন্ত্রণা, কার্তিকের ময়ূর ও শিবের ভূষণ সাপের প্রতিনিয়ত লড়াই চলতে থাকে। এই অশান্তি নিষ্কৃতি পেতেই সখী পদ্মার সঙ্গে পরামর্শ করে মর্ত্যে পূজা প্রচারের পরিকল্পনা করেন। অর্থাৎ মুকুন্দের কাব্যে দেবী চণ্ডীর পারিবারিক কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে অন্যদিকে মানিকের কাব্যের দুর্গা শত্রুবিনাশিনী।

মানিক দত্তর কাব্যে ইন্দ্রের কাছ থেকে নীলাম্বরকে পাওয়ার জন্য দেবী ইন্দ্রকে সিংহবাহিনীরূপে প্রতিভাত হন। পশুদের দ্বারা পূজা পাওয়ার জন্য দেবী চণ্ডী বীজুবনের সৃষ্টি করেন কিন্তু প্রাণীদের তাঁর অনুগত করার জন্য তাদের কোনো খাদ্যের ব্যবস্থা করেন নি। পশুরা অসহায়ভাবে সেই বনে কান্নাকাটি করতে থাকলে শিব সেই বীজুবনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তা লক্ষ্য করেন এবং কৃপাবশত পশুদের খাদ্যের সংস্থান করেন। এতে পশুরা শিবের অনুগত হয়ে পড়ে। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কারণ তাঁর পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেল! শিবকে গিয়ে তিনি কৈফিয়ত চান। শিবও বলেন পশু সৃষ্টি করে তার খাবারের ব্যবস্থা না করা অত্যন্ত অনৈতিক কাজ। কিন্তু দেবী চণ্ডী ক্রুদ্ধ হন কারণ যে দেবী পশুদের সৃষ্টি করলো তারা তাঁকে পূজা না করে শিবের পূজা কীভাবে করে? এই অংশটিতে মানিক দত্তর নিজস্বতা দেখা যায়, অন্য চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেখা যায় না। এখানে থেকে শিব ও পার্বতীর অর্থাৎ শৈব ও শাক্তের Power Politics বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এখানে শিব-পার্বতীর দ্বন্দ্ব নিছক দাম্পত্য কলহ নয়, ক্ষমতার লড়াই।

এরপর চণ্ডীমঙ্গল কাহিনির ঐতিহ্য অনুসরণ করে কালকেতুর জন্ম, বিবাহ, পশুদের গোহারি ও গোধিকারূপে দেবীর কালকেতুর ঘরে আগমন ঘটে। ফুল্লরা সুন্দরী রমণীরূপী দেবীকে সতীন ভেবে নিজের দুঃখের কথা জানাতে থাকে। এমনকী দেবীকে দুষ্ট নারী রূপে কটু কথাও বলে। দেবী ফুল্লরার মূঢ়তায় হাসতে থাকেন। কালকেতু ফিরে এলে ভবানীর ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে ও তাঁর স্তব করে।

জয় ২ ভবানী   রিপু নাশিনী
জগত জননী মহামায়ে।
হাম নর হীন বুদ্ধি   কৃপা কর ভগবতি
শরণ লইলাম তুয়া পায়ে।

ব্যাধখণ্ডের শেষে রাজাকে আবার দেবী দনুজদলনী দশভুজা রূপে দেখা দেন। ব্যাধখণ্ডে এভাবেই প্রতি ক্ষেত্রে দশভুজারূপে দুর্গাই কাব্য জুড়ে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ দুর্গামঙ্গলে দুর্গার রূপ চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিতে বেশি ধরা পড়েছে যা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় না। কাহিনিটি চণ্ডীমঙ্গলের কিন্তু দেবী রূপে তিনি দশভুজা। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের দেবীরূপের সঙ্গে এখানেই মানিক দত্তর চণ্ডীমঙ্গলের দেবীস্বরূপের পার্থক্য।

ব্যাধখণ্ডে দেবীর রূপ যতোটা দেখা যায় বণিক খণ্ডে দেবী ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করলেও সরাসরি কম আবির্ভূতা হয়েছেন। তবে দেবী এখানে কখনো বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী রূপে কখনো বোলতা রূপ নিয়েছেন কার্যসিদ্ধির জন্য। আর খুব বিখ্যাত কমলেকামিনী রূপকে মানিক দত্ত খুব বিস্তারিত ভাবে দেখাননি।

শ্রীমন্তর সঙ্গে রাজা মানসিংহের যুদ্ধে দেবী সম্পূর্ণ সহায়তা করেছেন। মশানে দেবী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী রূপে এসে শ্রীমন্তকে নাতি হিসাবে দেখেন। 'চামুণ্ডার বেশে দুর্গা হৈল ভয়ঙ্কর।/ ডাহিন হস্তে খাণ্ডা নিল বাম হস্তে খাপর।।/দন্ত কড়মড়ি জিভ্যা লহ ২ করে।।/ নরমুণ্ড পাখি দুর্গা মুন্ডমালা পড়ে।।

রাজার সেনারা পরাস্ত হলে শ্রীমন্তর সঙ্গে মানসিংহের অন্যান্য সেনাপতি কালু দণ্ড, ভীমসাম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এদের পরাক্রমে প্রথমে শ্রীমন্ত ভয় পেয়ে যায় কিন্তু দেবী তাকে আশ্বস্ত করেন ও সাহস দেন। সেই ভরসায় শ্রীমন্ত একে একে সকল শত্রুকে বিনাশ করেন, এমনকী মানসিংহকে হত্যা করেন। এই রণক্ষেত্রে শেল, বন্দুকের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। রাজা শালবানকে শিব শক্তিশেল দিয়েছিলো। সেই শেল শালবানের সেনারা নিক্ষেপ করতে থাকে। সেইসব শেলাকে দেবী দশ হস্তে ধারণ করেন এবং 'শেলকে ফিরাএ দুর্গা মন্ত্রের প্রতাপে।' দুর্গা খড়্গা দিয়ে সেনার মুন্ড কাটেন, নরমুণ্ড কেটে রক্ত পান করেন - এই চামুণ্ডা রূপে দেবীকে আমরা দেখতে পাই।

চামুণ্ডার বেশে দুর্গা ঘোর রণ করে।
মার ২ ডাকর ছাড়ে মশান ভিতরে।।
হুহুঙ্কার ছাড়ি রণ করে বাহুবলে।
রথারথি হস্তী ঘোড়া ধরি গিলি ফেলে।।

এভাবে সামগ্রিকভাবে আমরা মানিক দত্তর চন্ডীমঙ্গলের উভয় খণ্ডে দেবী দুর্গার বিভিন্নরূপ দেখতে পাই যার মধ্যে ভয়ঙ্কর রূপ স্থান পেয়েছে যা মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গলে সেভাবে দেখা যায় না। সাধারণত মনসার দেবীর ক্রুরতার সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীও বেশ ভয়ঙ্কর তবে তা সম্পূর্ণ পুরাণ-অনুসারী (মূলত মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। দেবী দুর্গার অসুরবিনাশিনী পৌরাণিক রূপ তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলো বলেই হয়তো মানিক দত্ত তা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তার ফলে পৌরাণিক ও অপৌরাণিক রূপের সংযোগে কিছু ব্যবধান থেকে যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তী তার অল্প কিছু কাল পরের কবি হওয়া সত্ত্বেও অসুরবিনাশিনী রূপের চেয়ে পারিবারিক দেবীরূপকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ-১৫৭।
২. আশুতোষ ভট্টচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, সপ্তম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ- ৩৪৫।
৩. সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ- ৪১২।
৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুরাণ থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্য, কোরক, মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা, শারদ ২০১৬, পৃ- ৬৪।
৫. তদেব।
৬. ড. সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, ভূমিকা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪।
৭. তদেব।

- মানিক দত্তর কাব্যের উদ্ধৃতিসমূহ ড. সুনীলকুমার ওঝা দ্বারা সম্পাদিত বই থেকে গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (নির্বাচিত) ছোটগল্প : স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা

পুষ্পা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম আশ্চর্য প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছোটগল্পে নারীর বঞ্চিত বেদনাহত চিত্র তুলে ধরেছেন। ছোটগল্প রচনার ঊষালগ্নে তিনি গ্রাম- বাংলার পল্লী প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য, মানব জীবনের সমস্যা, রহস্যময় মন, মনের জটিলতা, নারীর অস্তিত্ব সংকট ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন। তবে সাহিত্য জগতের শেষ বয়সে এসে তিনি নারীকেই তাঁর সাহিত্যের শীর্ষস্থান দিয়েছেন। নারীর দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের মহিমা, নারী তার সংকট-সমস্যার উত্তরণ, আত্মমর্যাদার অধিকার লাভ, অন্দরমহলের গন্ডি পেরিয়ে ও পুরুষশাসিত সমাজের বাঁধা প্রতিহত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের বিষয়ই তাঁর গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর অবদান দেখানোর চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছোটগল্প, নারী, স্বাধীনতা সংগ্রাম।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় তাঁর বিচরণ ছিল। ১৮৯১ সালে 'হিতবাদী' পত্রিকায় গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে ১৯৪০ সাল 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্প সুদীর্ঘ এই পঞ্চাশ বছরে তিনি বিচিত্র বিষয়ে অজস্র গল্প লিখেছেন। ছোটগল্প রচনার অজস্র উপকরণ মূলত তিনি পেয়েছিলেন শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শনে গিয়ে। এরপর মানুষ, প্রেম, প্রকৃতি বিষয়ে তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন। তবে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের নজরআন্দাজ করেননি। উনিশ শতকে নারী আন্দোলনের পর বিশশতকে নারী পুরুষের সম অধিকার, নারীর আইনি অধিকারের পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের স্পষ্ট প্রমাণ হল রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'নারী' প্রবন্ধটি।

'নারী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন –"পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে।অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থার ভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজ শাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করছিল ঘরের কাজ।এই সভ্যতা হয়েছিল একঝোঁক। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয় ভান্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পরেছিল। আজ ভান্ডারের দ্বার খুলেছে।... ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে।"[১] তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পের বিষয়বস্তুতে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর প্রসঙ্গ রয়েছে; যার মধ্যে 'বদনাম', 'সংস্কার,' 'নামঞ্জুর গল্প' অন্যতম।

'বদনাম' গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদেরও দেশের কাজে নিযুক্ত হতে বলেছেন, তা সৌদামিনীর বক্তব্যে স্পষ্ট "মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোলো- আনা কাজে লাগতে পারে।"[২] আলোচ্য গল্পে সৌদামিনীর স্বামী বিজয় পেশায় পুলিশ ইন্সপেক্টর। দীর্ঘদিন বিপ্লবী

অনিলকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। অথচ সে তার বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। বিজয় বাবুর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী সৌদামিনীর হাতে ভাইফোঁটা নিয়ে যায়। সৌদামিনীও অনিল কে ভাইয়ের মতো স্নেহ করতো। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তর্কবিতর্ক সৃষ্টি হলে সৌদামিনী জানায়-"পুলিশের ঘরের গিন্নি কি আসামীর ঘরের দিদি হতেই পারে না। সংসারের সব সম্বন্ধই কি সরকারি খামের ছাপ-মারা।"[৩]

বিপ্লবী অনিলকে গ্রেপ্তার করার একটি প্ল্যান স্থির হয় মোচাকাঠির জঙ্গলে। চর নিতাইয়ের মতে মোচকাঠির জঙ্গলে বিপ্লবীদের মস্ত বড়ো সভা হয়। গোটা জঙ্গল ঘেরাও করলে তার আর পালাবার পথ থাকবে না। কিন্তু সেখানেও সে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। অনিল ছিল ভীষণ চালাক প্রকৃতির মানুষ। সে তার দলবলে ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে বেড়াত। আর সবথেকে বড়ো ব্যাপার সেই মিশনে তাকে একজন মেয়ে সহায়তা করে।

মোচকাঠির প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার পর বিজয় বাবু সৌদামিনীর শরনাপন্ন হয়। শিবরাত্রির দিন ঠিক হয় অনিলের সাথে সেই মেয়েটিকেও গ্রেপ্তার করার। কেননা বিজয় লোকমুখে শুনছে শিবরাত্রির দিন তারা দুজনে মিলে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে জপতপ করে। প্ল্যান অনুযায়ী মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলে দেখে –"শিবলিঙ্গের সামনে তার স্ত্রী জোড় হাত করে বসে, আর অনিল একপাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। নিজের স্ত্রীকে দেখে বললেন –"সদু অবশেষে তোমার এই কাজ!"[৪] প্রত্যুত্তরে সৌদামিনী জানায় – "হ্যাঁ আমিই সেই মেয়ে যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ।নিজে পরিচয় দেবে বলেই আজ এখানে এসেছি। তুমি তো জানোই আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা দেয়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই -সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে না পারি তবে আমাদের নারী ধর্ম কে ধিক।"[৫] সমাজকে উপেক্ষা করে সৌদামিনী বিপ্লবী অনিলকে শেষ পর্যন্ত সহায়তা করতে চায়। তবে স্বামীকে অযত্নে রেখে দেশ সেবায় মেতে থাকেনি, তার সৌদামিনীর জবানিতে স্পষ্ট –"প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে।"[৬] স্বামী সেবার পাশাপাশি সে দেশের কঠিন কাজে গোপনে নিযুক্ত থেকেছে। অতএব নারীর সংসারের প্রতি সেবা ও দেশের কঠিন কর্তব্য পালনের সমন্বয়কে লেখক খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

'সংস্কার' গল্পেও জাতীয় আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী স্ত্রী-স্বামীর দেশপ্রেমের দুই ভিন্ন মতাদর্শকে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত আলোচ্য গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র কলিকা গিরেন্দ্রের স্ত্রী। কলিকা নামটি তার বাবার দেওয়া। তবে নামের সাথে কলিকার স্বভাবের কোন মিল ছিল না, তার মতামত ছিল খুবই পরিস্ফুট। অন্যদিকে তার স্বামী গিরিন্দ্র যার নিজস্ব কোনো পরিচয় ছিল না। দলের লোক তাকে কলিকার স্বামী বলেই জানত। তার স্বনামের সার্থকতার প্রতি কেউ লক্ষ্যই করত না। আলোচ্য গল্পে কলিকা নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক মনে করে। তার প্রমাণ 'ধ্রুববতা' খেতাব। বড়ো বাজারে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে পিকেটিং করতে গিয়ে সে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয়। এই কারণে দলের লোক তাকে ভক্তিভরে সেই উপাধিটি দেয়। কলিকার মতে তার গ্রন্থবিলাসী স্বামী যথার্থ অর্থে দেশকে ভালোবাসেনা। কারণ সে দেশের তৈরি বস্ত্র অর্থাৎ খদ্দর যথার্থ স্থানে পরিধান করেনা। অন্যদিকে তার স্বামীর মতে বাহ্যিক পোষাকে, আচারে প্রকৃত দেশপ্রেম হয়না, খদ্দর বস্ত্র পড়া মালা তিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কার। দেশ মানে তার কাছে অসংখ্য, দরিদ্র অসহায়, নিপীড়ত দেশবাসী। গল্পে এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তর্কবিতর্ক হলে কলিকা জানায়-

"দেখো খদ্দর-পরার শুচিতা যেদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচারে যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখনি সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখনি সেটা হয় সংস্কার; তখন চোখ বুজে কাজ করে যায়, চোখ খুলে দ্বিধা করেনা।"[৭] এই কারণে নয়ানের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নে যাওয়ার পথে জাতবিচারের হীন সংস্কারের জন্য মেথরকে মার খেতে দেখেও কলিকার সহানুভূতি জাগে না। অতএব গল্পে বাহ্যিক আড়ম্বরে বিশ্বাসী কলিকার দেশপ্রেম যা প্রকৃত অর্থে দেশপ্রেম নয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদেরও যোগদানের বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'নামঞ্জুর' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারী জীবনের পরিণতিকে খুব সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় কথকের আত্মীয় সম্পর্কে পিসি দীর্ঘকাল পশ্চিমে থাকতেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর নিঃসন্তান পিসি সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং তিনি বঞ্চিত কথকে সন্তাসম স্নেহ করতেন। তবে নিঃসন্তান পিসিমার আর একটি স্নেহের পাত্রী ছিল– "বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তার মা ছিল পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে লালন পালন করেছেন – সে জানেও না যে, তিনি তার মা নন।"[৮] এই জাতপাতের ভেদাভেদ, আচার বিচার থেকে অমিয়াকে তিনি সবসময় দূরে রাখতেন।পড়াশোনায় সে প্রচন্ড মেধাবী ছাত্রী ছিল। প্রতিবছর অঙ্ক, ইংরেজীতে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে আসত। পড়াশোনার খ্যাতির পাশাপাশি একদিন সে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়। তার অসাধারণ নেতৃত্বের কারণে কলেজের বন্ধুরা তাকে 'যুগলক্ষী' বলে সম্ভাষণ করে। আন্দোলনে অংশগ্রহণের পর অমিয়া অনিল নামের এক ছেলের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়ায় এবং দুজনেই বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু অমিয়ার জন্মপরিচয় জেনে অনিল বিবাহ অস্বীকার করে অন্যত্র চলে যায়।

উপসংহারে এসে বলা যায় যে, নারীর গোপনে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে দেশের কাজে যুক্ত হওয়া, স্বামী স্ত্রী একসাথে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান এবং শেষে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীর জীবনের পরিণতিকে তুলে ধরে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।আর এই শতসহস্র নারীর যোগেই দেশের স্বাধীনতার কাজ দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পরিবর্ধিত সংস্করণ: পৌষ, ১৩৫৫, নারী, কালান্তর, কলকাতা, ২ বঙ্কিম চাটুর্জে স্ট্রীট, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ.৩৬০

২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় সংস্করণ: মাঘ, ১৪১৫, বদনাম, গল্পগুচ্ছ, কলকাতা, সাহিত্যম্, পৃ.৭৭৯।

৩) তদেব, পৃ.৭৭৭।

৪) তদেব, পৃ.৭৮১।

৫) তদেব, ৭৮২।

৬) তদেব, ৭৮২।

৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় সংস্করণ:মাঘ, ১৪১৫, সংস্কার, গল্পগুচ্ছ, কলকাতা, সাহিত্যম্, পৃ.৬৯১।

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় সংস্করণ:মাঘ, ১৪১৫, নামঞ্জুর, গল্পগুচ্ছ, কলকাতা, সাহিত্যম্, পৃ.৬৮১।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) দাশ, শিশিরকুমার, পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০০৭, বাংলা ছোটগল্প, কলকাতা ৭৩, দেজ পাবলিশিং।

২) চক্রবর্তী, সুমিতা, প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০০৪, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, কলকাতা,২৭ বেনিয়াটোলা লেন, পুস্তক বিপণি।

৩) ভট্টাচার্য, তপধীর,প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০৭, নারী চেতনা: মননে ও সাহিত্যে, কলকাতা, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, পুস্তক বিপণি।

৪) দাশগুপ্ত, কমলা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৬৭, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী, কলকাতা ৯, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, বসুধারা প্রকাশনী।

ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতশিল্পে প্রযুক্তির বিবর্তনে পাওয়ারলুম : প্রসঙ্গ জেলা বর্ধমান

পুলক বিশ্বাস
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: ইতিহাসের অনেক ভালো-মন্দ দিকের সাক্ষী বাংলার প্রাচীন তাঁতশিল্প। অবিভক্ত বাংলায় ঐতিহ্যময় তাঁতশিল্প ছিল বাংলার গর্ব। ঠিক ঐ সময় থেকেই অনেক সভ্যতায়, শিল্প সংস্কৃতির নিদর্শনকে বহন করে চলেছে এই তাঁতশিল্প। বাংলার তাঁতের সূক্ষ্ম ও অপূর্ব কারুকার্যে সেকালে উৎসাহ বোধ করতেন ইউরোপের অনেক সম্রাজ্ঞী এমনকি মোগল দরবারের সম্রাটরাও। তাই তাঁতের তৈরি ঢাকাই মসলিন পরিধানের উদ্দেশ্যে অনেকেই উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। ঐ সব পোশাক-বস্ত্রাদি দেখলে আজও উপলব্ধি হয় যে, তাঁতিরা শুধুমাত্র শ্রমিক নন, শিল্পীও বটে। ঐতিহ্যবাহী বাংলার এই বস্ত্রশিল্পের সূত্র ধরেই, আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে বর্ধমান জেলার হুগলি নদী তীরবর্তী অঞ্চলে তাঁতশিল্প ও শিল্পীদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট। বিশেষত প্রযুক্তির বিবর্তনে পাওয়ারলুমের দাপটে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ক্ষতিসাধন, একইসাথে হস্তচালিত তাঁতশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে এবং আধুনিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে কতটা সক্ষম এই সংক্রান্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। এ প্রসঙ্গে, ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের অগ্রগতিতে সমবায় সমিতিগুলি এবং সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে, সে বিষয়গুলিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।
মূল শব্দ: বর্ধমান জেলা, হস্তচালিত তাঁতশিল্প, পাওয়ারলুম, অস্তিত্বের লড়াই, সমবায় সমিতি।

বর্ধমান জেলা পরিচিতি ও জেলার তাঁতশিল্পের প্রাচীনত্ব:

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ) গ্রন্থে 'সূক্ষ্ম' ও 'রাঢ় দেশকে' অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে "রাঢ়ভূমি দক্ষিণে দামোদর এবং সম্ভবত রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাধারণত রাঢ়দেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ়ের অপর নাম সূক্ষ্ম। বর্ধমানভুক্তি বা বর্ধমান জনপদ এই রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত"।[১] বর্ধমানজেলা ২২.৫৬ অক্ষাংশ থেকে ২৩.৫৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬.৪৮ দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৮.২৫ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।[২] বর্ধমানজেলার ব্যাপক বিস্তৃতি হলেও বর্তমানে জেলার কাটোয়া ও কালনা মহকুমায় এই হস্তচালিত তাঁতশিল্পের প্রাধান্য রয়েছে। এক্ষেত্রে বর্ধমানজেলার তাঁতশিল্পের প্রাচীনত্বের প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। বর্ধমানজেলার তাঁতশিল্পের উদ্ভব কখন হয়েছে সে কথা সঠিক ভাবে বলতে না পারলেও, এই অঞ্চলের তাঁতশিল্প ছিল বেশ প্রাচীন। যেমন জানা যায়, কালনা মহকুমা এলাকায় তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় (১৮১২-১৮৮৫) নিজ উদ্যোগে তাঁত বসিয়েছিলেন। বিলিতি সুতো কিনে কালনায় তিনি প্রায় ১২০০ তাঁতি বসিয়ে নানান রকমের কাপড় তৈরি করে বিক্রির জন্য বাইরে রপ্তানি করতে থাকেন।[৩] আবার কাটোয়া মহকুমাতেও তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য 'কাটোয়া তাঁতশিল্প কেন্দ্র' গড়ে উঠেছিল। একটা পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে, ১৯৬৫ সালে কাটোয়া মহকুমা অঞ্চলে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত এবং সমবায় বহির্ভূত তাঁতের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ১৫,৯৮৪ টি।[৪] অতিপ্রাচীনকাল থেকে বর্ধমান জেলার মেমারি, মানকর, কালনা, কাটোয়া ও জামালপুর থানায় অনেক তাঁতির বাস ছিল। মানকরে একসময় ৪৬০

ঘর তাঁতি তসরের কাপড় বুনত, মেমারিতে ২০০ ঘর তাঁতি ছিল যারা সিল্কের গরদ সুতোয় মোটা কাপড় তৈরিতে নিযুক্ত ছিল। সেক্ষেত্রে তারা বছরে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের গরদ সুতোয় মোটা কাপড় বুনতো।[৫] স্বাধীনতা পরবর্তী এবং তার আরও পরে মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর টাঙ্গাইলের বাইশ গ্রামের তন্তুজীবী সম্প্রদায়ের একাংশ পচিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এসে বসতি গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে থেকে অনেকে আবার আত্মীয়তার সূত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বী সূত্র ধরে বর্ধমানজেলার কালনা ও কাটোয়া মহকুমা অধ্যুষিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।[৬] উদ্বাস্তু এই তাঁতশিল্পী সম্প্রদায়ের হাত ধরেই জেলার তাঁতশিল্পে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

গ্রামীণ গার্হস্থ্য কুটিরশিল্প হিসাবে বর্ধমান জেলার তাঁতশিল্প:

একথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলার বস্ত্রশিল্প মূলত একটি গ্রামীণ গার্হস্থ্য কুটিরশিল্প। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলায় তাঁতি প্রায়শই কৃষক কিংবা উল্টোটা, অর্থাৎ কৃষক অনেক সময় তাঁতিও। আসলে বস্ত্রশিল্প এখানে গ্রামীণ পারিবারিক কুটিরশিল্প ছিল বলে, কৃষক অবসর সময়ে তাঁত বুনত, তাঁতিও আবার ফাঁক পেলে চাষবাস করত। কাপড় বোনা ছিল কৃষিকাজের সম্পূরক। বর্ধমান জেলা 'বাংলার শস্যভাণ্ডার' হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় তাঁতি এবং চাষি উভয়েরই বিকল্প পেশার এই মেলবন্ধন বর্ধমানজেলার তাঁতশিল্পকে বাংলার অন্য জেলা থেকে আলাদা করে রেখেছে। তুলো থেকে সুতো কাটার মতো দক্ষতার কাজ করত তাঁতি-চাষি পরিবারের নারীরা। পুরুষের সাথে সমানতালে জেলার দক্ষ নারীশ্রমিকরা স্থায়ীভাবে তাঁতবস্ত্র উৎপাদন করে এবং সমান মজুরি পেয়ে থাকে। এই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের বিষয়টি বর্ধমানজেলার নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। বর্ধমানজেলার নারীরা তাঁতশিল্পে বিশেষ জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা বেশ সজাগও ছিল। তার প্রমান হিসাবে বর্ধমানজেলার তাঁতশিল্পে একাধিক 'মহিলা সমবায় সমিতি' গড়ে উঠার কথা বলা যায়। যেমন, কাটোয়া প্রাক্তন ছাটরি বয়ন টি.এস.এস লিমিটেড (Katwa Prakton Chhatri Bayan TSS Ltd), দক্ষিণ তেলিনিপাড়া মহিলা টি. এস.এস লিমিটেড (Dakshin Telenipara Mohila TSS Ltd), ইমসে মহিলা টি.এস.এস লিমিটেড (Imse Mohila TSS Ltd), উখড়া মহিলা টি.এস.এস লিমিটেড (Ukhra Mohila TSS Ltd), বঙ্গশ্রী মহিলা টি.টি.এস এস লিমিটেড (Bangashree Mohila TTS Ltd.), গোয়ারা মহিলা তাঁতশিল্প এস.এস লিমিটেড (Goara Mohila Tant Shilpo SS Ltd.) ইত্যাদি।[৭] নারীদের তাঁতশিল্পে অংশগ্রহণের বিষয়ে যেমন অম্বিকা দে টানাপোড়েন পত্রিকায় লিখেছেন-

"দিবস রাতি তাঁতীর মেয়ে
তাঁত বুনছে জোর
টের পায় না সন্ধ্যা কখন
কখন আসে ভোর"।[৮]

প্রযুক্তির বিবর্তনে পাওয়ারলুম ও সুরাটের শাড়ির রমরমা বাজার:

তাঁতশিল্পের এহেন সুদিনের চিত্র পাল্টাতে শুরু করে পাওয়ারলুমের দাপটে। হস্ত-তাঁতশিল্প তার গৌরব হারিয়ে ফেলতে থাকে। কারণ বাজারে কৃত্রিম সুতো বা পলিয়েস্টার সুতো, যা কিনা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, তা খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। এই তন্তু দিয়ে যন্ত্রচালিত তাঁত বা পাওয়ারলুমে নিকৃষ্ট মানের শাড়ি উৎপাদিত হচ্ছে। এই সব শাড়ি বর্তমান বাজারে বিক্রি হচ্ছে এক থেকে দেড়শো টাকায়। বাজারে কে কত সস্তায় শাড়ি দিতে পারে সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ফলে শাড়ির দাম কমছে এবং সাথে কমে যাচ্ছে শাড়ির মান। ইদানীং আবার উন্নতমানের

পাওয়ারলুম বা র‍্যাপিয়ার মেশিন এসেছে বড়ো বড়ো ধনী ব্যবসায়ীদের কাছে, যাতে একসঙ্গে পাশাপাশি দুইখানা শাড়ি প্রস্তুত হয় এবং চব্বিশ ঘণ্টায় চোদ্দ থেকে ষোলখানা শাড়ি তৈরি হচ্ছে। এই অঢেল পরিমাণ উৎপাদনের জন্যই বাজারে এত সস্তায় শাড়ি বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু এই মেশিন কোনও সাধারণ তাঁতির পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। কারণ এক একটি মেশিনের মূল্য ১৪ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা। তার ওপরে এর জন্য পাকা উঁচু ঘর ও অন্যান্য খরচ বাবদ অনেক টাকার দরকার। তাই এই মেশিন বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে চলে গেছে।[৯] এই সব তাঁতে খুব সহজে কম সময়ে অনেক সংখ্যায় বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। তবে যন্ত্রচালিত তাঁতে কাপড়ের গুণগত মান নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে। মানুষের কাজের সুবিধার কথা ভেবে বেশি উৎপাদনের আশায় প্রতিনিয়ত তাঁতের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তাঁতি জীবিকার তাগিদে অথবা চলমান গতিধারার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য তার শিল্পসত্তা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, যেখানে হস্তচালিত তাঁতে তাঁতি 'তাঁতশিল্পী', সেখানে যন্ত্রচালিত তাঁতে 'তাঁতশ্রমিক'। শিল্পী আর শ্রমিকের মধ্যে কতটা পার্থক্য তা সহজেই অনুমেয়।

একই সাথে সুরাটের শাড়ি বর্ধমানজেলা সহ এরাজ্যের তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এবিষয়ে জানা যায়, সুরাটের কম দামের শাড়িতে ব্যবহার করা হয় কম দামের পলিয়েস্টার সুতো। তবে ওখানকার পাওয়ারলুম মেশিন উন্নত হওয়ায় একসঙ্গে প্রচুর শাড়ি তৈরি করা যায়। সে কারণে সুরাটের পাওয়ারলুমে তৈরি শাড়ির দাম কম।[১০] পাওয়ারলুমের দাপটে পুরুষ শিল্পীরা যেমন কাজ হারিয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করেছে এবং ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে তেমনি বর্ধমানজেলার আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে নারীরা যে প্রভাব ফেলেছিল তাও ভেঙে পড়ে। প্রসঙ্গত, হস্তচালিত তাঁতশিল্পের আনুষঙ্গিক কাজ হিসেবে চরকা বোনার কাজ চলে এসেছে। যে কাজগুলি মূলত এই নারীরা ভালোবেসেই করে থাকতো। তার উল্লেখ্যও আমরা পাই যেমন,

"তাঁতির বাড়ি নকশার বাসা
চরকা তুলার ভালোবাসা
ভালোবাসায় কাটনা কেটে
হাটে সুতা বেঁচে গুনে"।[১১]

প্রযুক্তির কল্যাণে স্পিনিং মিলগুলি মাড় দেওয়া রঙ সহ বিভিন্ন সুতো বাজারে এনেছে, তাঁতিয়ানা ভাষায় যাকে বলা হয় 'পাড়ি সুতা'। গ্রামের মা-মাসি- ঠাকুমাকে কর্মহীন-অর্থহীন করেছে এই সুতো। সোজা কথায়, তাঁদের যেটুকু রোজগার হতো এই পাড়ি সুতো এসে, তা বন্ধ হয়েছে। ফলে, হস্তচালিত তাঁত যেমন সঙ্কটে পড়েছে, একইসঙ্গে ওই কাজও পড়েছে সঙ্কটে।

চালকল আসতে ঢেঁকি সরে গিয়েছে, ট্র্যাক্টর আসতে হাল-বলদ। তেমনই পাওয়ারলুম (এক সঙ্গে দুটো শাড়ি বোনা হয়) বা র‍্যাপিয়ার (এক সঙ্গে আটটি শাড়ি বোনে) হাতে-চালানো তাঁতকে কোণঠাসা করবে, এটা কি অবধারিত নয়? এই বিবর্তনকে 'যুগের হাওয়া' তত্ত্ব বলে মানা যেত, যদি না তাতে থাকত প্রতারণার দুর্গন্ধ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোনটা হাতে-বোনা শাড়ি আর কোনটা মেশিনের, কোনটা খাঁটি সুতির আর কোনটায় মিশে আছে পলিয়েস্টার (বাম্পার) সুতো, বোঝার উপায় নেই। পাইকারি হাট- বাজার, বুটিক- শোরুম তো বটেই, সরকারি দোকানেও পলিয়েস্টার-মেশানো, মেশিনে- বোনা শাড়ি বিক্রি হচ্ছে হ্যান্ডলুম বলে। এমন অগ্নিপরীক্ষা করতে হত না ক্রেতাকে, যদি হ্যান্ডলুম মার্ক-এর যথাযথ ব্যবহার হত। তবে হ্যান্ডলুমস রিজার্ভেশন অ্যাক্ট, ১৯৮৫ অনুসারে অন্তত এগারোটি পণ্য পাওয়ারলুমে তৈরি নিষিদ্ধ

করা আছে। তালিকার শীর্ষে শাড়ি, তার পর ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, প্রভৃতি রয়েছে। অথচ দেখা যায়, দেদার ভাবে এই পাওয়ারলুমে শাড়ি তৈরির কাজ চলছে।[১২]

পাওয়ারলুম আইনে সোচ্চার তাঁতশিল্পী সম্প্রদায়:

সরকারের এই দ্বিচারিতা তাঁতিসম্প্রদায় যে একেবারে মুখ বুঝে সহ্য করে গেছে তা কিন্তু নয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। ফুলিয়ার হরিপদ বসাক ১০.০১.২০১৮ তারিখে একটি R.T.I. করেছিলেন। তাঁর অনেকগুলি প্রশ্নের মধ্যে একটি ছিল, ভারত সরকার প্রবর্তিত 'The Handloom (Reservation of Articles for Production) Act 1985, dt. 29.03.1985 (amended vide. Notification No. 5.0.2160(E), dt. 03.09.2008' এই আইনটি কি তুলে দেওয়া হয়েছে নাকি নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে? অন্যথায় ১১ প্রকার কাপড় যা হ্যান্ডলুমের জন্য সংরক্ষিত তা এত প্রকাশ্যে পাওয়ারলুমে বোনা চলছে কি করে?[১৩] আবার ৩ জানুয়ারি, ২০২৩ পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের নিরোল থেকে ধনঞ্জয় গুই সহ চব্বিশ জন তাঁতি মুম্বাইয়ের খাদি কমিশনারকে চিঠি লিখে আর্জি করেন, খাদি সংস্থায় পাওয়ারলুমের কাপড় বিক্রি বন্ধ করতে উদ্যোগ করা হোক। না হলে পথে বসবেন তাঁতিরা।[১৪] এপ্রসঙ্গে ১৯৬৭ সাল থেকে Crafts Council of West Bengal-এর প্রধানের দায়িত্ব থাকা রুবী পাল চৌধুরী 'Handloom Reservation Act' চালু হয়েছিল, তার কি পুনরায় প্রয়োগ সম্ভব নয়? প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, "হাতের তাঁতকে রক্ষার জন্য এই আইনটি খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল এক সময়। কিন্তু বর্তমানে এই আইনটি শুধু কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। এখনও সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এই আইনকে বাস্তবায়িত করা অবশ্যই সম্ভব। কেন সম্ভব নয়? আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখন হ্যান্ডলুম নিয়ে এত বড়ো বড়ো কথা বলছেন, বিশ্বকর্মা প্রোগ্রাম হচ্ছে। তাতে কেন তাঁতিরা ঢুকছে না! সত্যিই যে কি করছে জানি না! চারিদিকে শুনছি অনেক কথাই। যদি সত্যি সত্যিই কিছু হয়, তা হলে খুব ভালো। আসলে আমাদের তো হাতের অভাব নেই। সেই হাতগুলিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, তাদের আবার উৎপাদনে ফিরিয়ে আনতে হবে। তা হলেই আমরা ফিরে পাব আমাদের ঐতিহ্যবাহী আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাপ্টসগুলিকে"।[১৫]

বর্ধমান জেলার তাঁতশিল্পে মহাজনি শোষণ:

এ তো গেলো যন্ত্র দানব ও সুরাতের কাপড়ের গহন লীলা। কিন্তু মহাজন নামক রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি মানুষরূপী শোষণ যন্ত্রের অত্যাচারও নেহাত কম ছিল না। তাঁতি সমাজের দর্পণ হিসাবে বাংলা সাহিত্যে এই চিত্র বারবার উঠে এসেছে। বিচিত্র ছিল এদের শোষণ পদ্ধতি, যখন কাঁচামাল প্রয়োজন, তখন তাঁত শ্রমিকদের কাঁচামাল দেওয়া হত কিন্তু দাম বলা হত না, আর যখন দেখা যায় বাজারে কাঁচামালের দাম বেড়ে গেছে, তখন কাঁচামালের দাম একেবারে হিসাব করা হত। কাপড় লেনদেনের ক্ষেত্রটা ছিল ঠিক উলটো। তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী প্রতিদিন নেওয়া হত এবং তার (তাঁতিদের) ভরণ-পোষণের জন্য ন্যূনতম কিছু মজুরি দেওয়া হত, এরপর বাজারে কাপড়ের মন্দা দেখা দিলে শ্রমিকের দেওয়া সমস্ত কাপড়ের দাম একসঙ্গে হিসাব করা হত, এই ব্যবস্থায় শ্রমিককে ঠকিয়ে তাদের নির্ধারিত মজুরি থেকে যথেষ্ট কম দেওয়া হত। এছাড়া মহাজনরা বিবিধ অজুহাতে তাদের উৎপাদিত কাপড় বা পণ্য সামগ্রীর মান ভালো হয়নি ইত্যাদি বলে ঠকাত, যথা-কাপড়ের জমিতে বুনন খারাপ, বুটি তোলা ঠিকমতো হয়নি, কাপড়ের আঁচলা হয়নি, ইত্যাদি বলে কাপড় বাতিল করত এবং তাদের মজুরি থেকে দাম কেটে নিত। এভাবে তাঁতিরা দিনের পর দিন মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণে নিঃস্ব এবং দরিদ্র হয়েছে কিন্তু মহাজনরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেই চলেছিল। এ প্রসঙ্গে অনন্তমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়াটি উল্লেখ্য-

"টাঙ্গাইল, তাঁতসিল্ক
জামদানী-টার
কতো রঙ কতো বুটি
কী বা সে বাহার,
পরে কতো ধনবতী
রূপমতি কন্যে

তাঁতীদের দিন কাটে
হা-ঘরে, হা-অন্নে,
কারিগর শিল্পীরা
আজও যেন অভাজন
তারা শুধু চাল কোটে
পিঠে খায় মহাজন"।[১৬]

জেলার তাঁত শিল্পে সমবায়ের সহযোগিতায় সমবায় সমিতি ও সরকারের ভূমিকা:

এই ধরনের নানা প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে আশার আলো দেখিয়ে ছিল তৎকালীন সমবায়গুলি। "সমবায়ের সহযোগিতায় সমবায়" (Co-Operation amongst Co-Operatives) এই মূল সূত্রটিকে বিপনন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। সংকটের কালই বোধহয় নব উদ্যমে জেগে ওঠার প্রেরণা যোগায়, নতুন করে বাঁচতে শেখায়। তন্তুজীবীদের দুর্দশাই বর্ধমান জেলার তন্তুবায়দের জীবনে তথা তাঁতশিল্পে নব দিগন্তের সূচনা ঘটিয়েছিল। সংকটের সেই দিনগুলিতে এই দুর্দশাগ্রস্ত তন্তুজীবীরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে আন্দোলন শুরু করে। নিপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্থ তন্তুজীবীদের সংকটমোচনে সমবায়ের গুরুত্বকে তুলে ধরতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেন-

"ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত,
দেখে যারে আয়রে আয়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়"।[১৭]

তাঁতশিল্পের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সমবায়গুলি বারবার অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। এছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁত বস্ত্র কিভাবে মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় তার জন্য সমবায়গুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন করে চলেছে। তবে দেখা গেছে, সমবায়ের জয়যাত্রার ইতিহাসও শুরু থেকেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জন্য এই আন্দোলন প্রায়শই বাধার সম্মুখীন হয়েছে। যেমন, যাদের নিজস্ব তাঁত ছিল না তাদের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দক্ষশিল্পী হিসাবেই অন্যের তাঁতে খেটে জীবিকা নির্বাহ করলেও তাদেরকে সমবায়ে যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে এর সমাধান সূত্র হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনে 'Loom less Co-operative Society' তৈরি করে দেওয়া হয়।[১৮] তবে এ ব্যাপারে চিরাচরিত মহাজনী শোষণ থাকলেও গরীব তাঁতিরা সেই শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সমবায়ের ছত্রছায়ায় আসতে তখনও সন্দেহের দোলাচলে ভুগেছেন। এছাড়াও যে দিকটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা হলো, সমবায় সমিতিতে অন্তর্কলহ, সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সংগ্রহ করে পরিশোধে আগ্রহের অভাব, সঠিক হিসাব না রাখা, সময়মত সাধারণ সভা না করা, সাধারণ সভ্যদের সঙ্গে সংযোগের অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি সমিতিকে অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন আসে, দুর্নীতি করার প্রথম প্রশ্রয়টা (কিংবা বলা চলে হাতে খড়ি) কে দেয়? কেন দেয়? সমবায় কর্মীদের সঙ্গে হস্ততাঁত অফিসের কর্মীদের তিক্ততা যেমন বাড়ছে, তেমনি দুর্নিবার লোভ উভয় পক্ষকেই মরিয়া করে তুলছে। একটু স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলেই তাই লেগে যাচ্ছে বাত-বিতণ্ডা, হাতাহাতি, শাসানী, হুমকি। অনর্থ ঘটবার উপক্রম হচ্ছে এবং ঘটছেও। তবে হ্যাঁ সহযোগিতা তারা করেন বৈকি। কিন্তু গাইড, ফ্রেন্ড ও ফিলসফার হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পৌঁছাতে পারেন না। তার

আগেই সমবায়কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করে।[১৯] এই তিক্ততা ক্রমেই বাড়ছে এবং বাড়ছে বিপদের আশঙ্কা।

একইভাবে বর্ধমানজেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আইন, নীতি, প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁতশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করেছে। তাঁতশ্রী, মঞ্জুষা, তন্তুজের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে করোনা পরবর্তী তাঁতের বাজারকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার সরকারি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও বর্ধমান জেলার হুগলি নদীর তীরবর্তী ধাত্রীগ্রাম ও পূর্বস্থলীতে দুটি সরকারি 'তাঁতের হাট' প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে জেলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস অনেকাংশেই সফল হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।[২০] তবে এক্ষেত্রেও দেখা যায়, একাধিক সরকারি প্রকল্প, নীতিগুলি খাতায়-কলমে রয়েছে অথচ বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ সেভাবে গ্রহণ করা হয়নি। রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাথমিক সমিতির অভিভাবকরূপে রয়েছে একটি শীর্ষ সংস্থা। তাঁতশিল্প সমবায়ের শীর্ষ সমিতির নাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তন্তুবায় সমবায় সমিতি যা 'তন্তুজ' বলে সাধারণ্যে পরিচিত।[২১] এর প্রধান কাজ তাঁত-সমবায়গুলির উৎপাদিত কাপড় কিনে তা সারা দেশে ছড়ানো, নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র মারফত বিক্রয় করা, আর উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ন্যায্যমূল্যে সমিতিগুলিকে সরবরাহ করা। প্রাথমিক সমিতিগুলিই যেখানে চলার দিশা পাচ্ছে না সেখানে শীর্ষ সমিতি তাদেরকে আলোর পথ না দেখিয়ে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটি পরিসংখ্যান দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরা হলো। ২০১৯- ২১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমাতে তাঁতের সংখ্যা হল ২৯ হাজার ২৮০ টি। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র সক্রিয় কো-অপারেটিভের অধীনে ৮ হাজার ১৮৫ টি তাঁত রয়েছে। একইভাবে জেলার কালনা মহকুমাতেও ২৫ হাজার ৩২১ টি তাঁতের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সমবায় সমিতির অধীনে তাঁতের সংখ্যা ১৫ হাজার ৬১৩ হলেও সক্রিয় সমবায় সমিতির অধীনে মাত্র ২০৫৬ টা রয়েছে।[২২] এর থেকেই কো-অপারেটিভের বাইরে মহাজন শ্রেণী সহ অন্যান্য সংগঠন গুলির প্রভাব সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। দুর্দিনের অন্ধকার শীঘ্র আবার ঘিরে ফেলল বুঝি- এই আশঙ্কায় শঙ্কিত এ রাজ্যের তাঁতশিল্পীরা।

উপসংহার:

জেলার তাঁতশিল্পের এহেন সংকটে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে দুর্দিনের কালো মেঘ দূরীভূত হওয়া দূরে থাক, ক্রমশ তা ঘনীভূত হয়ে তাঁতকে অন্তর্জলি যাত্রায় যাওয়ার দশায় এনে ফেলেছে। সঙ্গে যন্ত্রণা-কাতর করে তুলেছে তাঁতিদের জীবন, দুর্বিষহ করে তুলছে তাদের জীবনযাত্রা। মহাজনি শোষণ, সমবায় গুলির সদস্যদের অন্তর্কলহ, পাওয়ারলুমের দাপটে তাঁত শিল্পের যে ক্ষতি বিদ্যমান ছিল সর্বোপরি করোনা মহামারী তাঁত শিল্পের কফিনে শেষ পেরেক মেরে দেয়। কারণ এই মহামারি শুধু যে কাপড়ের বাজার নষ্ট করেছে তাই নয়, অনেক শিল্পীকে ঋণের জ্বালায় আত্ম-নিধনের পথ বেছে নিতে সাহায্য করেছে। প্রসঙ্গত, বেশিরভাগ তাঁত শিল্পীদের কাছে জি.আই ট্যাগ বা রিজার্ভেশন অ্যাক্টের সম্পর্কে কিছু জানা না থাকলেও তাদের একটাই দাবি পাওয়ার লুমে শাড়ি উৎপাদন যেভাবেই হোক বন্ধ করে দেয়া হোক। অন্য যেকোন ক্ষেত্রে পাওয়ারলুম ব্যবহারে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। আবার, তাঁতিদের একাংশের বরাবরই দাবি ছিল হস্তচালিত তাঁতশিল্পে হ্যান্ডলুম মার্ক ব্যবহার করা। যদিও এই মার্ক ব্যবহারের জটিলতার কারণে এখনো করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সবশেষে তবুও বলা যায়, তাঁতশিল্পীদের হার না মানা অদম্য শক্তি শিল্পের সংকটকালীন পরিস্থিতি থেকে বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাদের

এই লড়াইয়ে থাকার প্রাণবন্ত ইচ্ছা এবং তাঁতশিল্পের সুদিন ফেরার আশা শিল্পকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। অতীত ও বর্তমানের মতো তাঁতশিল্পীদের টানাপোড়েন এর মধ্য দিয়ে এহেন লড়াই ভবিষ্যতেও জারি থাকবে এটুকু আশা করা যেতেই পারে।

সূত্র নির্দেশ:

১। চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, ২০০০, *বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি (*দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, পৃ. ৯-১০।

২। তদেব, পৃ. – ১৩।

৩। দাস সুমাল্য (সম্পাদনা), ২০১৯, *ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি,* কালনা, তটভূমি প্রকাশনী, পৃ. ১১।

৪। চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬২।

৫। তদেব, পৃ. ৯৩।

৬। *টানাপোড়েন,* অগ্রহায়ন ১৪৩০, তন্তুবায় মুখপত্র, নবপর্যায়ে তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ৪৭

৭। Directorate of Textile, Govt. of West Bengal, Katwa Handloom Development Office & Dhartrigram Tant Haat Office.

৮। টানাপোড়েন, ১৯৯১, তন্তুবায় মুখপত্র, দশম বর্ষ, সমবায় সপ্তাহ সংখ্যা, পৃ. ১৫।

৯। সাক্ষাৎকার, দেবনাথ চিন্ময়, ৫ জুলাই ২০২৪, সমবায় সমিতির সদস্য, আমডাঙ্গা, দাঁইহাট।

১০। সাক্ষাৎকার, মাইতি রঞ্জিত, ১৯ শে জুলাই ২০২৩, ধাত্রীগ্রাম হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ধাত্রীগ্রাম।

১১। *টানাপোড়েন,* অগ্রহায়ন ১৪৩০, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

১২। Government of India the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act 1985.

১৩। *টানাপোড়েন,* শ্রাবণ ১৪৩১, তন্তুবায় মুখপত্র, নবপর্যায়ে চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ৪০।

১৪। তদেব, পৃ. ১২৯।

১৫। তদেব, পৃ. ১১১।

১৬। *টানাপোড়েন,* ১৯৯১, তন্তুবায় মুখপত্র, দশম বর্ষ, গ্রীষ্ম সংখ্যা, পৃ. ১৭।

১৭। মুখার্জি দেবশ্রী, ২০২১, *নদীয়ার তাঁত শিল্পের ইতিহাসঃ প্রসঙ্গত শান্তিপুর ও ফুলিয়া ১৭৭৩ থেকে ১৯৭৭,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ১৪৭।

১৮। *টানাপোড়েন,* ১৪৩১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

১৯। সাক্ষাৎকার, গুঁই ধনঞ্জয়, ৩ জুলাই ২০২৪, কেতুগ্রাম থানা তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড ম্যানেজার ও তাঁতি, কাটোয়া।

২০। *অনুরণন,* ২২ মার্চ ২০১৯, মাসিক পত্রিকা, ২০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।

২১। *টানাপোড়েন,* ১৯৯৭, শরত সংখ্যা, পৃ. ১।

২২। Directorate of Textile, Govt. of West Bengal, Katwa Handloom Development Office. Statistical Statement of Handloom Sector Under D.O (Katwa Zone & Kalna Zone) for 2021-2022.

‘ক্ষণিকা’ কাব্যের ‘এক গাঁয়ে’ : ‘ধুলা মাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি’

প্রীতম চক্রবর্ত্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’ কাব্যের অন্যতম কবিতা ‘এক গাঁয়ে’; প্রকৃতির এক সহজ পটভূমিতে মিলন-বিরহের রূপ এঁকেছেন কবি। পল্লী জীবনের ‘বেঁধে বেঁধে থাকা’ ভাষিক এবং কাব্যিক রূপ পেয়েছে এখানে। রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ‘এক গাঁয়ে’। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির যৌথযাপনের সার্থক প্রতিচ্ছবি হয়ে কবিতাটি কালোত্তীর্ণ।
সূচক শব্দ : রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, এক গাঁয়ে, পল্লী, প্রকৃতি, মেলবন্ধন ও মানুষ।

মূল আলোচনা:
‘ক্ষণিকা’ কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন— ‘রবীন্দ্রকাব্য লিরিক-প্রধান— ক্ষণিকা আবার সেই লিরিকের চূড়ান্ত। হিন্দু পঞ্জিকার এক-এক বৎসরের অধিপতি এক-এক গ্রহ। ক্ষণিকার অধিদেবতা প্রধানতঃ শরৎকাল, কিংবা অন্যান্য ঋতুর কোমল রূপ। আমাদের ঋতু-পর্যায়ে শরৎ সর্বাপ্রেক্ষা সুকুমার। বর্ষা বসন্ত গ্রীষ্ম অত্যন্ত সংকোচে সম্ভ্রমে প্রবেশ করিয়াছে; অনধিকার প্রবেশের ভয়ে তাহাদের উগ্রতা অনেকটা পরিমাণে পরিহার করতে বাধ্য হইয়াছে। আবহাওয়ার এই শারদীয় সৌকুমার্যের মূল কবির একটি বিশেষ মনোভাব।’[১] অর্থাৎ ‘ক্ষণিকা’ কাব্যের মধ্যে তিনি শরৎ ঋতুর চরিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন, ‘ক্ষণিকা’ কাব্যে ‘শারদ প্রসন্নতা’ থাকলেও কাব্যটি কিন্তু ‘শরৎকাব্যকথাশ্রয়’ নয়। বরং ‘ক্ষণিকা’কে তিনি ‘প্রৌঢ় বর্ষা’র কাব্য বলে উল্লেখ করেছেন— “কল্পনা’র তৃণাঙ্কুর যে জীবন উল্লাস বহন করিয়া মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহিরে আসে সেই জীবন্মুক্তির হর্ষ ‘ক্ষণিকা’য় ঝলক দিয়াছে। শেষ দিকের কয়েকটি কবিতায় নববর্ষার অপ্রস্তুত অগ্রদূত অকালবসন্তের অকারণ পুলকচঞ্চলতার সুর বাজিয়াছে। ‘ক্ষণিকা’য় কবিচেতনার অভিনব মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ লাগিয়াছে। জীবপ্রকৃতির ও জড়প্রকৃতির অখণ্ডতা আর তাহার সহিত একতানবোধ এই জীবন্মুক্তির প্রেরণা।’[২] ‘ক্ষণিকা’র প্রেমের কবিতায় অধ্যাপক সেন লক্ষ করেছিলেন ‘ক্ষণপরিচিতির চপলতা’ এবং ‘ক্ষণহাসির দীপ্তি’। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থটি বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন—

আশা করি নিদেন-পক্ষে
ছ’টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন-বাসে
সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
স্বপ্নলোভে উড়ে যাবে;
কতকটা কি অগ্নিকণায়
ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?

কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
আপনি খসে পড়বে ধূলায়,
তারপরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

খুব হালকা চালে কবি কাব্যের বিষয়বস্তুর পরিচয় দিলেও 'ক্ষণিকা'র কবিতার ভাব এতখানি উপরিতলের নয়। প্রকাশভঙ্গি সহজ হলেও ভাবনার গভীরতা খুব স্পষ্টভাবেই অনুভব করা যায় কয়েকটি কবিতা পড়লেই। যেগুলির মধ্যে অন্যতম 'এক গাঁয়ে'।

১৯০০ সালের ২৬শে জুলাই 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ। এই কাব্যের 'উদ্বোধন' ও 'নববর্ষা' কবিতা ছাড়া বাকি কবিতাগুলি সবই প্রায় কবির অপ্রকাশিত রচনা। ১৯০৩ সালে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র বিভিন্ন পর্যায়ে (যেমন, লীলা, কৌতুক, কবিকথা, সোনার তরী, কল্পনা, প্রকৃতিগাথা, লোকালয়, রূপক, হতভাগ্য, নারী, জীবনদেবতা) 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলি বিন্যস্ত হয়েছিল। 'এক গাঁয়ে' কবিতাটি এখানে 'লীলা' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 'লীলা' পর্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যগ্রন্থে'র ভূমিকায় লিখেছেন— 'সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সে জন্য সত্যকে সত্যকথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহাদের বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়; তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে।'[৩] 'এক গাঁয়ে' কবিতাতেও বিচ্ছেদ-মিলনের অনন্য প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন কবি। কবিতাটির নির্দিষ্ট রচনাকালের উল্লেখ না থাকলেও, কাব্যের প্রকাশকাল অনুসরণ করে আমরা ধরে নিতে পারি ১৯০০ সাল বা তার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখেছিলেন। মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ সদ্য তাঁর কাব্যজীবনের 'ঐশ্বর্য পর্ব' ('মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী') অতিক্রম করে 'ভাবনা পর্বে' প্রবেশ করেছেন। 'ছিন্নপত্রে'র সমকালে পদ্মাতীরে বসবাস করার সময় যে সব ছোটগল্পে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সোনার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছিল, বেশিরভাগই ক্ষেত্রেই সেগুলির পটভূমি ছিল গ্রামজীবন। পরবর্তীকালে পটভূমির পরিবর্তন এসেছে। বিশেষত রবীন্দ্র-উপন্যাসে সেই পল্লীগ্রামের পটভূমি বিরল। ছোটগল্পে সুভা, ফটিক বা তারাপদ— প্রকৃতিই তাদের মনন-চিন্তনকে পূর্ণ করেছিল, সেইসব চরিত্রের উপস্থিতি আর দেখা যায় না। বরং সাহিত্যের নবপর্যায়ের বৈশিষ্ট্যে সেখানে চরিত্রের ব্যক্তিগত মনন, দ্বন্দ্ব-দোলাচলতা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি প্রবহমান রয়ে গেছে তাঁর সারাজীবনের কাব্যভুবনে।

কবিতার নামকরণে 'এক' শব্দের ব্যবহার, এবং কবিতায় আছে দুটি মানুষ। কবি বা বক্তা এবং আরও একজন। এই দুইকে বেঁধে রাখবার তাগিদেই কবিতার নামকরণে 'এক' শব্দটির ব্যবহার। কবিতার শুরু—

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ।

'সুখ'এর কথা স্বীকার করলেও তার অন্তরে মৃদু বেদনার স্পর্শ থেকে যায়। এক 'গাঁয়ে' বাস করলেও নৈকট্যের অভাবজনিত ব্যথা আছেই। তাই একগ্রামে বসবাসের সুযোগটুকুই তাদের 'একটি মাত্র সুখ'। এই পৃথিবীতেই 'স্বর্গ' গড়ে নিতে আগহী তারা। গ্রামের মুক্ত পটভূমি সম্পর্কের সেই বন্ধনকে দৃঢ় করেছে। সেই প্রিয়জনের গাছের দোয়েল পাখির গানে আনন্দে নেচে ওঠে কবি-কথকের মন। তাদের পোষ্য ভেড়া চলে আসে বক্তার বটগাছের তলায়। না, এই আগমন কোনও

'অনধিকার প্রবেশ' নয়; আন্তরিক বন্ধনকেই আরও দৃঢ় করে। এমনকি ভালোবাসার জনের পালিত পশু যদি বক্তার ক্ষেতের বেড়া ভেঙে দেয়, সেখানেও কলহের সৃষ্টি হয় না। পরম যত্নে সেই ভেড়াটিকে 'কোলের পরে' তুলে নেওয়া হয়। অর্থাৎ সংঘাতের বিষয়টি ভরে উঠছে মাধুর্যে। গ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামলিমার মাঝে শুধু মানবিক প্রেম নয়। প্রকৃতিপ্রীতি এবং মানবেতর প্রাণীর প্রতি স্নেহের ছবিটিও তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। মনে পড়ে 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতাটির কথা। সেখানে গ্রামের খোলা প্রকৃতি আর সরল মনের মানুষদের ছেড়ে শহরে গিয়ে মেয়েটির মনে হয়েছিল 'ইঁটের পরে ইঁট/ মাঝে মানুষ কীট/ নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা'। প্রকৃতির মাঝে প্রাণ জুড়ানোর আশায় ভেবেছে—

সদাই মনে হয়— আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

প্রথম স্তবকে গ্রামের প্রেক্ষাপটে সহনশীল মানুষের আন্তরিক ছবি তুলে ধরেছেন। সমগ্র কবিতা জুড়েই যেন 'বেঁধে বেঁধে' থাকার অঙ্গীকার স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এর পরের স্তবক—

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।।

এই চারটি লাইন গানের ধুয়োর মতো কবিতায় একাধিকবার ফিরে এসেছে। 'খঞ্জনা' নামটির এখানে বিশেষত্ব না থাকলেও মনে রাখার দরকার 'রক্তকরবী' (যদিও তা অনেক পরের রচনা) নাটকের নায়িকা নন্দিনীর নাম প্রথম দিকের খসড়ায় ছিল 'খঞ্জনী'। সেই মেয়েটিও অন্ধকার যক্ষপুরীতে ছিল একটি আলোর মতো। এই কবিতায় গ্রামের নাম খঞ্জনা এবং নদীর নাম অঞ্জনা— অর্থাৎ অঞ্জনা নদী তীরে গড়ে ওঠা খঞ্জনা গ্রাম যেন এঁকে অপরের পরিপূরক। অর্থাৎ গ্রামজীবনের প্রত্যেকটি মানুষও একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আপন-পর ভেদ যেখানে প্রায় নেই, সেখানে গ্রাম ও নদীও অবিচ্ছেদ্য। বক্তা পরিচিত সেই গ্রামের পাঁচজনের কাছে। 'পাঁচজনে'র বদলে কবি যদি 'পাঁচজনা' শব্দটি ব্যবহার করতেন তাহলে ছন্দের দাবী মেনে অন্ত্যানুপ্রাসও বজায় থাকতো। কিন্তু তা না করে স্তবকের প্রথম দুটি বাক্যের অনুরূপ শব্দালংকারের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তৈরি করেছেন কাব্যসৌন্দর্য। 'পাঁচজনে' ও 'রঞ্জনা'— শব্দের অন্তে মিল না থাকা সত্ত্বেও এক ভিন্নতর মাত্রা পেয়েছে পংক্তি দুটি। গ্রামের পাঁচজন চেনে বক্তাকে, এই জনপ্রিয়তা বক্তার অহংকার নয়, বরং সম্পর্কের নিবিড়তা, অকৃত্রিমতা এবং সহজতার পরিচায়ক। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এক আত্মিক বন্ধনের পরিচয় বহন করে লাইনটি। পরবর্তী লাইনেও বলছেন 'আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা'। এখানে 'রঞ্জনা' নামটির চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে 'আমাদের' শব্দটি। 'রঞ্জনা' শুধু বক্তার একার নয়, গ্রামের সকলের সঙ্গেই তার আত্মিক যোগ। তবে 'রঞ্জনা' নামটি চমক লাগায় অন্য কারণে। আবারও মনে আসে এই নামে পুংলিঙ্গ 'রঞ্জন' নামটি এবং রবীন্দ্রনাথের অভিনব নাট্যভাবনা 'রক্তকরবী'র কথা। সেখানে রঞ্জনের প্রেমেই নন্দিনী রক্তকরবীর রঙে রঞ্জিত। রঞ্জনের কথা বলতে গিয়ে 'ঈশানী পাড়ার নন্দিন' বলে— '... দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তির মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা

করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনই সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে।'[৪] অর্থাৎ গ্রামের মুক্ত প্রেক্ষাপটই রঞ্জনের গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা রঞ্জনকে গ্রামের মুক্ত প্রকৃতি থেকে সর্দারেরা টেনে নিয়ে গিয়েছিল অন্ধকার সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজে। সেখানে অন্যান্য খোদাইকরদের নিয়ে মেতে উঠেছিল খোদাইনৃত্যে। তার মধ্যে আছে জাদু, যার হাতের আশ্চর্য স্পর্শে মাঠ ভরে ওঠে সোনার ফসলে; কল্যাণী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বয়ে আনে সে। এই ছোট কবিতায় রঞ্জনার চরিত্রের কোনও বিবরণ নেই, শুধু নামটুকু ধরেই আমরা পৌঁছে যেতে পারি কল্পনার তীরে। রঞ্জনার মধ্যেও সেই প্রাণের প্রাচুর্যটুকু আছে বলেই বক্তার বিশেষ মানুষটি অনেকের আত্মজন।

পরের স্তবকের শুরুতেই পাই- 'দুইটি পাড়া বড়ই কাছাকাছি,/ মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।' গ্রামের মাঠ সাধারণত বিস্তৃতই হয়। দুইটি পাড়ার মাঝখানে একটি মাঠের দূরত্ব নেহাত কম নয়। অন্তত উনিশ শতকের শেষ বা বিশ শতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যে গ্রাম দেখেছেন। সেই মাঠ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে নেহাত খাটো নয়। তা সত্ত্বেও কবিতায় দেখেছি— পাড়া দুটি 'বড়োই কাছাকাছি'। এও এক সংহতি। মাঝের মাঠ পাড়াগুলির সম্পর্কের বন্ধনকে শিথিল করতে পারেনি। 'বধূ' কবিতায় যেমন দেখেছি 'পাষানকায়া' রাজধানীতে সবার মাঝে থেকেও 'গ্রাম্য বালিকা' নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় আঁখিজলে ভেসে যায়। অথচ গ্রামজীবনে নিবিড় সম্পর্কগুলোর দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'পল্লীগ্রামে' প্রবন্ধে লিখেছিলেন— 'আমার এই ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে-একটি ঐক্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বৃহত্ত্ব জটিলতা কিছুই নাই। এই ধরাপ্রান্তে ধানক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য গুটিকতক অভাব মোচন করিয়া জীবনধারণ করিতে অধিক দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। যে গুটিকয়েক আদিম পরিবারনীতি, গ্রামনীতি এবং প্রজানীতির আবশ্যক, সে কয়েকটি অতি সহজেই মানুষের জীবনের সহিত মিশিয়া অখণ্ড জীবন্তভাব ধারণ করিতে পারে... তবু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে-একটি সৌন্দর্য আছে তাহা চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং এই সৌন্দর্যটুকু অশিক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য হইতে পদ্মের ন্যায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া সমস্ত গর্বিত সভ্যসমাজকে একটি আদর্শ দেখাইতেছে। সেইজন্য লন্ডন-প্যারিসের তুমুল সভ্যতা কোলাহল দূর হইতে সংবাদপত্র যোগে কানে আসিয়া বাজিলেও, আমার গ্রামটি আমার হৃদয়ের মধ্যে অদ্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।'[৫] এর প্রধান কারণ জটিলতাহীন মানুষগুলির মধ্যেকার হার্দিক সম্পর্ক। তাই কবিতার পরবর্তী পংক্তিগুলিতে কবি লেখেন—

তাদের বনে অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধাঘাটে,
তাদের পারার কুসুম ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

এ সবই মেলবন্ধনের চিত্রকল্প। পরিচ্ছন্ন চিত্রকল্পগুলি গ্রামজীবনের সরল সাধারণ ছবিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে তো বটেই, পাশাপাশি স্বার্থমগ্ন জীবন থেকে মুখ ফেরানোর পথ দেখায়। এক বাগানের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে মৌমাছি অন্যের বাগানে নির্মাণ করছে মৌচাক। এই বাঁধনছাড়া লীলা যেন আমাদের বলে দেয়—

বসিয়া আছ কেন আপন-মনে
স্বার্থনিমগন কী কারণে?
চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয়প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।।

জলে ভেসে আসা জবার মালা কিংবা এপাড়ার জিনিস ওপাড়ার হাটে বিকিকিনি— মিলিয়ে মিশিয়ে গড়ে তোলে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন। রঞ্জনা ও বক্তার প্রেম কিংবা ভালোবাসার বাঁধন মিশে যায় গ্রামীণ মানুষের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের গানে-কবিতায় এভাবেই বারে বারে ব্যক্তিপ্রেম মানব প্রেমে উত্তরিত হয়। কবিতায় ফিরে ফিরে আসে খঞ্জনা গ্রাম, অঞ্জনা নদী, রঞ্জনা নাম্নী নারী ও পাঁচজনের পরিচিত সেই সাধারণ মানুষটি। পাঁচজনের থেকে তাকে আলাদা করা যায় না বলেই কবিতায় বিশেষ নামে পরিচিত করা হয়নি। আসলে গ্রামের মানুষ তো ওই একটুখানি আবাস, নদীর শীতল জল আর ভালোবাসার মানুষকে আশ্রয় করেই গড়ে তুলতে চায় স্বপ্ননীড়; খঞ্জনা-অঞ্জনা-রঞ্জনা, এই কবিতায় সেই সামান্য চাওয়ার প্রতীক হিসেবে প্রতিটি মৌলিক স্তবকের পর একবার করে আবারও ফিরে এসেছে।

পঞ্চম স্তবকে গিয়ে প্রকৃতির উর্বর ছবি এঁকেছেন কবি। সৃজনের ক্ষেত্রটিকে চিহ্নিত করেছেন—

আমাদের গ্রামের গলি ’পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের ক্ষেতে যখন তিসি ধরে
মোদের ক্ষেতে তখন ফোটে শণ।

গ্রাম জীবনে বসন্তের অনুপ্রবেশ। আমের মঞ্জরী ধরেছে গাছে গাছে। প্রকৃতির এই অনুষঙ্গই গ্রামের গলিকে ‘সংকীর্ণ’ করে না— দেয় মুক্তি। শস্য-শ্যামলা প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভুবনে বড় পরিচিত বিষয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে দেশমাতৃকার উদ্দেশে বেশ কিছু গান বেঁধেছিলেন তিনি (রবীন্দ্রনাথের ৪৬টি দেশপ্রেমের গানের মধ্যে ৩০টিই ওই সময় রচিত)। তার মধ্যে অন্যতম- ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’— ‘আমি কোথায় পাবো তারে’ এই লোকগানের সুরে গানটি নির্মাণ করেছিলেন । ওই বছরেই ৭ই আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে টাউন হলে যে সভা হয়, সেখানেও গানটি গাওয়া হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এটি। গানে ‘সোনার বাংলা’র প্রতি ভালবাসার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।।

আলোচ্য কবিতাতেও সেই ক্ষেতে ফলেছে তিসি আর শণ। তিসি হল তৈলপ্রদ এক জাতীয় বীজ এবং শণ হল পাটজাতীয় ক্ষুদ্র সরু গাছ বিশেষ বা তার আঁশ। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জমিদারী কাজকর্ম দেখাশোনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে, আর মাটি তাঁর কাছে তো ‘ভূমিলক্ষ্মী’। তাই মুক্ত প্রকৃতির ছবি আঁকতে গিয়ে জীবনের প্রয়োজনীয় এবং অনিবার্য দিকগুলি থেকে কোনোদিনই মুখ ফিরিয়ে থাকেননি কবি।

পরক্ষণেই কবি ফিরে গেছেন কবিতার রোমান্টিক পরিমণ্ডলে—

তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

দুই বাড়ি-দুটি ছাদ— মাঝে একখানি মাঠের ব্যবধান। এক আকাশই ছেয়ে আছে দুটি বাড়ির মাথায়। দখিন হাওয়াও মাঠ পেরিয়ে চলে আসে। তাই দুটি ছাদের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার বদল হতে পারে, এমনটা ভাবা সঙ্গত নয়। আসলে অনুকূল প্রকৃতি গাঁয়ের মানুষগুলোর মনকে করে সমৃদ্ধ। মেঘমুক্ত আকাশে তারার অবস্থান কিংবা মুক্ত দখিনা বাতাস অমল মনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। পঞ্চম স্তবকের শুরুতে 'আমের বোল' ধরার প্রসঙ্গ ছিল, স্তবকের শেষে এসেছে কদম ফুল ফোটার কথা। কদমের প্রসঙ্গে চলে আসে রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ— একাধিক বৈষ্ণব পদে আছে কদম গাছের প্রসঙ্গ; বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এই কদম গাছের তলাতেই শ্রীমতী রাধারানীর জন্য বাঁশরী বাজিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানে রাধাকৃষ্ণ লীলার অনুষঙ্গ বাঁশির মত চলে আসে কদমের প্রসঙ্গ— 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল', 'কদম্বরেই কানন ঘেরি', 'কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি' (বাদলধারা হল সারা), 'এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে', 'নীপবন-গন্ধঘন অন্ধকারে' (শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়), 'পিছনে নীপবীথিকায় রৌদ্রছায়া যায় খেলে' (এসেছিলে তবু আস নাই)— রবি ঠাকুরের বর্ষার গানে বারে বারেই ফিরে আসে কদম। আসলে বর্ষা ও বসন্ত, এই দুই ঋতু রবীন্দ্রনাথের গানে-কবিতায় বিশেষভাবে প্রেমের পটভূমি নির্মাণ করেছে। সাধারণভাবে বর্ষা বিরহের এবং বসন্ত মিলনের ঋতু। সেই 'বিরহ-মিলন গাথা'র স্পর্শ দিতে গিয়ে দখিন হাওয়া এবং শ্রাবণ-ধারাকে পর পর ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনা কখনোই ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে সংকীর্ণ পরিসরে উপস্থাপিত নয়। বৃহত্তর প্রকৃতির প্রেক্ষাপট এবং বিশ্বাত্মবোধ সব সময়েই মিশে আছে সেখানে। এই কবিতাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম, বেড়ে ওঠা-- সবই নগর কলকাতায়। তবুও শহর কলকাতা ছেড়ে জমিদারীর কাজে দীর্ঘদিন পূর্ববঙ্গে গ্রামে বাস করেছেন, বোলপুরে নির্মাণ করেছেন স্বপ্নের শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী। জীবনের শেষ পর্বে লেখা 'ঐকতান' কবিতায় নিজেকে 'পৃথিবীর কবি' বলে উল্লেখ করেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির-বাণী-লাগি কান পেতে আছি।

'এক গাঁয়ে' কবিতায় সেই মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের প্রেমগানই খুব সংযত ভাষায় প্রকাশ করেছেন তিনি। খঞ্জনা গ্রাম এবং পাশ দিয়ে বয়ে চলা অঞ্জনা নদী তো আসলে সেই জীবনের গতিময়তার প্রতীক। পরবর্তীকালে রানু অধিকারীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সাথেই আমার আলাপ চলত; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুনতে পেতেম। তার পরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটল, কতকাল সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম— এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের

উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্জনের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পলেখাটির মতো দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েছে। এই তো মানুষের জীবন।'[৬] শুধু 'মানুষের জীবন' নয়, মানবপ্রীতি-মর্ত্যপ্রীতি-প্রকৃতিপ্রীতি— সবকিছুই ছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম এবং সৃজনশিল্পের মূল অন্বিষ্ট। 'ক্ষণিকা' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন— '... কবি এই ধরণীর মানুষ— এই প্রকৃতি ও মানবের সহিতই তাঁহার চিরকালের সম্বন্ধ; একথা নিঃসন্দেহ যে, এই প্রকৃতি ও মানবের রসই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা উপাদেয় ও লোভনীয় রস। সুতরাং ইহাকে যে ছাড়িলেও অনায়াস ছাড়া যায় না এবং ছাড়িতেও দারুণ বেদনাবোধ হয়, ইহা স্বাভাবিক। এই বেদনা কিছু ভুলিয়া থাকা বা লঘু করার উদ্দেশ্যে কবি 'ক্ষণিকা'য় নিতান্ত আবেগহীনভাবে সহজ দৃষ্টিতে এই রসের ক্ষেত্রকে একবার দেখিয়া লইতেছেন ও কৌতুকের আবরণে চোখের জল ফেলিতেছেন। কোন বিতর্ক, বিচার না করিয়া, কোন চিন্তা ভাবনায় আন্দোলিত না হইয়া, কোন সামাজিক নিয়ম বা চিরপ্রচলিত প্রথাকে না মানিয়া, কোন সুখে-দুঃখে উদ্বেলিত না হইয়া, সহজ, সরল ও সত্য দৃষ্টি দিয়া এই জগৎ ও জীবনকে একবার ক্ষণকালের জন্য দেখিয়া আনন্দ আহরণ করিতেছেন।'[৭] এই বক্তব্য আলোচ্য 'এক গাঁয়ে' কবিতাটির ক্ষেত্রেও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। আসলে 'ক্ষণিকা'র পাতায় পাতায় সহজ-সুন্দরের প্রকাশ যেমন বর্ণময় তেমনই আন্তরিক আবেদনে পূর্ণ। যেমন 'পথে' কবিতায়-

দিঘির জলে ঝলক ঝলে
মাণিক-হীরা,
সর্ষে ক্ষেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে।

এভাবেই ক্ষণিক জীবনের আনন্দকে উপলব্ধি করেছেন কবি তাঁর 'ক্ষণিকা'য়। 'এক গাঁয়ে' কবিতা জুড়ে আছে সেই জীবন উপভোগের ছবি। প্রেম যেখানে 'আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে'। এই প্রেম ও সৌন্দর্যই তো কবির কাম্য। সহজ সত্যে উপলব্ধি এবং তার অসঙ্কোচ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভুবনে 'এক গাঁয়ে' অনন্য সংযোজন।

তথ্যসূত্র :

১. বিশী, প্রমথনাথ, ১৩৫৫, 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' (১ম খণ্ড), কলকাতা, মিত্রালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৪।
২. সেন, সুকুমার, ১৯৯৬, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড), কলকাতা, আনন্দ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, পৃ. ৮৭-৮৮।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২০১২, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (২য় খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, পৃ. ৭১০।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২০১৫, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ (১৩শ খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, পৃ. ৫১।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ (১৪শ খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, পৃ. ৩৭১।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৬, ‘ভানুসিংহের পত্রাবলী’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১০০।
৭. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, ১৩৫৪, ‘রবীন্দ্র সাহিত্য পরিক্রমা’ (কাব্য), কলকাতা, দি বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৪৫।

উনিশ শতকের কিশোর সাহিত্যে উপদ্রুত কিশোরীর ক্ষমতায়ন : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'

সঞ্চিতা চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা শিশু-কিশোরসাহিত্যের বহুবর্ণ বৈচিত্র্যময় জগতে পুরুষ-অধ্যুষিত জগতেরই যে প্রাধান্য নির্মিত হয়েছে, কিশোরকাহিনিতে মেয়ে চরিত্রের উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতির দিকে তাকিয়েই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এমনই এক আবহে, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' বাংলা কিশোরসাহিত্যের প্রথম দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনি। লক্ষ করার মতো বিষয় এই যে, এই অ্যাডভেঞ্চার নারীচরিত্রকেন্দ্রিক। 'কঙ্কাবতী'র বীজ বাংলার একটি অন্যরকম রূপকথার গল্প থেকে নেওয়া যা একটি অজাচারভীত বালিকার অস্তিত্বসংকটকে প্রকাশ করে। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসেও কিশোরীকন্যার অসম বিবাহসংক্রান্ত ভয় তার গভীর সংকটের কারণ হয়ে উঠেছে। এই বিষয়টি তৎকালীন বাংলা সাহিত্য জগতে অপরিচিত হলেও বস্তুত একটি গভীর সামাজিক সমস্যা যা সরাসরি বাল্যাবস্থাকে আক্রান্ত করে। উনিশ শতকের বালিকার বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোরকে যুগসচেতনতার সঙ্গে ধরতে পারার জন্য এই উপন্যাস কিশোরসাহিত্যের যে কোনো আলোচনায় ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে মেয়েদের কৈশোর বাংলার জনসমাজে বিবিধ পরিবর্তন ও রূপান্তরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে পূর্বপ্রচলিত প্রাচীন রক্ষণশীল সংস্কার এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত সমাজসংস্কার আন্দোলন--নারীর অবস্থান এই দুই বিপরীত সামাজিক প্রক্রিয়ার মাঝে পড়েছিল। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সামাজিক রক্ষণশীলতার সুযোগে নারীর পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সংকট। মেয়েদের কৈশোর এবং ছেলেদের কৈশোর--উনিশ শতকে এই দুইয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। বয়ঃসন্ধি বিকশিত হওয়ার আগেই পরিণতজীবনের অভিজ্ঞতা কিশোরী মেয়েদের ঘটতে শুরু করতো। বিবাহ, যৌনতা, সন্তানধারণ, সন্তানপালন, কঠোর গৃহশ্রমের মতো অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে দিয়ে যেত মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল। ফলত, কৈশোর বলে বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী অবস্থাটিই মেয়েদের জন্য ছিল না উনিশ শতকের বাংলায়। সাহিত্যে, সমাজে বয়ঃসন্ধিকাল-অতিক্রান্ত মেয়েদের বরাবর পরিণত নারীর মতোই আচরণ করতে দেখা যায়। 'কঙ্কাবতী'তে মেয়েদের সেই উপদ্রুত কৈশোরকালই ধরেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। মেয়েদের কৈশোর যে কতখানি সংকটাপন্ন ছিল সমসাময়িক কালে, কঙ্কাবতীর ওপর ঘটতে থাকা সামাজিক- পারিবারিক অত্যাচার থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কঙ্কাবতীর বালিকা বয়স উত্তীর্ণ হতেই তার বিবাহ নিয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে গ্রামসমাজ। অশীতিপর বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরী বিপত্নীক হওয়ার পর গোবর্ধন বাচস্পতি তাঁকে উৎসাহিত করেন কঙ্কাবতীকে বিবাহ করার জন্য। বৃদ্ধ জনার্দন অনিন্দ্যসুন্দরী কঙ্কাবতীকে বিবাহ করার জন্য 'পাগল' হয়ে ওঠেন। একটি শৈশব-অতিক্রান্ত সদ্য বালিকাকে ঘিরে বৃদ্ধদের এই যৌন উন্মাদনা বালিকাটির সংকট এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের চেহারাটা স্পষ্ট করে দেয়। পিতা ও ভ্রাতার সামনে জনার্দন চৌধুরী কঙ্কাবতীর বিনিময় মূল্য রেখে দেন। কঙ্কাবতীর নিজস্ব প্রেম ও আত্মসম্মান উপেক্ষা করে তাকে সমাজ এক যৌনপুতুলে অবনমিত করার দিকে অগ্রসর হয়। মেয়েদের কৈশোরকে উনিশ শতকের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রেখে 'কঙ্কাবতী'র রচনা ত্রৈলোক্যনাথ

মুখোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ; তেমনই এই উপন্যাসের আর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল কিশোরীর অভিযানকাহিনি। কঙ্কাবতীর এই অভিযানকাহিনি দুঃখদুর্দশা এবং জীবনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করতে করতে এগিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রভাবশালী কিশোরীচরিত্রের এই সংগ্রাম পরিবারের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কঙ্কাবতী বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহী কিশোরীর চরিত্র। উনিশ শতকের নবজাগরণের সময় প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করতে থাকা কিশোরীর জীবন; তার বয়ঃসন্ধিকালীন স্বপ্ন, প্রেম,পড়াশোনা করার আকাঙ্ক্ষা ও অবদমিত কণ্ঠস্বর কীভাবে উঠে এসেছে 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে--বর্তমান অভিসন্দর্ভে তারই স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে।
মূল শব্দ: উনিশ শতক, উপদ্রুত, কিশোরী, যৌনপুতুল, অস্তিত্বসংকট, সমাজ, পিতৃতন্ত্র, ক্ষমতায়ন।

মূল আলোচনা:

বাংলা শিশু-কিশোরসাহিত্যে শিশুকন্যা বা কিশোরীর ভূমিকা প্রায় দেখাই যায় না--সমালোচকদের দিক থেকে প্রায়শই এমন দাবি উঠতে দেখা যায়। এই দাবি একান্ত অসঙ্গত নয়। বাংলা শিশু-কিশোরসাহিত্যের বহুবর্ণ বৈচিত্র্যময় জগতে পুরুষ-অধ্যুষিত জগতেরই যে প্রাধান্য নির্মিত হয়েছে, কিশোরকাহিনিতে মেয়ে চরিত্রের উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতির দিকে তাকিয়েই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। লক্ষ করলে দেখা যায়, ছোটদের সাহিত্যে নারীচরিত্রের ভূমিকা হ্রাস পেতে শুরু করেছে বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে। উনিশ শতকে, কিশোরসাহিত্যের নির্মিতির প্রাক্কালে মেয়েদের ভূমিকা ছিল প্রাঞ্জল ও তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ শতকে, পত্রপত্রিকায় কিশোরসাহিত্যের রূপনির্মাণের প্রথম যুগের কারিগরেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইওরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ-সঞ্জাত আলোকায়নের সন্তান। তাই, আধুনিকতার অনেক অভিজ্ঞানের মতো নারীমুক্তির ভাবধারাকেও তাঁরা নিঃশর্তে গ্রহণ করেছিলেন। উনিশ শতকের কিশোরপত্রিকা 'সখা' (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক: প্রমদাচরণ সেন)[১], 'মুকুল' (প্রথম প্রকাশ: ১৮৯৫, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক: শিবনাথ শাস্ত্রী)[২] 'সাথী'(প্রথম প্রকাশ: ১৮৯৩, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক: সতীশচন্দ্র সেন)[৩] প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে পাঠক হিসাবে বালকদের সঙ্গে বালিকাদেরও সম্বোধন করা হয়েছে। 'সখা'-র সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে রেখেছিলেন 'রন্ধনবিদ্যা' ও 'সেলাই'-- যে দুটি কাজ একান্ত মেয়েদের বলেই পরিগণিত হতো।

এমনই এক আবহে, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' বাংলা কিশোরসাহিত্যের প্রথম দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনি। লক্ষ করার মতো বিষয় এই যে, এই অ্যাডভেঞ্চার নারী চরিত্রকেন্দ্রিক।

এই আলোচনায় যাওয়ার আগে 'কঙ্কাবতী'কে কেন কিশোরসাহিত্য হিসাবে ধরা হবে তার একটি প্রাঞ্জল বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। ত্রৈলোক্যনাথ কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে কিছুই লেখেননি। তিনি শিশুসাহিত্যিকও ছিলেন না। তাঁর রচনা মূলত প্রকাশিত হত 'জন্মভূমি'('জন্মভূমি' ১২৯৭ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে, ইংরাজি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক পত্রিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।) পত্রিকায়; সেটি ছোটদের পত্রিকাও ছিল না। তা সত্ত্বেও, বাংলা কিশোরসাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ একটিমাত্র উপন্যাসের জন্য যার নাম 'কঙ্কাবতী'।

'কঙ্কাবতী'কে স্রষ্টার স্বীকৃতি ছাড়াই ছোটোদের রচনা ধরে নেওয়ার কারণ এই উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত একটি সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ 'কঙ্কাবতী'কে বালক-বালিকাদের উত্তম

পাঠযোগ্য উপন্যাস বলে অভিহিত করেছিলেন--"... এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালকবালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরল গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্পলোকই লিখিতে পারেন।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের এই মতামতের প্রতিবাদে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কোনো বক্তব্য ছিল না। তাই ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতী'-র গোত্রনির্ধারণ করে না দিলেও বালকবালিকাদের উপযোগী সরল গ্রন্থ বলে এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অবশ্যই। 'কঙ্কাবতী' ছোটদের জগতে বহু বছর ধরে সমাদৃত হয়ে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক আধুনিক রূপকথা হিসাবে এই উপন্যাসের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং যেহেতু আধুনিক রূপকথা সংরূপটি ছোটোদের সাহিত্যক্ষেত্রেই বেশি প্রযুক্ত হয় তাই পরবর্তী কিশোরসাহিত্যের ওপর প্রভাবের কারণেও 'কঙ্কাবতী' আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে ছোটোদের, বিশেষত পরিণতমনস্ক কিশোর-কিশোরীর পাঠের উপযুক্ত উপাদান এবং উপকরণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। প্রথমত, 'কঙ্কাবতী'র বীজ বাংলার একটি অন্যরকম রূপকথার গল্প থেকে নেওয়া যা একটি অজাচারভীত বালিকার অস্তিত্বসংকটকে প্রকাশ করে। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসেও কিশোরীকন্যার অসম বিবাহসংক্রান্ত ভয় তার গভীর সংকটের কারণ হয়ে উঠেছে। এই বিষয়টি তৎকালীন বাংলা সাহিত্য জগতে অপরিচিত হলেও বস্তুত একটি গভীর সামাজিক সমস্যা যা সরাসরি বাল্যাবস্থাকে আক্রান্ত করে। উপদ্রুত বাল্য-কৈশোরের সংকট যেমন রূপকথার একটি বিষয়, তেমনই 'কঙ্কাবতী'-রও বিষয়বস্তু হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, 'কঙ্কাবতী'র দ্বিতীয় পর্যায় সম্পূর্ণভাবে ভূতপ্রেত, কথা বলা পশু ও কীটপতঙ্গ, বিভিন্ন যাদুস্পর্শ এবং যাদুপ্রতীক দ্বারা নির্মিত। আধুনিক রূপকথার সকল বৈশিষ্ট্যই 'কঙ্কাবতী'তে সন্নিবিষ্ট আছে। যে কারণে, ছোটদের উপভোগ্যতার সঙ্গে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সাযুজ্য আছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনেক গল্প-উপন্যাসেই এই অলৌকিক জগতের উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু, সেখানে বড়দের জগৎ এত প্রকট যে সেগুলিকে কোনোভাবেই ছোটদের উপযোগী বলে চিহ্নিত করা যায় না। 'কঙ্কাবতী'তে বড়দের জগতের উপস্থিতি প্রকট হয়ে ওঠেনি।

তৃতীয়ত, 'কঙ্কাবতী'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনি। অবাঞ্ছিত বিবাহ থেকে বাঁচতে অনির্দেশ্য ভবিষ্যের দিকে পা দিয়েছে কঙ্কাবতী। একের পর এক অজ্ঞাত পথ পেরিয়েছে, বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে প্রতিকূল বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা এবং অবশেষে কাহিনির অন্বিষ্ট লক্ষ্যেও উপনীত হয়েছে। যদিও অভিযানের এই রোমাঞ্চ ব্যাহত হয়েছে কাহিনির শেষাংশে যেখানে দেখা গেছে কঙ্কাবতীর ভ্রমণ নিছক স্বপ্নপ্রসূত, আসলে সে জ্বরবিকারেই ছিল; কোনো ভ্রমণেই যায়নি। কিন্তু এই সমাপ্তিভাগের বাস্তবতাটুকু বাদ দিলে, 'কঙ্কাবতী' যে একটি দুঃসাহসিক ভ্রমণকাহিনি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তী সময়ে অভিযানকাহিনি বাংলা কিশোরসাহিত্যের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও তার ওপর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনার বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল, এ কথা বলা যায় না। ত্রৈলোক্যনাথের বিষয় যেহেতু উপকথাসম্ভূত ছিল; তাই এই অভিযানকাহিনির সঙ্গে পরবর্তীতে রচিত উপকথা,পশুকথা, রূপকথার সাযুজ্যে তৈরি ছোটোদের আধুনিক রূপকথার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনতিকাল পরেই সমধর্মী আধুনিক রূপকথা লিখেছিলেন।

আধুনিক রূপকথা ছাড়াও সামাজিক উপন্যাস হিসাবে 'কঙ্কাবতী' উনিশ শতকের কৈশোরধারণাকে ভিন্নমাত্রায় ধারণ করে। 'কঙ্কাবতী' কে কিশোরকাহিনি হিসাবে যদি বিবেচনা না করাও হয়, তাও উনিশ শতকের বালিকার বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোরকে যুগসচেতনতার সঙ্গে ধরতে পারার জন্য এই উপন্যাস কিশোরসাহিত্যের যে কোনো আলোচনায় ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। 'কঙ্কাবতী'র প্রথম ভাগে রয়েছে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত কিশোরীর সংকট এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে কঙ্কাবতীর অ্যাডভেঞ্চার। যখন বাংলা কিশোরসাহিত্যের রূপরেখার ধারণাই তৈরি হয়নি, তখন কিশোরী চরিত্রের এই উপস্থাপন নিঃসন্দেহে লেখকের অনন্যসাধারণ চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়।

উনিশ শতকে মেয়েদের কৈশোর বাংলার জনসমাজে বিবিধ পরিবর্তন ও রূপান্তরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে পূর্বপ্রচলিত প্রাচীন রক্ষণশীল সংস্কার এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত সমাজসংস্কার আন্দোলন--নারীর অবস্থান এই দুই বিপরীত সামাজিক প্রক্রিয়ার মাঝে পড়েছিল। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সামাজিক রক্ষণশীলতার সুযোগে নারীর পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সংকট। মেয়েদের কৈশোর এবং ছেলেদের কৈশোর--উনিশ শতকে এই দুইয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বৈধব্য--এই তিন প্রথার দ্বারা নারীর স্বার্থ চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হচ্ছে উনিশ শতকে। এগুলির বিরুদ্ধ আইনপ্রবর্তন এবং প্রতিরোধও তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করছে সমাজে। কিন্তু, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পুরোভাগে তখনও নারীরা আসেনি। এই প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে ছিল পুরুষদের; নারীর কণ্ঠস্বর ছিল না কোথাও। উনিশ শতকের নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য তখনও দুর্বল। পরিবারের পুরুষদের ওপরই নির্ভর করতো একটি নারীর ভবিষ্যৎ। এমতাবস্থায়, বয়ঃসন্ধি বিকশিত হওয়ার আগেই পরিণতজীবনের অভিজ্ঞতা কিশোরী মেয়েদের ঘটতে শুরু করতো। বিবাহ, যৌনতা, সন্তানধারণ, সন্তানপালন, কঠোর গৃহশ্রমের মতো অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে দিয়ে যেত মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল। ফলত, কৈশোর বলে বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী অবস্থাটিই মেয়েদের জন্য ছিল না উনিশ শতকের বাংলায়। সাহিত্যে, সমাজে বয়ঃসন্ধিকাল-অতিক্রান্ত মেয়েদের বরাবর পরিণত নারীর মতোই আচরণ করতে দেখা যায়। 'কঙ্কাবতী'তে মেয়েদের সেই উপদ্রুত কৈশোরকালই ধরেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

মেয়েদের কৈশোর যে কতখানি সংকটাপন্ন ছিল সমসাময়িক কালে, কঙ্কাবতীর ওপর ঘটতে থাকা সামাজিক- পারিবারিক অত্যাচার থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কঙ্কাবতীর বালিকা বয়স উত্তীর্ণ হতেই তার বিবাহ নিয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে গ্রামসমাজ। অশীতিপর বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরী বিপত্নীক হওয়ার পর গোবর্ধন বাচস্পতি তাঁকে উৎসাহিত করেন কঙ্কাবতীকে বিবাহ করার জন্য। বৃদ্ধ জনার্দন অনিন্দ্যসুন্দরী কঙ্কাবতীকে বিবাহ করার জন্য 'পাগল' হয়ে ওঠেন। একটি শৈশব-অতিক্রান্ত সদ্য বালিকাকে ঘিরে বৃদ্ধদের এই যৌন উন্মাদনা বালিকাটির সংকট এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের চেহারাটা স্পষ্ট করে দেয়। পিতা ও ভ্রাতার সামনে জনার্দন চৌধুরী কঙ্কাবতীর বিপুল বিনিময় মূল্য রেখে দেন। দুই হাজার টাকা নগদে কঙ্কাবতীকে তিনি স্বচ্ছন্দে ক্রয় করতে পারেন। স্ত্রীধন হিসাবে প্রাপ্ত কঙ্কাবতীর একটি তালুক,দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ এবং গা-ভর্তি গহনা সম্পর্কেও কঙ্কাবতীর ভ্রাতা সুনিশ্চিত পরিকল্পনা করে ফেলে--" কঙ্কাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, গায়ে যেখানে যা ধরে গহনা দিবে, তালুক মুলুক দিবে, বাবাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিবে, আবার চাই কি? বুড়ো মরিয়া যাইলে কঙ্কাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হইবে।"[৫]

খেতুর সঙ্গে কঙ্কাবতীর প্রীতি সমাজনিবন্ধনের হিসাবের মধ্যেই আসে না। কন্যা এতটাই পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয় যে, সচেতন কঙ্কাবতীও খেতুর প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রেমের কথা ভাবেন না। তিনি ক্লিষ্ট হয়ে পড়েন, পীড়িত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তবু তাঁর মনোগত অভিপ্রায় নিরুচ্চারিতই থাকে। অথচ, খেতু এবং কঙ্কাবতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কের সম্ভাবনা কারোর কাছেই গোপন ছিল না। জনার্দন চৌধুরী এই বাধার কারণেই ঈর্ষান্বিত হয়ে খেতু ও তার মাকে বরফ খাওয়ার অভিযোগে জাতিচ্যুত করেন। কঙ্কাবতীর পিতা তনু রায়ও খেতু এবং কঙ্কাবতীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা জানতেন। কিন্তু, সামাজিক বিধান এবং স্বার্থের সংযোগের সামনে কিশোরী কন্যার মূল্যবোধ একেবারেই প্রাধান্য পায় না। কঙ্কাবতী একটি যৌন পুতুলের মতোই ব্যবহৃত হতে থাকেন।

কঙ্কাবতীর এই জীবনখন্ডের মধ্যেই উনিশ শতকের কন্যার উপদ্রুত কৈশোরের প্রলক্ষণগুলি চিহ্নিত হয়ে যায়। কঙ্কাবতীর কৈশোরক লক্ষণ ও আকর্ষণগুলিকে উপেক্ষা করেননি ত্রৈলোক্যনাথ। খেতুর কাছে পড়াশোনা শেখা, গল্পপ্রিয়, মাসিক পত্রিকাপ্রিয় কঙ্কাবতী আগ্রহী ছিলেন বাইরের জগৎ সম্পর্কে--"কঙ্কাবতী পড়িতে বড় ভালোবাসিতেন। কলিকাতা হইতে খেতু তাঁহাকে নানারূপ পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনগুলি পর্য্যন্ত কঙ্কাবতী পড়িতেন।"[৬]

কঙ্কাবতীর সুপ্ত প্রেম কৈশোরে জাগ্রত হচ্ছিল। বাস্তবে যা কঙ্কাবতী প্রকাশ করতে পারেননি, স্বপ্নে তার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ঘটেছে। খেতুর সঙ্গে বিবাহ এবং পতিগতপ্রাণা কঙ্কাবতী স্বপ্নে পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জেগে উঠেছেন। স্বপ্নে যে কৌতুকপ্রিয়, কৌতূহলময়ী, প্রেমময়ী কিশোরীকে দেখা যায় বাস্তবে সে এবং তার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষাগুলিই অবদমিত অবস্থায় থাকে। উনিশ শতকের কিশোরীর এই সংকট 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে অতি সাবলীলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কঙ্কাবতীর পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত সামাজিক উপক্রমণিকার পর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে কঙ্কাবতীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত। খেতুর সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় এবং পিতা ও ভ্রাতার চূড়ান্ত অমানবিক রূপ দেখার ফলে দুঃখিত কঙ্কাবতী পীড়িত হয়ে পড়লেন, কঠিন জ্বরবিকার হলো এবং কঙ্কাবতী বিকারজনিত ঘোরে উপনীত হলেন। এরপর কঙ্কাবতী স্বপ্নেই সামাজিক বাধা অতিক্রম করে অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চললেন। এখান থেকেই শুরু হলো কঙ্কাবতীর দুঃসাহসিক অভিযান।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথনরীতির পরিকল্পনায় যে ত্রুটি ছিল, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা নির্দিষ্ট করেছিলেন। এই অভিযানক্ষেত্রে এমন অনেককিছু ঘটছিল যা কঙ্কাবতীর অভিজ্ঞতার বাইরে, কঙ্কাবতী সেগুলি সম্পর্কে অবগত নন। কঙ্কাবতী স্বপ্ন দর্শন করলে এমন হওয়ার কথা নয়--এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিমত।[৭] পরিশেষ অংশে ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু নিরঞ্জন কবিরত্নের কথনে বলেছেন, দ্বিতীয় ভাগে সংঘটিত সকল ঘটনাই কঙ্কাবতীর স্বপ্নে সাক্ষাৎ ঘটেছে, কোনো অংশই কঙ্কাবতীর অজ্ঞাতসারে ঘটেনি।

এছাড়াও সামাজিক উপক্রমণিকার প্রারম্ভে 'কুসুমঘাটী' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ত্রৈলোক্যনাথ কুসুমঘাটী গ্রামটির ভূতপ্রেত,বাঘ, মন্ত্রপূত বাঘ, জীবজন্তু প্রভৃতির অবতারণা করে রেখেছিলেন। কঙ্কাবতী যখন অভিযান শুরু করলেন, তখন তিনি যেন ঠিক সেই প্রতিবেশটার মধ্যেই গিয়ে পড়লেন যার উল্লেখ লেখক উপন্যাসের প্রারম্ভে করেছিলেন। এই সম্পূর্ণ প্রতিবেশটিকে স্বপ্নে উপস্থাপিত করলে প্রতিবেশ সংস্থাপনেও একটি বিপর্যয় ঘটে।

মেয়েদের কৈশোরকে উনিশ শতকের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রেখে 'কঙ্কাবতী'র রচনা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ; তেমনই এই উপন্যাসের আর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল কিশোরীর অভিযানকাহিনি।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম কিশোরী অভিযাত্রীর স্থান কঙ্কাবতীই পেতেন, যদি এই উপন্যাসে স্বপ্ন এবং বিকারের প্রসঙ্গ না থাকতো। তা সত্ত্বেও, কঙ্কাবতীর এই অভিযান কিশোরসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ। উপকথাসম্ভূত এই অভিযানকাহিনি প্রথম দূরভ্রমণ এবং অসম্ভব জগতের যাদুকে স্পর্শ করেছিল। যদিও 'কঙ্কাবতী'র সঙ্গে লুইস ক্যারোলের অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড-এর সাদৃশ্যের কথা অনেকেই বলে থাকেন, তবুও 'কঙ্কাবতী' সম্পূর্ণ দেশীয় রূপকথা, লোককথা এবং পশুগল্পের চিহ্নগুলিই বহন করে। মাছেদের রাজত্ব, ঝিনুকের মধ্যে মাছেদের রানী হয়ে থাকা, গোয়ালিনীর দ্বারা ঝিনুক থেকে মুক্ত হওয়া, মাথায় শিকড় পরে খেতুর ব্যাঘ্ররূপধারণ, ধনসম্পদ প্রহরার জন্য যক করে রাখা, বিচিত্র চরিত্র ও স্বভাবের ভূতপ্রেতিনী,পশু ও পতঙ্গের জগৎ ইত্যাদি অনুষঙ্গের কিছুর মধ্যেই বৈদেশিক প্রভাব নেই। বরং, ত্রৈলোক্যনাথ পরম দক্ষতার সঙ্গে উপনিবেশের চরিত্র সংযুক্ত করেছেন এই উপকথাসম্ভূত উপন্যাসে। স্কল, স্কেলিটন এন্ড কোং-এর গঠন ও কার্যাবলী; ব্যাঙসাহেবের চরিত্রে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। উপনিবেশের রাজনৈতিক চরিত্রের অনেকটাই এই বিষয়গুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কঙ্কাবতীর এই অভিযানকাহিনি দুঃখদুর্দশা এবং জীবনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করতে করতে এগিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রভাবশালী কিশোরীচরিত্রের এই সংগ্রাম পরিবারের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কঙ্কাবতীর ওপর যাবতীয় সামাজিক অত্যাচার প্রযুক্ত হয়েছে তার পরিবারের প্রধান পিতা এবং ভ্রাতার দ্বারা। কঙ্কাবতীর অবদমিত কণ্ঠস্বর যখন কোথাও স্থান পায় নি তখন কঙ্কাবতী জীবনের জ্বালা জুড়োতে নদীতে ভেসেছে, বাবা যখন তাকে বিষয়সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে বিবাহবৃত্তে ফিরে আসতে বলেছেন তখন কঙ্কাবতী পরম গ্লানিতে তার নৌকাকে ডুবে যেতে বলেছে--

"টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ।
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
এ দারুণ যাতনা পিতা আর সহে না।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা!"[৮]

অতঃপর মাছেদের রাজত্বে কঙ্কাবতী তার সদ্য অতিক্রান্ত বাল্যের সমধর্মী একটি নিষ্পাপ জগৎ পেয়েছে থাকার জন্য যেখানে বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরীর বিকৃতকাম নেই, গ্রামবৃদ্ধদের কুনজর নেই এবং পিতার অর্থলিপ্সা নেই। মাছেদের রানি কঙ্কাবতী যখন ধরা পড়েছে গোয়ালিনীর জালে, তখন পরিবারবহির্ভূত মেয়েটি অযাচিত স্নেহে বঞ্চিত হয় নি। গোয়ালিনী তাকে পরম যত্নে আশ্রয় দিয়েছেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের থেকে সাধারণ মানুষের দূরত্ব যে কতটা তা তখন আবিষ্কার করেছে কঙ্কাবতী। সে বুঝেছে, তার পিতার নিয়ন্ত্রিত পরিমন্ডলের বাইরে তার জন্য সমর্থনের অভাব নেই। বৃহৎ পৃথিবী আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করেছে তার কাছে। প্রথম ভাগে যেখানে কঙ্কাবতী নিজের প্রেমের স্বপক্ষে একটি কথাও বলতে পারেনি, সেই কঙ্কাবতীই দ্বিতীয় ভাগে সদ্য মাতৃহারা খেতুকে কথা দিয়ে দিয়েছে অপেক্ষা করার জন্য। তনু রায়ের সংসারে গিয়ে সমাজনিন্দা এবং পরিবারের পীড়নের শিকার হয়েও সে থেকেছে অবিচল। উনিশ শতকের কিশোরীকন্যার নিজের শর্ত গঠনের প্রতিকূলতা এবং সমাজ-পরিবারে তার প্রতিক্রিয়া এভাবেই ব্যক্ত করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ।

সম্পূর্ণ কাহিনিটিকেই তিনি এই বিপুল অস্তিত্বসংকট এবং সংগ্রামের প্রেক্ষিতে আধারিত করেছেন। এবং সেই সঙ্গে উপকথার অংশটিও রোমাঞ্চময় করে তুলেছেন। ক্রমান্বিত ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে আদর্শ, ন্যায়নীতি, সততা ও মূল্যবোধ সবসময় বজায় রেখেছে কঙ্কাবতী।

নাকেশ্বরীর হাতে খেতুর মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে কঙ্কাবতী কোনোমতেই তাকে পরিত্যাগ করে যায়নি। প্রভূত ধনসম্পদের আশা এমনকি নিজের প্রাণের মায়াও সে অবিচলিত ভাবে পরিত্যাগ করেছে-- "কঙ্কাবতী মরিতে ভয় করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কঙ্কাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না! কঙ্কাবতীর এই প্রতিজ্ঞা। কঙ্কাবতী নিশ্চয় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।"[৯]

আলোকায়নের সময় লেখা কঙ্কাবতী-র স্রষ্টা এভাবেই তাঁর অভিযাত্রী কিশোরীকে সংকট, সংগ্রাম, মূল্যবোধ ও দুঃসাহসের পরিমন্ডলে বিজয়িনী করে তুলেছেন।

কঙ্কাবতীর স্বপ্নলব্ধ অভিযাত্রাটি অভিযানের যাবতীয় রোমাঞ্চ এবং আনন্দ অতিক্রম করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বহু পরিশ্রমের পর এমনকি আকাশ ভ্রমণের শেষেও কঙ্কাবতী খেতুর জন্য যথেষ্ট পরমায়ু সংগ্রহ করে আনতে পারেনি। অবশেষে সহমৃতা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সে। তার এই সিদ্ধান্ত তার আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সতীদাহ প্রসঙ্গে লেখক যে ভিন্নমত পোষণ করেন তা নাকেশ্বরীর একটি কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কঙ্কাবতীর সতী হওয়ার বিপক্ষে দীর্ঘশুন্ড এবং অন্যান্যরা মতামত তৈরি করলে, ইংরেজদের প্রণীত আইনের উল্লেখ করলে, নাকেশ্বরী এই আইন সম্পর্কে সমসাময়িক জনমতের কথা বলে --"উঠিয়া গেছে সত্য। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত পুরুষদের মত কি জান? পূর্ব্বপ্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচলিত করিবার নিমিত্ত তাহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন। শোক-বিহ্বলা, ক্ষিপ্ত-প্রায়া, জননী-ভগিনীদিগকে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আজকালের শিক্ষিত পুরুষরা নাচিয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম্মের আমরা সম্পূর্ণভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকি।"[১০]

কঙ্কাবতীর সিদ্ধান্ত কোনো সামাজিক লোকাচার পালন নয়, কেবল তার পরম কাঙ্ক্ষিত প্রেমিক ও স্বামীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কামনামাত্র। এই সিদ্ধান্ত কঙ্কাবতী নিজেই গ্রহণ করেছে। তার তাপিত হৃদয়ের সঙ্গে প্রখর জ্বরবিকার মিলিয়ে স্বপ্নে এই সিদ্ধান্ত তৈরি করা হয়েছে একান্ত স্বাভাবিক।

উপন্যাসের পরিশেষ অংশে কাহিনি ফিরে আসে আবার বাস্তববৃত্তে। যেখানে অভিযান বলে কিছু নেই, কঙ্কাবতীর স্বপ্ন সম্পূর্ণ বিকারসঞ্জাত। কিন্তু সামাজিক সমস্যাগুলির অবসান হয়ে যায় আশ্চর্যজনকভাবে। জনার্দন চৌধুরী পৌত্রের অকাল মৃত্যুতে অনুতপ্ত হয়ে কঙ্কাবতীকে বিবাহ করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন, গোবর্ধন শিরোমণি অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, কঙ্কাবতীর পিতা তনু রায় কন্যাকে বিক্রয় করার সংকল্প ত্যাগ করে আকস্মিকভাবে সন্তানস্নেহে অভিভূত হয়ে পড়েন, কঙ্কাবতীর ভ্রাতা স্নেহশীল ও একান্ত বাধ্য হয়ে ওঠেন। খেতুর সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ বাধাহীন হয়ে ওঠে। প্রথম ভাগে যে সামাজিক প্রতিকূলতার চিত্র এই উপন্যাসে রয়েছে পরিশেষ অংশে তা কোনরকম দ্বন্দ্ব ছাড়াই কঙ্কাবতী ও খেতুর পক্ষে এত অনুকূল হয়ে আসে যে তা অবাস্তব ও অসঙ্গত বলে মনে হয়।

তা সত্ত্বেও কঙ্কাবতী বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহী কিশোরীর চরিত্র। উনিশ শতকের নবজাগরণের সময় প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করতে থাকা কিশোরীর জীবন; তার বয়ঃসন্ধিকালীন স্বপ্ন, প্রেম,পড়াশোনা করার আকাঙ্ক্ষা ও অবদমিত কণ্ঠস্বর-- উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। কৈশোর এবং কিশোরীর কৈশোর-- তার স্বতন্ত্র মূল্যমান যে তৈরি হয়ে উঠছে উনিশ

শতকের শেষাংশে; তারই পরিচয় পাওয়া যায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই উপকথাসম্ভূত উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র:

১। বসু বাণী (সংকলিত), 'শিশুসাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী', প্রথম সং ১৯৬২, কলকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পৃ. ৪২৮

২। তত্রৈব, পৃ. ৪২৬

৩। তত্রৈব, পৃ. ৪২৯

৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, মুখবন্ধ, কঙ্কাবতী, প্রথম প্রকাশ ১৮৯২, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সং ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ।

৫। মুখোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথ, 'কঙ্কাবতী', প্রথম প্রকাশ ১৮৯২, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সং ১৩৬৪, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৭৫

৬। তত্রৈব, পৃ.৪৯

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মুখবন্ধ", তত্রৈব।

৮। তত্রৈব, পৃ.১০১

৯। তত্রৈব, পৃ. ১৬৮

১০। তত্রৈব, পৃ. ২৮১-৮২।

পুরাণের পরিসরে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনার রূপ : বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'

মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পুরাণের নবরূপ নিয়ে পরিবেশিত এক নাট্যরূপ। এই নাট্যরূপকে কবিকল্পনার প্রলেপ ও নাট্যকারের গভীর মননের দ্বারা সৃজন করেছেন নাট্যকার। এই নাটকের পৌরাণিক পাত্রপাত্রীর মধ্যে নাট্যকার সঞ্চার করে দিয়েছেন অতি আধুনিককালের নর-নারীর মানসিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মানসিক টানাপোড়েন ও তীব্র রোমান্টিক আবেগ। নাট্যকার এই নাটকটি পৌরাণিক আখ্যানকে স্মরণে রেখে রচনা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি স্মরণে রেখেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পতিতা' কবিতার বিষয়ভাবনাকে।

নাটকের প্রথম অঙ্কের মাঝে নাট্যকার এমন কিছু প্রসঙ্গ এনেছেন যা পুরাণকথিত নয়, তার কল্পনাপ্রসূত। নাট্যকার আসলে পুরাণের পাত্রে নবকথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। নাটকে বিষয়ের উপস্থাপনার কৌশলে বেশ কিছু অংশ একেবারে নতুন আধারে নতুন ঢঙে পরিবেশন করেছেন নাট্যকার। ফলে নাট্যচরিত্র হিসেবে রাজমন্ত্রী, বারাঙ্গণা লোলাপাঙ্গী, বারাঙ্গাণা তরঙ্গিণী অনেক বেশি জীবন্ত ও সার্থক হয়ে উঠেছে। পুরাণাশ্রয়ী চরিত্রকে নবচেতনার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে নাটকে। ফলে তরঙ্গিণী ও তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে নতুন মানবচেতনার মধ্যে রূপ লাভ করলেন পাঠক।

অমৃতের সন্ধান করার কাজে ব্যস্ত থাকা ঋষ্যশৃঙ্গ প্রতিকূলতার শিকার হয়ে দেহযোগ কামনাবাসনাকে একসময় সর্বাগ্রে স্থান দিল। অঙ্গরাজ্যকে সর্বনাশের কবল থেকে রক্ষা করে তাকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য দৈবজ্ঞদের বক্তব্য হল আজন্ম বনবাসী তরুণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে নিয়ে এসে তার কৌমার্যনাশ করতে হবে। যেভাবেই হোক তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে বশীভূত করতে হবে। বারাঙ্গণা লোলাপাঙ্গী আতঙ্কিত হল এই বালক তপস্বীর প্রতাপের খবর পেয়ে। চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন অপাপবিদ্ধ তেজস্বী তরুণ মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ। লোলাপাঙ্গীতনয়া গণিকা তরঙ্গিণীকে দায়িত্ব দেওয়া হল তপস্বীর কৌমার্য নাশ করতে। যার ফলশ্রুতিতে লোমপাদের অঙ্গরাজ্য পুণরায় সুজলা সুফলা হল। তরঙ্গিণী কামনার রজ্জুতে বেঁধে দিল ঋষ্যশৃঙ্গকে।

তরঙ্গিণীর সংস্পর্শে এসেই পদস্খলিত হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা বিভান্ডকের কাছে তাই তিনি জানতে চান, নারী কাকে বলে? পিতার ব্যাখ্যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে অদৃষ্টপূর্ব রূপমাধুরীর পরাকাষ্ঠার নামই হল নারী। সুন্দরীকে তাপসতনয় ভাবলেও তার শরীরে অনাস্বাদিত শিহরণ জাগ্রত হয়েছে। সেই অনুভূতিকে ঋষ্যশৃঙ্গ ভুলতে পারেননি। তাই নারী হয়ে উঠে তার নতুন জপমন্ত্র। নারী তার চেনা জগতের বাইরে এক নতুন জগৎ।

কামের প্রভাবে দুজন নরনারীর পুণ্যের পথ পরিক্রমা হল 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের মূল বিষয়বস্তু। পুরাণের ছায়াতলে নায়ক ঋষ্যশৃঙ্গ ও নায়িকা তরঙ্গিণী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তরঙ্গিণী অপহরণ করেছিল ঋষিতনয়ের কৌমার্য। এর মধ্য দিয়ে তরঙ্গিণী অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টিধারা নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। যে নারীসঙ্গ মূলত ঋষ্যশৃঙ্গকে আলোকাভিসারী করেছে, পুণ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সেই নারী হল তরঙ্গিণী।

নাটকের মধ্যে নায়ক ও নায়িকার মনোভূমির পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। রসদ পুরাণ হলেও আধুনিক নর-নারীর জীবনযন্ত্রণার ছাপ এই কল্পনাতে খুব প্রবল। পাশাপাশি আধুনিক চিন্তাচেতনার অনুপ্রবেশও ঘটেছে নাটকটিতে। নাট্যকার এই কাব্যনাট্যে মহাভারতীয় কাহিনীকে অনুসরণ করলেও তাঁর নিজস্ব মৌলিকতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই কেবল ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর কাহিনী নয়, ঋষ্যশৃঙ্গ ও তার স্ত্রী শান্তার মিলনাত্মক উপসংহারও কবিকল্পিত ভিন্নরূপেই দেখা দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু পুরাণ ভাবনাকে আধুনিক মানস অভিজ্ঞতার আলোকে সঞ্চারিত করে দেখাতে সক্ষম হলেন যে কাম ও প্রেমের মধ্যে কোথাও কোন বিরোধ নেই। বরং একে অন্যের পরিপূরক। কাহিনীবয়নে, চরিত্রের রূপায়ণে কবি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাকে আধুনিক মানব সভ্যতার আলোকে নাট্যায়িত করেছেন। পুরাণ ও কল্পনাকে মিশ্রিত করে এক নতুন জীবনরসের আস্বাদ দিয়েছেন।

সূচক শব্দ: পৌরাণিক কাহিনী, অনাবৃষ্টি, বর্ষণধারা, মানসিক সংঘাত, বারাঙ্গণা, চিন্তা, চেতনা, কল্পনা, কাম, প্রেম, কৌমার্য।

মূল আলোচনা:

বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' এক পুরাণ কাহিনী নির্ভর নাটক। নাটকটি 'দেশ' পত্রিকায় **১৯৬৬** সালে পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার পর গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৬৬** সালের আগস্ট মাসে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। নাটকের প্রথমেই দেখা যায় অনাবৃষ্টির কারণে রাজা লোমপাদের অঙ্গরাজ্য শস্যহীন। সেই শস্যহীনতা থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে হলে চাই ঘন বর্ষণধারা। রাজপুরোহিত জানালেন এই অনাবৃষ্টির থেকে মুক্তি পেতে হলে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মত্ব হরণ করতে হবে। আজীবন ব্রহ্মচারী তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য হরণ করতে পারলেই রাজ্যে নামবে বর্ষণধারা। বারাঙ্গণা লোলাপাঙ্গী এই কার্যের ভার নেয়। সে তার যুবতী লাস্যময়ী কন্যা বারাঙ্গণা তরঙ্গিণীকে এই কার্যে প্রেরণ করে।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পুরাণের নবরূপ নিয়ে পরিবেশিত এক নাট্যরূপ। এই নাট্যরূপকে কবিকল্পনার প্রলেপ ও নাট্যকারের গভীর মননের দ্বারা সৃজন করেছেন নাট্যকার। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু এই জাতীয় পুরাণকেন্দ্রিক নাটক লেখার পথপ্রদর্শক। এই নাটকটি পুরাণ বিষয়কেন্দ্রিক হলেও এর নবরূপায়ণে রয়েছে নাট্যকারের নিজস্ব চিন্তা, চেতনা ও কল্পনা। এই প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন – **"এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত- অর্থাৎ একটি পুরাণ কাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা।"**[১] নাট্যকার এই নাটকটি পৌরাণিক আখ্যানকে স্মরণে রেখে রচনা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি স্মরণে রেখেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পতিতা' কবিতার বিষয়ভাবনাকে।

বুদ্ধদেব বসু নাটকের পৌরাণিক পাত্রপাত্রীর মধ্যে সঞ্চার করেছেন আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব, বেদনা ও রোমান্টিক আবেগকে। সমালোচক বলেছেন – **"পুরাণের মুখচ্ছদে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনার রূপ 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাটক।"**[২] নাটকের প্রথম অঙ্কে তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য নাশ এবং অঙ্গরাজ্যে আনয়ন প্রসঙ্গে রাজমন্ত্রীর মন্তব্যের পর বলেছে – **"পারবো, প্রভু, আমি পারবো! আমার দেহে-মনে অপূর্ব প্রেরণা জেগেছে; আমি সম্পূর্ণ দৃশ্যটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"**[৩] এই অংশ গদ্যভাষায় লেখা হলেও কাব্যমন্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বারাঙ্গণা তরঙ্গিণীকে প্রথম চাক্ষুষ করে প্রারম্ভিক প্রতিক্রিয়ায় ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছে – **"কী দীপ্ত**

আপনার তপোপ্রভা, কী স্নিগ্ধ আপনার দৃষ্টিপাত, আপনার ভাষণ কি লাবণ্যঘন! আপনাকে দেখে আমি দুর্লভ চিত্তপ্রসাদ অনুভব করছি।"[৪] ঋষ্যশৃঙ্গের কণ্ঠে কাব্যময় এই সংলাপ কাব্যনাট্য হিসেবে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটিকে আরো স্পষ্ট করে।

আবেগমণ্ডিত ভাষায় কবি নাটকীয় কাহিনীর বর্ণনা দেন এভাবে – **"জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হল মনোরথ, উচ্ছ্বল হলো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিল বিদ্যুৎ।"**[৫] এভাবে নাট্যকার কাব্যমন্ডিত ভাষায় প্রকৃতির পরিবর্তনকে প্রকাশ করেছেন। কাব্যিক সংলাপ ও ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্র একেবারে এক হয়ে গেছে এভাবেই নাটকের মধ্যে। তরঙ্গিণীর বাহ্যসৌন্দর্য কাব্যিক ভাষায় প্রকাশিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে – **"নারী।.... নারী। নারী। নূতন নাম, নূতন রূপ, নূতন ভাষা। নূতন এক জগৎ।......মোহিনী, মায়াবিনী, ঊর্বশী। নূতন জপমন্ত্র আমার।"**[৬] এই কাব্যময় সংলাপ ঋষ্যশৃঙ্গের চারিত্রিক পরিবর্তনকে সুন্দরভাবে প্রতিভাত করে আমাদের সামনে।

নাটকের প্রথম অঙ্কের মাঝে নাট্যকার এমন কিছু প্রসঙ্গ এনেছেন যা পুরাণকথিত নয়, তার কল্পনাপ্রসূত। নাট্যকার আসলে পুরাণের পাত্রে নবকথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সমালোচকের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় – **'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের প্রথম দুটি অঙ্ক অনেকাংশে পুরাণ অনুসারী, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক পুরোপুরি বুদ্ধদেবের নিজস্ব সৃষ্টি।"**[৭] নাটকে বিষয়ের উপস্থাপনার কৌশলে বেশ কিছু অংশ একেবারে নতুন আধারে নতুন ঢঙ্গে পরিবেশন করেছেন নাট্যকার। ফলে নাট্যচরিত্র হিসেবে রাজমন্ত্রী, বারাঙ্গণা লোলাপাঙ্গী, বারাঙ্গাণা তরঙ্গিণী অনেক বেশি জীবন্ত ও সার্থক হয়ে উঠেছে। পুরাণাশ্রয়ী চরিত্রকে নবচেতনার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে নাটকে। ফলে তরঙ্গিণী ও তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে নতুন মানবচেতনার মধ্যে রূপ লাভ করলেন পাঠক।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে এসে তপস্বী ও তরঙ্গিণীর বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটতে দেখি আমরা। আবেগময় কণ্ঠে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ আকুল আগ্রহে তরঙ্গিণীর সামনে বলে –

"ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি আর্ত।
তরঙ্গিণী। তপোধন, আপনিও কি আর্তির অধীন?
ঋষ্যশৃঙ্গ। জ্বালা আমার দেহে। আর তার হেতু – তুমি!"[৮]

এই সংলাপে তপস্বীর কৌমার্যহরণ দৃশ্য প্রকট হয়েছে। প্রবল হয়েছে তার দেহের জ্বালা আর বারাঙ্গণার গণ্ডি ছাড়িয়ে আদর্শ প্রেমিকা হিসেবে তরঙ্গিণীর পবিত্র প্রেমের সহজ সরল উপলব্ধিও তেমনি ধীরে ধীরে প্রগাঢ় হয়েছে।

অমৃতের সন্ধান করার কাজে ব্যস্ত থাকা ঋষ্যশৃঙ্গ প্রতিকূলতার শিকার হয়ে দেহযোগ কামনাবাসনাকে একসময় সর্বাগ্রে স্থান দিল। অঙ্গরাজ্যকে সর্বনাশের কবল থেকে রক্ষা করে তাকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য দৈবজ্ঞদের বক্তব্য হল আজন্ম বনবাসী তরুণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে নিয়ে এসে তার কৌমার্যনাশ করতে হবে। যেভাবেই হোক তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে বশীভূত করতে হবে। বারাঙ্গণা লোলাপাঙ্গী আতঙ্কিত হল এই বালক তপস্বীর প্রতাপের খবর পেয়ে। চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন অপাপবিদ্ধ তেজস্বী তরুণ মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ। লোলাপাঙ্গীতনয়া গণিকা তরঙ্গিণীকে দায়িত্ব দেওয়া হল তপস্বীর কৌমার্য নাশ করতে। যার ফলশ্রুতিতে লোমপাদের অঙ্গরাজ্য পুণরায় সুজলা সুফলা হল। তরঙ্গিণী কামনার রজ্জুতে বেঁধে দিল ঋষ্যশৃঙ্গকে।

ঋষ্যশৃঙ্গ ব্রহ্মচারী, তপস্বী, নিষ্পাপ ঋষি। পিতার নির্জন আশ্রমে তিনি অন্য মানুষের সংসর্গহীনভাবে বেড়ে উঠেছেন। জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম মেনে যৌবনের পদধ্বনি এলেও কোন

নারীর সান্নিধ্য পাননি তিনি। এহেন তপস্বীকে কামাগ্নিতে জর্জরিত করলো তরঙ্গিণী। নাটকের প্রথম অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও তার চারিত্রিক প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের সংলাপে। দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনায় ঋষ্যশৃঙ্গ সকালের উদীয়মান সূর্যদেবকে প্রণাম করে প্রকৃতিপ্রাণের সম্ভাষণ জানান – **"আমার জীবন, আমার প্রাণ - আমার চক্ষু, কর্ণ, ত্বক তোমরাও আমার প্রিয়। তোমাদের নিয়ে, তোমাদের আশ্রয়ে আমার আত্মা আনন্দিত।"**[৯]

তাপস ঋষ্যশৃঙ্গের জীবন নির্দিষ্ট নিয়মের নিগড়ে নিয়ন্ত্রিত। তিনি যামিনীর তৃতীয় প্রহরে শয্যা ত্যাগ করেন। নিত্য কর্মসহ তিনি বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্তচর্চা করেন। একদিন আশ্রম সন্নিধানে ধ্বনিত হল এক মিষ্টিমধুর যন্ত্রসংগীত। এমন ধ্বনি শ্রবণে তিনি বলেন - **"মধুর এই ধ্বনি! যেন আমারই কোন আকাঙ্ক্ষার শব্দরূপ। কোথা থেকে আসছে?"**[১০] মধুর ধ্বনি আসলে ছিল তরঙ্গিণীর গীতকণ্ঠের কলতান। তপস্বীর দৃঢ়তায় ফাটল ধরাবার কৌশল। তার কৌমার্যকে আঘাতের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। সামনে সালাঙ্কারা সুন্দরী রমণীকে দেখেও তাকে তপস্বী মনে করেছেন তাপসীতনয়, মনে করেছেন কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা।

তরঙ্গিণীর সংস্পর্শে এসেই পদস্খলিত হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা বিভাণ্ডকের কাছে তাই তিনি জানতে চান – **"নারী কাকে বলে?"**[১১] পিতার ব্যাখ্যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে অদৃষ্টপূর্ব রূপমাধুরীর পরাকাষ্ঠার নামই হল নারী। সুন্দরীকে তাপসতনয় ভাবলেও তার শরীরে অনাস্বাদিত শিহরণ জাগ্রত হয়েছে। সেই অনুভূতিকে ঋষ্যশৃঙ্গ ভুলতে পারেননি। তাই নারী হয়ে উঠে তার নতুন জপমন্ত্র। নারী তার চেনা জগতের বাইরে এক নতুন জগৎ। তাই তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি - **"তুমি নারী, আমি পুরুষ।.....আমি অস্নাত থাকবো, তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে।.....আমি তোমার বিরহে কাতর, আমি তোমার অদর্শনে সন্তপ্ত।"**[১২]

দ্বিতীয় অঙ্কে এসে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানের আরাধ্য দিকভ্রষ্ট হল। সেই ধ্যানের আশ্রয় হল নারীশরীরের সৌন্দর্য ও লাবণ্যরূপসুধা পান। একসময় ঋষ্যশৃঙ্গ বলে উঠেন - **"তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।"**[১৩] তপস্বীর আজন্মলালিত কৌমার্যের ধ্বংস হয়। সমগ্র নাটকে দয়ায়, ক্ষমায়, ত্যাগে, দাক্ষিণ্যে তিনি সর্বাগ্রগণ্য। অন্ধকারময় রাজ্যে তিনি যাত্রা করেন। অথচ অন্যকে আলোকাভিসারের সন্ধান দিয়ে যান যিনি, তিনিই তো ঋষ্যশৃঙ্গ। নাটকের শেষ অঙ্কে তার তাপসসত্তাই প্রকট হয়ে ওঠে। পরম শূন্যতার মধ্যে ডুব দিয়ে তিনি খুঁজে পান দেহ উত্তরিত প্রেম। অমৃতের আস্বাদ, অমৃত সন্ধানের পথ। পান পুণ্যের পথও। পুণ্যের সাথে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার এক আদর্শ পথ নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ। অবশেষে ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রটি হয়ে গেছে সেই অমৃতের সাধনায় উত্তরিত এক অমৃতলোকের যাত্রী।

কামের প্রভাবে দুজন নরনারীর পুণ্যের পথ পরিক্রমা হল 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। নাটকের মূল বিষয়বস্তু পুরাণের ছায়াতলে নায়ক ঋষ্যশৃঙ্গ ও নায়িকা তরঙ্গিণী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যে নারীসঙ্গ মূলত ঋষ্যশৃঙ্গকে আলোকাভিসারী করেছে, পুণ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সেই নারী হল তরঙ্গিণী। মূল পুরাণকাহিনীর গণিকাকে বুদ্ধদেব বসু নতুন করে আবিষ্কার করলেন। এই নাটকের নায়িকা তরঙ্গিনী অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, নতুনবোধে উত্তীর্ণ এক চিরন্তনী নারী।

অঙ্গরাজ লোমপাদের রাজ্যের প্রাণদাত্রী হয়ে দেখা দিয়েছে এই বারাঙ্গণা। চম্পকনগরের গণিকাদের মধ্যমণি এই তরঙ্গিণী। রূপে, লাস্যে, ছলনায় তার কোন দ্বিতীয় বিকল্প নেই। তার কাজ বহু পুরুষের পরিচর্যা করা। এমন কোন পুরুষ নেই যার কাছে তরঙ্গিণী তার সর্বস্ব সমর্পণ করে দিতে পারে - রাজমন্ত্রীর এমন প্রশ্নের উত্তরে তরঙ্গিণী বলেছে – **"প্রভু, আমার সর্বস্ব বলতে আর কী আছে-শুধু এই শরীর! তার অধিকারী কে নয়, বলুন-রোগী, উন্মাদ, নপুংসক ও ভিখারি**

ছাড়া? যে আমাকে মূল্য দেয়, তারই জন্য আমি অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি - শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, যুবা, রূপবান, কুৎসিত, আমার কাছে সকলেই সমান।”[১৪]

বাকবিন্যাসে তরঙ্গিণী চতুরা। ছলনার দ্বারা সে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করেছে। সে জানে লজ্জাত্যাগ ও ঘৃণাবর্জন তার ক্রিয়াকর্ম। পশুপাখি ও পতঙ্গকে বৃক্ষলতা যেমন ফল দান করে, জনে জনে তেমনি তরঙ্গিণী আত্মদান করে। তার সেই মন্ত্রের নাম রতি। তরঙ্গিণীর কায়া-কান্তির স্পর্শে পরিতৃপ্তি এসেছে ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে তা তরঙ্গিণী জানে। তাই সে ঋষ্যশৃঙ্গকে জিজ্ঞাসা করে – **“প্রভু, আপনি তৃপ্ত?”**[১৫] এভাবেই নিজের কর্তব্যকর্মকে প্রাথমিকভাবে সুসম্পন্ন করে তরঙ্গিণী। চরিত্রধর্মে, মনোধর্মে তরঙ্গিণী বহুবলভা বা স্বৈরিণী। তবে স্বৈরিণীর কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় যদি কখনো বা পাপ চিন্তা তার মনের মধ্যে উদয় হয়, তবে তাকে সে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখে। রাজমন্ত্রী তাকেই দায়ভার অর্পণ করেন তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের দেহে মদনজ্বালা জাগিয়ে তোলার জন্য। তপস্বী জানে না, নারী কি। সে কারণে তরঙ্গিণীর পক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করা অত্যন্ত অনায়াসলব্ধ হয়ে উঠেছে।

তরঙ্গিণী অপহরণ করেছিল ঋষিতনয়ের কৌমার্য। এর মধ্য দিয়ে তরঙ্গিণী অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টিধারা নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ললিতভঙ্গিতে আবর্তিত হতে হতে ছন্দের প্রাণহিল্লোলে উৎসারিত হল তার কণ্ঠ থেকে এক আশ্চর্য রকমের সংলাপ - **“এসো ধারাজল। তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি। আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি।”**[১৬] তরঙ্গিণী বহুবল্লভের অধিকারিণী হয়েও তপস্বীতনয়ের সঙ্গে মিলনে পেয়েছে এক নতুন জীবনের আস্বাদ। কাজেই বহু বাহুর ডোরে আর নিজেকে সময়ে সময়ে জনে জনে ধরা দিতে মন তার সায় দেয় না। অভ্যস্ত জীবনধারা থেকে নিজেকে অন্য পথে অন্যভাবে চালিত করতে তৎপর হয় সে। কামকে এভাবেই পুণ্যের পথে নিয়ে যেতে কার্যকরী ভূমিকা নেয় তরঙ্গিণী। তরঙ্গিণীর দেহে জন্ম নিয়েছে এক আশ্চর্য নতুন আকর্ষণ। ঋষ্যশৃঙ্গ সম্পর্কে তাই তার মনোভাব - **“তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।”**[১৭] কামনাসর্বস্বতা থেকে বারাঙ্গণা তরঙ্গিণীর হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে অন্য পথে গমন করে। ঋষ্যশৃঙ্গকে তাই সে বলে - **“বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!.....তবে চলো - চলো আমার সঙ্গে।”**[১৮]

তপস্বীর সংস্পর্শে এসে পরম নির্ভরতার আশ্রয় পেয়েছে তরঙ্গিণী। পরম নিশ্চয়তার কারণে সে বলে – **“আমাকে উদ্ধার কর।”**[১৯] একসময়ে তরঙ্গিণী লোলাপাঙ্গীকে বলেছে তার মত দুঃখিনী আর কেউ নেই। জানতে চেয়েছে তার পিতৃপরিচয়। চন্দ্রকেতু তার সঙ্গ ও স্পর্শলাভে উদগ্রীব হলেও তরঙ্গিণী অন্য কথা বলে। পাপপঙ্কিল আবর্তে যার বাসা ছিল সেও নিঃসঙ্কোচে বলে – **“কিন্তু আমি তোমার পত্নী হবো না। আমি কোন পুরুষেরই পত্নী হবো না। জানো না আমি স্বভাবস্বৈরিণী?”**[২০] নাটকে তরঙ্গিণীর মধ্যে জেগেছে মানসদ্বন্দ্ব। তপস্বীকে স্বস্থানচ্যুত করায় তার মধ্যে জেগেছে আত্মজিজ্ঞাসা ও মানসযন্ত্রণা। তাই সে বলে – **“আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। আমি নদী থেকে জল নিয়ে আসবো, কুড়িয়ে আনবো সমিধ কাষ্ঠ, অগ্নিহোত্র অনির্বাণ রাখবো। আমি আর কিছু চাই না। শুধু দিনান্তে একবার-একবার তোমাকে চোখে দেখতে চাই। সেই আমার তপস্যা। সেই আমার স্বর্গ।”**[২১] নাটকে এভাবেই সামান্য বারাঙ্গণা তরঙ্গিণী বিভিন্ন স্তর পরম্পরায় নতুনবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে নানা প্রতিকূল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কামকে প্রেমের সোপান করে প্রেম ও পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হতে পেরেছিল। সেই পথ অমৃতের সন্ধান দেবার পথ। সেই মহতী পথের পথিক তরঙ্গিণী। তার চলার পাথেয় হলো নবতর জীবন-উপলব্ধি ও জীবনঅন্বেষা।

তপস্যা থেকে ভ্রষ্ট করতে গিয়ে বারাঙ্গণা তরঙ্গিণী এবার নিজ ধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছে। তাই সমস্ত চাওয়া পাওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করে সে। তার মধ্যে একটা মানুষ জেগে উঠেছে

ঋষ্যশৃঙ্গের সাহচর্যে। তাই সে বলে – **"মা, আমি যেন হারিয়ে গিয়েছি। আমি যেন নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।"**[২২] লোলাপাঙ্গী মনে করিয়ে দেয় কন্যাকে যে তার গুণমুগ্ধরা তার দরজায় এসে ফিরে গেছে। কিন্তু তরঙ্গিণীর কোন কিছুতেই সায় নেই। তরঙ্গিণীকে বিয়ে-সন্তান-সংসারের সহজ সমাধানের পথ দেখায় তার মা। গুণমুগ্ধদের দামি উপহারের লোভ দেখায়। বারাঙ্গণাদের মধ্যে তাঁর স্থান যে কোথায় সেটাও তাকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সবকিছুকেই তরঙ্গিণী অস্বীকার করে। মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিলাতে পারে না। তাই সে বলে - **"আমার মন বলে, আমার মত দুঃখিনী আর নেই।"**[২৩]

মায়ের প্রলোভনে প্রলোভিত নয় আর তরঙ্গিণী। তার সামনে বৃহত্তর আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে। তাই মাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে – **"মা তুমি আমাকে ভাবো কী! স্বামী, সন্তান, গার্হস্থ্য-এসব নিয়ে কি আমি তৃপ্ত হতে পারি? আমি স্রোতস্বিনী তরঙ্গিণী। মা, আমি যে বড় উচ্ছল। উদ্বেল আমার হৃদয়। আমার কোথাও আশ্রয় নেই।"**[২৪] তাই তরঙ্গিণী তার সব অলঙ্কার খুলে মাকে দিয়ে দেয়। লোলাপাঙ্গী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে - **"তরু, তুই কি সন্নেসিনি হতে চললি?"**[২৫] তরঙ্গিণী বলে – **"আমি কি হবো তা জানি না। আমার কি হবে তা জানি না। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।"**[২৬] তরঙ্গিণীর হৃদয় অশান্ত ও অতৃপ্ত। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তরঙ্গিণী আজ সন্দিগ্ধহৃদয় এক নারী।

তরঙ্গিণীর স্পর্শে ঋষ্যশৃঙ্গ স্বধর্মচ্যুত হয়ে লোমপাদের কন্যা শান্তাকে বিয়ে করে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হয়। যে কাজের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বধর্মচ্যুত হতে হয়েছিল সেই কার্য সম্পাদিত হয়ে যাওয়ায় পিতা বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ ততদিনে বিভাণ্ডকের সব কথা জেনে ফেলেছেন। পঞ্চদশ গ্রাম এবং পুত্র অঙ্গরাজ হবে এই প্রলোভনে তিনি লোমপাদের কাছে পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে অর্পণ করতে রাজি হয়েছিলেন। লোমপাদের অঙ্গীকার মতো অঙ্গরাজ সমৃদ্ধ হয়েছে আর শান্তা পুত্রবতীও হয়েছে। তাই বিভাণ্ডক পুত্রকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাতর হয়েছেন। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদের অঙ্গীকারের অধীন নন। তাই তিনি বলেছেন - **"আমি কোথাও যাবো না; এই নগর আমার যথাস্থান।"**[২৭] পিতার কাতর প্রার্থনায়ও দ্রবীভূত হয় না পুত্রের মন। বলে – **"না, আমি ফিরে যাবো না। আমি এখানেই থাকবো। অন্য এক প্রতীক্ষায়-অন্য এক প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।"**[২৮]

বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে আহ্বান করছেন আশ্রমে ফিরে যেতে, পুনরায় তপস্যায় নিমগ্ন হতে। তখন তার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ অবস্থান করছে এক অজানা জগতে। খুঁজছে সেই একজনকে যে তাকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তাই বিভাণ্ডক যখন বলছেন – **"চলো তবে-ফিরে চলো আমার আশ্রমে। আমার নয়, তোমার আশ্রম।"**[২৯] বলেছেন - **"ঋষ্যশৃঙ্গ, আমি তোমারই অনুগামী হতে চাই; আমাকে তোমার শিষ্য করে নাও।"**[৩০] তখন ঋষ্যশৃঙ্গের উক্তি - **"আপনি আমার গুরু, পূজনীয়, কিন্তু আমার পক্ষে গুরু আজ গুরুভার, শিষ্য প্রতিবন্ধক।"**[৩১] তাই ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার ইচ্ছের সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মেলাতে না পেরে বলেছেন – **"পিতা, আমাকে বিদায় দিন।"**[৩২]

তরঙ্গিণী তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে গিয়ে তাকে স্বধর্মচ্যুত করে। তরঙ্গিণীর স্পর্শে ঋষ্যশৃঙ্গের শরীরে ও মনে পরিবর্তন ঘটে। তরঙ্গিণী তার কার্যে সফল হয়। তপস্বীর কৌমার্য হরণ করে সে। তরঙ্গিণীর কায়াকান্তের স্পর্শে পরিতৃপ্তি এসেছে ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে। এসেছে পরিবর্তনও। ঋষ্যশৃঙ্গ জেনেছে নারী কি? কাকে নারী বলে। অন্যদিকে তরঙ্গিণী বহুবল্লভের অধিকারিণী হয়েও তপস্বী তনয়ের সঙ্গে মিলনে পেয়েছে এক নতুন জীবনের আশা। বারাঙ্গণা নারীর ধর্ম পালন করতে গিয়ে তরঙ্গিণীর জীবনেও এসেছে পরিবর্তন।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' বুদ্ধদেব বসুর রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। পূর্ণাঙ্গ অভিনয়যোগ্য ও শিল্প সাহিত্যমূল্যের বিচারে উজ্জ্বল। কামের পথ ধরে এরই প্রভাবে দুটি নরনারী কিভাবে জীবনে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র এই হল মূলকথা। নারীসঙ্গ কিভাবে ঋষ্যশৃঙ্গের মনে ভাবান্তর ঘটিয়ে আলোকাভিসারী করেছে, পুণ্যের পথে নিয়ে গেছে তা নাটকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

নাটকের মধ্যে নায়ক ও নায়িকার মনোভূমির পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। রসদ পুরাণ হলেও আধুনিক নর-নারীর জীবনযন্ত্রণার ছাপ এই কল্পনাতে খুব প্রবল। সমালোচক এর ভাষায় – **"বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে যে আধুনিক মানুষের মানবতা ও দ্বন্দ্ববেদনা সঞ্চার করেছেন সে তাঁর নিজস্ব ভাবনা।"**[৩৩] পাশাপাশি আধুনিক চিন্তাচেতনার অনুপ্রবেশও ঘটেছে নাটকটিতে। নাট্যকার এই কাব্যনাট্যে মহাভারতীয় কাহিনীকে অনুসরণ করলেও তাঁর নিজস্ব মৌলিকতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই কেবল ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর কাহিনী নয়, ঋষ্যশৃঙ্গ ও তার স্ত্রী শান্তার মিলনাত্মক উপসংহারও কবিকল্পিত ভিন্নরূপেই দেখা দিয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু পুরাণভাবনাকে আধুনিক মানস অভিজ্ঞতার আলোকে সঞ্চারিত করে দেখাতে সক্ষম হলেন যে কাম ও প্রেমের মধ্যে কোথাও কোন বিরোধ নেই। বরং একে অন্যের পরিপূরক। কাহিনীবয়নে, চরিত্রের রূপায়ণে কবি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাকে আধুনিক মানব সভ্যতার আলোকে নাট্যায়িত করেছেন। পুরাণ ও কল্পনাকে মিশ্রিত করে এক নতুন জীবনরসের আস্বাদ দিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী:

১) বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পাদনা), 'বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা', পৃঃ ৩০৩।
২) মুখোপাধ্যায়, তরুণ, 'নাটক, কাব্যনাটক : নিজস্ব দর্পণে', দ্রষ্টব্যঃ 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক : যে জীবন মৃত্যুর অধিক', পৃঃ ৮৮।
৩) বসু, বুদ্ধদেব, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', পৃঃ ২৪।
৪) তদেব, পৃঃ ২৮।
৫) তদেব, পৃঃ ৩৩।
৬) তদেব, পৃঃ ৩৮।
৭) বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পাদনা), 'বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা', পৃঃ ৩০৪।
৮) বসু, বুদ্ধদেব, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', পৃঃ ৩৯।
৯) তদেব, পৃঃ ২৬।
১০) তদেব, পৃঃ ২৭।
১১) তদেব, পৃঃ ৩৫।
১২) তদেব, পৃঃ ৩৮।
১৩) তদেব, পৃঃ ৩৯।
১৪ তদেব, পৃঃ ২২।
১৫) তদেব, পৃঃ ৩২।
১৬) তদেব, পৃঃ ৩৩।
১৭) তদেব, পৃঃ ৩৯।
১৮) তদেব, পৃঃ ৩৯।
১৯) তদেব, পৃঃ ৪০।
২০) তদেব, পৃঃ ৫২।

২১) তদেব, পৃঃ ৭৪।
২২) তদেব, পৃঃ ৫০।
২৩) তদেব, পৃঃ ৪৮।
২৪) তদেব, পৃঃ ৫০।
২৫) তদেব, পৃঃ ৭৫।
২৬) তদেব।
২৭) তদেব, পৃঃ ৬২।
২৮) তদেব, পৃঃ ৬৪।
২৯) তদেব।
৩০) তদেব, পৃঃ ৭৪।
৩১) তদেব।
৩২) তদেব, পৃঃ ৭৪-৭৫।
৩৩) মুখোপাধ্যায়, তরুণ, ‘নাটক, কাব্যনাটকঃ নিজস্ব দর্পণে’, দ্রষ্টব্যঃ ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’: উৎস সন্ধানে, পৃঃ ৮৬।

গ্রন্থপঞ্জী:

১) বসু, বুদ্ধদেব, ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৬৯।
২) ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ‘বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস’, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা -১২, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭১।
৩) সরকার, পবিত্র, ‘নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ’ (অখন্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম অখন্ড সংস্করণ, ২০০৮।
৪) সমাদ্দার, ড শেখর, ‘বাংলার নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাস’, প্রয়াগ প্রকাশনী, কোলকাতা-৪৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।
৫) বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পাদনা), ‘বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা’, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ, ২০১১।
৬) মুখোপাধ্যায়, তরুণ, ‘নাটক, কাব্যনাটকঃ নিজস্ব দর্পণে’, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।
৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবীন্দ্রনাথ, ‘কালজয়ী বাংলা নাটকঃ পুণর্বিচার’, গণমন প্রকাশন, কলকাতা – ৫০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫।
৮) ভট্টাচার্য ড. তারকনাথ, ‘বাংলা নাটক : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ’, (উৎস থেকে বিংশ শতাব্দী), বাংলা সাহিত্য একাডেমি, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৯।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাসের দলছুট নায়ক খগেনবাবু

মৌমিতা দে
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা* প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৩৫-এ। ইতিহাসের কাঁধে তখন বিশ্বযুদ্ধের পৃথিবী, বিষন্নতা, মনোবিকার ও অনিকেতের ভার। সম্মুখে 'দেশ', 'পূর্বাশা' ও 'পরিচয়'-এর রূঢ় প্রতিবাদ। আত্ম-পরিচয়ের সন্ধান করতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখলেন, 'ভগবান আমি মানি না, প্রমাণাভাবাৎ নয়, প্রয়োজনাভাবাৎ'। অন্যকে গড়ে তোলার অধিকার কারোর নেই; কারণ, একজন অন্যের ব্যবহারিক সামগ্রী নয়, উপকারের উপকরণও নয়, প্রত্যেকেই আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। এই পূর্ণাঙ্গতেই অর্থবহ অস্তিত্বশীল হওয়া। খগেনবাবু এই অস্তিত্বসন্ধানী মানুষ তথা লেখকের মুখপাত্র। অন্তঃশীলা, আবর্ত ও মোহনা; ত্রয়ী উপন্যাসের সমকাল তিনি; ইতিহাস তাঁর এক নাম।

সূচক শব্দ: Authentic Man, Negative capability, Shared Existence, Disturb Culture, আবর্ত, অনন্বয়ী ইত্যাদি।

মূল প্রবন্ধ:

> "খগেনবাবুর চিত্তে শান্তি নেই। আত্মশুদ্ধির অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় আত্মম্ভরী হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নৈরাত্মবোধের সংকল্পে চিত্তকে বহির্মুখী করাই তার একমাত্র প্রতিকার।"
>
> (অন্তঃশীলা)

বক্তব্যটি লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের। উদ্ধৃতি-ঋণ *অন্তঃশীলা*। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পর্কে লিখছেন, "জ্ঞান যে একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়া তার নির্দেশে যে পরমার্থের সাক্ষাৎ মেলে না, এবং বুদ্ধিই যে সর্বত্র বিরোধ বাধায় এই বের্গসনী সিদ্ধান্তে ধূর্জটিপ্রসাদ পৌঁছেছেন বুদ্ধিরই পরামর্শে, আবেগের তাড়নে নয়"।[১] সুধীন্দ্রনাথের এমন মন্তব্য থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায়, যে সময়কালে দাঁড়িয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস লিখছেন সে সময়ের 'কল্লোল গর্জনকে' তিনি গ্রহণ করছেন না। রোমান্টিক, আবেগজর্জর, সুখ দুঃখময় বাঙালী জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা কিংবা সমাজের একেবারে নীচুতলার মানুষের দারিদ্র্যমুখর সংগ্রাম, অন্ধকার জগতের ক্রিয়াকলাপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বা পুরনো মূল্যবোধের অবসানে নতুন মূল্যবোধের উদ্ভাসন, যার উপর ভর করে উপন্যাসের কলেবর সমৃদ্ধ হয়েছিল সেই 'romantic realism'- এর বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। বলছেন, "...নতুন সাহিত্যিকদের লেখায় পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন সাক্ষাৎ পাই কিন্তু কেন হলো, কীভাবে হলো- এই জ্ঞানের পরিচয় পাই না। ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে খেতে পারছে না- মাত্র এইটুকু কথাসাহিত্যে ফুটছে।... যারা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হাহুতাশ করেন তাঁরা লোক ভালো, কিন্তু রোমান্টিক। আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুঁটো মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার উপর রূপ সৃষ্টি হোক, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে।"[২] কেননা, বুদ্ধিবাদের অর্থ বুদ্ধির মত্ততা নয়, বুদ্ধিবাদের সৎ অর্থ হল ইচ্ছাশক্তির আপেক্ষিক গৌণতা। অবশ্য চরিত্রধর্মকে

বাদ দিয়ে তার জায়গা নেই। আগে চরিত্র, তারপর ঘটনা। তাই কেবল রোমান্টিসিজম নয়, কেবল দারিদ্র্যকে পুঁজি করে সহানুভূতির বৃত্তান্ত রচনা নয়, সাহিত্যে আনতে হয় কার্ল মার্ক্সের ধ্যান ধারণা।

অন্তঃশীলা উপন্যাসে খগেনবাবু বলছেন, "নিজের জীবনের ঘটনা থেকে যে নভেল লেখে সে বড় জোর একটা নভেল লিখতে পারে- কিন্তু সে আর্টিস্ট হতে পারে না"।[৩] কিংবা "অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়... চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘুর্ণি, কোথাও বা আবর্ত। এই ত জীবন। মোহনা কোথায়? এরই প্রতিচ্ছবি ঠিক না, এরই বিচার ও মূল্য নির্ধারণই আর্টিস্টের কাজ-- অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রকাশ। কিন্তু প্রধান কথা স্রোত চলছে--"।[৪] আর লেখক লিখছেন, "... অন্তঃশীলা আমি ভাবের বশে লিখিনি। এর মধ্যে না আছে আত্মকথা না আছে প্রেরণা। অথচ খুঁটিনাটি ঘটনার পিছনে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। সে সব অভিজ্ঞতা চিন্তার ভেতর দিয়েই চালু হয়ে এসেছে। এবং মন যখন প্রধানত লেখকের তখন মনোভঙ্গী ও ভাষা কিছু পরিমাণে তার সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে মিল খাবে। আমার মন খগেনবাবুকে ধার দিয়েছি মাত্র"।[৫] দিনলিপি *ঝিলিমিলি*তে লিখছেন, "লোকে বলে আমি বুদ্ধিসর্বস্ব। তা ঠিক নয়। বুদ্ধি মানে যদি Aristotelean syllogism হয়, তাও আমি ঠিক সেই হিসেবে লজিক্যেল নই। আমার মন ডায়ালেকটিকাল"।[৬] খগেনবাবুও বলছেন তেমনটাই, "আমার সাংখ্য বেদান্ত পড়া মিথ্যে। আমি নিতান্তই এ যুগের মানুষ। আমার ভেতর দিয়ে সমগ্র সভ্যতার সমন্বয় হোক- আমি সমগ্র ইতিহাসের সৃষ্টি।"[৭]

ধূর্জটিপ্রসাদ লেখক, অজস্র না হলেও নেহাৎ কম নয়- লিখেছেন ইংরাজিতে আর্থনীতিক সন্দর্ভ, 'রিয়ালিস্ট', 'আবর্ত', 'অন্তঃশীলা', 'মোহানা'-র মতো গল্প-উপন্যাস, 'আমরা ও তাঁহারা', 'চিন্তয়সি', 'বক্তব্য', 'মনে এলো', 'কথা ও সুর' 'সুর ও সঙ্গতি'-র মতো রম্যার্থদীপ্ত বহুমুখী মানসিক পদচারণার কথা। কিন্তু তথাপি— সব কিছু আয়োজন উপকরণ, তীক্ষ্ণ মনীষা ও রম্য বাকভঙ্গি, আদর্শবাদ ও কর্মচারিতা সত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদ আত্মখন্ডিত। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীর বংশধর তিনি, বিদ্যাসাগর - বঙ্কিমের গোত্রজ হয়েও তিনি খর্বকায় কুশীলব, অবমূল্যায়নী এই কালের উপযুক্ত প্রতিনিধি।

খগেনবাবুও বিশ্বাস করেন, সমস্ত ইতিহাসই সমকালের ইতিহাস। পলিটিক্যাল জীব কোনো পৃথক জীব নয়, মানুষের বেঁচে থাকার দৈনন্দিন সংগ্রামই মানুষকে অনিবার্যভাবে পলিটিক্যাল বানিয়ে দেয়। মনে করেন, যতটা বাইরের জগৎকে জেনে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় ঠিক ততটাই উদঘাটিত হয় তার নিজত্ব, ততটা সৃষ্ট হয় তার নতুনত্ব। আর এই নিজত্ব, এই নতুনত্বে নিজেকে দেখার আকাঙ্ক্ষাই আনে বিচ্ছিন্নতা! জানেন, যারই মন আছে সেই একাকী; ভিড়ের কোন মন নেই। সার্ত্রে যেমন বলেন, "মানুষ স্বাধীন, কারণ সে পূর্ণ নয় এবং স্বস্থিত সত্তা বা জড় বস্তুর মতো পর্যাপ্ত নয়। মানুষ যেহেতু অসম্পূর্ণ, মানুষের সম্ভাবনা আছে এবং তার নির্বাচনের (চয়েস) ক্ষমতা আছে।... স্বাধীনতা যথাযথই সেই শূন্যতা, যা মানুষের অন্তরে আছে এবং যা মানুষকে সে তার থেকে আলাদাভাবে গড়ে নিতে বাধ্য করে"।[৮] স্বাধীনতা চেতনার সত্তা, চেতনা শূন্যতার সৃষ্টি করে। খগেনবাবু বলেন, "আমার গন্তব্যের কোন ঠিকানা নেই, মানুষের গন্তব্য একাধিক, একটি টানছে এধারে, অন্যটি টানছে ওধারে, বিপরীত দিকে, মধ্যে মধ্যে দিকনির্ণয়ই হয় না।" অর্থাৎ, পথের সংখ্যা বহুল হলেও গন্তব্যের ঠিকানা নেই। স্বাধীন তবু চলার মতো দিক নেই তাঁর। খগেনবাবু এখানেই অনন্বয়ী। তাঁর হেঁটে চলায় মিশে আছে dual personality 'র বিরোধ।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ট্রাডিশনাল উপন্যাসের মতো *অন্তঃশীলা* শুরু হচ্ছে না। শুরু হচ্ছে সাবিত্রীর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। সার্ত্রে বলছেন, "There is only one really serious philosophical problem, that of suicide. To judge that life is or is not worth the trouble of being lived, this is to reply to the fundamental question of philosophy".[৯] খগেনবাবু সার্ত্রের এই ভাবনায় ভেবেছিলেন নিঃসন্দেহে। ধূর্জটিপ্রসাদও জানতেন, "Human insurrection is a prolonged protest again death";[১০] জীবন সীমানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই সত্তার অস্তিত্বকে পেতে হয়। জীবনের পাতিত্য (fallenness) থাকবে; তবু একথা তো ঠিক, ব্যথিত হৃদয় 'একক' (the one) পরিসীমার বাইরে গিয়ে যন্ত্রণা পেলেও তার বাঁচা 'authentic man' বা 'যথার্থ মানুষে'র মতোই বাঁচা। খগেনবাবু এই সত্যটিকে ধরেছিলেন; "সাবিত্রীর মধ্যে প্রথমে মিথ্যা ছিল না, পরে এসেছিল-- সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব, সভ্যতা ও স্বাভাবিকতার বিরোধ সে ধারণা করতে পারলে না নিজের মধ্যে...। সাবিত্রীর না মরে উপায় ছিল না।"[১১] আসলে তিনি জানতেন প্রত্যেকেই মুক্তি চায়, প্রত্যেকেই চায় উত্তরণ। কারণ, জীবন আর যাই হোক খেলার জিনিস নয়। ফলত স্বাভাবিকভাবেই খগেনবাবুর চরিত্রে এলো নতুন মোড়। বুঝলেন, বাইরে তিনি চিন্তাবিদ, প্রজ্ঞাবান কিন্তু ভিতরে একজন ছদ্ম ভাবপ্রবণ মানুষ। চিত্ত তাঁর বিক্ষুব্ধ, "... আজ একটি স্মারক-লিপি ধুয়ে পুঁছে গেল। রইল বাকি নিজের অসম্পূর্ণতা, আর আফসোস বনাম ঘৃণার জের, সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা।"[১২]

খগেনবাবুর এই সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা দু'দিক থেকেই, কখনো তিনি হৃদয়কে বড় করছেন, কখনো গুরুত্ব দিচ্ছেন বুদ্ধিকে। কখনো চাইছেন নিজের মধ্যেই নিজেকে রাখতে, কখনো চাইছেন অন্যের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে। রমলার ভাষায়, "খগেনবাবুর চরিত্রে লোভ নেই, কপটতা নেই... খগেনবাবু অন্তর্মুখী, বাইরের সব ব্যাপারকে মাথার মধ্যে এনে যাচাই করতে চান, ঘটনা হয়ে যায় আইডিয়া, আইডিয়ার রীতি অনুসারে বাইরের জীবনটাকে সাজাতে চান- বাধে বিরোধ। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে ভালবাসে, উনি নিজের ভাবনা ভাবতে ভালোবাসেন।"[১৩] হয়তো এজন্যই সাবিত্রীর মধ্যে কেবল নারীত্বের তেজ দেখতে চাননি, চেয়েছিলেন আত্মপ্রত্যয়- আত্মনিষ্ঠা-আত্মসচেতন-আত্মনির্ভরশীলতার দীপ্তি। কৃত্রিম আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণে বাঁচা তাঁর কাম্য নয়। সাবিত্রীর সান্নিধ্য দৈহিক সুখ দিয়েছিল মাত্র, রমলার মতো মানসিক তৃপ্তি দেয়নি। যদিও রমলাদেবী খগেনবাবুকে তাঁর অসম্পূর্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দিত তবু সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁর স্বভাব-বৈপরীত্য তাঁকে রমলার কাছে এনে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। লেখেন, "পুরুষসিদ্ধি একমাত্র শুদ্ধ প্রচেষ্টা। শুদ্ধ না হলে সিদ্ধি হয় না; শুদ্ধি ও সিদ্ধি একই প্রক্রিয়া। আপনি গুণবতী প্রকৃতিস্বরূপা-- আমি আপনার অতিরিক্ত হতে চাই।"[১৪] সাবিত্রী সামঞ্জস্যের হাত নিয়ে প্রয়োজনের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন, রমলা দাঁড়িয়েছিলেন আগ্নেয়গিরির মতো অন্তরের বিপ্লব বোঝার ক্ষমতা নিয়ে। কিন্তু এই বোঝার ক্ষমতাও তো কখনো সামনের জনের কাছে অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন আনতে পারে! সার্ত্রে বলেন, "shame is by nature recognition. I recognize that I am as the other sees me."[১৫] কোনো কোনো সময় অপর ব্যক্তির অস্তিত্ব আমার স্বাধীনতা হরণ করে। তার কাছে আমি তখন বস্তু রূপে গণ্য হই। খগেনবাবুর অনন্বয়ী হবার পথ আরো প্রশস্ত হল। মাসিমা ছিলেন আপনাতেই আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ না পেলেও হৃদয়ের মহত্ব ছিল তাঁর। মাসিমা কাশীবাসিনী হলেন। খগেনবাবুর জীবন থেকে স্নেহের পরশ গেল ঘুচে। খগেনবাবু এখন একা।

বিরোধের মধ্যদিয়ে যে জীবনের হেঁটে চলা, সে জীবনও তো কোনো একসময় সমন্বয়ের পথ আঁকড়ে ধরতে চায়, তা নাহলে জীবন মিথ্যে, সম্পর্ক মিথ্যে, মিথ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শ্লাঘা। একথা অবশ্য ঠিক যে, সাবিত্রী খগেনের জীবনের ট্রাজেডিতে মিশে আছে পরস্পরকে না বোঝা। তবে সাবিত্রী যেমনই হোক, সাবিত্রীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা ছিল তাঁর। ভিতরে ভিতরে তৈরিও করে দিয়েছিলেন খগেনবাবুকে। না হলে তিনি বলতেন কী করে "এখন বুঝতে পেরেছি আদর্শ অনুযায়ী ভালবাসা পাপ, তাতে অন্যের জীবনকে অপমান করা হয় নিজের স্বার্থের জন্য, নিজেরও স্বার্থসিদ্ধি হয় না। সে আমার আদর্শকে অতিক্রম করবে- তবেই তাকে নিষ্কামভাবে- সে যা তাই হিসাবে পাব। আদর্শের কাঠামোতে মূর্তি গড়া একপ্রকারের কাম।... এবার যাকে ভালবাসব তার বিশেষ অস্তিত্ব আমি গ্রাহ্য করব। প্রথমেই গ্রাহ্য করব তার কাছে কিছু দাবি না করে।"[১৬] রমলা এই দাবী না রাখার দাবীতে যুক্ত হয়েছিলেন। আর হয়েছিলেন বলেই, যে কোনো চিন্তাই রমলার কাছে মেলতে পারা তাঁর কাছে সহজ হয়েছিল। সহজ হয়েছিল বলা যে তাঁর, বাইরের পরিধিকে একটা মোটা নাম দিয়েছেন- সাধারণ মানুষ, জনগণ। ভীড়ের হাত থেকে তাঁকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। কেননা তিনি বুঝেছিলেন, প্রেমের পরিণতি বন্ধুত্বে, বন্ধুত্বের অবনতি প্রেমে। মন দিয়েই বোঝা যায় মনের অতিরিক্ত বন্ধুত্ব। বুঝেছিলেন, নিঃসম্পর্কিত জীবন কাটানো যায় কিনা তার পরীক্ষা করা দরকার। চলে যাওয়া দরকার কাশীতে; "ভিড়ের সঙ্গে মানুষের মতন মানুষের পার্থক্য খোঁজা, এই চেষ্টা। যে মানুষ সে নিজের ওপর দাবী করে, নিজের কাছে চায়, যে সাধারণ সে চায় পরের কাছে। সেইজন্য অবলম্বনহীনতাই যোগ্যতার কঠিনতম পরীক্ষা।... ধ্যানী ও যোগীরাই একমাত্র মানুষ, বাকি সব canaille- সাধারণ। আমার সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র হবার প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে।"[১৭] স্বতন্ত্র হবার এই প্রয়োজন খগেনবাবুর অনন্বয়ী হবার পথকে আবার নতুন একটা মোড়ে নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, কাশীতে তখনও তিনি দুটি বিপরীত বিষয়কে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। একটি, সুজন বিজনের 'totalization' এর বিশ্বাস, অন্যটি তাঁর ব্যক্তি আমির আভিজাত্য।

আবর্ত শুরু হল। লেখক লিখছেন, "বিজনের সোশিয়ালিজম আর খগেনবাবুর নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনা এক বস্তু নয়। বিজনের সম্মুখে সর্বনাশ, সে পুরাতনকে অগ্রাহ্য করে নতুনতর সমাজ সৃষ্টি করবে। খগেনবাবু চান মুক্তি।"[১৮] আর সুজন 'খগেনবাবুর শিষ্য'। তার সমগ্র জীবনটাই মৈত্রীস্থাপনের সেতুস্বরূপ। খগেনবাবু বলছেন, "তোমার ধর্ম পরাশ্রিত। সাধারণের মধ্যে আত্মবিলোপে আত্মার উন্নতি"।[১৯] মূলত বিজন চায় এমন একটা সমাজ যেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকবে না। খগেনবাবুর সঙ্গে তার মিল নেই তেমন না, বিজনের প্রাণে বাঁধনহারা স্রোতের গতি আছে তাই অনর্গল কথা বলা তার স্বভাব। খগেনবাবুর জীবনে বাধা পড়েছে নিজের তৈরি বাধা দিয়েই, তাই তিনিও কথা বলেন অনর্গল। তিনি অস্থির নন, একটা ধীশক্তি তাঁর মধ্যে থেকেই গেছে প্রথম থেকে। তাই সোশিয়ালিজমের উন্মাদনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। কেননা, দরিদ্রনারায়ণ দেশমাতার ভীষণ শত্রু। সমাজবিপ্লব এবং জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন একইসঙ্গে সম্ভব নয়। কার্ল মার্ক্সের শিষ্যরা সমাজ অর্থে মূলত শ্রেণি বোঝে, শ্রেণিসংগ্রাম ব্যক্তি আমিকে অস্বীকার করে।

ভাবলেন, সন্ন্যাসজীবনই শ্রেয়। কাশী গেলেন। আশ্রম গ্রহণ করলেন। কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটাতে বেদান্ত, সাধুজীর উপদেশ, বই পড়া, কোনো কাজে এল না তাঁর- বৈদান্তিক সাধুর সোহংজ্ঞানী হওয়ার উপদেশও হল ব্যর্থ। মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চান বলে সোহংজ্ঞানী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জীবনশিল্পী, তাই বেদান্ত মানা তাঁর ধর্ম নয়, কারণ আর্ট বা শিল্পের প্রাণ হচ্ছে সম্বন্ধ স্থাপন, অথচ বেদান্তের

ভিত্তি সম্বন্ধ অস্বীকার করা অর্থাৎ নেতিবাচক। এজন্যই সম্বন্ধ অস্বীকার করে যে মুক্তি, সে মুক্তি তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়। বুঝলেন বৈরাগ্যসাধনের প্রয়োজন কেবল চিত্তশুদ্ধিতে। দোলাচলতা তৈরি হল তাঁর। কাজ করলো দুটি গতি, প্রথমটি সম্পূর্ণতার দিকে, দ্বিতীয়টি বিচ্ছিন্নতার দিকে। একদিকে সংসার অন্যদিকে সমাজ। একদিকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সমষ্টির মধ্যে আত্মসন্ধান। এই দুই-এর মাঝখানে কী? আশ্রম? কিন্তু নিষ্কামভাবে দেখেন না তো কিছুই! আত্মোন্নতিই তাঁর মূল লক্ষ্য। বুঝতে পারেন তাঁর চরিত্রের মধ্যে কোথাও যেন 'পিউরিট্যানিজম'এর ছোঁয়া আছে। প্রকৃতির অনিবার্যতা মেনেও শান্তি পাওয়া যায় না, জ্ঞানের দ্বারাও নিয়তিকে জয় করা যায় না। মানুষের বেঁচে থাকা তাহলে কী উদ্দেশ্যহীন! *আবর্ত*-এ যা বলছেন, *মোহনা*-য় তার রেশ থেকে গেল। বললেন, অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেওয়া যায় না, কোথাও একটু বাকি থেকে যায়। মিলনের মধ্যে তৃপ্তি থাকলেও সম্পূর্ণতা নেই, আন্তরিক সম্বন্ধস্থাপনের মধ্যেও মিশে থাকে অতৃপ্তির বেদনা- তাই মিলনের জন্যও প্রয়োজন সাধনার। সাধনা সম্বন্ধস্থাপনের নয়, সম্বন্ধ সৃষ্টির। সম্পূর্ণতার সন্ধানের নামই মৈত্রীসাধনা। স্বাধীনতার সার্থকতা সেখানেই, যেখানে মানুষের উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তি ও ভাবসমূহের কর্মে পরিণত হবার অবকাশ থাকে।

অন্তঃশীলার শেষ অংশে সুজনকে লিখলেন, "আমি এখন মৈত্রীর অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। নিরালম্ব হয়ে থাকা যায় না- আমি পারলাম না"।[২০] *আবর্তে* বললেন, "অন্যকে না পেলে আমি পূর্ণ হব কেমন করে! ফ্রয়েড ও মার্ক্সের সমন্বয় চাই।... মানুষ ফুটতে চায়, পারে না, কারণ একলা ফোটা যায় না। নিরালম্ব দাম্ভিকতার নামান্তর"।[২১] ফল হল- তিনি *মোহনা*-য় এসে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ, যে খগেনবাবু অস্তিত্ব বলতে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বুঝতেন, সেই খগেনবাবুই *মোহনা*-য় এসে অস্তিত্বকে বাঁধলেন দায়িত্ব-কর্তব্যের ছাঁচে। জীবনের বৃহৎ কর্মধারায় মানুষের আত্মনিয়োগ-এই হল ব্রত।

মূলকথা, "রমলা দেবী আমার সহধর্মী, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট"। এই কথা বলতে পারার আগে পর্যন্ত খগেনবাবুকে যে পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল সেই পথে ছিলেন সাবিত্রী। সাবিত্রী সম্পর্কে বলছেন, "সাবিত্রী চেয়েছিল সামঞ্জস্য"। মানে, বাইরের মুখোশকেই তিনি চিনেছেন সত্য করে, অন্তরের খবরে যার বোধগম্যতা, সে রমলার। কারণ, খগেনের মতো রমলারও দীর্ঘশ্বাসে কথা ছোটো হয়ে আসে, নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধ বাধলে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকেন। কথা বলা মানে অযথা সময় নষ্ট করা, কথা বোঝার মতো আছেই বা কে? আর চিঠি! সে তো জোর করে মানিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি বিশেষ। সেল্ফ অ্যানালাইসিসের সুযোগ সেখানে নেই। তাই চিঠি নয়, সেল্ফ প্রোপাগেশনের জন্য ডায়েরিই যথেষ্ট। খগেনবাবু ডায়েরি লেখেন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন আসে, ব্যক্তির ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াসে কি সে নিজেই এক এবং একমাত্র? ব্যক্তির সহজাত দ্বৈততা কি সঙ্গ চায় না? বাঁধতে চায় না কোনো সম্বন্ধ? খগেনবাবুর পরিবর্তন দেখবো অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকেই। তিনি ক্রমশ 'shared existence'-এর অংশ হতে চান। কিন্তু ব্যক্তি-নির্বাচনের চরম স্বাধীনতা যুক্ত যে মানুষ, যে মানুষ আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করে, যে জনতার অংশ নয় বলে অস্থিরতা অনুভব করে, যার মধ্যে রয়েছে জগৎ সম্পৃক্ত 'Being'-এর সম্পর্কে শঙ্কা তাকেই তো 'authentic man'-এর মর্যাদা দেবো। খগেনবাবু বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে চিনতে চেয়েছেন এতদিন, এখন জানবেন হৃদয় দিয়ে। সাবিত্রীকে বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া যায় না, সাবিত্রীকে মন দিয়ে টানতে হয়। প্রেমকে পুজোরূপে দেখার আদর্শে পেতে গেলে অতিক্রম করে যেতে হয় নিজেকে। নিজেকে অতিক্রম করা মানে কামকে এড়িয়ে যাওয়া। প্রত্যেকের যেমন সাইকোলজিক্যাল নীডস আছে, তেমনি আত্মবিজ্ঞাপনের রুচিও রয়েছে। রমলার

হাতে সেই আত্মবিজ্ঞানপনের সুত্রটি ধরিয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু সাবিত্রী? সাবিত্রী তাহলে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থেকেই গেল? বঞ্চিত করে রাখা হলো বুঝি! -- খগেনবাবু ‘ambivert’ ।

তবে তাঁর কাছে একটা সত্য খুলে গিয়েছে, মানুষের বেঁচে থাকা আসলে একাকী নয়, একা বেঁচে থাকার অর্থ নিজেকে বঞ্চনা করা। যদি তাই না হতো তাহলে সাবিত্রীকে তিনি হারাতেন না। সাবিত্রী স্বামী খগেনকে চেয়েছিলেন, খগেনবাবুর কাছে সেই ভালোবাসা ছিল কই? নিজের ভিতরেই শূন্যতা রেখেছেন, নিজের শূন্যতাতেই ভরিয়েছেন সাবিত্রীকে। এদিক থেকে তিনিও তো অনন্বয়ী! সাবিত্রী যদি রমলা হতেন, তাহলে হয়তো খগেনবাবুর সাহিত্যপ্রীতিকে প্রশ্রয় দিতেন, যে ডায়েরিতে নিজেকে রাখেন, সেই ডায়েরির কি হতেন না সঙ্গী? তুলনা আপনা থেকেই আসে, সাবিত্রী যেখানে ঘরে বাঁধা মানুষ ছিলেন, রমলা সেখানে একা থাকার বিরুদ্ধে, পার্টিতে যান, বন্ধুবাধবদের আমন্ত্রণ করেন। আর খগেনবাবু এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একজন, যিনি বাঁচেন বইয়ের মধ্যে। মানে যখনই একা হয়েছেন, তখনই খুঁজেছেন নিজের মধ্যে, অন্যের অভিজ্ঞতায় আত্মোন্মচনের মতো। তাই আত্মাতেও বিশ্বাসী নন এখন। তাঁর কাছে একজনই তাঁর সঙ্গী- নিজে নিজেই। ফলত স্বাভাবিকভাবেই তিনি ‘hole in corner man’ এর মতো না সাবত্রীকে নিজের মতো তৈরি করতে পেরেছেন, না রমলাকে নিজের মধ্যে পেয়েছেন। একবার ভাবেন সম্বন্ধ বাঁধাই জীবন, আর একবার ভাবেন, “সম্বন্ধ সৃষ্টিই যদি জীবন হয় তাহলে আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রইল না ত, সমবেত জীবনকে অগ্রাহ্য করে এসেছি, অগ্রাহ্য কেন ঘৃণাই করেছি”।[২২] এদিক থেকেই বিচার্য বিষয়টি, এদিক থেকেই সাবিত্রী গৃহীত হবার জন্য ফুলশয্যার রাতে অপেক্ষা করলেও রমলা দেবীই তাঁর সহধর্মী।

অর্থাৎ দোলাচলতা, সবার সঙ্গে থেকেও নিঃসঙ্গ, সবার ভীড়ে থেকেও বিচ্ছিন্ন, অনন্বয়ী। হয়তো সফীক, বিজন, আসফাক, নাখভী, মহীন্দর, মহবুব, করিমের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে মিশে যেতে চাইবেন, কিন্তু পারবেন কি? মোহনায় এসে যেমন লেখেন “রমলা বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে হচ্ছে। তোমার নামে চেক রেখে গেলাম। যদি দরকার হয় ভাঙিয়ে নিও”।[২৩] তেমনি ছিঁড়েও দেন। মনে করেন এই নাটুকে মেয়েলি চিঠি লেখা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। কেননা তিনি নিজেই একসময় বলেছিলেন, “উপকার করাও ভালবাসি না, উপকৃত হতেও ভাল লাগে না!”[২৪] পাণ্ডিত্যের আভিজাত্যকে বর্জন না করে শ্রমিকের দলে চলে যাওয়া কি তাঁর সম্পূর্ণ চলে যাওয়া! কিছুটা বাকি থেকে যায়। জানেন, পৃথিবীতে একবার নিজের মত হয়ে জন্মগ্রহণ করলে কিছুতেই আর অন্য কারোর মতো হয়ে ওঠা যায় না। এখানেই তাঁর অসহায়তা। এখানেই সবার মধ্যে থেকেও তিনি নিয়ত একাকী। শূন্যতাকে পূরণ করতে চেয়েছেন মতামত দিয়ে, আদর্শবাদ দিয়ে, মার্ক্সিজম দিয়ে। বুদ্ধি দিয়ে ধরতে চেয়েছেন জীবনকে। আর ধরতে চেয়েছেন বলেই তিনি হয়ে উঠেছেন ‘hole in corner man’. একজন ‘authentic man’ এর মতো দলছুট; অনন্বয়ী।

উৎসপঞ্জি:

১. *প্রগতি, বক্তব্য, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী,* প্রথমখণ্ড, দে'জপাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা - ৪২৮
২. *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, দ্বিতীয়খণ্ড,* পৃষ্ঠা - ৩৪৭
৩. *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথমখণ্ড,* পৃষ্ঠা - ১৮০
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২১
৬. *ঝিলিমিলি, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, তৃতীয়খণ্ড,*পৃষ্ঠা - ৪১৫

৭. *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথমখণ্ড,*পৃষ্ঠা - ১৭৮
৮. *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড, পৃষ্ঠা - ১৭৪
৯. Myth of sisyphus, An essay of man in Revolt' trans. Anthony Bower, page - 15
১০. Albert Camus, The Rebel, An essay of man in Revolt' trans. Anthony Bower. Page 100
১১. *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮২
১২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৯
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮২
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৬
১৫. Jean-PaulSartre, *Being and Nothingness*, trans by Hazel E. Barnes
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৬
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ১২০
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮৯
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬৫
২০. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯০
২১. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬৫
২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮০
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১৫
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা–৪১৫।

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' : এক নারীর জীবন আখ্যান

মনিকা বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রবন্ধে হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে এক গ্রামীণ নারীর আত্ম-উন্মোচনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সূত্রে সাতচল্লিশ-পূর্ব অখণ্ড ভারতের উত্থান-পতন, তদানীন্তন রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশ গঠন ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'আগুনপাখি'র কথক চরিত্রে আমরা সেই চিরায়ত বাঙালি নারী চরিত্রকেই প্রত্যক্ষ করি। মেয়েটি গভীর মমতায় গড়ে তোলে তাদের একান্নবর্তী পরিবার। চারপাশের মানুষজন ও তাদের সাথে অন্তর সম্পর্কের ভিত্তিতে তার সামাজিক গণ্ডি রচিত হয়। যে নারী সচরাচর বিশ্বভুবনের খবর রাখে না, যে কিনা খুব অল্পেতেই তুষ্ট এবং কখনো সে উচ্চাভিলাষী নয়। কখনো একার খুশিতে খুশি হয় না। বরং আত্মীয়-স্বজন ও সংসারকে সবসময় কাছে টেনে নেয়। শত বৈরাগ্য, বিচ্ছিন্নতা ও হতাশার পরেও সংসারের জন্য সারা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায়। সংসারের সবাইকে নিয়ে একসাথে খেতে সে অনুভব করে স্বর্গীয় সুখ। উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই মাটি সংলগ্ন এই নারী পরিবারের সাথে দেশ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে। কেননা একটি কথা কেউই তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেনি যে, শুধুমাত্র ধর্মের জন্য একটি দেশ একটানা যেতে যেতে একটা জায়গা থেকে কীভাবে আলাদা হতে পারে। আর সেই আলাদা দেশের জন্যই কেন তাকে দেশান্তরি হতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় স্বামী-সন্তানরা একে একে দেশ ছেড়ে চলে গেলেও সেই নারী নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে এদেশেই থেকে যায় আগামী দিনের নতুন আলো দেখার জন্য। নারীর জীবনের সেই আখ্যানকেই বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ: সম্ভ্রান্ত, বিশ্বভুবন, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, রাশভারি, রণভেরী।

মূল প্রবন্ধ:

বাংলা কথাসাহিত্যের গৌরবময় এক নাম হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১)। মূলত রাঢ়বঙ্গের রূপকার এই কথাসাহিত্যিক তাঁর সুঠাম গদ্য এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনা ভঙ্গির জন্য প্রসিদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনে হাসান আজিজুল হক নিজেই দেশভাগের শিকার হয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত এবং একান্নবর্তী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছেন রাজশাহীতে। তাঁর বাবা মোহাম্মদ দোয়া বখশ্, মা জোহরা খাতুন এবং স্ত্রী শামসুন নাহার বেগম। তিনি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীর মহারানী দাশীশ্বরী হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের কারণে তাঁর পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। সেখান থেকেই তাঁর পরবর্তী পড়াশুনা শুরু হয়। পরবর্তীকালে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দেশভাগকে বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত করতে সাহায্য করেছিল। কথাসাহিত্যিক আজিজুল হক আমাদের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে আছেন 'আগুনপাখি'

(২০০৬) উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে। বাংলাদেশের সাহিত্যে এটি দেশভাগ নিয়ে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তবে লেখক 'আগুনপাখি' রচনার পূর্বে দেশভাগ নিয়ে বেশ কিছু গল্পও লিখেছিলেন। যেমন– 'উত্তর বসন্তে', 'আত্মজা এবং একটি কবরী গাছ', 'পরবাসী', 'মারী', 'খাঁচা', 'দিবাস্বপ্ন' ইত্যাদি।

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাসটি শুরু এবং শেষ হয় এক অজ গ্রাম্য মেয়ের ঘরোয়া দেশজ বাচন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। যে মেয়ে পরিবার বলতে বোঝে শুধুই নিজের বাবা-মা-ভাই আর দাদিকে। শৈশবে মা হারা মেয়েটি তার ভাইকে আঁকড়ে বড়ো হতে থাকে। মা মারা যাওয়ার পর ছোট ভাইটিকে মামার বাড়িতে নিয়ে গেলে আবার সে একা হয়ে পড়ে। বাবা ছিলেন রাশভারী মানুষ, কাউকে তেমন গ্রাহ্য করতেন না। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর কোনো মূল্য সেই সময় ছিল না।

> "মেয়েদের তো রাঁধাবাড়া আর ছেলে মানুষ করা ছাড়া আর কুনো কাজ ছিল না।"[১]

মাতৃহারা মেয়েটি বাবার সংসারে থেকে এমনি করে একদিন বড়ো হয়ে ওঠে। ফালি ছেড়ে মোটা শাড়ি পরার সাথে সাথে তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। তখনকার সময়ে মেয়েদের ব্যক্তিসত্তাকে কখনো প্রাধান্য দেওয়া হতো না। কেননা–

> "মেয়ে হল বাপের আঘিন্না দায়। বাপ যদি মনে করে মেয়েকে কেটে পানিতে ভাসিয়ে দেবে, তা কারুর কিছুই বলার ছিল না।"[২]

এই বিয়ের ব্যাপারে মুরুব্বিরা যা করবে তাই হবে। তারা যদি মনে করে একটি কলা গাছের সাথে মেয়েকে বিয়ে দেবে তো তাকে সেটাই মেনে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, ষাট বছরের বুড়োর সাথে পনেরো বছরের মেয়ের বিয়ে তখনকার দিনে সচরাচর দেখা যেত। এমনকি দ্বিতীয় বর, তৃতীয় বর, হেঁপোরুগি, মাতাল, চোর– কারোরই বিয়ে করার জন্য সুন্দরী মেয়ের অভাব হতো না। সেদিক থেকে এই অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েটির কপাল অনেক ভালো যে দ্বিগুণ বয়সের পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। বিশাল যৌথ পরিবারে এসে মেয়েটি হঠাৎ যেন অথৈ জলে পড়ে যায়। এত বড় সংসারে সে যেন কোনো দিকেই কূলকিনারা পায় না।

> "লতুন বউ আমি এসে ওঠলাম ডোবা থেকে দীঘিতে।"[৩]

শ্বশুরবাড়িতে এসে সেই যে সংসারের ঘানি টানা আরম্ভ করেছে তা আর কখনো থামেনি। সারাজীবন এভাবেই সংসারবৃত্তে আবদ্ধ থেকে জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে। আবার সব কাজকর্ম করার ফাঁকে ফাঁকে কর্তার কাছে একটু একটু করে লেখাপড়া শিখতে থাকে। স্বামীর কাছ থেকে চার দেয়ালের বাইরে বৃহত্তর সমাজের ঘটনাগুলি ক্রমশ বোঝার চেষ্টা করে। স্বামীর কাছেই প্রথম সে শোনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কথা। যদিও কেন এ বিরোধ তার কারণ মেয়েটির জানা ছিল না। কেননা ছোটোবেলা থেকে হিন্দু-মুসলমানকে সে একই সঙ্গে বসবাস করতে দেখেছে। ফলে দুই জাতির মধ্যে কোথাও যে বিভেদ রেখা আছে গ্রামের নারীটি তা মানতে পারেনি।

প্রতিটি পরিবারেরই কিছু কাহিনি থাকে, কিছু কলঙ্কও থাকে। অর্থাৎ– "সোংসার কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না।"[৪] এই চরম সত্যটি লেখক গল্পকথক নারীর মাধ্যমে তাঁর পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। নিয়তি, সমাজ, সংসার এসবের মধ্যে কোনো মিথ্যার স্থান নেই। কারো জন্য থেমে থাকে না সময়ের স্রোত ও সংসারের দায়। একের পর এক চলে আসছে বিধাতা নির্ধারিত সুখ-দুঃখ ও মৃত্যুর শোকাবহতা। উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই নামহীন মেয়েটির বড় খোকার মৃত্যু বাড়িতে শোকের আবহাওয়া তৈরি করে। দুনিয়াদারিতে তার আর কোনো কাজে

মন নেই। কিন্তু সংসার তাকে কোনোমতেই ছুটি দেয়নি। শোকের পাহাড় বুকে জমিয়ে রেখেই তাকে নিত্য নিয়মিত কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে, জন্ম দিতে হয়েছে একের পর এক সন্তানের। সংসার জ্বালা কখনো তাকে পীড়িত করেছে, আবার কখনো ভাবিয়েছে। খুব কাছ থেকে সে দেখে সংসারের ক্রমোন্নতি, ধনে-জনে-মানে-শস্যে-সম্পদে ধীরে ধীরে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি। আর এই তুমুল সুখের মধ্যে হঠাৎ শোনা যায় বিশ্বযুদ্ধের রণভেরী। টান পরে নিত্যকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগানে। আবার এরই মধ্যে একসময় দেখা যায় কলেরা-বসন্তের প্রাদুর্ভাব। পর পর দু'বছর ফসলের হানি হয়— একবার খরায়, তো আরেকবার অতিবৃষ্টিতে। নিয়তির করালগ্রাসে সেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের আক্রমণে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দ্রুত শেষ হয়ে প্রকটিত হয় স্বার্থের নগ্নরূপ।

'আগুনপাখি' উপন্যাসে বস্তুত এক গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের জীবন প্রবাহের উত্থান-পতনের অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে সেই পরিবারেরই মেজ বউয়ের জবানীতে। উপন্যাসের শুরুতে তাকে আমরা পাই অল্প বয়সেই বিয়ে হওয়া একটি সাধারণ মেয়ের ভূমিকায়; আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, স্বপ্ন-সুখের সমন্বয়ে এক অতি সাধারণ গ্রাম্য নারীর চরিত্রে।

> "জেবনের কুনো কাজ নিজে নিজে করি নাই, নিজের ইচ্ছা কেমন করে খাটাতে হয় কুনোদিন জানি নাই। আমি কি মানুষ, না মানুষের ছেঁয়া? তাও কি আমার নিজের ছেঁয়া।"[৫]

বস্তুত সে কখনো চায়নি পরিবারের সেরকম কেউ হয়ে উঠতে। কিন্তু সংসারই যেন তাকে পাঁকে পাঁকে জড়িয়েছে। তখন যুদ্ধের বাজার, পাকা সড়ক যেমন তৈরি হয়েছে গ্রামে গ্রামে, তেমনি রক্তের দাগও লেগেছে সেই সড়কে। মানুষজনের কথাবার্তার ধারাও বদলে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। এমনই এক পরিবর্তনশীল সময়ে মেয়েটির স্বামী তাকে প্রশ্ন করে— "আচ্ছা, হিন্দু-মুসলমানে তফাৎ কি বলো তো শুনি।"[৬]

কর্তার এই প্রশ্ন গ্রামের সহজ সরল মেয়েটিকে কেমন যেন বিপদে ফেলে দেয়। সে ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছে হিন্দু সবার জন্য কাটারি তৈরি করে, হিন্দু নাপিত বউ যত্ন করে হাত পায়ের নখ কেটে দিয়ে যায়। আবার মুসলমানরা চাষ-আবাদের কাজ করে, কাঠ চেরাই এর কাজ করে, মুনিষের কাজ করে। কিন্তু মেয়েটি জানে না হিন্দু-মুসলমানের কোনো ঐক্য যাতে তৈরি না হয় তার জন্য ব্রিটিশরা খালি ফাঁদ পেতে বসে আছে। এসব রাজনীতির কূটকাচাল গ্রামের মেয়েটি বোঝে না। তার মন ভয়ে, কান্নায় কেঁপে ওঠে যখন সে শোনে এক পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে কুপিয়ে মেরেছে। চারদিকে রক্তের বন্যা যেন বয়ে যেতে লাগল। সংসার চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও মেয়েটি স্বামীর কাছে এলাকা ছাড়িয়ে, দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বজোড়া সংকট ও বিপর্যয়ের খবর পায়। নির্ভীক সমাজ সচেতন বাস্তবদৃষ্টি সম্পন্ন মেয়েটির স্বামী যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেমন চলতে জানেন, তেমনি পরিবারের আয় বাড়ানোর কর্মপদ্ধতি এবং নিজের স্ত্রীকে শিক্ষা ও সমাজের আলোয় আনতে জানেন। স্ত্রীর মুখেই তার সম্পর্কে এই বিশ্বাসের কথা ফুটে ওঠে।

> "উ লোক সামান্য লয়, উ মানুষ বটবিরিক্ষি, তামাম মানুষকে ছেঁয়া দিতে পারে।"[৭]

উপন্যাসে লেখক এক গ্রাম্য নারীর কথকতার মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগজনিত কারণে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটকে। শুধু তাই নয়, স্বদেশী আন্দোলনের গুরুতর প্রভাব সেদিন গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরেই প্রবেশ করেছিল। সারা দেশে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। শোনা যায় মেয়েটির বড় খোকাও সেই ব্রিটিশ বিরোধী

আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ধীরে ধীরে দেশের মানুষ বিদেশী কাপড় বর্জন করে মোটা কাপড়ের প্রচলন আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে ইংরেজদের জব্দ করাই ছিল সেদিন সাধারণ মানুষের মূল লক্ষ্য। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের ফল আরো তীব্র হলে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিতে থাকে। বিদেশি দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলায় হঠাৎ একটি একটি করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের টান পড়তে থাকে। একদিকে তাঁতিরা যেমন বিদেশ থেকে সুতো জোগানের অভাবে কাপড় বুনতে পারছে না, অন্যদিকে তেমনি দেশের মানুষ সাধারণ লজ্জাটুকু ঢাকতে পরনের কাপড় জোগাতে পারছে না। শুধু তাই নয় এর ফলে দেখা যাচ্ছে চুরির উপদ্রব। মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্য অন্যের বাড়ি থেকে পুরনো বস্ত্র চুরি করে আনে। মেয়েরা কেউ কেউ লজ্জা ঢাকতে বুক এবং কোমরের কাছে ছেঁড়া চটের টুকরো ধরে থাকে। এরকম এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মেয়েটির স্বামী তাকে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করেন।

> "যুদ্ধ কি এইবার একটু একটু বুঝতে পারছো তো? প্রথমে দেখলে মানুষের পরনের কাপড় নাই। এখন দেখছ একটি একটি করে জিনিশ গরমিল হচ্ছে— নুন নাই, কেরোসিন নাই, চিনি নাই। তার মানে গাঁয়েগঞ্জে যা যা তৈরি করতে পারা যায় না, তাই তাই নাই।"[৮]

পরবর্তীতে দেখা যায় ব্রিটিশ শাসনের বর্বরতার ছবি। দীর্ঘ চার বছর পরে মেয়েটি বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে দেখতে পায় চারিদিকে মিলিটারির ঘাঁটি হয়েছে। দিনরাত মিলিটারির গাড়ি যাওয়া আসা করছে উদভ্রান্তের মতো। প্রতিটি গাড়িতেই রয়েছে এক দুজন করে ইংরেজ সাহেব। তাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পেছনের গাড়ির গাড়োয়ান চেঁচিয়ে তাদেরকে সাবধান করে দেয়—

> "মিলিটারি গাড়ি হলে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে মাঠে নেমে যেও কিন্তু, নাইলে তোমার গাড়ি ভেঙেচুরে মিলিটারি গাড়ি বেড়িয়ে যাবে। মরলে, না বাঁচলে, ফিরে চেয়ে দেখবে না।"[৯]

তাদের অত্যাচার এতটাই নৃশংস ছিল যে, গ্রামেগঞ্জে না খেতে পাওয়া মানুষদের মুখের গ্রাস পর্যন্ত কেড়ে নেয়। আশেপাশের গ্রামগুলিতে গরু, ছাগল, মুরগি— যা পায় তাই খেয়ে ফেলে। এমনকি গ্রামের মেয়েদের পর্যন্ত বাদ দেয়নি তারা। মেয়েরা কাজের তাগিদে বাড়ির বাইরে বেরোলে তাদের উপর উৎপাত শুরু করে দেয়। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের প্রভাবে মাঠগুলি সব ফসল শূন্য হলে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হয়। যার ফলে গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারগুলিতে ভাঙ্গন দেখা দিতে থাকে। কেননা পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। সে যেন কোনো রকম ফিরিস্তি মানতে চায় না। যে বাড়িতে এক সময় তিন বেলা রান্নার আয়োজন হতো সেখানে আর চুলো জ্বলে না, হাঁড়ি চড়ে না। মড়াইয়ের জমানো ধান শেষ হতে না হতেই পারস্পরিক সংঘাত দেখা দেয়।

> "অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে, সবকিছুই ভাগে কম পড়ছে, অমনি কোথা থেকে বিষের মতন গল গল করে হিংসা বেরিয়ে আসতে আরম্ভ হয়ে গেয়েছে।"[১০]

যে মেয়ে একদিন বাড়-বাড়ন্ত সংসারে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষ করেছিল, আজ সেই মেয়েটির চোখের সামনে পাঁচ ভাইয়ের সংসারকে আলাদা করে দেয় দুর্ভিক্ষের চরম যন্ত্রণা। অর্থাৎ তেলের শেষ ফোঁটাটাও যেন ফুরিয়ে যায় একসময়। আসলে সেদিনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট মানুষের যৌথ চেতনা ভাঙ্গনের প্রধান কারণ। আর একসাথে থাকা কারও দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ঘটনাক্রমে উপন্যাসে উঠে আসে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও দেশভাগের চিত্র। আর সেই দাঙ্গার মাঝে অকালে প্রাণ হারায় রায় বাড়ির বড়ো ছেলে সত্য। চার-পাঁচ জন মুসলমান মিলে তার পেটে, বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। সেদিন মেয়েটির চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছিল একের পর এক সম্প্রদায়িক হিংসা।

> "একদিন দোপরবেলায় চুলো থেকে উজ্জ্বলন্ত ভাতের হাঁড়িটি খালি নামিয়েছি, এমন সোময় খবর প্যালম রায়েদের বড় ছেলে সত্য কলকেতায় হিঁদু-মোসলমানের হিড়িকে কাটা পড়েছে।"[১১]

কিন্তু গ্রামের সেই সহজ সরল মেয়েটি জানতো না যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আবার কী জিনিস। গত বছর ধরেই সে শুধু শুনে আসছে মুসলমানদের আলাদা একটা দেশের জন্য আন্দোলন হচ্ছে, ব্রিটিশদের সাথে খুব দেন-দরবার চলছে। মেয়েটি 'বঙ্গবাসী' কাগজেও পড়েছে সেই বন্দোবস্তের কথা এবং জিন্না, নেহেরু, গান্ধী, প্যাটেলের নাম। আবার কিছুদিন পরে একটা কথা সবার মুখে মুখে শুনতে পায়— 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। সেদিন এই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের কাছে নিজের দলের বাইরে থাকা সব মানুষই ছিল মন্দ। কিন্তু মেয়েটি এতদিন থেকে দেখে এসেছে হিন্দু-মুসলমানদের গ্রামেগঞ্জে মিলেমিশে থাকতে। গ্রামে আগুন লাগার ঘটনাতেও হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়ে এগিয়ে এসে একে অন্যের বিপদে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতো মেয়েটির মনে প্রশ্ন জাগে হিন্দু-মুসলমান যদি একে অন্যের শত্রু হয় তাহলে নতুন বউ হয়ে আসার পর কত্তামার গা ভর্তি গয়না গড়িয়ে দেওয়া এবং বড়ো খোকা মারা গেলে গ্রামের ভট্টাচার্যি মশাইয়ের কর্তার গলা জড়িয়ে কাঁদা— এই সবই কি আদিখ্যেতা ছিল? কিন্তু ধীরে ধীরে মেয়েটির সেই বিশ্বাসের ভীত আলগা হয়ে যায় যখন দাঙ্গার আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রামে কিংবা রাজপথ থেকে জনপথে।

> "একদিন খবর এল, মউকুমা টাউনের ইউসুফ মিয়েকে তার নিজের বাড়ির ভিতর যেয়ে মেরে এয়েছে হিঁদুরা।"[১২]

হিন্দু-মুসলমানের হিড়িক মানেই হল হিন্দুকে মারবে মুসলমান আর মুসলমানকে মারবে হিন্দু। এভাবেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে ক্রমে অবিশ্বাস গজিয়ে ওঠে। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার পরিণামে সামাজিক মানুষের উৎপাটিত হওয়ার ইতিহাস, গৃহচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা, চোখের সামনে প্রিয়জনদের নিহত হওয়া মেয়েটিকে বিষন্ন করে তোলে।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখি যুদ্ধ, আকাল, মহামারীর মতো দাঙ্গাও ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান দুই জাতকে ইংরেজরা চিরদিনের মতো পরস্পরের শত্রু করে দিল। দেশ স্বাধীন হল ঠিকই কিন্তু তিনটি টুকরোতে ভাগ হয়ে গেল। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। অর্থাৎ যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা বেশি সেইসব জায়গা নিয়ে ভারত, আর যেখানে যেখানে মুসলমান বেশি সেইসব জায়গা নিয়ে পাকিস্তান। কিন্তু মেয়েটির ধারণা ছিল যে দেশভাগ হওয়া মানেই এখানকার সব মুসলমান চলে যাবে পাকিস্তানে আর ওখানকার সব হিন্দু আসবে ভারতে। মেয়েটির স্বামী তার এই ভুল ভাবনা ভেঙে দিয়ে তাকে পাকিস্তান চলে যাওয়ার কথা বললে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। কেননা পাকিস্তান হওয়ার পর ছেলেমেয়েরা একে একে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং সেখানে গিয়ে তারা তাদের বাবা-মাকেও তাদের কাছে যেতে বলে। এই প্রস্তাবে মেয়েটির স্বামী সম্মত হলেও তাকে কিন্তু কোনোমতেই রাজি করানো যায় না। কেননা সে বুঝতেই পারল না যেসব লোকজন দেশভাগ নিয়ে উদ্বেল ও উদ্বাহ ছিল তারা অনেকেই থেকে গেল। কিন্তু অন্যরা যারা এই বিভাজন চায়নি তারা কেন চলে যেতে বাধ্য হল।

অর্থাৎ বিনা কারণে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা ছায়া পড়ে গেল। ঘরবাড়ি-সমাজ-সংসার সব ভেঙে সাত টুকরো হয়ে গেল। আর এই হাঙ্গামায় মেয়েটি তার ননদের মৃত্যু শোকে আরো জর্জরিত হয়ে যায়। তাই বারবার ছেলেমেয়েদের কাছে যাওয়ার ডাক আসলেও সব সময়ই সে তা প্রত্যাখ্যান করে। তার দেশান্তরি হওয়ার এই উপলব্ধি কর্তাকে অবাক করে দেয়।

> "চারা গাছ এক জায়গা থেকে আর জায়গায় লাগাইলে হয়, এক দ্যাশ থেকে আর দ্যাশে লাগাইলেও বোধায় হয়, কিন্তুক গাছ বুড়িয়ে গেলে আর কিছুতেই ভিন্ মাটিতে বাঁচে না।"[১৩]

একজন সাধারণ নারী দেশ-মাটির টানে সবকিছুকে তুচ্ছ মনে করে নিজের সিদ্ধান্তে অটুট থেকেছে। স্বামী-পুত্র-কন্যার শত অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে একলাই থেকে যায় শেকড় আঁকড়ে। আত্ম-প্রত্যয়ে দীপ্ত গ্রামীণ অশিক্ষিত সেই নারী যেকোনো কিছুর মূল্যে দেশ ছেড়ে যায় না।

> "আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না যি সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার আর এই দ্যাশটি আমার লয়। আমাকে আরও বোঝাইতে পারলে না যি ছেলেমেয়ে আর জায়গায় গেয়েছে বলে আমাকেও সিখানে যেতে হবে। আমার সোয়ামি গেলে আমি আর কি করব? আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তু আলেদা মানুষ।"[১৪]

মেয়েটি সারাজীবন পুরুষের জাঁতাকলে আবর্তিত হলেও সে উপন্যাসের শেষে তাঁর প্রত্যাখ্যানের ভাষা নির্মাণ করেছে। নিজের আমিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে সবকিছু ত্যাগ করে নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক জীবনকে বিশেষভাবে দেখার এক অপরূপ কৌশল অর্জন করেছেন। প্রান্তিক মানুষের জীবনধারা, সাধারণ ব্যক্তি মনের ভেতরের অনুভব শক্তি ও প্রকাশের ক্ষমতা হাসান আজিজুল হকের আরাধ্য বিষয়। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, অতঃপর সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের মতো ভয়াবহ ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপটে অনেক মুসলিম পরিবারের পশ্চিমবাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় আগমন এবং অগণিত হিন্দু পরিবারের পূর্ব থেকে পশ্চিমবাংলায় গমন আমাদের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ও স্বাভাবিক সত্য। হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাসেও এই চরম সত্যটি প্রতীয়মান। লেখক এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ, চিন্তার স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্জন উপন্যাসের সেই নারীর জীবন আখ্যানকে কেন্দ্র করে আমাদের পুনর্জাগরণের আভাস দেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেই নারী আরোহণ করে ব্যক্তিত্বের চূড়ায়। আর অদ্দিষ্ট নারীটি ছিল লেখক হাসান আজিজুল হকের খুব কাছের একজন, মা কিংবা মাতৃস্থানীয়া।

তথ্যসূত্র:

১. হক, হাসান আজিজুল, দশম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০২১, আগুনপাখি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৭
২. তদেব : পৃ. ২১
৩. তদেব : পৃ. ২৮
৪. তদেব : পৃ. ১০৫
৫. তদেব : পৃ. ২৯

৬. তদেব : পৃ. ৭৫
৭. তদেব : পৃ. ৮৬
৮. তদেব : পৃ. ১৫০
৯. তদেব : পৃ. ১৩৯
১০. তদেব : পৃ. ১৮৬
১১. তদেব : পৃ. ২০৯
১২. তদেব : পৃ. ২২৮
১৩. তদেব : পৃ. ২৪৫
১৪. তদেব : পৃ. ২৫২।

রবীন্দ্র-ভাবনায় বৌদ্ধ দর্শনের কয়েকটি দিক : একটি পর্যালোচনা

শেখ মোঃ মাকতুবুল ইসলাম
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: হিংসা জর্জরিত পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি মানবতাবাদী দর্শন গড়ে তুলেছিলেন কোন ঈশ্বরের আদেশ বা দৈববাণী দ্বারা নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা পুষ্ট হয়ে। বুদ্ধদেবের জীবনী, বাণী ও মানবতাবাদী আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীর টান অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও কবিতায় বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা মূলত আর্যসত্যচতুষ্টয়, ক্ষণিকত্ববাদ, নির্বাণ এবং ব্রহ্মবিহার, এই চারটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছি। বৌদ্ধ দর্শনের উপর্যুক্ত বিষয়গুলি, যা রবীন্দ্র মানসে ভেসে উঠেছে, সেগুলি অবিকৃতভাবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন, নাকি নিজ প্রজ্ঞার দ্বারা পরিমার্জন করে গ্রহণ করেছেন, তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। বৌদ্ধ দর্শনের আর্যসত্যচতুষ্টয়ের প্রথম আর্যসত্যে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ এবং বেঁচে থাকার সামগ্রী যা মানুষ ভোগ করে, এসব কিছুকে দুঃখের নামান্তর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ জন্ম মানেই দুঃখ ভোগ করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী কবি তিনি জগতের মধ্যে দুঃখ নয় বরং আনন্দের সন্ধান করেছেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে দুঃখকে তিনি স্বীকার করেছেন এবং তা থেকে মুক্তির রাস্তাও দেখিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবনার কিছুটা সাদৃশ্য আমরা দেখিয়েছি। দুঃখমুক্তির উপায় বৌদ্ধ দর্শনে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে রবীন্দ্র দর্শনে ঠিক সেভাবে বর্ণনা করা হয়নি। তাছাড়া আমরা যদি মুক্তির অবস্থা বা নির্বাণের প্রসঙ্গ দেখি, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নির্বাণ কখনো শূন্যতার অবস্থা হতে পারে না। তবে নির্বাণের অবস্থা বিষয়ে বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবনার পার্থক্যও আছে। বুদ্ধদেব জগতের দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চির মুক্তির কথা বলেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ জগতের আনন্দ রসে আপ্লুত হওয়ার কথা বলেছেন। দুঃখ দ্বারা জর্জরিত হয়ে পৃথিবীর বুকে আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করাকেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি বলেছেন। বুদ্ধদেব জগতের সংস্পর্শে আসাকে বন্ধন বলে মনে করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জগতের প্রতি স্নেহ, মায়া ও প্রেম দ্বারা আনন্দ পেতে চেয়েছেন। বৌদ্ধ দর্শনের 'ব্রহ্মবিহার'-এর ধারণা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার ধারণা হয়তো বৌদ্ধ দর্শনের মৈত্রী, করুণা অর্থাৎ ব্রহ্মবিহার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৌদ্ধ দর্শন, আর্যসত্য, ক্ষণিকত্ববাদ, নির্বাণ, ব্রহ্মবিহার।

মূল আলোচনা:

১

বর্বরোচিত ও হিংসায় জর্জরিত পৃথিবীকে যিনি সর্বপ্রথম অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে, নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনিই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ (আনু: ৫৬৬-৪৮৩ খ্রী:পূর্ব:)। বোধিপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সকল মানুষ ও সকল প্রাণীর প্রতি শান্তি, মৈত্রী ও ভালোবাসার বাণী বিতরণ করে গেছেন। সমগ্র পৃথিবীর বুকে যেসকল মনীষী ভারতবর্ষকে নতুন রূপে তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে গৌতম বুদ্ধ অন্যতম। বুদ্ধদেবের মহানুভবতা, বৌদ্ধ

যুগের ঘটনাবলী ও ভারতের বাইরে তার প্রভাব, রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা এক বিরলতম ঘটনা। বুদ্ধদেবের জীবনী, মানবতাবাদী আদর্শ; মৈত্রী ও অহিংসা ও করুণা গুণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীর টান অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি সবসময় বুদ্ধদেবের ভালোবাসার স্পর্শ অনুভব করেছেন। সম্ভবত উপনিষদের পরেই রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের চারিত্রিক গুণাবলী ও মানবতাবাদী আদর্শের প্রতি হৃদয়ের টান অনুভব করেছেন সবচেয়ে বেশি। বুদ্ধদেবকেই তিনি নিজের মনের মণিকোঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রূপে আখ্যায়িত করে, তাঁর অন্তরের বিনম্র প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়-"আমি অন্তরের মধ্যে যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।"[১] বুদ্ধদেবের ত্যাগের জীবন ও তাঁর বাণীগুলির দিকে আলোকপাত করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি শুধু মানুষ ছিলেন না বরং সুমহান আদর্শের প্রতীক ছিলেন। অহিংসা প্রেম ও মৈত্রীর বিমুর্ত প্রতীক। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়ে তাঁর বিভিন্ন রচনায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে কেবল বৌদ্ধ দর্শনের আর্যসত্যচতুষ্টয়, ক্ষণিকত্ববাদ, নির্বাণ এবং ব্রহ্মবিহার, এই চারটি দিকের প্রতি, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র চিন্তায় (কবিতা ও প্রবন্ধে) উঠে এসেছে। বৌদ্ধ দর্শনের উপর্যুক্ত বিষয়গুলি, যা রবীন্দ্রমানসে ভেসে উঠেছে, সেগুলি অবিকৃতভাবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন নাকি নিজ প্রজ্ঞার দ্বারা পরিমার্জন করে গ্রহণ করেছেন, তা দেখানোর চেষ্টা করব। সমগ্র নিবন্ধটি পাঁচটি পর্বে ভাগ করে আলোচিত হবে। প্রথম পর্বে, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, সেই দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় পর্বে বৌদ্ধ দর্শনের আর্যসত্যচতুষ্টয় বিষয়ে বৌদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দেখানোর প্রচেষ্টা করবো। তৃতীয় পর্বের আলোচ্য বিষয় হবে বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকত্ববাদ এবং রবীন্দ্র দর্শনের গতিবাদ। নির্বাণ ও ব্রহ্মবিহারের আলোচনা দিয়ে চতুর্থ পর্বের আলোচনা শেষ করবো। সব শেষে আমরা আমরা দেখবো, বৌদ্ধ দর্শনের বিষয়গুলি রবীন্দ্রনাথ নিজ প্রজ্ঞার দ্বারা কিছুটা পরিমার্জন করে গ্রহণ করেছেন।

২

বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের কয়েকটি কারণ আমরা প্রথমে বলার চেষ্টা করব। তিনি এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা করা হতো। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭- ১৯০৫) সিংহলে যাত্রা করে বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী, করুণা ও মানবতাবাদী আদর্শের দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিলেন। তার প্রভাবে রবি ঠাকুরের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) রচনা করেন 'আর্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত' (১৮৯৯) এবং অন্য দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) রচনা করেন 'বৌদ্ধ ধর্ম' (১৯০১) নামক গ্রন্থ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই দুটি গ্রন্থের দ্বারা দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) সংসর্গ লাভ করেন এবং তাঁর লেখা 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (১৮৮২)-নামক গ্রন্থটি রবীন্দ্র মানসে জায়গা করে নেয়। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও দর্শন বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ওই গ্রন্থ দ্বারাই অনুপ্রাণিত বলে জানা যায়। জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'ব্রাহ্মসমাজ'-এ বৌদ্ধ সংস্কৃতি গুরুত্ব লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কাটে সেখানেই, তাই বৌদ্ধচর্চার হাতে খড়ি সেখানে বলে ধারণা করা হয়। শান্তিনিকেতনের 'ব্রহ্মচর্য আশ্রম' এবং পরে বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধধর্ম

ও দর্শন চিন্তার অধ্যায়ন-অধ্যাপনা ক্রমশ বেড়েই চলে। ওই সময়ে 'ধম্মপদ' গ্রন্থের দ্বারাও এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে 'ধম্মপদের' বাংলা পদ্যানুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য অনুবাদের কাজ আর সমাপ্ত হয়নি। ধম্মপদের অসমাপ্ত অনুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫) প্রকাশিত হয়েছে। ধম্মপদ এবং গীতার মধ্যে কিছু বক্তব্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন-"গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহতমূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্য কী ধম্মপদে কী গীতায় এমন অনেক কথাই আছে ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।"[২] দ্বিতীয়ত, বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে একদিকে আচার-অনুষ্ঠান যজ্ঞাদিক্রিয়া এবং দার্শনিক তত্ত্ব, প্রভৃতির প্রাধান্য ছিল বেশি, তুলনায় প্রেম, করুণা প্রভৃতির প্রতি ধর্মের লক্ষ্য ছিল কম। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ধর্মে মানবসম্পর্ক, প্রেম, মৈত্রী, প্রভৃতির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল। তাই বুদ্ধদেব রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য। মানবধর্মের উপাসক রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

৩

বুদ্ধদেব সর্বদাই মানুষকে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। এই চারটি উপদেশ 'চার আর্যসত্য' নামে পরিচিত। এই অর্যসত্যচতুষ্টয়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের মূল কথা নিহিত আছে। সেজন্য গৌতম বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারটি আর্য সত্যের মহত্ব বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধদর্শনে এই আর্যসত্যের জ্ঞানকে মুক্তির উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্যসত্যচতুষ্টয়কে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ, রোগের কারণ, রোগের উপশম এবং রোগ উপশমের উপায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধদর্শনে প্রথম আর্যসত্যে দুঃখকে জগৎ-সংসারের প্রধান বাস্তব সত্য বলে মনে করা হয়েছে। সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণিক। আর ক্ষণিক বস্তু নিত্য সুখ দিতে পারে না বলেই তা দুঃখজনক। কোনো সুখদায়ক বস্তু না পাওয়া থেকে দুঃখ, আবার পেয়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়েও দুঃখ। আপাতসুখকর বস্তুই দুঃখ দিয়ে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে দুঃখই জীবনের শেষ নয়। দুঃখ থেকে মুক্তির রাস্তাও সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে আনন্দবাদী কবি। তিনি জগতের মধ্যে আনন্দ ও প্রেমের স্বাদ খুঁজে পেয়েছেন। 'আত্মপরিচয়ে' তিনি বলেছেন তার কাছে 'স্বর্গের চেয়ে প্রিয় এই পৃথিবী'। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তিনি দুঃখকে স্বীকারও করেছেন। তাঁর কথায়-

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারদিকে;
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দূরগ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়।[৩]

জীবনের চড়াই উতরাইয়ে দুঃখ থাকবে। দুঃখ এড়ানোর সাধ্য কারো নেই। দুঃখের অভিঘাতে জীবন যন্ত্রণাকে বিপর্যস্ত করে, তিনি দুঃখের বুকে আনন্দের সন্ধান করেছেন। বুদ্ধদেবের মতো রবীন্দ্রনাথও আশাবাদী। তাঁর কাছে এই দুঃখ ক্ষনিকের। বৌদ্ধদর্শনের দ্বিতীয় আর্যসত্যের মতো তিনিও মনে করেন দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব। তাই দুঃখই শেষ কথা নয়। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব বলেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,

অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।[৪]

দুঃখের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বৌদ্ধদর্শনে অবিদ্যাকে দুঃখের মূল কারণ বলা হয়েছে। কারণ থেকে যার উৎপন্ন হয়, কারণের নাশ হলে তার নাশ হবেই। কার্যকারণ পরম্পরায় অবিদ্যা যেহেতু দুঃখের মূল কারণ, তাই আর্যসত্যের সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা দূর হলে দুঃখও দূর হবে। রবীন্দ্রনাথও দুঃখ থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছেন। তবে তাঁর পথ একটু অন্যরকম। সাপে কামড়ালে বিষ দিয়ে যেমন বিষ নষ্ট করা হয়, ঠিক সেরকম দুঃখ দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ দুঃখের ক্ষয়সাধন করতে চেয়েছেন।-

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।[৫]

আমরা আগে দেখেছি বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পেতে অবিদ্যা নাশের নিদান দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে দুঃখের হাত থেকে মুক্তিকে বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ বলা হয়েছে। নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য চতুর্থ আর্যসত্যে আটটি মার্গ অনুশীলনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে কামনা-বাসনা সহ সমস্ত প্রকার দুঃখের মূল কারণকে দুঃখ দ্বারা আঘাত করে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ধূপকে না পোড়ালে যেমন তার গন্ধ পাওয়া যায় না। আলোকে না জ্বালিয়ে দিলে যেমন আলো কোনকিছুকে দেখতে সাহায্য করে না। তেমনি মানুষকে দুঃখের আগুনে না জ্বালিয়ে দিলে আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করা যায় না এবং তার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটতে পারে না।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমারে দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।[৬]

দুঃখ, যন্ত্রণা, মৃত্যু দ্বারা কবি কখনোই বিচলিত হন নি, বরং তিনি তা বরণ করে নিয়েছেন। দুঃখচিন্তা এবং দুঃখ থেকে মুক্তির রাস্তা কবি যেভাবে দেখিয়েছেন, তা সত্যিই আশ্চর্য এবং অভিনব। আত্মবিকাশের জন্য কবি দুঃখ, বিপদ, আঘাতকে নিজের কাছে আহ্বান করেছেন।

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।[৭]

৪

বৌদ্ধদর্শনে অনিত্যবাদ স্বীকার করা হয়। যার মূল বক্তব্য হল, জগতের কোন বস্তুর অপরিবর্তনীয় স্থায়ী সত্তা নেই। সবকিছুই অনিত্য ও পরিবর্তনশীল। যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ আছে। দৈহিক ও মানসিক সকল ঘটনাই ক্ষণস্থায়ী। এই জগত-জীবন হল নিরবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের প্রবাহ। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতকে স্থায়ী বলে মনে হলেও আসলে কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই জগতের কোনো কিছুই নিত্য বা স্থায়ী হতে পারে না। পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাসের (Heraclitus: ৫৩৫- ৪৭৫ খ্রী:পূ:) দর্শনেও আমরা জীবন ও জগতের অনিত্যতা পরিবর্তনশীলতা ও ক্ষণস্তায়িত্বের উল্লেখ পাই। আবার উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গশোঁর (Henri Bergson ১৮৫৯:১৯৪১) মতেও এই জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল।

অনাদি, অনন্ত প্রাণ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিবর্তন সৃষ্টি করে চলেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও আমরা দেখেছি-'গতিতেই সব পাপের ক্ষয় হয়, চলমান ব্যক্তির সঙ্গে দেবতারাও থাকেন।' সৌতান্ত্রিক বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদকে ক্ষণিকত্ববাদে রূপান্তরিত করেন। ক্ষণিকত্ববাদ অনুসারে জগতের প্রতিটি বস্তু যে শুধু অনিত্য তা নয়, বরং সেগুলির কোনোটিই এক ক্ষণের বেশি স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই ক্ষণস্থায়ী।

রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তিগত জীবনে অনিত্যবাদ বা গতিবাদকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে গতি চিরন্তন সত্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-"আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক। আমরা জন্মান্তরবাদী। দেশে এই গতির ইঙ্গিত সর্বত্র। মৃত্যু আমাদের শাশ্বত গতিপথের দ্বার খুলে দেয়। যে চলতে চায় না তাকেও মৃত্যু লোক-লোকান্তরে ঠেলে নিয়ে যায়।"[৮] বৌদ্ধদর্শনে আমরা দেখেছি 'সর্বং অনিত্যং সর্বং ক্ষণিকম্'। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন কোন কিছুকে চিরস্থায়ী ধরে রাখা যায় না। সবকিছুই গতির নিয়মে পরিবর্তিত হয়। ক্ষণিকত্ববাদে যেমন বলা হয় প্রত্যেক বস্তু ক্ষণিকের জন্য অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং অন্য কোনো বস্তু সৃষ্টি করে তবেই বিনষ্ট হয়। প্রতি ক্ষণে নতুনের আবির্ভাব ও পুরাতনের বিনাশ ঘটে। ক্ষণিকত্ববাদের ফলেই এই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন গতি বা পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্টি সৃষ্টিপ্রবাহ। তবে এই সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য আনন্দ প্রাপ্তি। গতির জন্যই এই সৃষ্টি প্রবাহ আপন বেগে ছুটে চলেছে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল-"গতির ছন্দেই বিশ্বের সৌন্দর্য। গতি নিয়েই সৃষ্টি। এই চরাচর সেই সৃষ্টি বা গতির প্রবাহ। কি অপূর্ব ছন্দে এই সৃষ্টি প্রবাহ চলছে তা দেখলে বিস্মৃত হতে হয়।"[৯] আসা-যাওয়া জীবনের ধর্ম। যে এসেছিল সে চলে গেছে। মানুষ জন্মলাভ করেছে আবার অন্য পথে অন্য জন্ম পেয়েছে। অন্তহীন গতিপথে জীবন-মৃত্যু একটা খেলা। তাই মৃত্যুর জন্য দুঃখ নয়। চলমান জীবনের এই সত্য, তাঁর বহু কবিতায় বারবার ব্যক্ত হয়েছে-

চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ পাথারে;
পথের দুধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে;
সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিনী।[১০]

৫

বৌদ্ধ মতে যে কারণ থেকে দুঃখের উদ্ভব হয়, সেই কারণগুলি নিরোধ করতে পারলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভকে বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ বলা হয়েছে। মানুষ নিজের চেষ্টায় আত্মসংযোমের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়কে নিজের বশীভূত করে, নিয়ত ধ্যানের দ্বারা যদি সত্য অনুধাবন করে, তাহলে সে সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়ে এই জীবনে নির্বাণলাভ করতে পারে। নির্বাণ বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনে চারটি ভিন্ন মত আছে। নির্বাণ পূর্ণ বিলুপ্তির অবস্থা; কামনা বাসনা সহ সত্তার চির অবলুপ্তির অবস্থা। এই অর্থে নির্বাণকে নেতিবাচক অবস্থা হিসেবে দেখা হয়। নির্বাণের আরেকটি অর্থ করা হয়, শ্বাশত আনন্দময় অবস্থা হিসেবে। নির্বাণের এর আলোচনায় বুদ্ধ সবসময় নীরব থেকেছেন, এই অর্থে নির্বাণের তৃতীয় অর্থ হল, নির্বাণ অনির্বচনীয় অবস্থা। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির যেহেতু জন্ম-মৃত্যু নেই তাই নির্বাণ শাশ্বত অপরিবর্তনীয় অবস্থা।

বুদ্ধ শিক্ষার সারমর্ম রবীন্দ্রনাথ যা পেয়েছেন তার নিরিখে তিনি নির্বাণের অর্থ বুঝেছেন। সৌত্রান্তিক দার্শনিক সম্প্রদায় নির্বাণের অবস্থাকে অভাবাত্মক বলে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তা বলেননি। তাঁর মতে মুক্তি নঞর্থক নয়। সদর্থক ও সৎকর্মের মাধ্যমে, আত্মত্যাগের দ্বারা মুক্তি হয়। তাই নির্বাণ অভাবাত্মক নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- "তাঁরই স্মরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঞর্থক নয় সদর্থক; যে মুক্তি কর্ম ত্যাগে নয় সাধুকর্মের মাধ্যমে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগদ্বেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়।"[১১] ব্রহ্মবিহার দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়। ব্রহ্মবিহার যদি নির্বাণলাভের মার্গ হয় তবে নির্বাণ কখনো শূন্যতা হতে পারে না। নির্বাণ পরিপূর্ণতার অবস্থা। পূর্ণ বিশ্বপ্রেমের অবস্থা। "সর্বভুতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে।... অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনমতেই শ্রদ্ধেয় হয়ে।"[১২] রবীন্দ্রনাথ বার বার একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, নির্বাণের পথে যাত্রা মানে শূন্যতার পথে যাত্রা নয়। স্বার্থপর বাসনা ত্যাগ এবং সকলের প্রতি প্রেম দিয়ে যা পাওয়া যায়, তাই হল নির্বাণ। 'প্রেমের বীজ মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিলে' আনন্দই পাওয়া যায়, এই আনন্দই মুক্তি, এই আনন্দপ্রাপ্তিই নির্বাণ। তাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মতে নির্বাণ হল আনন্দময় অবস্থা।

৬

বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি, এই তিনটি অনুশীলনকে আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি পর্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়। বৌদ্ধ নৈতিকতায় শীল এক ধরনের নৈতিক (সদাচার) আচরণ। এই নৈতিকতার সদর্থক এবং নঞর্থক, দুটি দিক আছে। সদর্থক দিকটি হল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারটি ব্রহ্মবিহারের অনুশীলন। বৌদ্ধ দর্শনে এই ব্রহ্মবিহার বিশেষ ধরনের ধ্যান। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই তিন ধ্যানে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারটি ভাব দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। ব্রহ্মবিহার পালনের দ্বারা সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি একে অন্যের সঙ্গে গভীর আন্তরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ব্রহ্মবিহার ভাবনা বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা বিকাশের ভিত্তি স্বরূপ। বুদ্ধদেবের মতে যিনি সর্বভুতের প্রতি মৈত্রীভাব প্রকাশ করেন তার প্রতি কারোর বৈরীভাব থাকতে পারে না। মৈত্রী ভাবনার দ্বারা দ্বেষ, করুণা ভাবনার দ্বারা হিংসা, মুদিতা দ্বারা আরতি, উপেক্ষা দ্বারা প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের 'ব্রহ্মবিহার'-এর ধারণা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ব্রহ্মবিহারের অন্তর্গত মৈত্রী ও করুণা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ছিল অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্তি কিন্তু অহংবোধ থাকলে বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা যায় না। তাই বাসনা বিলোপের কথা বলা হয়েছে। বাসনা বিলোপ করে সর্ব প্রাণীর কল্যাণ চিন্তায় পূর্ণতা লাভ করা যায়। একে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহার বলেছেন। ব্রহ্মবিহারের ধারণা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিময় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার।"[১৩] এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বিশ্বমৈত্রীর ব্যাপকতা ও তীব্রতা কত গভীর। বুদ্ধদেবের এই শিক্ষা প্রেমের শিক্ষা। বিশ্বপ্রেম, সমগ্র বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাব প্রকাশ করা এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করা। রবীন্দ্র দর্শনে আমরা দেখেছি তিনি মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন, একটি হল ছোটো আমি বা জীবসত্তা এবং আরেকটি হল বড়ো আমি বা বিশ্বমানব। বিশ্বসত্তায় মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে বিশ্বমানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্রহ্মবিহারের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন-"অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি

সামান্য প্রীতি নয়- মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালবাসেন সেইরকম ভালবাসা।[১৪] রবীন্দ্রনাথের মতে এই মৈত্রী ভাবনাকে অনুশীলন করতে হলে মন থেকে ক্রোধ, হিংসা, লোভ দূর করতে হবে এবং তা করতে গেলে শীল গ্রহণ করা প্রয়োজন। মৈত্রী ভাবনা বিস্তারের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; প্রথমে নিজের, পরে নিজের প্রিয় ব্যক্তিদের, এই ভাবে ক্রমশ বিশ্বের সকল ভুতের প্রতি মৈত্রীভাব বিস্তার করতে হবে। ঠিক তেমনি রবীন্দ্র দর্শনেও প্রথমে নিজের প্রতি প্রেম, পরে প্রিয়জনকে প্রেম, এইভাবে বিশ্বলকের প্রতি প্রেমের বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। করুণা প্রসঙ্গে; পরের দুঃখে, এমনকি পাপী-তাপীর প্রতিও করুণার ধারা প্রবাহিত করতে হবে। করুণার স্বরূপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য।"[১৫]

৭

সাহিত্য, সংস্কৃতি, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি, এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের কলম অবাধে বিচরণ করে নি। তিনি যে বিষয়ে কলম ধরেছেন তার এতটাই গভীরে প্রবেশ করেছেন যে, অনেক সময় বিষয়ের সঙ্গে নিজের সত্তা বিলীন হয়ে গিয়েছে। ইসলামিক সংস্কৃতি, খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৈদিক সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ে তার অসংখ্য লেখা, আলোচনা, সমালোচনা আমরা পেয়েছি। বুদ্ধদেবের উদার মানবিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা তিনি এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তার জীবনের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে বৌদ্ধ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন নিয়ে চর্চা করেছেন। আমাদের নিবন্ধে আমরা মূলত বৌদ্ধ দর্শনের চারটি আর্যসত্য, ক্ষণিকত্ববাদ, নির্বাণ এবং ব্রহ্মবিহার নিয়ে আলোচনা করেছি। বৌদ্ধ দর্শনের আর্যসত্যচতুষ্টয়ের প্রথম আর্যসত্যে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ এবং বেঁচে থাকার সামগ্রী যা মানুষ ভোগ করে, এসব কিছুকে দুঃখের নামান্তর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ জন্ম মানেই দুঃখ ভোগ করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী কবি। তিনি জগতের মধ্যে দুঃখ নয় বরং আনন্দের সন্ধান করেছেন। পৃথিবীটা তাঁর কাছে দুঃখের ভাণ্ডার নয় বরং আনন্দরসে ভরপুর। তবে ক্ষেত্র বিশেষে দুঃখকে তিনি স্বীকার করেছেন এবং তা থেকে মুক্তির রাস্তাও দেখিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্র-ভাবনার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। দুঃখমুক্তির উপায় বৌদ্ধ দর্শনে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, রবীন্দ্র দর্শনে ঠিক সেভাবে বর্ণনা করা হয়নি। তাছাড়া আমরা যদি মুক্তির অবস্থা বা নির্বাণের প্রসঙ্গ দেখি, সেখানেও দেখব বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিস্তর পার্থক্য আছে। বুদ্ধদেব জগতের দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চির মুক্তির কথা বলেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ জগতের আনন্দ রসে আপ্লুত হওয়ার কথা বলেছেন। বুদ্ধদেব জগতের সংস্পর্শে আসাকে বন্ধন বলে মনে করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জগতের প্রতি স্নেহ, মায়া ও প্রেম দ্বারা আনন্দ পেতে চেয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের 'ব্রহ্মবিহার' ধারণা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশ্বশান্তি এবং মানবিকতা বিকাশের একমাত্র পন্থা বৌদ্ধ দর্শনের এই ব্রহ্মবিহার ভাবনা। সমগ্র মানবজাতির প্রতি, প্রাণের প্রতি, সুখ, শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্টার জন্য ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করা উচিত। রবীন্দ্র দর্শনে আমরা দেখেছি যে, মানুষের প্রকৃত ধর্ম হল সমগ্র বিশ্বের প্রতি উদার মানবিকতাবোধ। রবীন্দ্রনাথের এই মানবতাবাদের ধারণা বৌদ্ধ দর্শনের মৈত্রী, করুণার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত। তবে আমাদের মনে হয় গৌতম বুদ্ধের জীবনদর্শনের সঙ্গে যদি রবীন্দ্রনাথের কোনো কালেই পরিচয় না হতো, তবুও আমরা তাঁর লেখায় এমন অনেক উপাদান পেতাম যা বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে মিল থাকত।

তথ্যসূত্র:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬০ খ্রী:, বুদ্ধদেব, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ: ১।
২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, "প্রাচীন সাহিত্য", *ধম্মপদ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পৃ: ৮৩।
৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, "শেষ সপ্তক", কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ: ১৮৫।
৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬১ খ্রী:, কঙ্কাল, "পূরবী", কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ: ১৮৭।
৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, ৪৩ সংখ্যক, গীতালি, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ: ৫২।
৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, গীতবিতান, অখন্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ: ৯৮।
৭) তদেব, পৃ: ৯৮।
৮) সেন, ক্ষিতিমোহন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, বলাকা কাব্য-পরিক্রমা, কলকাতা, এ মুখার্জ্জী এন্ড কোং লিমিটেড, পৃ: ১৭।
৯) তদেব, পৃ: ২০।
১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬ খ্রী:, বলাকা, ৬ নম্বর কবিতা, এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, পৃ: ১৯।
১১) প্রাগুক্ত, বুদ্ধদেব, পৃ: ১২।
১২) তদেব, (বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ), পৃ: ৩৫।
১৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ: ৪৫৭।
১৪) প্রাগুক্ত, বুদ্ধদেব, (ব্রহ্মবিহার), পৃ: ২১-২২।
১৫) তদেব, (বুদ্ধদেব প্রসঙ্গ) পৃ: ৫০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) ঘোষ, মহেশচন্দ্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, বুদ্ধ প্রসঙ্গ, কলকাতা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
২) জানা, রাধারমণ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পালি-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ, (প্রবন্ধ), বৈশাখ অসাড়।
৩) ভিক্ষু, শীলভদ্র, 1948 খ্রী: বুদ্ধবাণী, কলকাতা, মহাবধি সোসাইটি।
৪) কিশোর, হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, 2011 খ্রী: রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধচর্চা, কলকাতা, একুশ শতক।
৫) দত্ত, ভাবতোষ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ, (প্রবন্ধ), কলকাতা, জগৎজ্যোতি প্রচারণা, সংখ্যা।
৬) জানা, রাধারমণ, পালিভাষা- সাহিত্য বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, পুস্তক বিপিনন।
৭) চৌধুরী, সুকোমল, ২০১৪ খ্রী:, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি।

আয়ুর্বেদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আদিবাসীদের যোগদান

মধুমিতা জানা
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
মহিষাদল রাজ কলেজ, মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: আয়ুর্বেদ হলো ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র। প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে ভারতবর্ষের মাটিতে এই চিকিৎসা পদ্ধতির উৎপত্তি হয়। আয়ুর্বেদ শব্দটি হলো দুটি সংস্কৃত শব্দের সংযোগে সৃষ্টি, যথা- 'আয়ুষ্', অর্থাৎ 'জীবন' এবং 'বেদ' অর্থাৎ 'বিজ্ঞান'। যথাক্রমে আয়ুর্বেদ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'জীবনের বিজ্ঞান'। এটি এমনই এক চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে রোগ নিরাময়ের চেয়ে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়। রোগ নিরাময় ব্যবস্থা করাই এর মূল লক্ষ্য। আয়ুর্বেদের মতে, মানব দেহের চারটি মূল উপাদান হলো দোষ, ধাতু, মল এবং অগ্নি। আয়ুর্বেদে এগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাই এগুলিকে 'মূল সিদ্ধান্ত' বা 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল তত্ত্ব' বলা হয়। *যোগাসন আজ* একটি জনপ্রিয় বিষয়। আয়ুর্বেদ হল একটি বহু বছরের পুরনো ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ওষুধ ব্যবস্থা যা আধুনিক বিশ্বে টিকে আছে। এটি হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করেছে, তার সহজ কিন্তু কার্যকর পদ্ধতির মাধ্যমে। আয়ুর্বেদ আসলে একটি লোক ঔষধ যা বহু শতাব্দীর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। আয়ুর্বেদিক ঔষুধ যা শুধুমাত্র অসুস্থ হওয়ার পরে নিরাময় করে না বরং সুস্থ শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থার বিকাশে জনজাতির একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 'জনজাতি' বলতে ভারতের 'অদিবাসী' সম্প্রদায়কে বোঝায়। আদিবাসী শব্দটি সংস্কৃতভাষা থেকে এসেছে। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল –

আদি অর্থ "প্রাচীন" বা "মূল" বাসী অর্থ "বাসিন্দা" বা "নিবাসী"

সুতরাং আদিবাসী শব্দের অর্থ হল – "প্রাচীন বাসিন্দা" বা "মূল বাসিন্দা" ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্যালোচনা করে বোঝা যায় সবচেয়ে প্রাচীন বাসিন্দা হল আদিবাসী সম্প্রদায়। তাই ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার বিকাশে প্রথম প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাদের বিভিন্ন বিষয়ে অবদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে। জঙ্গলমহলের ঔষধি বৃক্ষগুলোকে আদিবাসীরা সর্বপ্রথম সনাক্ত করে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে বহু দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি বহু শতাব্দী ধরে তুলসী, নিম ও অশ্বগন্ধার মতো ঔষধি বৃক্ষ গুলোকে চিহ্নিত করে ব্যবহারের চার সুফল পেয়ে এসেছে। আদিবাসীদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির অসীম প্রভাব সংস্কৃত চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায় তুলসী, নীলকন্ঠ, অশ্বগন্ধা, মুন্ডা সম্প্রদায় অমৃতা, হরিতকী, বিহলা এবং খারিয়া সম্প্রদায় অশ্বগন্ধা, তুলসী ও নীলকন্ঠ গাছকে ঔষধি হিসেবে বেশি ব্যবহার করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি। সুতরাং ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার বিকাশে আদিবাসী জনজাতির আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূচক শব্দ: ঔষধি, জনজাতি, আয়ুর্বেদ, চিকিৎসা, সম্প্রদায়।

ভূমিকা:

আয়ুর্বেদিক ঔষুধের ইতিহাস একটি আকর্ষণীয় বিষয় কারণ এটি রোগের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের একটি ইতিহাস। সভ্যতার অগ্রগতি এবং রোগের ধরণ পরিবর্তনের সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। আয়ুর্বেদ হল ওষুধের একটি পদ্ধতি যা প্রাচীনকালে যুক্তিসঙ্গত যৌক্তিক ভিত্তির সাথে উদ্ভূত হয়েছে। আয়ুর্বেদের উৎপত্তিতে অথর্ববেদকে দায়ী করা হয়েছে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আয়ুর্বেদের চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত হয়। আয়ুর্বেদের তত্ত্ব এবং অনুশীলন ছদ্মবিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। আয়ু’ শব্দের অর্থ ‘জীবন’ এবং ‘বেদ’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ বা ‘বিদ্যা’। ‘আয়ুর্বেদ’ শব্দের অর্থ জীবনজ্ঞান বা জীববিদ্যা। আয়ুর্বেদ চিকিত্সা মূলত ভেষজ বা উদ্ভিদের মাধ্যমে প্রচলিত চিকিত্সা পদ্ধতি। এই চিকিত্সা ৫০০০ বছরের পুরাতন। আদিম যুগে গাছপালার মাধ্যমেই মানুষের রোগের চিকিৎসা করা হতো। এই চিকিত্সা বর্তমানে ‘হারবাল চিকিত্সা’ তথা ‘অলটারনেটিভ ট্রিটমেন্ট’ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সীসা, পারদ এবং আর্সেনিক রয়েছে, যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলে পরিচিত।

আয়ুর্বেদ অনুসারে, *Ayu* (বয়স/জীবন) সেই সময়কাল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যার জন্য আত্মা, মন এবং (শারীরিক) শরীর একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি শব্দের সবচেয়ে ব্যাপক অর্থ *Ayu* বা জীবন। এটি শুধুমাত্র মানুষের জন্যই নয়, পশু, পাখি এবং গাছপালাদের জন্যও অর্থপূর্ণ। তাদের সকলকে বৈদিক ঐতিহ্যে বসবাসকারী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কারণ তাদের সকলের আত্মা, মন এবং বস্তুর সম্পৃক্ততা রয়েছে। এবং উদ্ভিদের আত্মা মানুষের মধ্যে উপস্থিত আত্মার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। এই কারণেই আয়ুর্বেদ শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়। অতএব, *Ayu* (বয়স/জীবন) হল সেই সময়কাল, যা ভ্রূণের গঠন থেকে শুরু করে একটি প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত, আয়ুর্বেদ সমস্ত জ্ঞানকে কভার করে বা ভ্রূণ, শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্কদের বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান। আয়ুর্বেদ শুধুমাত্র শরীরবিদ্যা, রোগবিদ্যা, এবং শরীরের চিকিৎসা সম্পর্কে কাঠামোগত তথ্য নয়। পরিবর্তে, আয়ুর্বেদ মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্য।

যাইহোক, জ্ঞান সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধের মতো বিভিন্ন কারণের উপরও নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কয়েক শতাব্দী আগে, মানুষ বিশ্বাস করত যে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে। তারা এই থেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণও তৈরি করেছে। বেদ হল প্রজ্ঞা। বেদ হল সেই জ্ঞান যা একটি গ্রহণযোগ্য মনের উপর অবতীর্ণ হয় ।

আয়ুর্বেদ হল জীবনের বিজ্ঞান, তাই এটি সমস্ত জীবের জন্য প্রযোজ্য।

সার্জারির *ক্ষেত্র* বা আয়ুর্বেদের বিষয় হল *পুরুষ*। এই সংস্কৃত শব্দ "পুরুষ" এর একাধিক অর্থ রয়েছে। সবচেয়ে ব্যাপক এবং মৌলিক অর্থ হল – আত্মা। অতএব, আয়ুর্বেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আত্মাকে তার প্রধান উদ্দেশ্য - পরিত্রাণ অর্জনে সাহায্য করা। মোক্ষ হল আয়ুর্বেদের বৃক্ষের সূত্র বা বীজ।

বহু প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসীদের আয়ুর্বেদ অনুশীলন করার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে অরণ্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করে কিভাবে সুন্দর ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকা যায়। অরণ্যের গাছ, পাতা, ফুল, ফল, মূল প্রভৃতিকে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সুস্থ ও কর্মঠ হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সভ্যতার শুরু থেকে আদিবাসী সম্প্রদায় পরিবেশের সাথে বসবাস বা সহাবস্থান শুরু করে তখন থেকে ভেষজ ওষুধের ব্যবহার

করে আসছে। ভেষজ ওষুধগুলো যে কোনো ছোট আঘাত চর্মরোগ, জ্বর, ডিহাইড্রেশন প্রভৃতি অসুখের ক্ষেত্রে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার করত। এবং এখনও ব্যবহার করে চলেছে। জনজাতি সম্প্রদায় এই জনপ্রিয় আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলোকে সর্বপ্রথম আপন করে নিয়েছিল। যেহেতু জনজাতি সম্প্রদায়কে প্রকৃতির সঙ্গে অরণ্যের জীবজন্তুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বাঁচতে হয়, তাই প্রকৃতির মধ্যে থাকতে থাকতে অরণ্য প্রকৃতিকে সহজে ঔষধি হিসেবে আপন করে নিয়েছে। সংস্কৃত বেদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও এদের চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ আছে। আয়ুর্বেদিক ওষুধের যুগ যুগ ধরে অনুশীলন জনজাতি সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যগত পরম্পরা। উদাহরণস্বরূপ স্থানীয়ভাবে যাকে ভেরেঙ্গঁ গাছ বলা হয়, তা মাড়ি থেকে রক্তক্ষরনের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। বন্য ইয়াম গাছের শিকড় থেকে শিশু ক্যানসার চিকিৎসার বিভিন্ন মারন ওষুধ তৈরী হয়। জনজাতি অর্থাৎ আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদভিত্তিক ঔষধি পরবর্তী সময়ে আয়ুর্বেদিক ঔষধ হিসাবে পরিগণিত হয়। ২০১৫ সালে ভারত সরকার এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য আয়ুষমন্ত্রক প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্পে স্বাস্থ্য সচেতন ব্যবস্থার কৌশল হিসাবে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদ ভিত্তিক ঔষধি অনুশীলনের সঙ্গে আয়ুর্বেদ প্রচারের লক্ষ্য রাখে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হল আদিবাসী বাসিন্দাদের মধ্যে আয়ুর্বেদের সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া ও তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। ঐতিহ্যবাহী জনজাতির নিরাময়কারী ভেষজওষুধগুলোতে পরবর্তীসময়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন সংরক্ষনের জন্য আয়ুর্বেদিক ঔষুধ তৈরী হয়েছে।

জনজাতি সম্প্রদায়ের মৌলিক চাহিদা পূরণে অরণ্যের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খাদ্য, ঔষধ ও আশ্রয় এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে অরণ্যের ভূমিকা সত্যই অনস্বীকার্য। পিপল, আমলা, মরিঙ্গা, জামুন প্রভৃতি গাছ অত্যন্ত মূল্যবান ঔষধি হিসাবে, বিশেষ করে মরিঙ্গা গাছের প্রতিটি অংশ মূল, ছাল, পাতা, বীজ আয়ুর্বেদিক ঔষুধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

সারা পৃথিবী জুড়ে আদিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি। আদিবাসী অর্থাৎ জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেসমস্ত এলাকায় বাস করে সেই সমস্ত অঞ্চল খুবই অনুন্নত। এর পেছনে মূল কারণগুলির অন্যতম হল দারিদ্র ও অশিক্ষা। জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন ও জীবিকা খুবই সমস্যাসঙ্কুল। সমস্যা গুলোর মধ্যে অন্যতম একটা সমস্যা হল স্বাস্থ্য সমস্যা। স্বাস্থ্য বলতে জীব ও তার পরিবেশের গতিশীল ভারসাম্যের অবস্থাকে বোঝায়। জনজাতি সম্প্রদায় স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে ভেষজ ঔষধিগাছগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দারিদ্রতা জনজাতিগোষ্ঠীকে ঔষধি গাছগুলিকে আপন করে নিতে বাধ্য করেছে। এতে নির্ভেজাল বনৌষধিকে ব্যবহার করে তারা দীর্ঘকাল সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) অনুমান অনুসারে মানুষ তার স্বাস্থ্যের জন্য ঐতিহ্যগত ঔষুধের উপর নির্ভরশীল। সেই ঐতিহ্যগত ঔষধ জনজাতির বনৌষধি। ভারতবর্ষজুড়ে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বনাঞ্চল কেন্দ্রিক জীবন ও জীবিকার উপর নির্ভরশীল এবং তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভিদের নির্যাসের উপর।

আয়ুর্বেদিক ঔষুধের সংগ্রহস্থল হল বনাঞ্চল ভারতবর্ষ জুড়ে জনজাতি বর্গের মানুষজনের বনাঞ্চলকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকাই নির্ভরশীল দীর্ঘকাল ধরে। যেখানে জীবন-যাপনের সমস্তটাই তারা বন থেকে সংগ্রহ করে। বনৌষধি ব্যবহারের মাধ্যমে তারা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা মেটায়। যে সকল বনৌষধি তারা বিভিন্ন অসুখ সারাতে ব্যবহার করত সেই সমস্ত গাছগুলি বর্তমানেও বিভিন্ন ঔষধ তৈরীতে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়। জনজাতিদের জীবন ও জীবিকায় অরণ্য তাদের নিত্যসঙ্গী। দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয় এই অরণ্য। W. W. Hunter তাই বলেছেন - “Jungle is their unfailing friend” আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে

অনভিজ্ঞ জনজাতিদের কাছে অরণ্যে বনৌষধ মহৌষধে পরিণত হয়েছে। অসুখ-বিসুখ হলে এরা ওষুধ এবং পথ্য ফলমূল বনভূমি থেকেই সংগ্রহ করে। সেইগুলি ব্যবহার করে রোগের নিরাময় ঘটায় তাই বনৌষধির গুরুত্ব জনজাতিগোষ্ঠীর কাছে প্রবল। ভারতবর্ষের মূল বাসিন্দা আদিবাসী অর্থাৎ প্রথম বাসিন্দারা স্বাস্থ্য সমস্যায় ঐতিহ্যবাহী ঔষধ ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে অব্যহতি পায়। তাই তারা বনাঞ্চল নির্ভর জীবনযাপন করার সাথে সাথে বনাঞ্চল নির্ভর ঔষধ সংরক্ষন করে।

আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কিত যুক্তি ও সমস্যা:

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা লাভের সুযোগ থাকলেও ঐতিহ্যবাহী সংগৃহীত ঔষধের উপর তারা বিশ্বাসী এবং অনেক বেশি নির্ভরশীল। সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যগত ঔষধের উপর খুবই নির্ভরশীল। ভেষজ ঔষধই জনজাতি গোষ্ঠীর কাছে অন্যতম সহায়ক হয়ে ওঠে। এরা বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত ঔষধ সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান ও ধারনা রাখে। যার ফলে প্রয়োজনীয় ঔষধ নিজেরাই সংগ্রহ করতে সমর্থ। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এরা দূরারোগ্য ব্যাধি দূর করতে অনেকটাই সফল হয়েছে। তাই জনজাতিগোষ্ঠীর কাছে আয়ুর্বেদিক বনৌষধি হচ্ছে অন্যতম ভরসা ও বিশ্বাসের জায়গা।

আদিবাসীদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির অসীম প্রভাব সংস্কৃত চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মহুল ফুলের অর্জুনারিষ্ট নামক ঔষধ তৈরি করা হয়, যা রক্তচাপ, হৃদরোগ ও মধুমেহ রোগে উপকারী। মহুল গাছের ছাল ও পাতা থেকে প্রস্তুত হয় বিভিন্ন বিষক্রিয়া দূরীকরণের ঔষধ। মহুল ফুলের রস মেয়েদের বহু দূরারোগ্য জটিল অসুখ সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়াও মহুল গাছের পাতা ও ছাল থেকে প্রস্তুত ঔষধ পাকস্থলির সমস্যা, পাকস্থলীর যন্ত্রনায় খুবই উপকারী। মহুল বৃক্ষের আয়ুর্বেদিক ব্যবহার আদিবাসীরা হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহার করে অব্যর্থ ফল ভোগ করে আসছে। অশ্বগন্ধা গাছের পাতা ও মূল বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তুলসী গাছের সমস্ত অংশ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। হরিতকী গাছের ফলও বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। অমৃতা গাছের মূল ও পাতা বিভিন্ন দূরারোগ্য ব্যধি নিরাময়ে সহায়তা করে। নীলকণ্ঠ গাছের পাতা ও ফুল নানা ব্যাধি দূরীকরনে ব্যবহৃত হয়।

উপসংহার: অষ্টম শতাব্দীতে পাওয়া আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বইগুলি শুধুমাত্র পদ্ধতিগত নির্দেশনাই দেয় না বরং সময়ের সাথে সাথে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল তার একটি ইতিহাসও প্রদান করে। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান প্রাথমিকভাবে *চরক সংহিতা*, *সুশ্রুতসংহিতা* এবং *অষ্টাঙ্গ হৃদয়*নিয়ে গঠিত বৃহত্ ত্রয়ী গ্রন্থপুঞ্জ। এই বইগুলি মৌলিক নীতি এবং তত্ত্বগুলি বর্ণনা করে যেগুলি থেকে আধুনিক আয়ুর্বেদ বিকশিত হয়েছে। চরক সংহিতা, যা আনুমানিক ৪00 খ্রিস্টপূর্বাব্দের, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা তত্ত্ব এবং অনুশীলনের একটি প্রধান সংকলন। 20টি অধ্যায়ে 8,400 টিরও বেশি শ্লোক রয়েছে। আধুনিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা এখনও তাদের চিকিৎসা প্রশিক্ষণে চরক সংহিতা ব্যবহার করেন। **সুশ্রুত রচিত *সুশ্রুত সংহিতা*,** যা আনুমানিক 700 খ্রিস্টপূর্বাব্দের, এতে মৌলিক বিষয়বস্তু রয়েছে যেমন স্বাস্থ্যের আয়ুর্বেদিক সংজ্ঞা, রক্ত সম্পর্কিত তথ্য, এবং পিত্তের পাঁচটি উপদোষ বর্ণিত হয়েছে। অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম্, আনুমানিক 400 খ্রিস্টাব্দে রচিত। এই গ্রন্থগুলি কফের পাঁচটি উপদোষকে সংজ্ঞায়িত করে এবং জীবনের বস্তুগত মূল্যের উপর জোর দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থায় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির ক্ষেত্রে জনজাতিগোষ্ঠীর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই বনৌষধিগুলোকে সংরক্ষনের জন্য বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আমাদের বর্তমান জনজীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করে তুলতে বেশি করে বনৌষধি গাছ লাগাতে হবে। বাড়ীতে এসি লাগানোর দিকে নজর না দিয়ে গাছ লাগানোর দিকে নজর দিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। খাতুন, হাজেরা (২০২৩) “আদিবাসী সমাজ” তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা।

২। সেন, সুচীব্রত (২০২২) ভারতের আদিবাসী : “সমাজ পরিবেশ ও সংগ্রাম”, বুকপোষ্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।

৩। লুসাই, জনি (২০০৭) “আদিবাসী জনগোষ্ঠী” বাংলাদেশ এশিয়াস্টিক সোসাইটি, ঢাকা।

৪। ভট্ট, লক্ষণ (২০২৩) “আদিবাসী সমাজ” তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা।

৫। ভট্টাচার্য, শিবকালী (২০০৪) চিরঞ্জীব বনৌষধি, কলকাতা।

৬। ব্রহ্মচারী, শ্যামরূপ (২০১২) শ্রীমদ্ভাগবত শ্রী মায়াপুর জনদীয়া।

৭। ষড়ঙ্গী, ড বুদ্ধেশ্বর (২০১৩) সাহিত্যসুধা, বেনারস মার্কেন্টাইল কোম্পানি।

৮। মিশ্র, আচার্য রামচন্দ্র, সংস্কৃত সাহিত্যে তিহাস, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারানসী।

শ্রীহর্ষপ্রণীত রত্নাবলী নাটিকার অলঙ্কার অন্বেষণ

লিটন মিত্র
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
এবং
অনিন্দিতা দাশ
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: অলঙ্কার কাব্যের সৌন্দর্যবর্ধনে যেমন সহায়ক তেমনি একজন কবির মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। কবির অব্যক্ত অনুভূতি নানাবিধ উপকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। সংস্কৃত নাট্যজগতে শ্রীহর্ষ একজন নিপুণ কবি। তাঁর এই নৈপুণ্য *রত্নাবলী* নাটিকায় যথাযথভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এই নাটিকাটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও নাট্যকারের দক্ষতা ও নৈপুণ্যে তা ঋদ্ধ করেছে সংস্কৃত সাহিত্যাঙ্গনকে। তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির প্রকাশে বিভিন্ন অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি অর্থের গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন। এসব অলঙ্কার প্রয়োগে কবি হিসেবে তিনি খ্যাত হয়েছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।
সূচক শব্দ: শ্রীহর্ষ, রত্নাবলী, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার।

সংস্কৃত নাট্যজগতে শ্রীহর্ষ একজন প্রতিভাবান কবি। তিনি *রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা* এবং *নাগানন্দ*- এই তিন রূপকের রচয়িতা। তাঁর সময়কাল ধরা হয় আনুমানিক ৬০৬ থেকে ৬৪৭ (মতান্তরে ৬৪৮) খ্রিষ্টাব্দ। *রত্নাবলী* নাটিকায় রাজা উদয়ন এবং সাগরিকার (রত্নাবলী) প্রণয় মূল আলোচ্য বিষয়। নাট্যকার শ্রীহর্ষ তাঁর এই রচনা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করতে দক্ষতার সাথে রস-প্রয়োগ, অলঙ্কার, রীতি, ভাষার ব্যবহার, ছন্দ সহ যাবতীয় বিষয়াদি যুক্ত করেছেন।

মূল আলোচনা: অলঙ্কার (অলম্-√কৃ+ঘঞ্ ণ) শব্দটির সাধারণ অর্থ সৌন্দর্যবর্ধনকারী অর্থাৎ আভরণ, ভূষণ প্রভৃতি। কাব্যের সৌন্দর্যবর্ধন করে অলঙ্কার। তবে এর বাহুল্য হলে তা কাব্যকে দুর্বোধ্য করে তোলে। অলঙ্কার শব্দ ও অর্থের বিচারে দুই প্রকার। যেমন: ১. শব্দালঙ্কার ও ২. অর্থালঙ্কার। *রত্নাবলী* রচয়িতা শ্রীহর্ষ নিপুণ হস্তে এই দুই ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করে আলোচ্য নাটিকাটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছেন। এখানে তিনি ঔপোম্যবাচক অর্থালঙ্কারের ব্যবহার বেশি করেছেন। তন্মধ্যে ‘উৎপ্রেক্ষা’ নামক অর্থালঙ্কারের সর্বাধিক প্রয়োগ হয়েছে। নিম্নে নাটিকায় বিভিন্ন শ্লোকসমূহে ব্যবহৃত অলঙ্কারসমূহের অন্বেষণপূর্বক নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১। কাব্যলিঙ্গ:

হেতোর্বাক্য পদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে।-(সা.দ)[১]

অর্থাৎ কোনো বাক্যের অর্থ কিংবা পদের অর্থ যদি ব্যঞ্জনাবশতঃ কারণরূপে সূচিত হয় তখন কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়।

রত্নাবলী নাটিকার প্রথম শ্লোকটি কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারের উদাহরণ।যেমন:

পাদাগ্রস্থিতয়া মুহুঃ স্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং

শম্ভোঃ সম্পৃহলোচনত্রয়পথং য্যান্ত্যা তদারাধনে।
হ্লীমত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্গমোৎ কম্পয়া
বিশ্লিষ্যন্ কুসুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তঃন্তরে পাতু বঃ।।-১/১[২]

অর্থাৎ শিবের আরাধনায় পার্বতী তাঁর উঁচু মাথায় পুষ্পাঞ্জলি দেয়ার জন্য পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে স্বয়ং উঁচু হলেন। কিন্তু স্তনের ভরে আবার অবনত হয়ে পড়লেন। বার বার এরূপ করায় শিবের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। এবং তাঁর তিন চোখই সম্পৃহ হলো। দেবী লজ্জিত হলেন। তাঁর দেহে রোমাঞ্চ, ঘর্ম এবং কম্প দেখা দিল। শিবের মস্তক লক্ষ্য করে পুষ্পাঞ্জলি ছুড়লেন বটে, কিন্তু তা ততদূর উঠল না, মাঝেই ছড়িয়ে পড়ল। এই অঞ্জলি আপনাদেরকে রক্ষা করুন।

এখানে মহাদেব শিবকে দেবী পার্বতী দ্রুততার সঙ্গে অঞ্জলি প্রদান করতে গিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে আর এমন হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে সদ্য বিবাহিতা দেবীর লজ্জা। সুতরাং 'হ্লীমত্যা' শব্দটি এখানে হেতু। সুতরাং শিবকে পুষ্পাঞ্জলি সঠিকরূপে না দেওয়ার কারণরূপে ব্যঞ্জনাবশত দেবীর লজ্জা বর্ণিত হওয়ায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়েছে । এছাড়াও দ্বিতীয় অঙ্কের ১৯ এবং ২০নং শ্লোক দুটিতে এ অলঙ্কারের ব্যবহার হয়েছে। আবার প্রথম অঙ্কের ১০ নং শ্লোকে কাব্যলিঙ্গ এবং উৎপ্রেক্ষা উভয় অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।যেমন:

রাজ্যং নির্জিতশত্রু যোগ্যসচিবে ন্যস্তঃ সমস্তো ভরঃ
সম্যক্ পালনলালিতাঃ প্রশমিতাশেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ।
প্রদ্যোতস্য সুতা বসন্তসময়স্ত্বঞ্চেতি নাম্না ধৃতিং
কামঃ কামমুপৈত্বয়ং মম পুনর্মন্যে মহানুৎসবঃ।

অর্থাৎ এই উৎসব নামেই কেবল কামদেবের, কাম এই নাম নিয়েই তিনি সুখে থাকুন। রাজ্যে শত্রু পরাজিত হয়েছে, যোগ্য মন্ত্রীর কাছে সকল ভার অর্পণ করেছি। প্রজাগণের যত উপদ্রব সব দূর হয়েছে এবং তারা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে। বসন্তকাল, প্রদ্যোতের কন্যা এবং তুমি সঙ্গে আছো-মনে হচ্ছে যেন আমারই উৎসব।

এখানে বাক্যার্থহেতু কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়েছে, আবার 'মন্যে' দ্বারা কামদেবের সাথে উদয়ন রাজার সম্ভাবনা কল্পনা অর্থাৎ প্রকৃতকে অপ্রকৃতরূপে সম্ভাবনা করায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারও হয়েছে।

২। স্বভাবোক্তি অলঙ্কার:

স্বভাবোক্তির্দুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্।-(সা.দ)

অর্থাৎ সাধারণের কাছে যা বোধগম্য নয় কিন্তু গভীর পর্যালোচনা করার মাধ্যমে কবিরা যা বুঝতে পারেন এমন বিষয় বর্ণিত হলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়। নাটিকার প্রথম অঙ্কের ২ নং শ্লোকে সদ্য বিবাহিতা দেবীর শিবকে দেখে লজ্জিত হওয়া এবং স্বামীর প্রতি অনুরাগ শিব দেখেই উপলব্ধি করে আলিঙ্গন করেন। এরূপ ভাব প্রকাশের বর্ণনা করতে গিয়ে নাট্যকার স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। যেমন:

ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুতা ব্যাবর্ত্তমানা হ্রিয়া
তৈস্তৈর্বন্ধুবধূজনস্য বচনৈর্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ।
দৃষ্ট্বাগ্রে বরমাত্তসাধ্যসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতা শ্লিষ্টা শিবায়াস্তু বঃ।।

-(১/২)

এছাড়াও নাটিকার ২/২,৩; ৩/৪, ৭ নং শ্লোকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের ব্যবহার হয়েছে।

৩। শ্লেষ অলঙ্কার:

শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে।-(সা.দ)

অর্থাৎ শ্লিষ্ট পদসমূহের দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ হলে তাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে।

শ্লেষ অলঙ্কার শব্দ ও অর্থভেদে দুই ধরনের। *রত্নাবলী* নাটিকার প্রথম অঙ্কের ৩নং শ্লোকটি নান্দীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্লোকটিতে শিব-পার্বতী এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের দু'পক্ষের উক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন:

সম্প্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তো মদর্থে পুরা
তদ্যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জং বোঢুং তব।
তামেবানুনয়স্বভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহং
মুঞ্চেত্যাহ রুষা যমদ্রিতনয়া লক্ষ্মীশ্চ পায়াৎ স বঃ।।

-(১/৩)

এখানে 'মকরধ্বজ' অর্থ কামদেব ও সমুদ্র অর্থাৎ কামদেবের ভস্মিত হওয়া এবং সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব দুটি ঘটনাকেই বোঝাচ্ছে। 'বহুমার্গ' শব্দটি দ্বারা গঙ্গা ও সরস্বতীকে বুঝিয়েছে। কারণ গঙ্গা বহুদিকে প্রবাহিত হয় আবার সরস্বতী বহুবিদ্যায় পারদর্শী। কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহ দ্বারা শিব ও নারায়ণ দুজনকেই বোঝায়। কেননা কৃষ্ণ দ্বারা নারায়ণ বোঝায় আবার বিষ পান করে গলায় নীল রং ধারণ করায় শিবের আরেক নাম নীলকণ্ঠ। সুতরাং শ্লিষ্ট পদসমূহের দ্বারা একাধিক অর্থের প্রকাশ হওয়ায় শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে।

৪। অনুপ্রাস অলঙ্কার:

অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।-(সা.দ)

অর্থাৎ একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হলে এবং স্বরবর্ণের বৈসাদৃশ্য থাকলেও ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্য থাকেলে তাকে অনুপ্রাস অলঙ্কার বলে।

অনুপ্রাস শব্দালঙ্কারের অন্তর্গত। এ নাটিকার প্রথম অঙ্কের ৪নং শ্লোকটি অনুপ্রাস অলঙ্কারের উদাহরণ। যেমন:

ক্রোধেদ্ধৈর্দৃষ্টিপাতৈস্ত্রিভিরুপশমিতা বহ্নয়োঽমী ত্রয়োঽপি
ত্রাসার্ত্তা ঋত্বিজোঽধশ্চপলগণহৃতোষ্ণীষপট্টাঃ পতন্তি।
দক্ষঃ স্তৌত্যস্য পত্নী বিলপতি করুণং বিদ্রুতপ্পাপি দেবৈঃ
শংসন্নিত্যট্টহাসো মখমথনবিধৌ পাতু দেব্যৈ শিবো বঃ।।-(১/৪)

এছাড়াও অস্তব্যস্তশিরস্ত্রশস্ত্রকষণৈঃ কৃত্তোত্তমাঙ্গে ক্ষণং/ব্যূঢ়াসৃক্ সরিতি স্বনৎপ্রহরণে বর্মোদ্দলদ্বহ্নিনি।/আহূয়াজিমুখে স কোসলপতির্ভগ্নে প্রধানে বলে/একেনৈব রুমণ্বতা শরশতৈর্মত্তদ্বিপস্থো হতঃ।(৪/৬) শ্লোকটিতে অনুপ্রাস অলঙ্কাররের প্রয়োগ ঘটেছে। তবে দ্বিতীয় অঙ্কের ৭নং শ্লোকে যেমন: দুর্বারাং কুসুমশরব্যথাং বহন্ত্যা/কামিন্যা যদভিহিতং পুরঃ সখীনাম্।/তদ্ভূয়ঃ শিশুশুকসারিকাভিরুক্তং/ধন্যানাং শ্রবণপথাতিথিত্বমেতি- অনুপ্রাস এবং অর্থান্তরন্যাস উভয় অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। এখানে প্রথম চরণে ব,র; দ্বিতীয় চরণে ম,ন; তৃতীয় চরণে ভ,শু,ক এবং ন,তি ও থ দুইবার করে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে। আবার অর্থের দিক দিয়ে,এখানে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনরূপে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়েছে।

৫। উপমা অলঙ্কার:

সাম্যং বাচ্যমবৈধম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।-(সা.দ)

অর্থাৎ একই বাক্যে দুটি বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে যদি কোনো বিরুদ্ধ ধর্ম না থাকে এবং ইবাদি শব্দ দ্বারা গুণক্রিয়াদিযুক্ত সাদৃশ্যকে প্রকাশ করে তাকে উপমা অলঙ্কার বলে।

উদয়গিরিতটান্তরিতমিয়ং প্রাচী সুচয়তি দিঙ্নিশানাথম্।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী।।-(১/২৫)

নাটিকার এ শ্লোকটি উপমালঙ্কারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে বাসবদত্তার সঙ্গে অস্তমিত সূর্যের তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে 'ইব' শব্দ দ্বারা সাদৃশ্য প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়াও বিশ্রান্তবিগ্রহকথো রতিমান্ জনস্য/চিত্তে বসন্ প্রিয়বসন্তক এব সাক্ষাৎ।/পর্যুৎসুকো নিজমহোৎসবদর্শনায়/বৎসেশ্বরঃ কুসুমচাপ ইবাভ্যুপৈতি।। (১/৯) এই শ্লোকে উপমার ব্যবহার হয়েছে। এখানে কামদেবের সঙ্গে রাজার তুলনা করা হয়েছে। তবে 'বিগ্রহ','রতি','বসন্ত'-এসব শ্লিষ্ট পদসমূহ দ্বারা একাধিক অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় শ্লেষাশ্রিত উপমা অলঙ্কার হয়েছে। প্রথম অঙ্কের ২১নং শ্লোকে বাসবদত্তাকে নতুন পাতার সঙ্গে তুলনা করায় উপমালঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে। যেমন: প্রত্যগ্রমজ্জনবিশেষবির্বিক্তকান্তিঃ/কৌসুম্ভরাগরুচিরস্ফুরদংশুকান্তা।/ বিভ্রাজসে মকরকেতনমর্চয়ন্তী/বালপ্রবালবিটপিপ্রভবা লতেব।। নাটিকায় ব্যবহৃত "অস্তাপাস্তসমস্তভাসি নভসঃ পার প্রয়াতে রবা-/বাস্থানীং সময়ে সমং নৃপজনঃ সায়ন্তনে সম্পতন্।/সাম্প্রত্যেষ সরোরুহদ্যুতিমুষঃ পাদাংস্তবাসেবিতুং/প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দৃশামুদয়নস্যেন্দোরিবোদ্বীক্ষতে।।-(১/২৪) এ শ্লোকটি একটি পূর্ণোপমার উদাহরণ। এখানে 'ইন্দোরিব দৃশাং প্রীত্যুৎকর্ষকৃতঃ উদয়নস্য' চাঁদের কিরণের সঙ্গে উদয়নের তুলনা করা হয়েছে আর 'প্রীত্যুৎকর্ষ' শব্দটি সাধারণ ধর্মের সূচনা করেছে। 'ইব' শব্দটি দ্বারা সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা-/দায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।/অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাং ধ্রুবং/পশ্যন্ কোপবিপাটলদ্যুতি মুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্।।(২/৪)-নাটিকার এ শ্লোকে কামিনী নারীর সঙ্গে উদ্যানলতার তুলনা হয়েছে তবে তা শ্লেষাত্মক। সুতরাং এটি শ্লেষাশ্রিত উপমা।

লীলাবধূতপদ্মা কথয়ন্তী পক্ষপাতমধিকং নঃ।/মানসমুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা রাজহংসীব।। (২/৮)- নাটিকার এ শ্লোকটিও শ্লেষাশ্রিত উপমার উদাহরণ। এখানে রাজহংসী উপমান আর চিত্রস্থিত নারী উপমেয়। 'ইব' দ্বারা সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছে। তবে চিত্রস্থিত নারী এখানে শ্লেষাত্মক পদ যা দ্বারা সাগারিকা এবং লক্ষ্মী দুজনকে বুঝিয়েছে।

প্রাপ্তা কথমপি দৈবাৎ কণ্ঠমনীতৈব সা প্রকটরাগা।/রত্নাবলীব কান্তা মম হস্তাদ্ভ্রংশিতা ভবতা।। (২/১৮)- এখানে তুলনার পাশাপাশি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় শ্লেষাশ্রিত উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে।

কণ্ঠাশ্লেষং সমাসাদ্য তস্যাঃ প্রভ্রষ্টয়ানয়া।/তুল্যাবস্থা সখীবেয়ং তনুরাশ্বাস্যতে মম।। (৪/৪) এবং আক্ষিপ্তো জয়কুঞ্জরেণ তুরগান্নির্বর্ণয়ন বল্লভান্/সঙ্গীতধ্বনিনা হৃতঃ ক্ষিতিভৃতাং গোষ্ঠীষু তিষ্ঠন্ ক্ষণম্।/সদ্যোবিস্মৃত সিংহলেন্দ্রবিভবঃ কক্ষাপ্রদেশে প্যহো/দ্বাঃস্থেনৈব কুতূহলেন মহতা গ্রাম্যো যথাহং কৃতঃ।। (৪/১২) এ দুটি শ্লোকও উপমালঙ্কারের উদাহরণ। এখানে সিংহল রাজ্যের বিভবের সঙ্গে বৎসদেশের তুলনা করে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে।

৬। প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার:

প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্ বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ।
একো পি ধর্মঃ সামান্যো যত্র নির্দ্দিশ্যতে পৃথক্।।- (সা.দ.)

-যখন দুটি বাক্যের মধ্যে সাদৃশ্য বোঝাতে একটি সাধারণ ধর্মের প্রয়োগ হয় এবং তা উপমেয় ও উপমান উভয় পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তখন প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ:

তীব্রঃ স্মরসন্তাপো ন তথাদৌ বাধতে যথাসন্নে।
তপতি প্রাবৃষি নিতরামভ্যর্ণজলাগমো দিবসঃ।। (৩/১০)

নাটিকার এ শ্লোকটিতে বর্ষার জলাগমের তীব্রতার সঙ্গে প্রেমানলের তীব্রতার তুলনা করা হয়েছে আর এ দুটি বাক্যের সাধারণ ধর্ম হচ্ছে তীব্রতা। অতএব শ্লোকটি প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের উদাহরণ।

৭। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার:

ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।-(সা.দ)

অর্থাৎ উপমেয়ের উপমানরূপে উৎকট সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

নাট্যকার এ নাটিকায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন।

স্পৃষ্টস্ত্বয়ৈব দয়িতে স্মরপূজাব্যাপৃতেন হস্তেন।
উদ্ভিন্নাপরমৃদুতরকিসলয় ইব লক্ষ্যতে 'শোকঃ।। (১/২২)

উপরের শ্লোকটিতে উপমান হচ্ছে অশোক বৃক্ষ আর উপমেয় হচ্ছে দেবী বাসবদত্তা। এখানে রাজা উদয়ন দেবীকে মদন পূজার সময় অশোক বৃক্ষে স্পর্শ করতেই মনে করছেন আরেকটি নতুন পাতা বের হয়েছে অশোক বৃক্ষ থেকে। অর্থাৎ রাজার সংশয় তৈরি হয়েছে এবং উপমেয় দেবীকে উপমান অশোক বৃক্ষ মনে করায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

কুসুমসুকুমারমূর্ত্তির্দধতী নিয়মেন তনুতরং মধ্যম্।
আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা চাপযষ্ঠিরিব।। (১/২০)

এখানে কামদেবের ধনু হচ্ছে উপমান আর দেবী বাসবদত্তা উপমেয়। শ্লোকটিতে উপমানের প্রাধান্য বেশি হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে। তবে কুসুমসুকুমারমূর্তি বলতে দেবী এবং কামদেবের ধনুর ক্ষীণতা বোঝানো হয়েছে বলে তা শ্লেষাশ্রিত উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

আরুহ্য শৈলশিখরং ত্বদ্বদনাপহৃতকান্তিসর্বস্বঃ।
প্রতিকর্ত্তুমিবোর্ধ্বকরঃ স্থিতঃ পুরস্তান্নিশানাথঃ।। (৩/১২)

এই শ্লোকটিতেও শ্লেষাশ্রিত উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে। এখানে উপমান নিশানাথের কান্তি আর উপমেয় প্রিয়ার মুখের কান্তি-এ দুয়ের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে বলে উৎপ্রেক্ষা আর 'কান্তি' শব্দটি এখানে শ্লেষাত্মক অর্থাৎ চাঁদ ও প্রিয়ার মুখের ঔজ্জ্বল্য- দু-ই বোঝাচ্ছে বলে অলঙ্কারটি শ্লেষাশ্রিত।

এগুলো ব্যতীত নাটিকার ১/১১, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৬; ২/৫, ৯, ১০, ১১; ৩/৫; ৪/১, ২, ৫, ১৪, ১৫ নং শ্লোকগুলিতে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে।

৮। অতিশয়োক্তি অলঙ্কার:

সিদ্ধত্বে ধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।-(সা.দ)

অর্থাৎ যখন (সম্ভাবনারূপ) অধ্যবসায় সিদ্ধ (নিশ্চয়াত্মক) হয় তখন তাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে।

উদাহরণ:

ধারাযন্ত্রবিমুক্তসন্ততপয়ঃ পূরপ্লুতে সর্বতঃ
সদ্যঃ সান্দ্রবিমর্দকর্দমকৃতক্রীড়ে ক্ষণং প্রাঙ্গণে।

উদ্দামপ্রমদাকপোলনিপতৎ সিন্দুররাগারুণৈঃ
সৈন্দুরীক্রিয়তে জনেন চরণন্যাসৈঃ পুরঃ কুট্টিমম্।।

(১/১২)

রত্নাবলী নাটিকার এই শ্লোকটিতে, দরদালান সিঁদুরযুক্ত কাদা লেগে এমন অবস্থা হয়েছে যা দেখে নিশ্চিত মনে হচ্ছে দালান যেন সিঁদুর দিয়েই গড়া। এভাবে উপমেয় ও উপমানের ভেদ থাকা সত্ত্বেও তা নিশ্চয়াত্মক মনে হওয়ায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় অঙ্কের ১৫নং শ্লোকেও এই অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে।যেমন: দৃশঃ পৃথুতরীকৃতা জিতনিজাব্জপত্রত্বিষ-/শ্চতুর্ভিরপি সাধু সাধ্বিতি মুখৈঃ সমং ব্যাহৃতম্।/শিরাংসি চলিতানি বিস্ময়বশাদ্ধ্রুবং বেধসা/বিধায় ললনাং জগত্রয়ললামভূতামিমাম্।।এখানে প্রিয়ার ছবি দেখে রাজার মনে হচ্ছে তিনি ত্রিভুবনের অলঙ্কারস্বরূপ বলে সৃষ্টিকর্তা নিজেই বিস্মিত হয়ে 'সাধু', 'সাধু' বলে উঠেছিলেন। এভাবে সাগরিকাকে নিয়ে নিশ্চিতরূপে বর্ণনা করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

৯। স্মরণ অলঙ্কার:

সদৃশানুভবাদ্-বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে।-(সা.দ)

অর্থাৎ যখন কোনো দৃশ্য দেখে পূর্বানুভূত একই রকম কোনো বস্তুর স্মরণ হয় তখন তাকে স্মরণ অলঙ্কার বলে। তবে এই স্মরণের ক্ষেত্রে বস্তগত সাদৃশ্য থাকতে হয়।

রত্নাবলী নাটিকার প্রথমাঙ্কের ১৩ নং শ্লোকটি স্মরণালঙ্কারের উদাহরণ। যেমন:

অস্মিন্ প্রকীর্ণপটাবাসকৃতান্ধকারে
দৃষ্টো মনাক্মমণিবিভূষণরশ্মিজালৈঃ।
পাতালমুদ্যৎ ফণাকৃতিশৃঙ্গকো য়ং
মামদ্য সংস্মরয়তীব ভুজঙ্গলোকঃ।।

(১/১৩)

উল্লিখিত শ্লোকটিতে রাজার আবির ছড়ানো অন্ধকারাচ্ছন্নতা দেখে অন্ধকারময় পাতালভূমির স্মরণ হওয়ায় স্মরণ অলঙ্কার হয়েছে।

১০। রূপক অলঙ্কার:

রূপকং রূপিতারোপাদ্ বিষয়ে নিরপহ্নবে।-(সা.দ)

অর্থাৎ যদি উপমেয়কে নিষেধ না করে উপমেয়ের উপর উপমানের অভেদ আরোপিত হয় তাকে রূপক অলঙ্কার বলে।

রত্নাবলী নাটিকার তৃতীয় অঙ্কের ১৪ নং শ্লোকটি রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ। যেমন:

আতাম্রতামপনয়ামি বিলক্ষ এষ
লাক্ষাকৃতাং চরণয়োস্তব দেবি মূর্দ্ধা।
কোপোপরাগজনিতাস্তু মুখেন্দুবিম্বে
হর্ত্তুং ক্ষমো যদি পরং করুণা ময়ি স্যাৎ।।

(৩/১৪)

এখানে উপমেয় দেবী বাসবদত্তার মুখমণ্ডল আর উপমান হচ্ছে তাম্রবর্ণ। অথচ মুখমণ্ডলকেই তাম্রবর্ণের প্রতিবিম্ব মনে করা হয়েছে বলে এটি রূপক অলঙ্কার। অর্থাৎ এখানে উপমেয়ের উপর উপমানের অভেদ আরোপিত হয়েছে।

১১। বিভাবনা অলঙ্কার:

বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে।
উক্তানুউক্তনিমিত্তাত্বাৎ দ্বিধা সা পরিকীর্ত্তিতা।-(সা.দ)

অর্থাৎ কারণ ছাড়া কার্যের উৎপত্তি হলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। উক্ত ও অনুক্ত ভেদে বিভাবনা দুই প্রকার হতে পারে। প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়া যেহেতু কার্য সম্ভব নয় সুতরাং কার্য হওয়ার পেছনে কোনো অপ্রসিদ্ধ কারণ থাকে। এই অপ্রসিদ্ধ কারণ উক্ত হলে উক্তনিমিত্ত আর অপ্রসিদ্ধ কারণ অনুক্ত হলে অনুক্তনিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ:

মনশ্চলং প্রকৃত্যৈব দুর্লক্ষ্যঞ্চ তথাপি মে।
কামেনৈতৎ কথং বিদ্ধং সমং সর্বৈঃ শিলীমুখৈঃ।। (৩/২)

আলোচ্য নাটিকার উল্লিখিত শ্লোকটি বিভাবনা অলঙ্কারের উদাহরণ। মন স্বভাবত চঞ্চলই হয় এবং দৃষ্টির অগোচরে থাকে কিন্তু রাজার মন বিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ কারণ ছাড়াতো কার্য সম্ভব নয়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে কামদেবের বাণ দ্বারা সমানভাবে বিদ্ধ হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে রাজা প্রেমে পতিত হওয়ার জন্যই মন বিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং কামদেবের বাণ রূপ নিমিত্তই মন বিদ্ধ হওয়ার পক্ষে অপ্রসিদ্ধ কারণ। অতএব উদাহরণটি উক্তনিমিত্ত বিভাবনার অন্তর্গত।

আবার, প্রণয়বিশদাং দৃষ্টিং বক্ত্রে দদাতি নঃ শঙ্কিতা/ঘটয়তি ঘনং কণ্ঠাশ্লেষে রসান্ন পয়োধরৌ।/বহতি বহুশো গচ্ছামীতি প্রযত্নধৃতাপ্যহো/রময়তিতরাং সঙ্কেতস্থা তথাপি হি কামিনী। (৩/৯)-এই শ্লোকে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নতুনের প্রতি আকর্ষণের অপ্রসিদ্ধ কারণরূপে প্রেয়সীর দ্বিধা (অর্থাৎ সঙ্কোচ, শঙ্কা, লজ্জাদি) প্রতীত হওয়ায় বিভাবনা অলঙ্কার হয়েছে।

১২। অপহ্নুতি অলঙ্কার:

প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ।-(সা.দ)

যখন প্রকৃত অর্থাৎ উপমেয়ের নিষেধ হয়ে অন্য অর্থাৎ উপমানকে প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। সহজভাবে বলা যায়, উপমেয়কে অস্বীকার করা হচ্ছে অপহ্নুতি অলঙ্কার।

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্য পারিজাতস্য পল্লবঃ।
কুতোঽন্যথা স্রবত্যেষ স্বেদচ্ছদ্মামৃতদ্রবঃ।। (২/১৭)

আলোচ্য নাটিকার উপরি-উক্ত শ্লোকটিতে লক্ষ্মীদেবী উপমান আর সাগরিকা হচ্ছে উপমেয়। এখানে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে স্থাপন করায় অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়েছে। অর্থাৎ সাগরিকাকে দেবী লক্ষ্মীই মনে করা হয়েছে বলে এই অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে।

এছাড়াও নাটিকার তৃতীয় অঙ্কের ১১নং শ্লোকটি অপহ্নুতি অলঙ্কারের উদাহরণ। যেমন:

শীতাংশুর্মুখমুৎপলে তব দৃশৌ পদ্মানুকারৌ করৌ
রম্ভাস্তম্ভনিভং তবোরুযুগলং বাহূ মৃণালোপমৌ।
ইত্যাহ্লাদকরাখিলাঙ্গি রভসান্নিঃশঙ্কমালিঙ্গ্যমা-
মঙ্গানি ত্বমনঙ্গতাপবিধুরাণ্যেহ্যেহি নির্ব্বাপয়।।

(৩/১১)

শ্লোকটির প্রথম দুই চরণে ‘শীতাংশু’ আর প্রিয়ার মুখ; পদ্ম আর চোখ; পদ্মের মৃণাল আর বাহু, কদলীর স্তম্ভের সঙ্গে উরুযুগলের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। তাই এখানে উপমা

অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। আবার পরবর্তী দুই চরণে রাজার কামানলজনিত উত্তাপ দূর করতে প্রেয়সীর আলিঙ্গনকেই আশ্রয় কল্পনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে উপমেয়কে নিষেধ করে উপমানকে স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে অপহ্নুতি অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে।

১৩। সমাসোক্তি অলঙ্কার:

সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ।।-(সা.দ)

অর্থাৎ সমান কার্য, লিঙ্গ বা বিশেষণের দ্বারা যদি কোনো বর্ণনীয় পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার আরোপিত হয় তখন সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়।

যাতোঽস্মি পদ্মনয়নে সময়ো মমৈষ
সুপ্তা ময়ৈব ভবতী প্রতিবোধনীয়া।
প্রত্যায়নাময়মিতীব সরোরুহিণ্যাঃ
সূর্যোস্তমস্তকনিবিষ্টকরঃ করোতি।। (৩/৬)

উপরি-উক্ত শ্লোকটিতে রাজা আর তার প্রেয়সীর মধ্যে অপ্রস্তুত পদার্থ হচ্ছে অস্তমিত সূর্য। একারণে এটি সমাসোক্তি অলঙ্কার। তবে সূর্যের সঙ্গে রাজার তুলনার ক্ষেত্রে রাজাকেই সূর্য মনে করায় সংশয় সৃষ্টি হয়েছে বলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারেরও প্রয়োগ হয়েছে।

১৪। প্রতীপ অলঙ্কার:

প্রসিদ্ধস্যোমান্যস্যোপমেয়ত্ব প্রকল্পনম্।
নিষ্ফলত্বাভিধানং বা প্রতীপমিতি কথ্যতে।।-(সা.দ)

অর্থাৎ উপমান রূপ কোনো বস্তুকে যদি উপমেয় রূপে কল্পনা করা হয় তবে তা প্রতীপ অলঙ্কার হয়। আবার উপমানের নিষ্ফলতা কল্পনা করলেও প্রতীপ অলঙ্কার হয়। আলোচ্য নাটিকাটির তৃতীয় অঙ্কের ১৩নং শ্লোকটিতে উপমানের নিষ্ফলতা প্রকাশ পাওয়ায় প্রতীপ অলঙ্কার হয়েছে। যেমন:

কিং পদ্মস্য রুচঃ ন হন্তি নয়নানন্দং বিধত্তে ন কিং
বৃদ্ধিং বা ঝসকেতনস্য কুরুতে নালোকমাত্রেণ কিম্।
বক্ত্রেন্দো তব সত্যয়ং যদপরঃ শীতাংশুরমভ্যুদ্গতো
দর্পঃ স্যাদমৃতেন চেদিহ তদপ্যস্ত্যেব বিম্বাধরে।। (৩/১৩)

-এই চন্দ্র যেন উদিত হতে গিয়ে স্পষ্টই নিজের জড়ত্ব প্রকাশ করলো। কেননা, তোমার মুখচন্দ্র থাকতে পদ্মের রূপের লোপ হয় নাকি, মানুষের কি চোখ জুড়ায়, দর্শন মাত্রই মীনকেতনের বৃদ্ধি হয় নাকি? তবে আর এই দ্বিতীয় চন্দ্র আজ কেন উঠলো, বলো তো? যদি বলো চন্দ্রে অমৃত আছে, তবে এ দর্পভরে উঠেছে, কিন্তু তাও এই বিম্বাধরে আছে।

এখানে উপমেয় বাসবদত্তার মুখকেই চন্দ্র ভেবে চন্দ্রকেই দ্বিতীয় চন্দ্র উল্লেখ করায় উপমানের নিষ্ফলতা প্রকাশ পেয়েছে।অতএব এটি প্রতীপ অলঙ্কার।

১৫। অসঙ্গতি অলঙ্কার:

কার্যকারণয়োর্ভিন্নদেশতায়ামসঙ্গতি।-(সা.দ)

অর্থাৎ কার্য ও কারণের মধ্যে ভিন্ন অধিকরণ যুক্ত হলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। আলোচ্য নাটিকার তৃতীয় অঙ্কের ১৬নং শ্লোকটি অসঙ্গতি অলঙ্কারের উদাহরণ। যেমন:

মম কণ্ঠগতাঃ প্রাণাঃ পাশে কণ্ঠগতে তব।
অতঃ স্বার্থঃ প্রযত্নো’য়ং ত্যজ্যতাং সাহসং প্রিয়ে।।-(৩/১৬)

এখানে বলা হয়েছে, সাগরিকা নিজের গলায় ফাঁস দিলেও প্রাণ চলে যাচ্ছে রাজার। সুতরাং ভিন্ন অধিকরণ যুক্ত হওয়ায় অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়েছে।

১৬। পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার:

পর্য্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীয়তে।

অর্থাৎ যখন কোনো উহ্য বস্তু কোনো উক্তির বিশেষ ভঙ্গির সাহায্যে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তখন তাকে পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়। এ নাটিকায় নাট্যকার অলমলমতিমাত্রং সাহসেনামুনা তে/ত্বরিতমপি বিমুঞ্চ ত্বং লতাপাশমেতম্।/চলিতমপি নিরোদ্ধুং জীবিতং জীবিতেশে/ক্ষণমিহ মম কণ্ঠে বাহুপাশং নিধেহি।।(৩/১৭) এবং প্রাণাঃ পরিত্যজত কামমদক্ষিণং মাং/রে দক্ষিণা ভবত মদ্বচনং কুরুধ্বম্।/শীঘ্রং ন যাত যদি তন্মুষিতাঃ নূনং/যাতা সুদূরমধুনা গজগামিনী সা।।(৪/৩)-এ দুটি শ্লোকে পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন।দুটি শ্লোকেই রাজা অভিব্যক্তিতে তাঁর অব্যক্ত প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমটিতে সাগরিকার গলা থেকে লতাপাশ সরানোর ছলে স্পর্শসুখ পেয়েছেন আর দ্বিতীয়টিতে সাগরিকা বেঁচে নেই ভেবে নিজের প্রাণ চলে যাওয়ার প্রার্থনা করছেন। কারণ সাগরিকা ব্যতীত রাজার জীবন বৃথা। এভাবে আচরণের দ্বারা উহ্য বস্তু স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাওয়ায় পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার হয়েছে।

আলোচনার সমাপ্তিতে বলা যায়, অলঙ্কার কাব্যের উৎকর্ষতা সাধন করে। নিপুণ কবি শ্রীহর্ষ তাঁর চারাঙ্কবিশিষ্ট *রত্নাবলী* নাটিকায় মোট ষোলোটি অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। আর এসব অলঙ্কার ব্যবহারে নাটিকাটি পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়েছে তো বটেই; কাব্যরচনাকে করেছে মাধুর্যপূর্ণ এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত।

তথ্যসূত্র:

১। অধ্যাপক, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৭৬, *সাহিত্যদর্পণঃ*, গঙ্গাধর লেন, পৃ-৮৫৩
(উল্লেখ্য, এখানে ব্যবহৃত অলঙ্কারসমূহের সংজ্ঞা এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে)

২। Saradaranjan Ray, Edited by, 1969, *Ratnavali*, Calcutta, p-1
(উল্লেখ্য, এখানে ব্যবহৃত নাটিকার প্রতিটি শ্লোক এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে)

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

১। ড সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র,* নবপত্র প্রকাশন,২০১৪, কলকাতা

২। ড ঝর্ণা ভট্টাচার্য, অলংকারপ্রদীপ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৪, কলকাতা-৬

৩। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রতত্ত্ব ও সমীক্ষা,১ম প্রকাশ, ২০১২, কলকাতা

৪। নরেন বিশ্বাস সম্পাদিত, অলঙ্কার অন্বেষা, ৩য় মুদ্রণ, ২০১০, ঢাকা

৫। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য-জিজ্ঞাসা, ১৩৮৭, বিশ্বভারতী

৬। শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলংকার চন্দ্রিকা, ১৩৬৩, কলিকাতা

৭। শ্রী পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ছন্দ মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা, ২০০৪, কলিকাতা।

কঙ্কাবতী : সংরূপের সন্ধানে

অরুণাভ মিত্র
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চারুচন্দ্র কলেজ, কলকাতা

ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজি নভেলটিই গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষ, বিদেশি ভাষা বলতে ইংরেজি ভাষা ও বিদেশি সাহিত্য বলতে ইংরেজি সাহিত্যকেই বোঝে। পরাধীন ভারতের সমগ্র চেতনাকে গ্রাস করে নেওয়া এই ব্রিটিশ মানসিকতা তাকে পাশ্চাত্যের অন্যান্য ভাষার (ফরাসি, জার্মান) সাহিত্য থেকে সরিয়ে রেখেছে। প্রাচ্য ঐতিহ্যের অবিশৃঙ্খল আটপৌরে গল্পকথনরীতি থেকে সরে এসে, পাশ্চাত্য যুক্তি-বুদ্ধির মোহে আচ্ছন্ন উনিশ শতক স্বভাবতই রোমান্সের দুঃসাহসিক অতিবর্ণনের পথ ছেড়ে বাস্তবানুগ হয়। কিন্তু এই নভেল-আচ্ছন্ন বাঙালি পাঠক মহলে মূর্তিমান বিদ্রোহের ন্যায় **১৮৯২** সালে প্রথম প্রকাশিত হয় **ঔপন্যাসিক ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কঙ্কাবতী*** উপন্যাস। উনিশ শতকের শেষার্ধে অথবা বিংশ শতকের দোরগোড়ায় ত্রৈলোক্যনাথ সেই প্রাচ্য কথকতার ধারাকেই যেন পুনরুজ্জীবিত করলেন এক নতুন আঙ্গিকে। আমাদের ‘কথাসরিতসাগর’, ‘হুতোম পেঁচার নকশা’, ‘নববাবুবিলাস’, ‘নববিবিবিলাস’, ‘কলিকাতা কমলালয়’ প্রভৃতি ব্যঙ্গ কথকতারই যেন সঙ্গত উত্তরাধিকার বহন করে ***কঙ্কাবতী*** উপন্যাসটি।

উপন্যাস প্রকাশের পরের বছর (১৮৯৩ সাল) সবচেয়ে বড়ো গোল বাধল সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত (ফাল্গুন, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক ভূমিকাকে কেন্দ্র করে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সিদ্ধান্তগুলি হল—

> **প্রথমত,** উপন্যাসের প্রথম ভাগ বাস্তব ঘটনা সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় ভাগ **‘অসম্ভব, অমূলক অদ্ভুত রসের’**[১] **‘অদ্ভুত রূপকথা’**[২]। রূপকথাকে **‘রোগশয্যার স্বপ্ন’**[৩] বলে সরল সমাপতন করাটা ঔপন্যাসিকের উচিত হয়নি। কারণ স্বপ্নের জগত নির্মিত হয় স্বপ্নদ্রষ্টার দৃষ্টিগোচরতার ভিত্তিতে। উপাখ্যানটিতে সেই সূত্র মানা হয়নি।
>
> **দ্বিতীয়ত,** উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশ **‘অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেগ’**[৪]-এর কারণ হয়।
>
> **তৃতীয়ত,** উপাখ্যানটির উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষের **‘বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন’**[৫] করা।

আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন **১৮৯৩**সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বত্রিশ বছর বয়সি এক স্বনামধন্য কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর কবিপ্রতিভাকে অনুজ কবিদের একপ্রকার এড়িয়ে যাওয়াটা অসাধ্য বোধ হচ্ছে। এমন সময় এই সমালোচনা ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন জনসমাজে গ্রহণযোগ্যতাকে যথেষ্ঠই বিড়ম্বিত করেছে।

‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসের প্রথম ভাগটি তৎকালীন সময়ের একটি গল্প বলে, যাকে বাস্তবোচিত বোধহয়। দ্বিতীয় ভাগের গল্পের সঙ্গে বাস্তবের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। উপস্থাপনার ভঙ্গিও বাস্তব সম্মত নয়। প্রশ্ন হলো, ‘কঙ্কাবতী’ কতটা বাস্তব (প্রথম ভাগ) এবং কতটা অবাস্তব/রূপকথা (দ্বিতীয় ভাগ)। তাই উপন্যাসটিকে সম্পূর্ণত বাস্তব বা অবাস্তব বলে সিদ্ধান্ত করাটা মুশকিল। কারণ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুযায়ী যদি এটিকে রূপকথা ধরা হয় তাহলে প্রথম ভাগে রূপকথা নেই।

দ্বিতীয় ভাগটি ত্রৈলোক্যনাথের মতে বিকারগ্রস্ত কঙ্কাবতীর স্বপ্ন। সেখানে, রবীন্দ্রনাথ বলেন, তা স্বপ্ন নয়, রূপকথা। তাঁর যুক্তিতে, স্বপ্ন সৃষ্টিছাড়া ও অসংলগ্ন। রূপকথা সংলগ্ন ও গল্পসূত্রযুক্ত। স্বপ্নদর্শী লোকের আয়ত্তগম্য বাস্তব থেকেই স্বপ্নের নির্মাণ। কিন্তু স্বপ্নে বিচ্যুতি থাকবেই এবং স্বপ্নে সেই প্রতীতিই যথেষ্ট আয়ত্তগম্য না হতে পারে। স্বপ্ন তো আর ডায়েরি বা আত্মজীবনী নয় যে তা স্বপ্নদর্শী লোকের দর্শিত বাস্তব থেকেই হবে। তাই, কঙ্কাবতীর স্বপ্নে থাকা সমস্ত প্রতীকের সারি (অচেতন-সম্ভূত) তার বাস্তবে তার দেখা সূত্র বহন না করাটাই স্বাভাবিক।

উনিশ শতকের সাহিত্যরচনার অন্যতম আদর্শ হলো, যুক্তিনিষ্ঠতা ও কার্যকারণসিদ্ধতা। তাই, রূপকথা ও উপন্যাসের (যা উনিশ শতকের যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশ মাধ্যম) এই অদ্ভুত মিশেলেই রবীন্দ্রনাথের তথা উনিশ শতকীয় বিদগ্ধ ঔপনিবেশিক সমাজের মান্য বিশ্বাসের ঘোরতর আপত্তি। একি বাপু! হয় উপন্যাস লেখো, নয় রূপকথা। এমন রূপকথাধর্মী উপন্যাসের ন্যায় জগাখিচুড়ি সংরূপ লেখা সাহিত্যধর্ম মান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বিরুদ্ধতা তাই সংস্কৃতির **পারস্পরিক অ-বোধগম্যতা**।

'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে ঔপন্যাসিক ত্রৈলোক্যনাথ যে ধরণের রূপকচিহ্নিত জগতের নির্মাণ করলেন তা তাঁর বাল্যজীবনের সংকেতভাষা অভ্যাসেরই পরিণত রূপ। তিনি যে রূপকথা ও কল্প-মিথের নির্মাণ করেন উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে তা মূলতঃ পাঠকের কাছে সমসাময়িক বাস্তবের বিচ্যুতিপূর্ণ নকশাকে তুলে ধরে। 'কঙ্কাবতী'র মাধ্যমে তিনি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের যথাযথ ছবি আঁকতে চেয়েছেন। যেকোনো ঔপন্যাসিকের কাছে তাঁর সমরৈখিক বাস্তব (synchronic) সর্বদা বিশৃঙ্খলরূপেই ধরা দেয়। যদি তিনি তাকে হুবহু তলে ধরেন তবে সেখানে অদ্ভুত, ভঙ্গুর, বিশৃঙ্খল, টুকরো ছবি মিলবে; বাস্তব নিয়ে গল্প বানালে তা সর্বদাই গল্প হবে, বাস্তব হবে না। একদিকে উপন্যাস, অন্যদিকে নকশা-মিথ-রূপকথার এক জটিল সংরূপ লাভ করেছে গ্রন্থটি। কারণ, 'কঙ্কাবতী' রচনার সময় ত্রৈলোক্যনাথ বোধহয় গুরুত্ব দিয়েছেন শুধুই তাঁর রূপচিহ্নিত জগৎ নির্মাণে—তাই যে ধরণের সংরূপ যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুই গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম আপত্তি হল, 'কঙ্কাবতী'তে ঔপন্যাসিক রূপকথাকে 'স্বপ্ন' বলে চালাবার চালাকি করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধটি অদ্ভুত, অসম্ভব, অমূলক রূপকথা। ১৮৬৫ সালে লুইস ক্যারেলের **'Alice's Adventures in Wonderland'** উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, যা একপ্রকার যথাযথ স্বপ্নের মান্য উদাহরণ বলেই রবীন্দ্রনাথের ধারণা। ১৮৮৬ সালে ত্রৈলোক্যনাথ বিলেত যান এবং ইউরোপের বহু দেশ ঘোরেন। ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে সেই সময় তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার রূপকথার সংরূপ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন বলেই আমরা অনুমান করতে পারি। তাই, মুক্তদেশের শিশু-নাগরিক অ্যালিস গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুমিয়ে এক নিষ্পাপ স্বপ্ন দেখে। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক সমাজের কিম্ভূতকিমাচার শাসনকাঠামোয় নিষ্পেষিত কঙ্কাবতী স্বপ্ন দেখে জ্বরবিকারের ঘোরে প্রলাপ বকতে বকতে। অ্যালিস সুস্থ, কঙ্কাবতী অসুস্থ। ত্রৈলোক্যনাথ কঙ্কাবতীর এই জ্বরের অধ্যায়টির নাম দেন 'বিকার'। এটি ঔপনিবেশিক অসংলগ্ন, অমূলক, অসম্ভব বাস্তবের বিকার। স্বপ্ন সর্বদা স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির গোচরতায় ঘটে। খর্ব্বুরের মন্ত্রপূত সর্ষেদানা কীভাবে ব্যাঙকে ডেকে আনলো তা কঙ্কাবতীর চোখের সামনে ঘটেনি তাই এটি স্বপ্ন নয়। আসলে স্বপ্ন কঙ্কাবতীর, যার সর্বজ্ঞ-কথক ত্রৈলোক্যনাথ।

'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের প্রথম ভাগ বাস্তব ও দ্বিতীয় ভাগ অবাস্তব বলেই বোধহয়। বিশেষতঃ দ্বিতীয় ভাগে কঙ্কাবতীর জ্বরবিকারে অবাস্তব জগতের নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক তা

হল— মাছেদের, ভূত-কোম্পানীর, ব্যাঙ-সাহেবের, মশাপ্রভুর ও আকাশের চাঁদের জগত। উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে অবাস্তব ঘটনা থেকে উদ্ভুত অদ্ভুত রসের সহযোগী হয়েছে হাস্যরস। অসঙ্গতি থেকে হাস্যের উৎপত্তি তা সর্বজনবিদিত। সামাজিক অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়াই এই সকল জগতের উৎপত্তির মূল কারণ তা বলা চলে। রূপকথা পরিবর্তে তাই আমরা এই অংশকে রূপক-কথাও বলতে পারি। বাস্তবের জগতে যে অর্থের জন্য কঙ্কাবতীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে, মাছেদের জগতে সেই অর্থেরই প্রাচুর্য রয়েছে। রূপক-কথার জগতে কঙ্কাবতীর সকল ইচ্ছাই পূরণ হয়। বাঘ-রূপী খেতু প্রচুর অর্থ দিয়ে তনুরায়ের মন তুষ্ঠ করে কঙ্কাবতীকে বিয়ে করে। অন্যদিকে, খেতুর সঙ্গে ভূতেদের কথোপকথন হয় যারা ইংরেজদের উপর ক্ষুব্ধ কারণ ইংরেজরা ভূত মানে না। ব্রিটিশ উপনিবেশে যুক্তিবাদ চর্চার ধারায় বাঙলাদেশ থেকে বিতারিত হয় প্রাচ্যের ভূতেরা (সংস্কার-লোককথা-উপকথার ধারা)। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর অন্য একটি গ্রন্থে ভূতেদের উৎপত্তি নিয়ে বলেন, অন্ধকার জমে গিয়ে ভূতেদের জন্ম হয়। এই অন্ধকার হলো কুসংস্কার, অশিক্ষার অন্ধকার। অথচ এই নবজাগরণের আলোর ধ্বজাধারী অনেক যুক্তিবাদী ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকেই পাশ্চাত্য থেকে আসা থিওসফিস্টদের প্রেতচর্চার সঙ্গে জড়িত। খেতুর শরীরে নাকেশ্বরীর এসে কথা বলাও এই থিওসফিস্টদের প্রেতচর্চার আদল নয় কি? তাই সমাজের কোথাও না কোথাও যুক্তিবাদ ও অযৌক্তিকতা যেন সমান্তরাল রেখা ধরে চলে। কেউ কাউকে স্বীকার করে না। অথচ এক অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। রক্ষণশীল, প্রাচীনপন্থী 'ভূত-কোম্পানী' বাজারচলতি ধারণাকে ধরে তাদের কোম্পানীর নাম রাখে 'স্কল স্কেলিটন অ্যান্ড কোং'। উনিশ শতকের বহু বাঙালী ব্যবসায়ী যেমন নিজেরদের দোকানের ইংরেজি নাম রাখেন ব্যবস্যার পণ্যচিহ্নের (branding) জন্য। যেমন— দ্বারকানাথ ঘোষ হারমোনিয়াম বিক্রির জন্য দোকানের নাম পালটে রাখেন 'Dwarkin & Sons'। যার বিজ্ঞাপনপত্রটি নির্মাণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এটিও একধরণের ঔপনিবেশিক চেতনাদুষ্টতা।

ব্যাঙ-সাহেবের মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকের মেকী সাহেবীয়ানার ভেকধারী অশিক্ষিত মুৎসুদ্দী সম্প্রদায়ের বঙ্গসন্তানদেরকে ঔপন্যাসিক তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গে জর্জরিত করেছেন। গুটিকয়েক ইংরেজী শব্দজ্ঞান ও বোলচাল শিখে পাড়াগাঁয়ের ব্যাঙ, সাহেব সেজে নিজের নাম রেখেছে মিস্টার গামিশ। সাহেবী পোষাক পড়ে, খট্‌খট্ উল্টোপাল্টা ইংরেজী বলে নিজের কদর বাড়াতে চায়। কিন্তু এই অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতিই তাঁকে আরো বেশি হাস্যকর ও অসম্ভ্রমজনক করে তোলে। ট্রেনে চড়ার ক্ষেত্রেও তার স্বপ্ন সেই তৃতীয় শ্রেণীর ফাঁকা কামরায় যাওয়াতেই আটকে থাকে। কেউ তাঁকে স্বজাতীয় 'ব্যাঙ' নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়। কেউ তার কাছে না থাকলে তবেই সে বাংলায় কথা বলে। উনিশ শতকে ইংরেজদের সাথে ব্যবসা করে হঠাৎ বড়লোক অশিক্ষিত মুৎসুদ্দি সম্প্রদায়ের খাঁটি রূপক-চরিত্র হল ব্যাঙ সাহেব। নক্‌শাসাহিত্যে এই ধরণের বহু চরিত্রের উদাহরণ মেলে।

মশাপ্রভুদের জগতের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের ঔপনিবেশিক বাজার দখলের যে ইউরোপীয় রাজনীতিতে সারা বিশ্ব শোষিত তারই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে—

> "শুন মনুষ্য-শাবক, এই ভারতে যত নর-নারী দেখিতে পাও, ইহারা সকলেই মশাদিগের সম্পত্তি। যে মশা মহাশয় তোমার অধিকারী তাঁহার নিকট হইতে বোধহয় তুমি পলাইয়া আসিয়াছ...এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ভারতবাসীদিগের যাওয়া উচিত নয়। ভারতবাসীদিগের আপন আপন গ্রামে বসিয়া থাকা। তাহা করিলে মশাদিগের সম্পত্তি লইয়া আর বিবাদ হয় না।"[৬]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেমন উপনিবেশের মানুষদের নিজেদের সম্পত্তি বলে মনে করতো তেমনই দীর্ঘশুণ্ড নামক মশাটি তাদের খাদ্যের আধার ভারতবর্ষীয় মানুষদের দেশভ্রমণ ও সমুদ্র বা পর্বত উল্লঙ্ঘনের বিরোধিতা করেছে। কারণ তা করলে ভারতবাসী শিক্ষিত হবে এবং তাদের শাসন মানবে না। মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত শুরু করলে মশকদের রক্তভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য বিঘ্নিত হয়। প্রাচীন ভারতে নৌবানিজ্যের প্রসঙ্গ বিভিন্ন গ্রন্থে মেলে। অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ধীরে ধীরে সমুদ্র বা জলবানিজ্য দুধর্ষ দস্যু পারসিকদের হস্তগত হতে থাকে। যার ফলে জলপথে বহির্বানিজ্য বন্ধ হয়। তাছাড়া বণিক ইংরেজরা জলপথেই বাংলায় প্রবেশ করে বাংলা দখল করে। তাই নদীমাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও জলবানিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে একধরণের অন্ধসংস্কার উনিশ শতকের হিন্দু মনে সঞ্চারিত ছিল। উপন্যাসের প্রথম ভাগে তনু রায় তাঁর মায়ের সমুদ্রদর্শনের ইচ্ছাকে শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা নাকচ করে, তেমনই মশাকুল ওরফে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তিও খাদ্যরূপ ভারতবর্ষীয়দের কালাপানি কুসংস্কারকে সযতনে লালন করতো। ঔপন্যাসিক ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিদেশ থেকে সমুদ্র যাত্রা করে ফেরার পর আত্মীয় জয়পুরের দেওয়ান কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় **'প্রায়শ্চিত্ত ও পুনঃযজ্ঞোপবীত'**[৭] ধারণ করেন।

খর্ব্বুর মহারাজের স্ত্রীকর্তৃক নিপীড়নের যে ছবি মেলে তা উনিশ শতকের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ। সে যুগে মেয়েরা বেশি নিপীড়িত, পুরুষের তুলনায়। খর্ব্বুরের মতন মহান শক্তিশালী তান্ত্রিকও যে মশাদের নিয়ন্ত্রনাধীন এ বিষয়টি খুবই আশ্চর্যের। আকাশে চাঁদের জগত চাঁদ, আকাশের দুর্দান্ত সেপাই ও নক্ষত্রের বউদের নিয়েই তৈরি। কঙ্কাবতী চাঁদের শিকড় কাটতে এসেছে শুনে সেই সিপাই নিজেই ভয়ে কাতর হয়ে প্রায় বাস্তবের ভীত-সন্ত্রস্ত আরক্ষাবাহিনীর সেরেই বলে—

> "রেখে দাও তোমার (চাঁদের) মহিনা। না হয়য় কর্ম ছাড়িয়া দিব; পৃথিবীতে গিয়া কনস্টেবিলি করিয়া খাইব...সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় বটে, তা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় আমি তফাতে থাকিব। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব হইয়া যাইলে দাঙ্গাবাজেরা আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেলে, তখন আমি রাস্তার দু-চারিজন ভাল মানুষ ধরিয়া, কাছারিতে নিয়া হাজির করিব।"[৮]

আকাশের সেপাই বীরপুরুষ হলেও কানে কালা। তাঁর বীরপনা নিরীহ নিরপরাধীদের উপরেই বর্ষিত হয়। এই সেপাই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের সুবিধাবাদী, অত্যাচারী দেশীয় সেপাইদের কথাই মনে পড়ায়, যাদের বলে বলীয়ান ইংরেজ সাম্রাজ্য ভারতে দুশো বছর রাজত্ব করতে সক্ষম হয়েছে।

তাই দেখাই যাচ্ছে যে, উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগটিকে যতই অবাস্তব বোধ হোক না কেন, সে বাস্তবেরই রূপক। উপন্যাসের শুরুতেই শিকড় মাথায় দিয়ে বাঘে রূপান্তরিত হওয়ার যে কিংবদন্তি শোনা যায়, কঙ্কাবতীর স্বপ্নে সেই প্রতীকই বিবাহসমস্যা সমাধানের মূলসূত্র হিসেবে দেখা দিয়েছে। আবার অন্যদিকে বাঘ হওয়ার প্রসঙ্গই কঙ্কাবতীর জ্বরবিকারের পর্যায়ে সংকট বয়ে নিয়ে আসে এবং বহুচেষ্টাতেও খেতুকে বাঁচানো যায় না। বাস্তবের সংকট স্বপ্নে পূরিত হয়, রূপকথায় সম্পূর্ণতা লাভ করে। অথচ গোল বাধে তখন যখন দেখা যায় রূপকথাটি খেতুর মৃত্যুর মতো বিয়োগান্তক ঘটনায় শেষ হয়। তাই, অবাস্তবের জগতে বাস্তবের রূপক, বিয়োগান্তক রূপকথা—একার্থে ***কঙ্কাবতীর*** অবাস্তব ও রূপকথার রাবীন্দ্রিক তকমার তীব্র বিরোধিতা করে।

কঙ্কাবতী উপন্যাসের শেষটা খুব গোলমেলে। দ্বিতীয় ভাগের অবাস্তব বা ইচ্ছেপূরণের দেশে 'রূপকথা'র গল্পের শেষে খেতুর মৃত্যু এবং প্রথম ভাগের পূর্বসূত্রানুযায়ী কঙ্কাবতীর 'পরিশেষ' অংশে সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের যাবতীয় অসংগতি, বিরোধ, বিপত্তি ম্যাজিকের মতোই যোগ্য কারণ ছাড়া ভ্যানিশ হয়ে যায়। তাই, প্রথম ভাগের বাস্তবের রূপকথামূলক পরিণতি ও দ্বিতীয় ভাগের অবাস্তবের বাস্তবমূলক পরিণতি—উনিশ শতকের কোনো সাহিত্যসংরূপেই মেলে না। দুটি ভাগের জোড়কলমের তত্ত্বরূপ ঔপন্যাসিক ত্রৈলোক্যনাথ 'পরিশেষ' অংশে নিরঞ্জনের সংলাপে ব্যক্ত করেছেন—

> "কি আশ্চর্য স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন বা বিকারের প্রলাপ বলিয়া তুমি উপহাস করিও না। স্বপ্ন কি নয়, তাহাই বুঝিতে পারি না। এই আমাদের জীবন, আমাদের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, সকলই স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়...কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া স্বপ্ন-সৃজিত কাল্পনিক জীবের ন্যায় আমরা সকলেই এই সংসারে যেন বিচরণ করিতেছি...সমুদয় বাহ্যজগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়-কল্পিত, কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগৎও সেইরূপ কঙ্কাবতীর সুষুপ্ত ইন্দ্রিয়-কল্পিত। দুই জগতে বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ নাই।"[৯]

কঙ্কাবতীর জ্বরবিকার ঔপনিবেশিক সমাজের উপনিবেশ মোহগ্রস্ততার বিকার। যে বিকারে ঠিক-বেঠিক বিচার মুশকিল। ব্রিটিশ শাসন ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বাংলাদেশের মানুষের চেতনায় যে ধরণের আধিপত্য কায়েম করে রেখেছে—সেখান থেকে মুক্তিদান করা ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রচলিত গল্পবয়ানের যে ঢঙে আখ্যানটি শেষ করেন তাতেই সেই সংরূপগত অমোঘ প্রশ্নটি জন্মায়। কিন্তু ***কঙ্কাবতী*** সম্পূর্ণ রূপকথা বা বাস্তবকথা কোনোটিই নয়। সমকালীন ঔপনিবেসিক সমাজে যা ঘটছে এবং যা ঘটতে পারতো তারই প্রচেষ্টা করেছেন আখ্যানকার। এই প্রচেষ্টায় যখন যে সংরূপ বক্তব্যের প্রয়োজনে বোধ হয়েছে গ্রহণ করেছেন তিনি। তাই কঙ্কাবতীকে বাস্তবের রূপক-কথা বলা চলে, যেখানে সমসাময়িক সংকট রূপকায়িত হয়েছে।

বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের অন্যতম পথপ্রদর্শক হলেন রূশ আঙ্গিকবাদী সমালোচক ভ্লাদিমির প্রপ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Morphology of the Folktale' (1928)-এ রুশ লোককথার ভিত্তিতে লোককথার ব্যাকরণ নির্মাণে সচেষ্ট হন। সেখানে লোককথার চরিত্রের ভূমিকা-উপযোগের (role-function) বিন্যাস (permutation) বিচার করে মোট একত্রিশটি উপযোগের কথা বলেন। প্রপের এই মডেলেরই সুন্দর বিন্যাস নির্মাণ করে আলগিরদাস জুলিয়েন গ্রিমাস তাঁর 'Semantique Structurale: Recherche de methode' প্রবন্ধে তিনজোড়া অ্যাক্ট্যান্ট (Actant)-এর কথা বলেন—

১. অভিলাষ, অনুসন্ধান বা লক্ষ্য(কর্তা/কর্ম)
২. যোগাযোগ মাধ্যম(প্রেরক-প্রাপক)
৩. সহায়তা বা বিরোধিতা(সহায়তা/প্রতিবন্ধকতা)

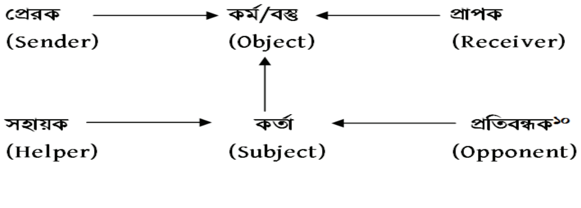

উপরোক্ত মডেলের মধ্যে দিয়ে ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসটির আখ্যানকাঠামোকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—

প্রথম ভাগ:

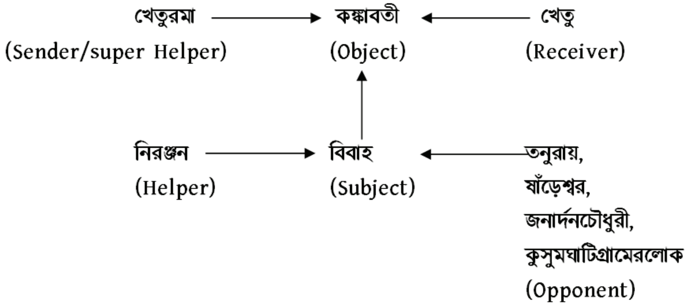

দ্বিতীয় ভাগ:

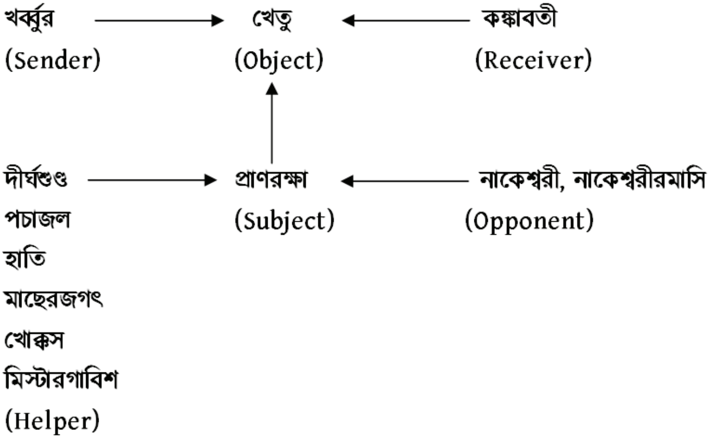

উপন্যাসের উভয়ভাগেই কঙ্কাবতী অসহায়। দ্বিতীয় ভাগে খেতুর প্রাণরক্ষার জন্য কঙ্কাবতীর অসহায়ত্ব প্রকটিত। কঙ্কাবতী কোমল, অসুরক্ষিত—তাই পাঠকের করুণা তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছে, খর্ব্বুরের উগ্রচণ্ডা স্ত্রীর ক্ষেত্রে নয়। প্রথম ভাগে কঙ্কাবতীর অসহায়ত্ব ও কোমলতা প্রকট হয়েছে তনুরায়ের ক্রুর, নিষ্ঠুর, ধূর্ত মানসিকতায়। উপরের দুটি মডেলে দেখা যায়, যেটিতে প্রতিপক্ষ বেশি সে গল্পেই পরিণতি কঙ্কাবতীর পক্ষে এবং দ্বিতীয়টিতে সহায়ক বেশি হলেও সে খেতুর প্রাণরক্ষা করতে অক্ষম হয়।

কঙ্কাবতী উপন্যাসের ‘কুসুমঘাটি’ পরিচ্ছেদের বিবরণে লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তির ইঙ্গিত মেলে। শিকড় মাথায় দিয়ে বাঘ হওয়ার কিংবদন্তির মোটিফটি বারবার ফিরে আসে। মশকবাহিনীর দীর্ঘশুণ্ড সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের কথাই মনে করায়। তেমনই কাঁকড়াচন্দ্র, মিস্টার গামিশ নিজেদের বোঁচা ও থ্যাবড়া নাক নিয়েই চিন্তিত। দেশজ খর্ব না-ধারী সকলেরই আর্যবংশজ

ও শাসকশ্রেণীর ন্যায় টিকালো নাকের সম্ভ্রমলাভের বাসনা, ঔপনিবেশিক জনগণের নৃতাত্ত্বিক চেতনা-সংকটকেই চিহ্নিত করে। তাই এমন বহুতত্ত্বউদ্রেককারী আলোচ্য উপন্যাসটি শুধুমাত্র শিশু-কিশোরপাঠ্য—এমন মতামত একদেশদর্শী সংস্কারদুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল সমালোচনা ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্যমান্য সংরূপের প্রতিস্পর্ধী যে মূল দেশজ কথকতার ধারার এই ধরণের সাহিত্যকে আরো শুষ্ক করেছে, নাহলে আমরা ত্রৈলোক্যনাথের মতো আরো বিচিত্র পরীক্ষা-প্রয়াসী সাহিত্যিক পেতাম। এই ঘটনা আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিরাট ক্ষতি।

তথ্যসূত্র:

১. *কঙ্কাবতী,* ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ২০০৯, কলকাতা: সুজন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, পৃ-৫
২. তদেব, পৃ-৫
৩. তদেব, পৃ-৫
৪. তদেব, পৃ-৫
৫. তদেব, পৃ-৬
৬. তদেব, পৃ-১৫১-১৫২
৭. *ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌষ ১৩৫০, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ-২৩
৮. *কঙ্কাবতী,* ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ২০০৯, কলকাতা: সুজন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, পৃ-১৭৭
৯. তদেব, পৃ-১৯৫-১৯৬
১০. *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস,* সম্রাট দত্ত, ২০১০, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, পৃ-৩৭-৩৮

ঋণস্বীকার:
অধ্যাপক আবদুল কাফি, অধ্যাপক নির্মাল্যকুমার ঘোষ, ঋকদেব ভট্টাচার্য।

গান্ধীজির মৌলিক সদ্‌গুনাবলী : একটি সমীক্ষা

বরুন কুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
মহিষাদল রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ: মহাত্মা গান্ধী একজন সামাজিক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করলেও তাঁর রচনার দার্শনিক মূল্য কম নয়। তাঁর রচনার দার্শনিক উৎকর্ষতার জন্যই সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনে তিনি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন মূল্যবোধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করার পর নৈতিকতা, সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, সত্যাগ্রহর অনুশীলন করেছিলেন। নৈতিকতা সমসাময়িক সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি। কারন নৈতিকতা মানব জীবনের ভিত্তি। সমাজের প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করে নৈতিকতার উপর অর্থাৎ এটি শান্তি, সুখ এবং অগ্রগতিতে অবদান রাখে এবং সমাজের একটি আদর্শ বিবর্তনের জন্য একটি বায়ুমণ্ডল তৈরি করে। গান্ধীজির সমগ্র দার্শনিক চিন্তাধারা মুলত দুটি নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সেগুলি হল- সত্য ও অহিংসা, যা আগের তুললায় আজ বেশি প্রাসঙ্গিক।তিনি বলতেন জীবনের মূল নীতি সত্যের উপর ভিত্তি করে চলে। তিনি সত্যকে মানুষের আচার-আচরনের আদর্শ আকারে দেখেছিলেন। তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সংগ্রাম সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং জাতীয় ও ব্যক্তি স্বায়ত্তশাসনের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করছে।গান্ধীর অহিংসা শুধুমাত্র হত্যা থেকে বিরত ছিল না, সমগ্র মানবজাতির এবং সমস্ত জীবের প্রতি ভালবাসাও দেখায়। তিনি গণতন্ত্রের একজন কট্টর সমর্থক। অহিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে সবার জন্য সমান স্বাধীনতা থাকবে। তিনি বলেছেন "সত্যিকারের গণতন্ত্র কেবল অহিংসার ফলাফল হতে পারে। মানব প্রতিষ্ঠানের অপূর্ণতার কারণে আধুনিক সমাজ আরও আক্রমণাত্মক, দুর্নীতিপরায়ন, শোষণমূলক এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে। আধুনিক সমাজের কুফল থেকে মুক্তি পেতে গান্ধীর মৌলিক সদ্‌গুনাবলী অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সমস্যা যাই হোক না কেন গান্ধীবাদের সবসময়ই একটি প্রতিকার ছিল। আমি গান্ধীজির নীতিশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ মৌলক সদ্‌গুনাবলীর ধারণাগুলিকে আলোচনা করতে যাচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা এই প্রকল্পের লখ্য। তাই এই প্রকল্পটিতে দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে বর্তমান বিশ্বের কাছে গান্ধীজির মৌলিক সদ্‌গুনাবলী কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
সূচকশব্দ: ধর্ম ও নৈতিকতা, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, ব্রম্ভচর্য, অভয়।

ভূমিকা: মহাত্মা গান্ধী একজন সামাজিক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করলেও তাঁর রচনার দার্শনিক মূল্য কম নয়। তাঁর রচনার দার্শনিক উৎকর্ষতার জন্যই সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনে তিনি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।তিনি বিভিন্ন মূল্যবোধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করার পর নৈতিকতা, সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, সত্যাগ্রহর অনুশীলন করেছিলেন। নৈতিকতা সমসাময়িক সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি। কারন নৈতিকতা মানব জীবনের ভিত্তি। সমাজের প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করে নৈতিকতার উপর। গান্ধীর নীতিদর্শন খুব একটা সুসংহত নীতিদর্শন ছিল না। নৈতিক বিধিনিষেধ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সবক্ষেত্রে

ধারাবাহিকতা নেই। আসলে তিনি যতটা সমাজসংস্কারক ছিলেন ততটা নীতিদার্শনিক ছিলেন না। তিনি তাত্ত্বিক ছিলেন না, ছিলেন এক নিষ্ঠাবান কর্মযোগী। পারিপার্শ্বিক সমস্যার সুরাহা খুজতে গিয়ে তাঁর কাছে যে পথ নৈতিক বলে মনে হয়েছে, সেই পথেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। এই পথ একাধারে সত্যের পথ, অহিংসার পথ, প্রেমের পথ, জনকল্যাণের পথ। এভাবেই গান্ধীজি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর সত্যাগ্রহের ধারণা, অহিংসারধারণা, সর্বদয়ের ধারণা। নৈতিকতার সাথে সম্বন্ধিত এই মৌলিক ধারণাগুলি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গীতার শিক্ষণ থেকেই লাভ করেছিলেন। গীতায় নীতিহীনতারবিরুদ্ধে নৈতিকতার, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের সংগ্রাম কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এই নৈতিক সংগ্রামকে গান্ধীজি হাতিয়ার করেছিলেন। গান্ধীজির কাছে গীতা এক আধ্যাত্মিক নিদান স্বরূপ, যার মধ্যে সব নৈতিক প্রশ্নের সমাধান নিহিত আছে। এই প্রকল্পটিতে আমি গান্ধীজির দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রথমত- ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে গান্ধীজির মতামত বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়ত- গান্ধীজির মূল ব্রত হিসাবে তার মৌলিক সদ্‌গুনাবলীর প্রাসঙ্গিকতা।

ধর্ম ও নৈতিকতা:গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন ধর্ম ও নৈতিকতা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মৃত্তিকায় উপ্ত বীজের যেমন জল প্রয়োজন, তেমনি নৈতিকতারও ধর্ম প্রয়োজন। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও বৃদ্ধির জন্য যেমন জল প্রয়োজন, তেমনি নৈতিকতাবোধের জাগরণ ও বিকাশের জন্য ধর্ম প্রয়োজন। নৈতিকতা বিরোধী যে কোনো ধর্মীয় মতবাদকে তিনি দ্বিধাহীনভাবে নস্যাৎ করেন। তিনি অযৌক্তিক ধর্মীয় ভাবাবেগকে গ্রহন করতেও প্রস্তুত যদি তা না অনৈতিক হয়। তিনি বলেন, "নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে আমরা ধর্মীয় হতে পারি না। নৈতিকতাকে অগ্রাহ্য করে এমন কোন ধর্ম নেই। যেমন মানুষ অনৃতভাষী, নিষ্ঠুর ও আত্মসংযমী হয়ে দাবি করতে পারে না যে ঈশ্বর তার পক্ষে আছে"। গান্ধীজির মতে সত্তা এক, সেই সত্তা ঈশ্বর এবং ঈশ্বর সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই তাঁর ধর্মীয় ধারণাগুলিও নিঃসৃত হয়েছে। যদি সত্য ঈশ্বর হয়, তবে আন্তরিক সত্যান্বেষণ হল ধর্ম। ধর্মকে সাধারণভাবে কোনো উচ্চতর শক্তি বা নীতির কাছে আত্মোৎসর্গরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। তিনি বলেন ঐ উচ্চতর নীতি হল সত্য এবং সেজন্য সত্য বা ঈশ্বরের প্রতি আত্মোৎসর্গই ধর্ম। এই ধর্ম শব্দটি বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। এটি চূড়ান্ত মূল্যবোধের বিশ্বাস যা মহাবিশ্বের কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধর্ম, মানব সমাজের প্রায় একটি সার্বজনীন ঘটনা। শ্রী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, "ধর্ম একটি বাস্তবতার অন্তর্দৃষ্টি, এবং যদিও যুক্তির কাছে অগম্য, তবে এটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ"। গান্ধীজি বলেছেন, একজন ধর্মীয় ব্যক্তি তার দ্বারা তার উপর আরোপিত সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে। গান্ধীজি কেতাবি দার্শনিক ছিলেন না। তাই নৈতিকতা সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা খুব বেশী তাত্ত্বিক নয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে 'মন্দ' ক্রিয়াগুলিও নৈতিক হতে পারে, কেননা সেগুলি ঐচ্ছিক। কিন্তু গান্ধীজির মতে, কেবল কল্যাণকর ক্রিয়াগুলিই নৈতিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তাত্ত্বিক নীতিদর্শনে 'নৈতিক'-এর বিপরীত হল 'ন-নৈতিক', কিন্তু গান্ধীজির দর্শনে 'নৈতিক'-এর বিপরীত হল অনৈতিক। যা কিছু কল্যাণকর ও সদ্‌গুনসম্পন্ন তাই নৈতিক। কল্যাণ ও অকল্যাণ হল নৈতিকতার একটি অর্থ, এবং এই অর্থে নৈতিক অনুশাসন অনুসারে জীবনযাপন হল নৈতিকতা। কিন্তু যদি কল্যাণ বলতে অপরের প্রতি কল্যাণ করা বোঝায়, তাহলে অন্যের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ আত্ম-অতিক্রান্তি বা প্রেম নৈতিকতার সারমর্ম।

মৌলিক সদ্‌গুণ:গান্ধীজি জীবনের কিছু মৌলিক সদ্‌গুণাবলীর পরামর্শ দিয়েছিলেন যা একটি ধার্মিক ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। ভারতীয় ঐতিহ্য সমাজের ভালোর জন্য ব্যক্তিদের দ্বারা কয়েকটি প্রধান গুণাবলীর পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেয়। ভারতীয় নীতিবিদ্যায় এরূপ পাঁচটি সদ্‌গুণের কথা বলা হয় – সেগুলি হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য। গান্ধীজি এগুলির স্বীকার করেন এবং আরও একটি গুণাবলী অভয় যোগ করেন। কেবল পার্থক্য এই যে গান্ধীজি সদ্‌গুণাবলীকে তাঁর স্বকীয় পন্থায়, স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনে করেন যে সদ্‌গুণগুলিকে অবশ্যই আধুনিক রীতিতে ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে করে সেগুলি কালের প্রয়োজনের সঙ্গে এবং মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার তৎকালীন শর্তগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

অহিংসা:সাধারণ অর্থে অহিংসা বলতে কারোর প্রতি হিংসা না করা বা কাউকে হত্যা না করাকে বোঝায়। কিন্তু গান্ধীজি অহিংসা শব্দটিকে এত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার না করে বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রয়োগের এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন। তিনি অহিংসার শিকড় খুঁজেছিলেন মানবজাতির প্রতি পরার্থপরতা, প্রেম এবং দয়া ভাবনার মধ্যে দিয়ে। তিনি মনে করেছিলেন যে অহিংসা একটি নৈতিক গুণ হিসাবে সত্তার আইন। গান্ধীজির মত আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে অহিংসার জন্য শারীরিক এবং মানসিক সাহসের চেয়ে, অনেক বেশী শারীরিক এবং মানসিক সাহসের প্রয়োজন হয় যা শারীরিক আঘাত দেওয়ার জন্য প্রয়োজন। শারীরিক শক্তির সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন- “অহিংসা হল ভালবাসার একটি ইতিবাচক অবস্থা, মন্দ কাজের জন্যও ভাল করা.............এর জন্য আপনাকে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যায়কারীকে প্রতিরোধ করতে হবে”। গান্ধীজি অভিমত দিয়েছিলেন যে অহিংসা শুধুমাত্র ঋষি এবং সাধুদের জন্য নয়, এটি সাধারণ মানুষের জন্যও বোঝায়। সমাজের প্রকৃত সম্প্রীতি অহিংসার মধ্যে নিহিত কিন্তু হিংসাতে নয়। এইভাবে, অহিংসার ধারণা জোর দিয়েছিল শুধুমাত্র বর্তমান সময়ে নয়, ভবিষ্যতেও মানবজাতির সর্বোচ্চ কল্যাণে অবদান রাখার জন্য। সহিংসতা থেকে উৎপন্ন ভালো জিনিসটা অস্থায়ী এবং মন্দটা স্থায়ী।

সত্য:গান্ধীজি সত্যের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল সত্যতা-পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্রম। তাঁর কাছে, সত্য নিছক কথায় সত্য নয়, চিন্তা এবং কাজেও। তিনি ঈশ্বরের সাথে পরম সত্যকে চিহ্নিত করেছিলেন। সত্য শব্দটি এসেছে ‘সৎ’ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে থাকা। গান্ধীজি বলেন যে, যে কোনো প্রকার নৈতিক অবমূল্যায়ন বা বিকৃতি অজ্ঞানতার কারণ। তিনি স্পষ্টতই ছয়টি চরম শত্রুর উল্লেখ করেন যেগুলি থেকে কুসংস্কার, বিদ্বেষ ও বৈরীভাব জাগ্রত হয় এবং ব্যক্তি সত্য উপলব্ধিতে অক্ষম হয়। এই ছয়টি চরম শত্রু হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্যও মিথ্যাত্ব। সুতরাং সত্য অনুশীলনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে এই প্রতিবন্ধকতাগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। তাকে অবশ্যই নৈতিক বিশুদ্ধতা ও সাহস কর্ষণ করতে হবে। তাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তার দৃষ্টিকে এই প্রতিবন্ধকতাগুলি আচ্ছন্ন করতে না পারে।

অস্তেয়: গান্ধীজি ‘অস্তেয়’ শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেন। একটি অর্থে অস্তেয় হল দান ব্যতীত অপরের সম্পদ অগ্রহণ। অপর একটি অর্থে অস্তেয় হল অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিজের অধিকারে রাখা নিষিদ্ধ। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে অস্তেয়কে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দুটি ধর্ম গান্ধীজির উপর অনেক প্রভাব ফেলেছিল। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে লোকেরা সর্বদা তাদের বাস্তব সম্পর্কে সচেতন থাকে না এবং অনেকে তাদের চাওয়াকে বাড়িয়ে দেয় এবং এইভাবে

অজ্ঞানভাবে নিজেদের চোর হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন যে জনগণকে তাদের চাহিদা কমাতে হবে। এই পরিবর্তন সম্ভাব্য পরিমাণে সম্পত্তি উপশম করতে পারে। তিনি সেইসব লোককে চোর বলে বর্ণনা করেছিলেন যারা যুক্তিহীনভাবে তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী অর্জন করে বেঁচে থাকার জন্য। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ব্যক্তি যদি সহজ জীবনযাপন করে তবেই এই গুণটি অনুসরণ করার যোগ্য।

অপরিগ্রহ: গান্ধীজি মনে করেন অপরিগ্রহ অ-চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। বিনা প্রয়োজনে যে জিনিস আমরা আঁকড়ে থাকি, তা যদি ইতিমধ্যে চুরি গিয়ে নাও থাকে, তাহলেও তাকে অপহৃত সম্পতি বলেই গণ্য করতে হবে। অধিকৃতির মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করার ব্যাপারটিও আছে। কোনও সত্যসন্ধানী, প্রেমের আইনের কোনও অনুগামী, আগামীকালের জন্য কিছু অধিকার করে রাখতে পারে না। ঈশ্বর কখনও আগামী কালকের জন্য মজুত করেন না। সেই মুহূর্তের জন্য যা দরকার তার থেকে বেশী ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না। অপরিগ্রহের আদর্শ সর্বতোভাবে পূরণ করার জন্য মানুষের উচিত পাখির মতোই, আগামীকালের জন্য মাথার ছাদ, বসন ও খাদ্য সঞ্চয় না করা। তার দরকার শুধু রোজকার রুটি। কিন্তু এটা জোগান দেওয়ার কাজ তার নয়, ঈশ্বরের। গান্ধীজী বলেন, প্রেম এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার একসঙ্গে চলতে পারে না। তত্ত্বগত দিক দিয়ে যেখানে নির্ভেজাল প্রেম রয়েছে সেখানে সম্পূর্ণ অপরিগ্রহ থাকতে হবে। এই দেহ হল আমাদের শেষ অধিকৃতি। অতএব কোনও মানুষ তখনই সর্বাঙ্গীণ প্রেম ও অপরিগ্রহ প্রদর্শন করতে পারবে যদি সে মানবসেবার জন্য দেহকে বর্জন করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত হয়।

ব্রম্ভচর্য: ব্যুৎপত্তিগতভাবে বলতে গেলে, এই গুণটি ব্রম্ভের উপলব্ধির জন্য একটি জীবন পদ্ধতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সব ধরনের সংযম। গান্ধীজি বলেছেন, অন্য সব সমাচরণের মতোই ব্রম্ভচর্যও চিন্তায়, কথায় ও কাজে পালন করতে হবে। ‘গীতা’য় বলা হয়েছে এবং অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, কোনও নির্বোধ আপাতদৃষ্টিতে তার দেহ নিয়ন্ত্রণ কোরেও যদি মনে কুচিন্তা লালন করে, তার সকল চেষ্টাই বিফল। মন যদি একইসঙ্গে চঞ্চল হয়ে ইতস্তত ধাবিত হয় তাহলে দেহকে পীড়ন করা হয়তো ক্ষতিকর। মন যেখানে যাবে, দেহও সেখানেই যাবে- হয় এখন, নয়তো পরে .... মনের মধ্যে অশুদ্ধ চিন্তা পুষে রাখা এক ব্যাপার, আর সম্পূর্ণ ভিন্ন হল, মন যদি আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও এখানে-সেখানে পালিয়ে বেড়ায়। মনের পাপাচারী ভ্রমণের সঙ্গে আমরা যদি অসহযোগ করি তাহলে শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই। গান্ধীজির ভাষায়, “ব্রম্ভচর্য মানে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, এবং অন্য সকলকে বিনামূল্যে খেলার অনুমতি দেয়, সে তার প্রচেষ্টাকে বৃথা বলে মনে করতে বাধ্য......... সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ হবে বৈজ্ঞানিক এবং সাফল্যের সম্ভাবনা”।

অভয়: গান্ধীজি আরেকটি গুণ যোগ করেছেন, তা হল অভয়। এই অভয় হল অহিংসা অনুশীলনের ঐকান্তিক শর্ত। এটি একটি কঠিন তপশ্চর্যা, কেননা এর জন্য কেবল সাধারণ ভীতিকে জয় করলেই হবে না ; বরং অনাহার, অবমাননা, দৈহিক হিংসা, এমনকি মৃত্যুভয় থেকেও মুক্ত হতে হবে। গান্ধীজি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কাপুরুষেরা কখনোই নৈতিক হতে পারে না। তাই অভয় হল প্রতিকূল অবস্থা ও বিপদের মুখোমুখী হয়েও নৈতিক সাহস থাকা নামক একটি সদ্‌গুণ। তিনি বলেছেন যে এটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব যারা পরমকে উপলব্ধি করেছেন। গান্ধীজি বলেন, “এটা শুনে ঈশ্বর মানুষকে ভয় করা বন্ধ করতে পারেন।”

উপসংহার: বৈজ্ঞানিকও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে এবং এর ফলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রতি অধিকতর মনোযোগের প্রয়োজন। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন সমস্ত জীবন একই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তিনি মনে করেন যে অহিংসার আধ্যাত্মিক শক্তি সামাজিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার। যদি অহিংসাকে কেউ সহিংসতায় পরিণত না করে তবে অহিংসা আত্ম-বিধ্বংসী, আত্মত্যাগমূলক নয়। সহিংসতার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দেখাতে হবে। গান্ধীজি মনে করেছিলেন যে একজন ব্যক্তির জীবনও সহিংসতার পক্ষে যেন না যায়। গান্ধীজি এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা আনতে চেয়েছিলেন যেখানে, সর্বোত্তম, সর্বশেষ এবং নিম্নতম মঙ্গল রয়েছে। তিনি যে সমাজের কথা ভাবতেন তা নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অবিচার ও অর্থনৈতিক শোষণ মুক্ত। সমাজ গড়ে উঠবে সত্য, অহিংসা, সাম্য এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে।

গান্ধীজির নীতিদর্শন সর্বদা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে বিশেষ করে এই সমসাময়িক বিশ্বে যেখানে তাঁর সদ্‌গুনাবলীর ধারণাগুলি বাস্তববাদ এবং বস্তুবাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে মনুষ্যত্বের উপাদানকে অপসারণ করে তার দর্শন যেমন "সত্য" এবং "অহিংস" প্রেম, সহানুভূতি এবং সহনশীলতার মৌলিক মানবিক নীতিগুলিকে উদ্ভূত করে। গান্ধীজির কথায়, "সত্য এবং অসত্য প্রায়শই একসাথে থাকে, ভাল এবং মন্দকে প্রায়শই একসাথে পাওয়া যায়", তবে যখন দুটি মিথ্যা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন যেটি বৃহত্তর সহিংসতায় জয় লাভ করে সেটি সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তাই তিনি বলেন যে এমনকি যখন মিথ্যাত্ব সফল হচ্ছে বলে মনে হয় তখনও তা সত্যের পোশাকে আবৃত থাকে বলেই সম্ভব হয়। কেবল সেই মিথ্যাত্বই সফল হয় যা কিছু সময়ের জন্য সত্যরূপে প্রকাশিত হয়। মিথ্যাত্ব যখন 'সত্য'রূপে উপস্থাপিত হয় কেবল তখনই তা কার্যকরী হয় এবং সাফল্য লাভ করে। এর থেকেই বোঝা যায় যে মিথ্যাত্ব নয় – সত্যবাদিতার মধ্যেই কল্যাণের শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। মানব প্রতিষ্ঠানের অপূর্ণতার কারণে আধুনিক সমাজ আরও আক্রমণাত্মক, অধিগ্রহণমূলক, শোষণমূলক এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে। আধুনিক সমাজের কুফল থেকে মুক্তি পেতে গান্ধীর সদ্‌গুনাবলী অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সমস্যা যাই হোক না কেন, জটিল-আধুনিক-অতিআধুনিক যাই হোক না কেন, গান্ধীজির মৌলিক সদ্‌গুনাবলীর ভাবনায় সবসময়ই একটি প্রতিকার আছে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা:

১। চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ (সম্পাদক), মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা (খণ্ড ১-৫), আমেদাবাদ : নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ২০০০।
২। হরিজন, নবজীবন ট্রাস্ট, আমেদাবাদ, ১৯৩৪।
৩। ইয়ং ইন্ডিয়া, নবজীবন ট্রাস্ট, আমেদাবাদ, ১৯২৫।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার (সম্পাদক), গান্ধী রচনা-সম্ভার, কোলকাতা : গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, ১৯৭০।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস, মহাত্মা গান্ধীর দর্শন, কোলকাতা : রবীন্দ্র লাইব্রেরী,১৯৬৮।
৬। বসু, নির্মল কুমার (সংকলক), গান্ধী রচনা সংকলন, কোলকাতা : প্রকাশনবিভাগ, গান্ধী স্মারকনিধি,১৯৬৬।
৭। রঁল্যা, রঁম্যা, মহাত্মা গান্ধী (অনুবাদক – ঋষি দাস), কোলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৯১।

ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতা : বিংশ শতাব্দীতে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর গতিশীল নগরায়ণ

প্রভাত ঘোষ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : হুগলি জেলার উত্তরপাড়া-কোতরাং একটি পুরনো ঐতিহ্যের শহর। বিংশ শতাব্দীতে এই শহরটির নাগরিক চরিত্রের সার্বিক বিকাশ লক্ষ করা যায়। যদিও গ্রাম্য চরিত্র থেকে শহুরে চরিত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ছিল দীর্ঘমেয়াদী। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে যে নাগরিক কাঠামো গড়ে ওঠে তা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের থেকে অনেকটাই ভিন্ন চরিত্রের। বিংশ শতাব্দীতে শহরটির আর্থ-সামাজিক কাঠামোর যেমন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তেমনি জনঘনত্বের পরিমাণের পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন শহর গড়ে উঠলেও উত্তরপাড়া-কোতরাং শহরটি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া পৌরসভা গঠনের প্রেক্ষাপটেও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থাপিত হওয়া পৌরসভাগুলির সঙ্গে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর বিশেষ পার্থক্য ছিল। হুগলি নদী তীরবর্তী অন্যান্য পৌরসভাগুলির প্রতিষ্ঠায় ইউরোপীয় তাৎপরতা ছিল মুখ্য, সেখানে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর ক্ষেত্রে ছিল ব্যক্তিগত ও সাধারণ মানুষের তৎপরতা। এই গবেষণাপত্রটি বিংশ শতকে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর নগরায়ণের চরিত্রসহ জনসংখ্যার পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো নাগরিক পরিষেবাগুলির বিকাশকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।
সূচক শব্দ : নগরায়ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা।

মূল আলোচনা:

নগরায়ণ কোন নতুন বিষয় নয়। আমরা প্রাচীন যুগ থেকেই নগরায়ণের অস্তিত্ব লক্ষ করি। বর্তমানে গবেষকরা নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তত্ত্বগতভাবে সংজ্ঞায়িত ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছেন। নগরায়ণ হলো একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া।[১] নগরায়ণের এই প্রক্রিয়ায় গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যার স্থানান্তর ঘটতে থাকে যার ফলে নগরের আয়তনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নগরায়ণের এই বৃদ্ধি উলম্ব (vertical) এবং অনুভূমিক (horizontal) এই দুই ধরনেরই হতে পারে।[২] সমাজতাত্ত্বিক লুইস ওয়ার্থ (Louis Wirth) তার *Urbanism As a Way of Life* প্রবন্ধে বলেছেন যে নগরায়ণ বলতে শুধুমাত্র শহরগুলিতে জনসংখ্যার আগমনকেই বোঝায় না বরং এটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের একটি নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে আকৃষ্ট করে।[৩] হুগলি জেলার নগরায়ণের ইতিহাসে উত্তরপাড়া-কোতরাং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি শুধুমাত্র হুগলি জেলা নয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত পৌরসভাগুলির মধ্যে পুরনো একটি পৌরসভা। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে শহরটি প্রতিষ্ঠার সময় -এর আয়তন ছিল মাত্র দেড় বর্গমাইল।[৪] শহরটির নামের মধ্যেও তেমন কোন প্রাচীনত্ব নেই। পার্শ্ববর্তী বালি গ্রামের উত্তরাংশে অবস্থিত হওয়ায় বালি গ্রামের উত্তরপাড়া হিসাবেই নামটি পরিচিতি লাভ করে।[৫] পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল এই পৌরসভাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে এটি উত্তরপাড়া-কোতরাং পৌরসভা হিসেবেই পরিচিত।

পৌরসভা গঠনের ইতিহাসে এই শহরটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরপাড়া ছিল সুবে বাংলার প্রথম ও প্রাচীনতম পৌরসভা।[৬] যদিও উত্তরপাড়ার পূর্বে শ্রীরামপুর শহরটি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত এই পৌরসভাটির মেয়াদ খুব বেশি দিন ছিল না ফলে কিছুদিনের মধ্যেই -এর কার্যকলাপ বন্ধ হয়। তাই আইনত আবার বাংলার পৌরসভা গঠনের ইতিহাসে উত্তরপাড়াকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়ে থাকে। এছাড়া এই দুটি পৌরসভা গঠনের প্রকৃতিও ছিল ভিন্ন। শ্রীরামপুরের পৌরসভা গঠনে ছিল ইউরোপীয় তাৎপরতা, কিন্তু উত্তরপাড়ার ক্ষেত্রে ছিল সেই সময়কার জমিদার মুখার্জি বংশ এবং সেখানকার সাধারণ মানুষের তৎপরতা যা উত্তরপাড়ার মানুষদের আধুনিক মনষ্কতার বাস্তব চিত্রকে উপস্থাপন করে।

উত্তরপাড়ার অগ্রগতি ও নগরায়ণে সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জয়কৃষ্ণ মুখার্জী ও তার পরিবার। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বেশিরভাগ সময়টাই পৌরসভার কার্যকলাপ ও উত্তরপাড়ার অগ্রগতির বিষয়টি এই মুখার্জি পরিবারের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছিল। উত্তরপাড়া পৌরসভা প্রতিষ্ঠাসহ নাগরিক জীবনে প্রতিটি সুযোগ-সুবিধা প্রদানে জয়কৃষ্ণ মুখার্জী তার নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

পৌরসভা প্রতিষ্ঠার সময় এই শহরটির আয়তন ছিল যেমন অনেকটাই কম তেমনি জনসংখ্যাও ছিল অল্প। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অংশ উত্তরপাড়ার সঙ্গে সংযোজিত হতে থাকে, এর ফলে এই শহরের আয়তনও যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি জনসংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১৮৭২ সালে উত্তরপাড়ার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৩৮৯ জন।[৭] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরও কিছু পৌরসভার প্রতিষ্ঠা হয়। তবে ইংরেজ সরকার পৌরসভাগুলির বিষয়ে কিছু ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও পৌরসভাগুলির প্রতিষ্ঠা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সামগ্রিক বিবেচনা করে উঠতে পারেনি, ফলে অল্প আয়তন এবং অল্প জনসংখ্যা বিশিষ্ট উত্তরপাড়ায় পৌরসভার উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তারই পার্শ্ববর্তী স্থানে ১৮৭৬ সালে কোতরাং পৌরসভার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৮] ১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারি অনুযায়ী কোতরাং -এর মোট জনসংখ্যা ছিল ৬,১১১ জন। উত্তরপাড়ায় অবস্থিত বিশিষ্ট বর্গের সাহায্য সহযোগিতায় উত্তরপাড়া পৌরসভা অগ্রগতি লাভ করলেও পার্শ্ববর্তী কোতরাং অঞ্চলটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছিল অনেকটাই দুর্বল। ফলে হঠাৎ করে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এই কোতরাং পুরসভাটি নাগরিক কাজে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। যদিও উত্তরপাড়ার থেকে পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও জনসংখ্যার বিচারে কোতরাং শহরটি উত্তরপাড়া থেকে সর্বদা এগিয়েই ছিল। পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৯৬৪ সালে দুটি পৌরসভার একত্রিকরণ ঘটে।[৯]

শহরের রূপবিদ্যা (Morphology of the town)

উত্তরপাড়া-কোতরাং শহরটির পূর্ব দিকে রয়েছে হুগলি নদী এবং পশ্চিম দিকে রয়েছে পূর্ব রেলওয়ের লাইন। নতুন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড অর্থাৎ জাতীয় সড়ক নম্বর ২ হুগলি নদীর পাশ বরাবর চলে গেছে। শহরটির প্রেক্ষাপট অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, শহরটি গ্রাম্য চরিত থেকে শহুরে চরিত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় রাস্তাঘাট, সরকারি কার্যালয়, বাসস্থান, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, কল-কারখানা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করে স্থাপিত হয়নি। ফলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি যে সর্বক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ছকে অবস্থান করেছে তা নয়। শহরে জনবসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট, বাসস্থানসহ অন্যান্য বিষয়গুলি প্রয়োজনমতো শহরের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে। কোন শহরের রেলপথ ও জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী জায়গায়

বাসস্থান নির্মাণ শহরের একটি সাধারণ চিত্র। উত্তরপাড়া শহরটির ক্ষেত্রেও -এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না।

হুগলি জেলার সদর দপ্তর চুঁচুড়া হওয়াই স্বাভাবিকভাবেই উত্তরপাড়ার মূল প্রশাসনিক দপ্তর চুঁচুড়ায় অবস্থিত। এছাড়া উত্তরপাড়া-কোতরাং শ্রীরামপুর সাব-ডিভিশনের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় শ্রীরামপুরেও কিছু প্রশাসনিক দপ্তর হয়েছে। তবে শহরের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দপ্তর -এর বেশিরভাগটাই রয়েছে উত্তরপাড়ায়, আর কিছু রয়েছে ভদ্রকালীতে কিন্তু সেই অর্থে কোতরাং-এ খুব সামান্যই প্রশাসনিক দপ্তর রয়েছে।[১০] শহরের প্রশাসনিক কার্যালয়ের বেশিরভাগই রয়েছে জাতীয় সড়ক নম্বর ২ -এর ধারে। পৌরসভা থেকে শুরু করে বাজার, ব্যাংক, ফায়ার স্টেশন, পোস্ট অফিস, পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টরের কার্যালয় সবই গড়ে উঠেছে এই জাতীয় সড়কের পাশে।

মানচিত্র: ১ - উত্তরপাড়া-কোতরাং শহরের মানচিত্র

Source : https://images.app.google/iTRqeZLjEuLfZytlx6

শহরটির নির্দিষ্ট কোন বাণিজ্যিক অঞ্চল লক্ষ করা যায় না, তবে শহরটি যেহেতু জাতীয় সড়ক বরাবর রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই জাতীয় সড়কের দুই পাশ ধরে খুচরো ব্যবসায়ীসহ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান গড়ে উঠেছে। এই লাইন বরাবর সুসজ্জিত দোকান থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা মেটাই। তবে জাতীয় সড়ক বরাবর গড়ে ওঠা দোকানগুলি ছাড়াও শহরের মধ্যেই কিছু কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার গড়ে উঠেছে। যেমন উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর মধ্যবর্তী স্থানে পুরাতন বাজার, হিন্দমোটর স্টেশন সংলগ্ন বাজার এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাঁঠালতলা বাজার প্রভৃতি।

জনসংখ্যার গতিবিধি (Demographic trends)

কোন শহরের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন সেই শহরের সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামো ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ শহরের সামগ্রিক অগ্রগতিকে নির্দেশ করতে সাহায্য করে। হুগলি নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে অল্প আয়তন ও অল্প জনঘনত্ব বিশিষ্ট উত্তরপাড়া-কোতরাং শহরটির গ্রাম্য অঞ্চল থেকে শহরে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে এক বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট উত্তরপাড়ার জনসংখ্যা বেড়েছিল ২,৬৪৭ জন অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছরে ১০০ জনেরও সামান্য কম।[১১]

সারণি: ১

১৯০১-১৯৯১ সময়কালে উত্তরপাড়া-কোতরাং শহরে জনসংখ্যা এবং দশকীয় বৃদ্ধির হারের
পরিবর্তন

বর্ষ (Year)	জনসংখ্যা (Population)	দশকীয় বৃদ্ধির হার (Decennial Growth Rate)
১৯০১	১২,৯৮০	--
১৯১১	১৩,৯৪৭	৭.৪৪
১৯২১	১৫,৫০৩	১১.১৫
১৯৩১	১৬,৫১০	৬.৪৯
১৯৪১	২৩,০১১	৩৯.৩৭
১৯৫১	৩১,৩০৩	৩৬.০৩
১৯৬১	৫২,১৬৩	৬৬.৬৩
১৯৭১	৬৭,৫৬৮	২৯.৫৩
১৯৮১	৭৯,৫৯৮	১৭.৮০
১৯৯১	১,০১,২৬৮	২৭.২২

সূত্র: ১৯০১-১৯৯১ সালের বিভিন্ন জনগণনার রিপোর্ট

বিংশ শতাব্দীতে অবস্থার ক্রমশ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯০১ সালে এই শহরটির জনসংখ্যা ছিল ১২,৯৮০ জন, যা এই শতাব্দীর শেষ আদমশুমারি ১৯৯১ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ১,০১,২৬৮ জনে। বিংশ শতাব্দীতে শহরটির এই বিপুল জনসংখ্যার বৃদ্ধি শহরটির নগরায়ণের বিকাশকে উপস্থাপন করে। বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর জনসংখ্যার বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। ১৯৩১ সালে এই শহরটির জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬,৫৭০ জনে। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলিতে জনসংখ্যার পরিবর্তন ছিল চোখেপড়ার মতো ১৯৩১-৪১ সালে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩৯.৩৭ শতাংশ। সমগ্র বিংশ শতকের মধ্যে এই শহরটির সর্বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৯৬১ সালে। এই সময় শহরটির জনসংখ্যা ছিল ৫২,১৬৩ জন, এবং ১৯৫১-৬১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৬৬.৬৩ শতাংশ। তবে ১৯৬১ সাল অনুপাতে না হলেও শতাব্দী শেষ তিন দশকে শহরটি তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে একটি সাধারণ অনুপাতে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

আর্থ-সামাজিক রূপান্তর (Socio-economic transformation)

উত্তরপাড়ার জনসংখ্যার অগ্রগতির বিষয়টি ওই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক সুস্থিতির অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তরপাড়া ছিল পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলগুলির মতোই একটি সাধারণ গ্রাম। কিন্তু, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে পুরো সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রগতির ফলে উত্তরপাড়ার সামাজিক চরিত্রের পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। শহরটি তার গ্রাম্য চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে শহুরে চরিত্রে প্রবেশ করে। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ধরেই এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই শহরটির আর্থ-সামাজিক চরিত্রের সার্বিক বিকাশ লক্ষ করা যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তরপাড়া ছিল জঙ্গলাকীর্ণ নিচু জমি এবং জনবসতি ছিল অত্যন্ত কম। কৈবর্ত, সদগোপ এবং মুসলমান সহ অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করত।[১২] হুগলি নদী তীরবর্তী হওয়ায় মাছ ধরা, কৃষি কাজের মতো কাজের সঙ্গে বেশিরভাগ

মানুষ যুক্ত ছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতি বাইরের অঞ্চলের মানুষদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে থাকে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিকে উৎসাহিত করে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেখা যায় এই অঞ্চলে ৯৭ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধর্মীয় দিক থেকে ছিল হিন্দু, এছাড়াও এই অঞ্চলে ভাষাগত দিক থেকে অবাঙালী শ্রেণীর মানুষের আগমন ঘটলেও ৮৫ শতাংশ মানুষ ছিল বাংলা ভাষাভাষী। ঐতিহ্যগতভাবে এই অঞ্চলটিতে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষনীয়।[১৩]

উত্তরপাড়ায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সাহা, জেলে, গন্ধবণিক, তাঁতি, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, কংস বণিক সহ অন্যান্য জাতির মানুষের বসবাস ছিল। জাতিগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির মানুষের শতাংশের ভিত্তিতে অবস্থান ছিল সব থেকে বেশি। এই অঞ্চলে তফসিল জাতি ও উপজাতির মানুষেরও অবস্থান ছিল। ধোবী, বাগদি, রাজবংশী কৈবর্ত, মুচি, মেথর, নমঃশূদ্র প্রভৃতি তপশিলি জাতির মানুষদের বসবাস লক্ষ করা যায়। তপশিলি উপজাতি হিসেবে শুধুমাত্র ওরানদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[১৪] ১৯৬১ সালে তপশিলি জাতির এই অঞ্চলে উপস্থিতি ছিল মাত্র ৪.৬ শতাংশ যা ১৯৭১ সালে কমে দাঁড়ায় ২.২ শতাংশে। ১৯৮১ সালে আবার -এর পরিমাণ কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ৩.৭ শতাংশে।[১৫] কিন্তু তপশিলি উপজাতির মানুষের উপস্থিতি ছিল নিতান্তই কম আবার শহুরে অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণ আরো নিম্নমুখী হয় । ১৯৬১ সালে মোট তপশিলি উপজাতির মানুষ ছিল ০.৭ শতাংশ, ১৯৮১ তে এই হার কমে দাঁড়ায় ০.৩ শতাংশে। বিবাহ সাধারনত নিজ ধর্মের মধ্যেই হতো তবে আন্তঃবর্ণে (inter-caste) বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল যদিও নিজ জাতির (intra-caste) মধ্যে বিবাহ প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষি ও জাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কাঠামো বিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকেও অব্যাহত থাকে। তবে পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে এই অর্থনৈতিক কাঠামোটি অদৃশ্য হয়ে একটি নতুন বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়।[১৬] ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরের বছরই উত্তরপাড়ায় ভারতের অন্যতম ঐতিহাসিক অটোমোবাইল উৎপাদন কেন্দ্র হিন্দুস্তান মোটর কারখানার প্রতিষ্ঠা হয়, যা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরপাড়ার অর্থনৈতিক কাঠামোর চরিত্রকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। কারখানায় শ্রমিক হিসাবে নিযুক্তির জন্য মানুষজন এই অঞ্চলে ভিড় বাড়াতে থাকে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অন্যান্য শিল্প যেমন হুগলির জুট মিল শিল্প, উত্তরপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁত শিল্পের বিকাশ, হিন্দ মোটরস্ ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লোহা ও ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ইলেকট্রিক ও টেকনোলজিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি শিল্প গড়ে ওঠে। এছাড়া বিংশ শতকে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এ আরেকটি শিল্প বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছিল সেটি হলো ইঁট ও টালি এবং সুড়কি তৈরির শিল্প। নদী তীরবর্তী উর্বর মাটি থেকে এই ইঁট ও টালি শিল্প গড়ে ওঠে। টালি শিল্পটি আবার বিশেষত কোতরাং অঞ্চলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল।[১৭] ১৯৬১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার ৩০.৮ শতাংশ মানুষ ছিল মোট কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি (total workers)। পরবর্তী দুটি আদমশুমারিতে মোট কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির (total workers) হার ছিল কিছুটা নিম্নমুখী। ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালে মোট কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির হার ছিল যথাক্রমে ২৭.৮ ও ২৭.৫ শতাংশ।[১৮]

অন্যান্য পৌর সুবিধা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা)
অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উত্তরপাড়া যেমন আধুনিক বাংলার ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ঠিক তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারেও উত্তরপাড়ার অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে আধুনিক শিক্ষার প্রসার উত্তরপাড়ার সামাজিক অগ্রগতিকে নতুন করে প্রভাবিত করেছিল। ধনী জমিদার এবং উত্তরপাড়ার প্রগতিশীল ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উত্তরপাড়ায় এই আধুনিক শিক্ষার সূচনা ঘটেছিল। এই সময় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূণ পদক্ষেপ ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রসার।

১৮৪৬ সালে জয়কৃষ্ণ মুখার্জী উত্তরপাড়ায় একটি সরকারি স্কুল খোলেন। স্কুলটি পরিচালনার জন্য তিনি এবং তার ভাই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাৎসরিক ১২০০ টাকার সম্পত্তি দান করেন।[১৯] পরবর্তী সময়ে স্কুলের সঙ্গে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হলে সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। ১৮৮৭ সালে উত্তরপাড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। শর্ত ছিল স্কুলটির দায়িত্ব তাদের হাত থেকে নেওয়া হবে। হস্তান্তরের শর্তগুলি নির্ধারিত হয় ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে এবং তারপর কলেজ এবং কলেজিয়েট স্কুলটি একটি পরিচালন বোর্ডের অধীনে রাখা হয়। ১৮৯৭ সালে সরকার স্কুলটির দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করে, পরবর্তী সময়ে কলেজটি ১৯০৬ সাল পর্যন্ত রাজা পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।[২০] নদীর তীরে দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনে পড়াশোনার কাজ চলতো যার সঙ্গে আবার একটি হোস্টেল সংযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালের ৩১ শে মার্চ সময়কালে সেখানে ৩২ জন ছাত্র ছিল।

সারণি: ২

১৯৫১ এবং ১৯৭১ সালে উত্তরপাড়া-কোতরাং শহরে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতর সংখ্যা ও শতাংশের পরিসংখ্যান

বর্ষ (Year)	জনসংখ্যা (Population)	শিক্ষিত (Literate)	অশিক্ষিত (Illiterate)
১৯৫১	৩১,৩০৩ (১০০.০)	১৩,১২২ (৪১.৯)	১৮,১৮১ (৫৮.১)
১৯৭১	৬৭,৫৬৮ (১০০.০)	৪৪,৬০২ (৬৬.০)	২২,৯৬৬ (৩৪.০)

সূত্র: Town Survey report, Uttarpara-Kotrung, Census of India 1981, p. 239.

বিংশ শতাব্দীতে বিশেষত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এ শিক্ষার হার খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ সালে হুগলি জেলার সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ২৫.১৬ শতাংশ।[২১] পরবর্তী দশকগুলিতে সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য ভাবেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল এবং এই সময় থেকে গ্রামের থেকে শহরের সাক্ষরতার হার আরো বেশি করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উত্তরপাড়া শহরের মধ্যেও উচ্চ শিক্ষিতের এবং বেশী সংখ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বসবাস লক্ষ করা যাচ্ছিল। ১৯৫১ সালে উত্তরপাড়ার মোট জনসংখ্যার ৪১.৯ শতাংশ ছিল শিক্ষিত মানুষের বসবাস এবং নিরক্ষর মানুষের হার ছিল ৫৮.১ শতাংশ। ১৯৭১ সালে এই শহরটির শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৬.০ এবং নিরক্ষরতার হার কমে দাঁড়ায় ৩৪.০ শতাংশ। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শহরটির নিরক্ষরতার হার হ্রাসের দিকে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হুগলি জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ছিল অনুন্নত। বেশিরভাগ অঞ্চল ছিল আগাছা জঙ্গলে ভরা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, ড্রেনেজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, নোংরা জল জমে থাকার মত বিষয়গুলি সেই সময় বিভিন্ন রোগ মহামারীর প্রাদুর্ভাবকে বাড়িয়ে তুলেছিল। উত্তরপাড়াও -এর ব্যতিক্রম ছিল না। ১৮৬১ -এর সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বর্ধমান ও হুগলি জেলাতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৮৪ সালে উত্তরপাড়া সহ হুগলি, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কলেরা বিশেষ মহামারীর আকার নিয়েছিল এবং -এর প্রভাব বিংশ শতকের প্রথমের দিকেও লক্ষ করা গিয়েছিল।[২২] ১৮৯৬ সাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে খুব বেশি মৃত্যুর হার (১৬.৬৫) নিয়ে প্রথমে অবস্থান করেছিল কোতরাং তারপরেই ছিল উত্তরপাড়ার অবস্থান, এখানে মৃত্যুর হারছিল ১৪.০২ শতাংশ।[২৩] এছাড়া আমাশয়, ডায়রিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, স্মল পক্স প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সমস্ত রোগের প্রকোপগুলি স্বাস্থ্য সচেতনতার দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে।

উত্তরপাড়ার মুখার্জি পরিবার যে শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রেই অবদান রেখেছিল তাই নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়েও তারা বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। এই পরিবারের উদ্যোগে উত্তরপাড়ায় একটি ডিস্পেন্সারি খোলা হয়েছিল যেখানে পুরুষদের জন্য ১৬ টি এবং মহিলাদের জন্য ৪ টি শয্যা রয়েছে। যদিও এই ডিসপেন্সারিটি রক্ষণাবেক্ষণে সরকারও অনুদান প্রদান করেছিল।[২৪] বিংশ শতাব্দীতে উত্তরপাড়া-কোতরাং পৌরসভায় অবস্থিত উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট হসপিটাল, উত্তরপাড়া আর. সি. ডিসপেনসারি এবং ভদ্রকালী আর. সি. হসপিটাল নামক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি এই পৌরসভায় অবস্থিত মানুষদের অনেকাংশেই স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে সক্ষম হয়েছিল। শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসায় নয়, স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কেও এই সময় ভীষণভাবে প্রচার চালানো হতে থাকে। কলেরা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ ও বসন্তের মতো রোগ যাতে পুরসমাজে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য পৌর নেতৃত্বের সতর্কতা ও তৎপরতা ছিল যথেষ্ট।[২৫] পুরসভার মানুষের সাবেকি মানসিকতায় আঘাৎ এনে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগেরউপর পুরসভা নিষেধাজ্ঞা জারি করে। উত্তরপাড়া পুরসভার এই দৃষ্টান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে সেই সময় সংবাদ প্রভাকর -এর মত পত্রিকাও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে ছাড়েনি।[২৬]

উত্তরপাড়া-কোতরাং পৌরসভাটির নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল শহরটির যোগাযোগ ব্যবস্থা। কলকাতা থেকে মাত্র ১০ কি.মি -এর মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা লাভে শহরটি সক্ষম হয়। শহরের মধ্যে দিয়ে যে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড চলে গেছে তা কলকাতাসহ আশেপাশের অঞ্চলের সঙ্গে এই শহরটির যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করে। শহরটির মধ্য দিয়ে রেল পরিষেবার প্রচলন উত্তরপাড়া-কোতরাং -এর নগরায়ণের পথকে প্রশস্ত করেছিল। ১৯০৬ সালের প্রথম দিকে এই শহরের প্রথম স্টেশন উত্তরপাড়া রেলওয়ে স্টেশন প্রতিষ্ঠা হয়।[২৭] উত্তরপাড়া স্টেশন -এর মাধ্যমে এই শহরের মানুষেরা রেল পরিষেবা গ্রহণ করে। বর্তমানে এটি হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া হুগলি নদীর পাশেই এই শহরটি অবস্থিত হওয়ায় ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমেও এই শহরের মানুষেরা নদীর ওপারের অঞ্চলের সঙ্গে যাতায়াতকে সহজতর করে তোলে। এছাড়াও শহরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য চওড়া রাস্তা আছে। বাস, মোটর চালিত যানবাহন, রিক্সা প্রভৃতির মাধ্যমে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন করা হতো।

পশ্চিমবঙ্গের একটি পুরনো ঐতিহ্যের শহর হিসেবে উত্তরপাড়া-কোতরাং আজও বিশেষ সামাদৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উত্তরপাড়া-কোতরাং -এ নগরায়ণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে তার সার্বিক প্রতিফলন লক্ষ করা গিয়েছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক সুস্থিতি একে অপরের পরিপূরক হয়ে শহরের বিকাশকে অব্যাহত রেখেছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যকলাপ এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কলকাতার মতো একটি বড় শহরের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব এই অঞ্চলে ভীষণভাবে বিদ্যমান। বিংশ শতকে এই অঞ্চলে যে নাগরিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠে সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি ঘটতে থাকে, যা আবার এই অঞ্চলের জনঘনত্ব বৃদ্ধির পশ্চাতে বিশেষ কারণ হিসেবে কাজ করে। তবে এই অতিরিক্ত জনঘনত্বের চাপ ভূমি সংকট সহ পরিবেশ দূষণ এবং যানজটের মত সমস্যাগুলির সৃষ্টি করছে। প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সূত্রনির্দেশ :

১. Rupan Sarkar, *English Bazar in Colonial Bengal: An Urban History of Malda (1813-1947)*, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, 2021, p. 13

২. Ananda Gopal Gupta, *History of Urbanization*, Lucky Publishers, Kolkata, 2018, p. 19

৩. Louis Wirth, *Urbanism As a Way of Life*, American journal of sociology, no. 1, 1938, pp. 1-24.

৪. মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তরপাড়া পৌরসভার ইতিকতা ১৮৫২-১৯৬৮* (প্রবন্ধ), দ্রঃ- উত্তর স্বাক্ষর (স্মারক সংকলন), অধিকর্তা, গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৮, পৃ. ২১৪

৫. অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তরপাড়া বিবরণ*, উত্তরপাড়া, ১৯২০, পৃ. ২

৬. মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তরপাড়া পৌরসভার ইতিকথা ১৮৫২-১৯৬৮* (প্রবন্ধ), উত্তর স্বাক্ষর (স্মারক সংকলন), অধিকর্তা, গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৮, পৃ. ২১৬

৭. সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *ফিরে দেখাঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উত্তরপাড়া আর কোতরং*, অপ্রচলিত পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৮

৮. তদেব, পৃ. ৫৮

৯. Amiya Kumar Banerji, West Bengal District Gazetteers, Hooghly, 1972, p. 496

১০. Town Survey Report, Uttarpara-Kotrung, Census of India, 1981, p. 8

১১. সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *ফিরে দেখাঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উত্তরপাড়া আর কোতরং*, অপ্রচলিত পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৮

১২. সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়, *জয়কৃষ্ণের স্বকালঃ উত্তরপাড়ার আর্থ-সামাজিক চিত্র* (প্রবন্ধ), দ্রঃ-একটি আলোকপ্রবাহ: উনিশ থেকে একুশ শতক (স্মারক গ্রন্থ), উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া, ২০০৯, পৃ. ৫১২

১৩. Town Survey Report, Uttarpara-Kotrung, Census of India,1981, p. 87

১৪. Ibid., p. 88

১৫. Ibid., p. 235

১৬. Ibid., p. 61

১৭. Amiya Kumar Banerji, West Bengal District Gazetteers, Hooghly, 1972, p. 288

১৮. Town Survey Report, Uttarpara-Kotrung, Census of India, 1981, p. 62

১৯. সুধীর কুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ* (প্রথম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৪৩১.

২০. L.S.S. O'Malley & Manmohan Chakraborty, Bengal District Gazetteers, Hooghly, Bengal Secretariat Press, 1912, pp. 233-234

২১. Amiya Kumar Banerji, West Bengal District Gazetteers, Hooghly, 1972, p. 531

২২. Amiya Kumar Banerji, West Bengal District Gazetteers, Hooghly, 1972, p. 579

২৩. L.S.S. O'Malley & Manmohan Chakraborty, Bengal District Gazetteers, Hooghly, Bengal Secretariat Press, 1912, p. 129

২৪. Ibid., p.133

২৫. সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *ফিরে দেখাঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উত্তরপাড়া আর কোতরং*, অপ্রচলিত পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৭

২৬. তদেব, পৃ. ৪৯

২৭. Town Survey Report, Uttarpara-Kotrung, Census of India, 1981, p. 11।

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষ

সঞ্চিতা হাজরা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
যোগমায়াদেবী কলেজ

সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির আমরা তাদের নিম্নবিত্ত, প্রান্তীয় বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। সমাজের চোখে যারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত তারাই মূলত নিম্নবিত্ত হিসেবে পরিচিত। এই শ্রেণির মানুষদের পেটে খিদের জ্বালা, আর মনে সংগ্রামী চিন্তাভাবনা। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষজন দুবেলা দুমুঠো খাবারের জন্য নিজের জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলে প্রতিনিয়ত। তাদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেমন চোখে পড়ে না। দুটো খাবার, মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই পেলেই তারা খুশি। তবে নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে নানারকম সংস্কার চোখে পড়ে। নানারকম লৌকিক দেবদেবী, তন্ত্র-মন্ত্র, ভূত-প্রেত, ব্রত ইত্যাদিতে তারা বিশ্বাসী। অভিজিৎ সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৫ সালে। দেশভাগের শিকার তিনি। খুব অল্পবয়সে জড়িয়ে পড়েন নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে। সেই সূত্রে মিশেছেন একাধিক নিম্নবিত্তের মানুষজনের সঙ্গে। এই সমস্ত মানুষদের সঙ্গে মিশে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা তিনি তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। এখন আমরা তাঁর দুটি উপন্যাস আলোচনা করে দেখার চেষ্টা করব সেখানে নিম্নবিত্তের মানুষজনের কথা কিভাবে উঠে এসেছে।

নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে লেখা অভিজিৎ সেনের উপন্যাস ‘নিম্নগতির নদী’। সাধারণ মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য দুবেলা দুমুঠো অন্নের জোগাড়ের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। একটি আদর্শ নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত তিনটি ধারা থাকে, যেগুলিকে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন নামে অভিহিত করা হয়। এই উপন্যাসের পটভূমি হল পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার অন্তর্গত কালিয়াচক ও মানিকচক থানার মানিকচক, মথুরাপুর, ভূতনী, পঞ্চানন্দপুর হয়ে ফারাক্কা ব্যারেজ অঞ্চল যার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী। এই ভূতনী দিয়ারা অঞ্চলের চাঁই, বিন, মন্ডল শ্রেণির মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ও সাধারণ দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের জীবনবৃত্তান্ত এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। কালিয়াচক ও মানিকচক অঞ্চলে গঙ্গার নিম্ন ধারায় আছে গভীর প্রভাব। সাধারণ মানুষদের উচ্চ কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সামান্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান যাদের চাহিদা। দুবেলা দুমুঠো খেতে পেলে যারা খুশি সেই সমস্ত সাধারণ মানুষদের কথা সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বাহারুদ্দিন ঘোড়ার গাড়ি চালায়। প্রবল বন্যার কারণে বাহারুদ্দিনের ঘর বাড়ি সবকিছু জলে তলিয়ে গেছে। সকলে আশ্রয় নিয়েছে বাঁধের উপর, বাহারও সেখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। বাহার যে কিনা এক করুণ কাহিনির সাক্ষী। তার জীবনে এক করুণ কাহিনি ঘটেছে। বাহারের স্ত্রী রশিদা বাহারকে মদ ছাড়ার কথা বললে বাহার রাজি নয়। তাই বাহারের স্ত্রী মদ ছাড়ার ওষুধ খাওয়ালে রাগত হয়ে রশিদাকে তালাক দেয় বাহার। আবার রাগ কমে গেলে বাহার তার ভুল বুঝতে পেরে রশিদাকে ফেরাতে চায়। কিন্তু শাস্ত্র-সমাজ বলেও একটা বিষয় আছে। এইরকম দুর্ঘটনাজনক পরিস্থিতিতে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী একজন মধ্যবর্তী ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। তালাক দেওয়ার পর তালাকের আগের স্ত্রী যে কোন একজন পরনারী বা অবিবাহিতা নারীর অনুরূপও নয়। তাকে নিয়ে ঘর করা সমাজের

চোখে হারাম। তাকে আবার নতুন করে বিয়ে করাও নাকি হারাম কাজ। তাকে ফেরৎ পাওয়া তখনই সম্ভব যখন সেই স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষের বিয়ে দিয়ে আবার তালাকের মাধ্যমে হারাম করে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা সমাজ ঠিক করে দেয়। জানুটোলা গ্রামের সাদেক মিয়াঁ, অনেকে সাদেককে প্রকাশ্যে সাদিখান বলেও সম্বোধন করে থাকে। এই কাজের জন্য প্রায় সমাজ-নিযুক্ত সাদেকই মধ্যবর্তী ব্যক্তি, সাদেক মিয়াঁ একাজে পেশাদার একজন মানুষ। সাদেক রশিদাকে বিয়ে করেছে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে। তিন মাসের জন্য রশিদা চলল সাদেকের সঙ্গে ঘর করতে প্রস্তুত। বাহারুদ্দিন নিরুপায় হয়ে তার একমাত্র জীবিকার উপায় গোরুর গাড়িটি দশহাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু সাদেক মিয়াঁও পাক্কা ধুরন্দর লোক। সে রশিদার রূপ-যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, সাদেক রশিদাকে তিন মাস পার হয়ে গেলেও ছাড়তে রাজি নয়। এদিকে রশিদাও মন দিয়ে সাদেকের সঙ্গে সংসার ভালোভাবেই করতে লাগল। বাহার ভেবে পেল না এই মুহূর্তে তার কি করা উচিৎ। রশিদা বলত-

"জানোয়ারের ভালোবাসায়, জানোয়ারের সেবায় কোন খাদ নেই।"[১]

এদিকে বাহার তার আরবি ঘোড়াটিকে অর্থাৎ সোরাবকে খুঁজতে লাগলো সেই বাঁধের ধারে ধারে। একসময় সোরাবকে খুঁজেও পেল। খুঁজে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মন অনেক হালকা হল। এরপর তাকে নিয়ে পাড়ি দিল সুদূর তেপান্তরের পাড়ে চলে যাওয়ার স্বপ্নের রাজ্যে।

নিম্নবিত্ত মানুষদের যা শেষ অবলম্বন, তাকে আঁকড়ে তারা বেঁচে থাকতে চায়। বাহারুদ্দিন সোরাবকে পেল, কিন্তু পোড়া কপাল, সোরাবকে পেয়ে বাহারুদ্দিন একটু সান্ত্বনার যে স্পর্শ পেয়েছিল তা বেশিক্ষন স্থায়ী হলো না। বন্যার ফলে পশুগুলোকে বাঁধের যে ভাগে রাখা হয়েছিল সেই অংশটা রাত থেকেই ভাঙন ধরতে শুরু করেছিল। রাতটা কোনমতে কাটলেও ভোরের দিকে পুরো ভাগটাই সবটাই গঙ্গায় সলিল সমাধি ঘটল। বাহারকে রেখে সোরাবও চলে গেল। এই ভাবেই শেষ হয়ে গেল একটা পরিবার। নিম্নবিত্ত মানুষদের অবলম্বন যদি চলে যায় তাহলে তার বেঁচে থাকার আশাও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যায়। স্ত্রী, ঘোড়া সবকিছু হারিয়ে বাহারুদ্দিন সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ল।

এরপর আশা যাক এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র লক্ষ্মীতারার প্রসঙ্গে। যার বসবাস মালদা জেলার ভূতনী দিয়ারা অঞ্চলে। সমাজের সব লোকে তাকে দেয়াশিন নামে চেনে। লক্ষ্মীতারা নাকি মানুষের মনের দুঃখ, যন্ত্রণা, রোগ জ্বালা সবকিছু ভুলিয়ে দেয় বলেই সকলে বিশ্বাস করে। অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা আসে নিজেদের জীবনের যন্ত্রণাদায়ক ঘটনার উপশম ঘটাতে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মানুষজন আসে লক্ষ্মীতারার কাছে। শনিবার এবং মঙ্গলবার লক্ষীতারা কপালে সিদূর লেপটে, মাথার চুলকে উচুঁতে বেধে, পরিষ্কার গাড়ি পড়ে, সাক্ষাৎ দেবী হয়ে বসে পড়ে দেয়াশিনের থানে। লোকেরা তাদের নিজেদের মনের কথা তার সম্মুখে খুলে বলে। লক্ষ্মী তাদের কথা মন দিয়ে শোনে তারপর তাদেরকে জামা তুলে পিঠ আলগা করে মাথা নীচু করতে বলে। সবশেষে সে নিমের ডাল দিয়ে তিন বার পিঠে আঘাত করে আর মুখে বলে 'ভুলো-ভুলো ভুল যাও'। নিম্নবিত্ত মানুষদের মধ্যে কুসংস্কার যে প্রকট তা আমরা এখান থেকে আন্দাজ করতেই পারি। আর এভাবেই নাকি মানুষের পাপবোধ, দগ্ধস্মৃতি, বুকের আগুন জ্বালা থেকে শান্তি, মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লোকে দেয়াশিন লক্ষ্মীতারার শরণাপন্ন হয়। লক্ষ্মীতারারা দেহাতি, সমাজের চোখে তারা নিচু জাতি। কিন্তু সেই লক্ষ্মীই যখন দেয়াশিনের থানে বসে তখন সমাজের অনেক উচ্চবিত্তরাও আসে তার কাছে

প্রতিকার চাইতে। সেইসময় জাতপাত বিচারের দরকার পড়ে না। বংশানুক্রমে তারা আরোগ্য বিধির ক্রীতদাসী। লেখকের ভাষায়-

> "লক্ষ্মীতারা এক নদীদ্বীপ বাসীনি। বংশানুক্রমে আচরিত এক বিশ্বাস-আরোগ্য বিধির ক্রীতদাসী সে। সপ্তাহের একটি দিন প্রায়ান্ধকার একটি ঘরে পাথরের একখানা বিগ্রহের সামনে তাকে বসতে হয়। তাকে তেল, সিঁদূর, কাজল দিয়ে সাজতে হয়, চুল বাঁধতে হয় বিশেষ ছাদের খোঁপাতে। তাকে তখন স্বয়ং দেবী অথবা দেবদাসীর মতো মনে হবে। তাকে সবাই এখানে দেয়াশিন বলেই জানে। যদি কোন স্মৃতি তোমাকে দগ্ধ করতে থাকে, যদি কোন পাপ বা পাগ বোধ তোমাকে শত অনুতাপেও রেহাই না দেয়, যদি তোমার বুকের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকে, তাহলে মানিকচক, সাহেবগঞ্জ, রাজমহল, কাটিহার-এর মানুষ তুমি দেয়াশিন লক্ষ্মীতারা শরণাপন্ন হবে। নগ্ন গায়ে তোমাকে বসতে হবে নতজানু হয়ে। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে লক্ষ্মীতারা শুনবে তোমার অনর্গল হৃদয়ের কথা, তোমার স্বীকারোক্তি, এমনকি নিষেধের উঁচু দেয়াল ডিঙিয়ে ওপারে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বীকারোক্তি।"[২]

এভাবে সাধারণ মানুষের কথা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন অভিজিৎ সেন। সমাজের চোখে যারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত যাদের কথা কেউ বলতে পছন্দ করে তাদের কথা এতো সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন।

অভিজিৎ সেন ব্যক্তিগত জীবনে সরাসরি নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেইসময় তিনি যে সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সেই অভিজ্ঞতার ছাপ তার অনেক গল্প- উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। নকশালদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত এমনই একটি উপন্যাস হল 'লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা'। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভব্রত একজন নকশালবাদী কর্মী। সে শহুরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। শহরে একটা ঘটনা ঘটানোর পর গা ঢাকা দেওয়ার জন্য তাকে গ্রামে পাঠায় তার দল । গ্রামে এসে সে সোহরাব আলি নামক এক দরিদ্র কৃষকের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সোহরাব নিজেও সরাসরি নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। চৌঘরা গ্রামের সোহরাবের বাড়িতে তার ভাবী ও মূলজানের সঙ্গে পরিচয় হয়। ভাবী ছিল শুভব্রতর কেয়ারটেকারের মত। তার সমস্ত কিছুর দেখাশোনা করত। তার কখন, কী প্রয়োজন সব ভাবীর মারফৎ-ই হত। কিন্তু ভাবী ও সোহরাবের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক সরল ছিলনা। দেওর বৌদি সম্পর্ক তো নয়ই। বরং তার থেকে উপরেই স্থান ছিল ভাবীর। ভাবীর স্বামী মাদারবক্স ছিল পাগল, এই কারণেই ভাবী সোহরাবকেই আঁকড়ে ধরে বাকি জীবনটা বাঁচতে চেয়েছিল। এদিকে শুভব্রত মনে মনে ভেবেছিল-

> "কিন্তু সোরাব আলী আর ভাবীর সম্পর্ক তার কাছে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকল না। আর আশ্চর্য, ভাবী মাসখানেকের মধ্যেই প্রকারান্তরে তাকে জানিয়ে দিল সম্পর্কটা। ততদিনে শুভব্রতর সঙ্গেও তার সম্পর্ক সহজ হয়ে গেছে। চৌঘরার অত্যন্ত শ্লথ গ্রাম্য জীবনে শুভব্রত যেমন নতুন নতুন গাছ, লতাপাতার নাম ও রূপ চিনতে লাগল, তেমনি এই সীমাহীন গরীব মানুষদেরও চিনতে লাগল। বুঝতে শুরু করল বাঙালি গরিব মুসলমানের ব্যক্তি, শ্রেণি ও সমাজকে।"[৩]

এইভাবেই শুভব্রত নিম্নশ্রেণির মানুষদেরকে ধীরে ধীরে বুঝতে লাগল। তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিখে গেল।

চৌঘরা গ্রামের পাশের গ্রামের নাম অমৃতখণ্ড। এই গ্রামে কাওরা সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস। এরা সমাজে নিম্নশ্রেণির মানুষ হিসেবে বিবেচিত। এরা চৌঘরার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের থেকেও গরীব। সোরাব শুভব্রতকে এই সমস্ত মানুষদের কথা বলতে গিয়ে বলে-

> "কাওরারা কাহনের ধার ঘেঁসে নীচু জমিতে ঘর বেঁধে থাকে। কাহনের জল ছেঁচে মাছ কুঁচে শালুক বুনো শাকপাতা কন্দফল, এসব সংগ্রহ করে কাওরাদের মেয়েরা। পুরুষেরা বিলের অভ্যন্তরে নিরাপদ ঝোপঝাড়ের আড়ালে চোয়ানির ভাটি বসায়, লোকের বাড়িতে ঘরোয়া মজুরের কাজ করে। চুরি-ডাকাতিরও দুর্নাম আছে কারও কারও। মেয়েদের মধ্যে গোপনে কিংবা প্রকাশ বেশ্যাবৃত্তির চল আছে। এই যাবতীয় কাজকর্মের জন্য স্ত্রী-পুরুষের প্রধান ভরসা অমৃতখন্ড এবং তার দক্ষিনে অশ্বথ গ্রামের বর্ধিষ্ণু উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কাওরা পুরুষেরা অত্যন্ত অলস এবং নেশাখোর। স্ত্রীলোকদের প্রধান কাজ ঝিয়ের ও দাইয়ের কাজ ইত্যাদি।"[৪]

কাওরা পাড়ার মতোই গুনপুরের দুলে পাড়াও নিম্নশ্রেণির মানুষদের বাস। এরা দুলে সম্প্রদায়ের মানুষ। নলিন, বঙ্কু ও বলরাম সকলে দুলে পাড়ার বাসিন্দা। এরা সকলেই নকশালপন্থী। গ্রামে কাজ করার সুবিধার্থে শুভব্রতর সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দেয় সোরাব। সোরাব বলে-

> "দুলেদের বংশগত পেশা ছিল পালকি-বেহারার কাজ করা। এখন আর দোলা কিংবা পাল্কির প্রচলন প্রায় নেই-ই বলতে গেলে।...কেউ কেউ চাষের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে চেষ্টা করছে বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু চাষের কাজে দুলেরা খুব দক্ষ নয়। এ কাজ কোনদিন তাদের বাপ-ঠাকুর্দা করেনি।... দুলেদের কামচোর হিসাবে নিন্দা-প্রচার আছে। দুর্নাম আছে চোর-ছ্যাঁচোর বলেও। দুলেনীদের শরীর বেচার অর্থাৎ গোপন বেশ্যাবৃত্তিও খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তারা গ্রামে এবং গ্রামের বাইরেও অবস্থাপন্ন গৃহস্থবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। অধিকাংশেরই কোন জমিজমা নেই অসম্ভব উদ্যোগহীন এই দুলেরা। খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই বলে হিন্দু ও মুসলমানদের কাছে এরা খুবই ঘৃণ্য।"[৫]

জাতপাতের ঊর্ধ্বে মানুষ কখনই যেতে পারেনি। গ্রামের দিকে এই বিষয়টি আরো প্রকট। গ্রাম্যসমাজে জাতপাত নিয়ে ভীষণভাবে মানুষ মেতে থাকে। শুভব্রত গ্রামে থাকাকালীন গ্রামের মানুষদের আরো ভালোভাবে জানতে পেরেছে। সে জানতে পেরেছে গ্রামের কোন সীমায় কোন শ্রেণির মানুষের অবস্থান। গ্রামের এই দুলে বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষজন মুসলমানদের কোরবানি ঈদের সময় গরীব মুসলমানদের সঙ্গে অবস্থাপন্ন মুসলমানদের বাড়ি গিয়ে মাংস সংগ্রহ করে থাকে। এইরকমই একটা দাওয়াতে শুভব্রত নিমন্ত্রণ পায় তার দুলে বন্ধুদের কাছ থেকে। সেদিন পাড়ায় হাজি সাহেবের ছেলের বিয়ে ছিল, মাইকে গান বাজছিল, আর শুভব্রত তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দুলে পাড়ায় গিয়েছিল। শুভব্রতর দুলে বন্ধু বলরামের বাড়িতে তার স্ত্রী বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে খাবার পরিবেশন করেছিল। খাবার মুখে তোলার পরই শুভব্রতর কেমন যেন বিস্বাদ লাগে। তার মনে হয় তাকে যে মাংস দেওয়া হয়েছে তা পূর্বে কারও দ্বারা চর্বিত

হয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়। সেই খাবার মুখে তোলার কারণে বাড়ি আসার সময় বারবার বমি করে নিস্তেজ হয়ে পড়ে সে। এইরকম এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে থাকল শুভব্রত।

অভিজিৎ সেন অল্পবয়সে থেকেই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষদের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। এদের সুখ-দুখ, সুবিধা-অসুবিধাকে খুব কাছ থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। একই আন্দোলনে জড়িত হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে। নিম্নশ্রেণির মুসলমানের বাড়িতে দীর্ঘদিন থেকেছেন। তাই তার গল্প-উপন্যাসগুলিতে এই সমস্ত মানুষদের কথায় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষজনই তো সমাজের ভিত তৈরি করে। তাই তাদেরকে উপেক্ষা করা মানেই সমাজকে উপেক্ষা করা। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তদের মতো তাদের অনেক চাহিদা থাকে না, তারা অল্পতেই সন্তুষ্ট। বিভিন্ন ধরনের সংস্কারে তারা বিশ্বাসী। আর এই সমস্ত মানুষদের কথাই অভিজিৎ সেন তার আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে খুব সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. সেন অভিজিৎ, 'নিম্নগতির নদী', প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ-৮৩।
২. তদেব, পৃ. – ৬৭।
৩. সেন অভিজিৎ, 'লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা', প্রথম প্রকাশ- জে এন সি, ডিসেম্বর ২০১৫, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ-১০৬।
৪. তদেব, পৃ. – ১৪৩।
৫. তদেব, পৃ. – ১৭৫।

আকর গ্রন্থ:

১. সেন অভিজিৎ, 'নিম্নগতির নদী', প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৬।
২. সেন অভিজিৎ, 'লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা', প্রথম প্রকাশ- জে এন সি, ডিসেম্বর ২০১৫, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী প্রফুল্লকুমার, 'প্রান্তিক মানব', দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা- ৬, প্রকাশ – পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯।
২. দেবসেন সুবোধ, 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৯, প্রকাশ – ১৯৯৯।

দেশভাগের তীব্র প্রতিচ্ছবি তুলসী লাহিড়ীর ‘বাংলার মাটি’

সফিকুল ইসলাম
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা: ১৯৪৭ সালের দেশভাগের তীব্র প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সমসাময়িক বিভিন্ন নাটকে। দেশভাগের ফলে উভয় বাংলায় সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বাস্তবভাবে চিত্রিত করেছেন তুলসী লাহিড়ী ‘বাংলার মাটি’ নাটকে। এ নাটকে বাংলার বুকে কিরকম ভয়াবহ অবস্থা ফুটে উঠেছে দেখানো হয়েছে।

মূল প্রবন্ধ:

তুলসী লাহিড়ীর প্রতিটি নাটকেই সমাজ-সমস্যা বিশেষভাবে দেখা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন একটি বিশেষ তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা নাট্যকারের পরোক্ষ দায়িত্ব। নাট্যকার জানিয়েছেন সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি 'বাংলার মাটি' নাটকটি রচনা করেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর যে সকল হিন্দু পরিবার পূর্ববঙ্গে থেকে গিয়েছিল তাদের সমস্যার নানাদিক আলোচ্য নাটকে চিত্রিত হয়েছে। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের ভাব ও ভাবনার মিশ্রণে এই নাটকের কাহিনিকে সাজিয়েছেন। নাটকটি রচনা সম্পর্কে নাট্যকার ‘নাটকের ভূমিকাংশে’ বলেছেন-

> “এ নাটক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যাই হোক না কেন এটা ভাঙ্গা বাংলার বর্তমান ভাঙ্গা মনের কাহিনী। বাংলা ভাগের পর থেকে যা দেখেছি শুনেছি ভেবেছি বুঝেছি তাই দিয়ে এ নাটক সাজিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমার চিন্তায় যতটুকু পেয়েছি তারও একটু ইঙ্গিত দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।”[১]

নাটকটির কাহিনি গড়ে উঠেছে পূর্ববঙ্গের এক ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু পরিবারকে কেন্দ্র করে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে এসে গেছে মুসলিম চরিত্র। নাট্যকার এই নাটকে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের ও জীবনের ভালো ও মন্দ দুইই ফুটিয়ে তুলেছেন। যুগ-যুগান্তর ধরে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বাস করলেও কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তের ফলে মানুষ ভেদ- বুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতি-ধর্ম-সংস্কারের ঊর্দ্ধে ভাষাগত আত্মীয়তার সূত্রে প্রাপ্ত অখন্ড বাঙালিত্বের চেতনা বিচ্ছিন্ন হিন্দু মুসলিমকে এক সূত্রে বাঁধে। নাটকের শেষে দেখি, বৃদ্ধ কালীবাবু পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেন।

‘বাংলার মাটি’ তিন অঙ্কে বিভক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখি, দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভের পর, পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া কালীবাবুর পরিবারের আশাভঙ্গজনিত কাহিনি। অবসরপ্রাপ্ত কালীবাবুর পরিবারে তিনি ছাড়া আছে বিধবা পুত্রবধূ কিরণশশী, বয়স্কা অবিবাহিতা নাতনী চিত্রা আর নাতি লটকা। বাংলা বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হলে দলে দলে হিন্দু বাস্তত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়। কালীবাবুর পাড়ার প্রায় সবাই পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছে। পাড়ায় যেকটি মানুষ আছে তারাও ভয়ে সুযোগ বুঝে চুপি চুপি বাড়ি-ঘর বিক্রি করে চলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। যারা মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তারাও

বাড়ির মেয়েদের গ্রাম থেকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসেছেন। পাকিস্তানি শাসনে হিন্দুরা তাদের বাক্ স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। তারা যেন ছায়া দেখলেই ভয়ে চমকে ওঠে। এই রকম অন্তহীন আশঙ্কা ও অশান্তির মধ্যে কালীবাবু প্রতিদিন জীবনযাপন করছেন। তিনি বৃদ্ধ, নিঃসহায়, পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর পুরো পরিবারটির দায়িত্ব তার উপরে। কী করবেন, কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ায় নাতি নাতনীর পড়াশুনা বন্ধ, গুন্ডা বদমাইসের ভয়ে স্কুল-কলেজে যেতে পারে না। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর কালীবাবুর বাড়ি ভাড়া না দিয়ে ভোগ দখলের বিরুদ্ধে মামলা করলেও দীর্ঘ আড়াই বছরে তার কিছুই হয় না। তাদের যুক্তি রাতারাতি পাকিস্তানের সৃষ্টি, কিন্তু রাতারাতি তো আর প্রশাসনিক কাজ চালানোর জন্য বাড়ি তৈরি সম্ভব নয়। তাই বাড়িগুলো দখল করে সরকারি কাজ কর্ম চালানো হচ্ছে। কালীবাবুর মনে প্রশ্ন জাগে, 'খালি হিন্দুর বাড়ি REQUISITION হয় কেন?' উকিল সদানন্দবাবু পাকিস্তান প্রশাসনের স্তাবকতা করেও নিজের বাড়ি রক্ষা করতে পারে না। তার বাড়ির জন্য সরকার থেকে 'PARTIAL REQUISITION' -এর ধমক দেওয়া হয়। বাড়ি ভাড়া নিয়ে ভাড়া না দেওয়ায় কালীবাবুর মনে আইন সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে সদানন্দবাবু বলেন-

> "আইন কেতাবের পাতায় আছে। আইন মোতাবেক কাজ করার মালিক যারা, তারা যে যার মত আপন ইষ্ট। তাই হিদুর বেলায় তারা আইনের অন্য অর্থ করে।"[২]

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'এই স্বাধীনতা' নাটকেও আমরা দেখি উকিল প্রমথর বাড়ি দখল করে নেওয়া হয়। সে আইনের আশ্রয় নিলেও কোনো সুরাহা হয় না। বরং মামলা করায় তার স্ত্রী ও মেয়েকে হরণ করার চিঠি আসে। অসম্মান থেকে বাঁচতে প্রমথ এক বৃষ্টির দিনে সব কিছু ফেলে স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। আর এই নাটকের সদানন্দবাবু 'আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে, নির্লজ্জের মত চাটুবাক্য বলে' টিকে থাকে।

দেশের এইরকম অরাজক পরিস্থিতিতে কী করবে তা বুঝতে পারে না কালীবাবু। তাই শুভাকাঙ্ক্ষী, সকল অন্যায় অবিচার জুলুম থেকে রক্ষাকর্তা প্রতিবেশী আবু মিঞার সঙ্গে পরামর্শ করে। তিনি আবু মিঞার কাছে জানতে চান, এ দেশে কি আর বাস করা যাবে? কালীবাবুর প্রশ্নে আবু মিঞা স্পষ্টভাবে কিছু না বললেও তার কথায় স্পষ্ট হয় পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুত্যাগী উদ্বাস্তুদের দুর্দশা। সদানন্দের কথাতেও স্পষ্ট অনেক স্বপ্ন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে গেলেও কি করুণ পরিণতি তাদের। সেখানে 'refugee' মানে হয়েছে গালাগাল। সেখানকার মানুষ বাস্তুত্যাগীদের বিদেশীর চোখে দেখে। আনোয়ারা খাতুন হয়ে ওঠা অনিতা জানায়, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এ ক্যাম্প ও ক্যাম্প করে উড়িষ্যার অর্মদ্ধা পর্যন্ত ভেসে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা। পশ্চিমবঙ্গে দুই বছর ভেসে বেড়াতে বেড়াতে সে জীবনকে চিনেছে, চিনেছে মানুষকে। সে দেখেছে, তার মত রূপহীন নারীকেও লুটে খাবার জন্য, কত নির্লজ্জ জানোয়ার কত বেশে তার চারিপাশে ঘুরেছে। চাকরি জোগাড় করে দেবে, ঋণ পাইয়ে দেবে, ট্রেনিং সেন্টারে সুবিধা করে দেবে, কত রকম বিচিত্র সব কায়দা তাদের। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের এত সব দুর্দশার কথা শোনার পরেও চিত্রা নাছোড়বান্দা, পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবে। সে মনে করে, পাকিস্তানে নিত্য terrorised হয়ে লুকিয়ে কাঁদার চেয়ে সেখানে গিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করে জীবন যুদ্ধে মরাও ভালো। তাই মাকে অনুনয় করে চলো দেশ ছেড়ে পালাই। কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে মা কিরণশশী মেয়ের কথায় সম্মতি দিতে

পারে না। চিত্রা তখন মাকে আশ্বাস দেয়, কলকাতায় গেলে যেমন করেই হোক সে কিছু রোজগার করতে পারবেই। সে মাকে আরও বলে, মনে শান্তিতে থেকে এক বেলা খেলেও সুখ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিমদের হিন্দু বিদ্বেষের কারণ হিসেবে নাট্যকার বলেছেন, 'বর্তমান বাংলার অধিকাংশ মুসলিম অতীতের হিন্দু সমাজের অত্যাচার জর্জরিত বিদ্রোহীর দল।' সামাজিকভাবে দীর্ঘদিন মুসলিমদের অস্পৃশ্য করে রাখা, দীন করে দেখাই মুসলিমদের হিন্দু বিদ্বেষের কারণ বলে নাট্যকার মনে করেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে আবু মিঞা-কালীবাবু-চিত্রার কথোপকথনে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। আবু মিঞার কথায় জানা যায়, আবু মিঞার সঙ্গে কালীবাবুর পরিবারের ভালো সম্পর্ক থাকলেও মুসলিম আবু মিঞার জন্য আলাদা চায়ের কাপ। এমনকি সেই চায়ের কাপ ধুয়ে স্নান করতে হত। চিত্রার বয়সের চেয়ে বেশি বয়সের সেই চায়ের কাপে আমরা আবু মিঞাকে চা খেতে দেখি। আবু মিঞার গল্প থেকে জানতে পারি, থিয়েটার হলে পিকনিক হলে কালীবাবু রান্না করে পরিবেশন করতেন কিন্তু খেতেন না। এই অস্পৃশ্যতা তখন সমাজে প্রবলভাবেই বর্তমান ছিল। আবু মিঞার কথাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, হিন্দুর মুসলিমের প্রতি ঘৃণা ও অনাদরই আজকের এই অশান্তির জন্য অনেকাংশে দায়ী। আবু মিঞার কথায়-

> "এই সংস্কারটুকু তোমরা যদি জাঁক করে জাহির না কত্তে তাহলে দেশ জুড়ে এত লোকের এত অশান্তি বোধ হয় হত না।"[৩]

হিন্দুর এই অস্পৃশ্যতা দোষ বেশিভাগ মুসলিমই বাতিক বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু চতুর শ্রেণির মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল। প্রথমে হিন্দু মুসলিমের বিভেদ সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও ক্রমশ তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। দ্বিতীয় অঙ্কেও ছলিমের কথায় হিন্দু-মুসলিমের সামাজিক বৈষম্য উঠে এসেছে। ছলিম কালীবাবুকে অনুযোগ করে বলেছে, আপনারা মানুষের সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার করতেন এবং করেন। এ প্রসঙ্গে ছলিম বেদনাদায়ক একদিনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে-

> "শ্যামু তখন ছোট। তার সঙ্গে রূপকথা শুনতে আমি এ বাড়ীতে আসতাম। সে বেচারী তখনও হুঁসিয়ার হয় নাই। তাই ডেকে ঘরে নিয়ে যেত। একদিন বিছানায় বসেছিলাম বলে, আপনি এবং খুড়ীমা তাকে দিয়ে চাদর সতরঞ্চী অবধি ধুইয়েছেন। সে কথা আমি ভুলিনি। শ্যামু কেঁদেছিল। বলেছিল, 'আমাদের বাড়ী আর আসিস্ না ছলিম।"[৪]

এই অভিজ্ঞতাই ছলিমকে হিন্দুদের সম্পর্কে কঠোর করেছিল। সে চেয়েছিল আচার- বিচার পালন করা হিন্দুদের পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দিতে। ছলিম কালীবাবুকে সতর্ক করে বলেছিল, পাকিস্তানে আচার বিচারের ফুটানী ছাড়তে না পারলে বিপদে পড়বেন।

স্বাধীনতা পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটায়। এতদিন যারা অবহেলিত ছিল, সেই মুসলিম শ্রেণিই পূর্ববঙ্গের শাসন ক্ষমতার অধিকার পায়। নতুন রাষ্ট্র সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিমদের আত্মপ্রকাশের এক বৃহৎ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তারা মনে করে, হিন্দুর কোনো স্থান নেই নতুন রাষ্ট্রে। ইসলাম রাষ্ট্রে হিন্দুরা অবাঞ্ছিত। এতদিন অবহেলিত মানুষগুলি হিন্দু বিদ্বেষে মেতে ওঠে। কালীবাবুর উদ্দেশ্যে ছলিমের কথায় মুসলিম চরিত্রের এই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "ইংরেজ ডেকে এনে রাজ্য পাইয়ে দিয়ে মুসলমানদের সর্বনাশ করে যে সব সুবিধে আপনারা ভোগ কত্তেন, তা ত আর এখন সম্ভব নয়।... দেড়

> শত বছর রাজ শক্তির খিদমৎ করে সহজ সরল মুসলমানদের ধন দৌলত যে ভাবে আপনারা হাতিয়ে নিতেন- এখন এরা তার বদলা নিচ্ছে।"[৫]

ছলিমের এই মনোভঙ্গী হিন্দুর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে। সাধারণ হিন্দু নতুন রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার অধিকারের প্রশ্নে ক্রমেই আশাহত হতে থাকে। কিছু সংখ্যক মুসলিম নানাভাবে বুঝিয়ে দেয়, হিন্দুর কোনো স্থান নেই, ইসলামরাষ্ট্রে তারা অবাঞ্ছিত। স্বদেশে ও স্বভূমিতে হিন্দুর বিপন্নতা, সামাজিক নিগ্রহ, পরবশ্যতার গ্লানি চিত্রার কথায় পরিস্ফুট-

> "এখানে যেন সবার কাছে হীন। সবার কাছে অপরাধী। ঘৃণা আর দয়া, দুয়েতেই সমান জ্বালা। অপমানের আগুনে পুড়ছি আর দেঁতো হাসি হেসে সবার সঙ্গে আলাপ খাতির কচ্ছি।"[৬]

পাকিস্তানে অপরাধীর মত হীন হয়ে, অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকতে চায়নি চিত্রা। তাই বাড়িতে অনেকবার বলে সম্মতি না পাওয়ায়, কাউকে কিছু না জানিয়ে চিত্রা প্রতিবেশী নুরু মিঞার সঙ্গে গোপনে কলকাতায় রওনা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দু'জনেই স্টেশনে ধরা পড়ে যায়। এই নিয়ে শহরে রই রই পড়ে যায়। বিপত্নীক ধূর্ত উকিল সদানন্দ চিত্রাকে বিয়ে করার অভিলাষে কালীবাবুকে নূরুর বিরুদ্ধে S.D.O কোর্টে নারীহরণের মামলা করার পরামর্শ দেয়। সে নানাভাবে কালীবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, হিন্দু মানসম্মান নাহলে থাকবে না। শহরে এই বিষয় নিয়ে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলতে থাকে। সমস্ত ঘটনাই সদানন্দ করেছে তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। চিত্রার পূর্ব পাকিস্তানে ভালো লাগছিল না, তাই সে কলকাতায় যাচ্ছিল- এই ছোট ঘটনাকে সদানন্দ Minority Board-এর ভবানীবাবুর কাছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করেছিল। সদানন্দ নানাভাবে বোঝালেও চিত্রা নুরুর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলতে রাজি হয় না। ছলিম মমতাজ মিঞার কাছে নুরুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার চেষ্টার কথা জেনে কালীবাবুর বাড়ি আসে এর পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করতে। তিনি উকিল সদানন্দকে মনে করিয়ে দেন, 'জমানা বদলে গেছে সেটি হুঁস নেই।' সদানন্দকে শাসিয়ে বলে-

> "উকীল বাবু আপনি একটি প্যাঁচ ক'চ্ছেন- পাঁচটি প্যাচ আপনার জন্য তৈরি হচ্ছে। এ দেশ ছেড়ে গিয়ে রিফীউজী হয়ে কলোনীতে হোগলার ঘরে বাস কত্তে হবে। তৈরী হোন গিয়ে।"[৭]

ছলিম জেনেছে নুরু নির্দোষ। সে একজন সাধারণ বন্ধুর মত চিত্রাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। টিকিট কেটে দিয়েছে আর কলকাতায় চিত্রার বন্ধু স্টেশনে না এলে তার বাড়িতে চিত্রাকে পৌঁছে দেবে। ছলিমের কথায়, একটি হিন্দু ভদ্রলোকের মেয়ে মুসলিমের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল বলে সব হিন্দু গেল গেল রব করে বেসামাল হয়ে উঠেছে। তার কথায়, হিন্দু ভদ্রলোকেরা মুসলিমদের মানুষ বলেই মনে করে না। আনসার বাহিনীও আসে চিত্রার জবানবন্দী নিতে। তারা খবর পেয়েছে মিথ্যা মামলা করার চেষ্টা চলছে। মিথ্যা মামলা থেকে শহরে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় তারা বড় কঠোর। চিত্রা বাড়ি না থাকায় একটু ঘুরে আসতে বললে আনসার বাহিনী জানায় ঘোরাঘুরির সময় তাদের নেই। তাদের সব সময় সচেতন থাকতে হয়। কারণ তাদের ধারণা পঞ্চম বাহিনীর হিন্দুরা নানা কায়দায় দেশের ধন সম্পদ সরানোর ষড়যন্ত্র করছে। কালীবাবু চিত্রা-নুরুকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবু মিঞা সকল দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কালীবাবুকে পরামর্শ দেন তার নাতি নুরুর সঙ্গে চিত্রার বিয়ে দিতে।

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী স্বাধীনতালাভের পর পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল হিন্দু থেকে গিয়েছিল, তাদের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা বাস্তবসম্মত। অনেক আশা নিয়ে, দেশকে ভালোবেসে যেসকল হিন্দু সেখানে থেকে গিয়েছিলে, কিছু দিনের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষের শিকার হয়ে তাদের আশাভঙ্গ হয়। তাদের সঙ্গে অন্যায় হলেও প্রশাসনিকভাবে তারা ন্যায় পেতেন না। তাদের নানাভাবে পর্যদুস্ত করে রাখা হয়েছিল। অত্যাচারিত হতে হতে তারা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার তখনও তাদের বাধা দেওয়া হত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন ও কিছু মুসলিম জনগণ মনে করত হিন্দুরা দেশের সম্পত্তি ভারতে পাচার করছে। অধিকাংশ হিন্দু মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায় গুন্ডা, বদমাইসদের নোংরামোর কারণে। আইন আদালতে হিন্দুরা যে সঠিক বিচার পেতো না, তারও বাস্তব চিত্র আলোচ্য নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তেই সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভয়ে ভয়ে কাটাতে হত- কখন কী থেকে বিপদ আসে। নাটকের অন্যতম চরিত্র কালীবাবু নাতি লঙ্কাকে পরামর্শ দেয়, 'খুব বুঝে সুঝে কথাবার্তা বলবি'। কালীবাবুর কথায় বোঝা যায়, হিন্দুরা কতখানি স্বাধীনতাহীনতায় ভুগছিলেন। নাট্যকার হিন্দু হয়ে হিন্দুর দোষ ত্রুটি বেশি দেখানোর ফলে নাট্যকাহিনি স্থানে স্থানে অবাস্তব হয়ে পড়েছে। আদর্শ চরিত্র রূপে চিত্রিত আবু মিঞা চরিত্রটির মুখে হিন্দু- মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে কথাগুলি শোনা যায়, তা পুরোপুরি বাস্তবতাকে রক্ষা করতে পারেনি। কালীবাবুর পরিবারের কথা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষের যে দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বাস্তবসম্মত। নাটকটি রচনায় নাট্যকার শিল্পগুণের পরিচয় দিলেও নাটকের পরিণতি রচনায় বাস্তবতার পরিচয় দিতে পারেন নি। এখানে নাটকটি সম্পর্কে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যটি উল্লেখ করা হল-

> "বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার হিন্দুর পারিবারিক জীবনের সমস্যাটি এখানে বাস্তব রূপ লাভ করলেও ইহার সমাধান নিতান্ত অবাস্তব।"[৮]

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পর যে সকল হিন্দু পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের আত্মযন্ত্রণার কাহিনি নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'বাংলার মাটি' নাটকে চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার নাটকের ভূমিকাংশেই নাট্যকাহিনির বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন। 'বাংলার মাটি' নাটকটি পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের ও জীবনের ভালো দুই দিকই। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে হিন্দুরা যে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন সেই বাস্তব সত্য আমরা নাটকটি পাঠে জানতে পারি। আর যারা থেকে গিয়েছিলেন তারা যে কতটা স্বাধীনতাহীনতায় ভুগছিলেন তা নাটকের অন্যতম কালীবাবু চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ায় হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভয়ে স্কুল কলেজে যেতে পারত না। এই বাস্তব চিত্র আমরা 'বাংলার মাটি' নাটকটি পাঠে জানতে পারি।

দেশভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার থেকে অনেক বাড়ি দখল করে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো হচ্ছিল। পাকিস্তান সরকারের যুক্তি ছিল রাতারাতি পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ায় প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার্থে বাড়ি দখল করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায়, শুধুমাত্র হিন্দুর বাড়ি দখল করা হয়েছিল। প্রশাসনিক কাজের জন্য বাড়ি নিয়ে ভাড়াও দিত না বাড়ির মালিককে। ভাড়া না পাওয়ার জন্য বাড়ির মালিক আইনের দারস্থ হলেও আশানুরূপ সাহায্য পেতেন না। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী আলোচ্য নাটকে কালীবাবু এবং উকিল সদানন্দবাবুর বাড়ি সরকার থেকে দখলের চিত্র দেখিয়ে তৎকালীন বাস্তব চিত্র তুলে ধরছেন।

দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুরা কীভাবে মুসলিম রাষ্ট্রে ছিল তারও বাস্তব চিত্র নাট্যকার এ নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার বলেছেন, পাকিস্তানের প্রশাসনের কাছে নত হয়ে, নির্লজ্জের মত চাটুবাক্য করে টিকে থাকত হত।

'বাংলার মাটি' নাটকে নাট্যকার অনিতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তুদের কী পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল তার বাস্তব রূপ অঙ্কন করেছেন। অনিতার মত অনেক নারীকেই দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে দেহ ব্যবসায়ীদের জালে পড়তে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের দুর্দিনের সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ কাজ পাইয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের জীবনকে যে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছিল এই বাস্তব সত্যই আমরা 'বাংলার মাটি' নাটকে খুঁজে পাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিমদের হিন্দু বিদ্বেষের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন, সামাজিকভাবে দীর্ঘদিন হিন্দুদের দ্বারা মুসলিমদের অস্পৃশ্য করে রাখা। নাটকে আমরা দেখি, কালীবাবুর সঙ্গে প্রতিবেশী আবু মিঞার পারিবারিক সম্পর্ক ভাল হলেও হিন্দু সংস্কারবশত আবু মিঞার জন্য আলাদা চায়ের কাপ ছিল। নাটকের আর এক চরিত্র আবু মিঞার ছেলে ছলিমের কথাতেও হিন্দু সংস্কারের কথা উঠে এসেছে। বাস্তবিকই হিন্দুরা দীর্ঘদিন মুসলিমদের সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। তারপর যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়, শাসন ক্ষমতায় বসে মুসলিম শাসক, তখন হিন্দুদের প্রতি দীর্ঘদিনের ক্ষোভ বেরিয়ে আসে।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমরা মনে করত রাষ্ট্র ভাগ না হলে তাদের হিন্দুদের শাসনে থাকতে হত। তারা মনে করত হিন্দুরা মুসলিমদের সর্বনাশ করে ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা পাইয়ে দিয়েছিল। তারা মনে করত ইংরেজ শাসনে থাকার সময় হিন্দুরা ইংরেজদের তোষামদ করে সবরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলিমের এই রকম মনোভঙ্গী হওয়ার জন্য হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই বাস্তব চিত্র নাট্যকার তাঁর 'বাংলার মাটি' নাটকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মুসলিমদের হিন্দু বিদ্বেষের ফলে হিন্দুরা হয়ে পড়েছিল সকলের কাছে হীন। মুসলিমরা মনে করত হিন্দুরা অপরাধী। অপরাধীর মত হীন হয়ে, অপমানিত হয়ে নিঃসহায়, সম্বলহীন কিছু মানুষ থেকে গেলেও কিছু সংখ্যক মানুষ অপমান থেকে মুক্তি পেতে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে, পাকিস্তান সরকার তাতেও বাধা দিয়েছিল। এই বাস্তব সত্যও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী এই নাটকে চিত্রা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাটকটি বিশ্লেষণে দেখা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের আশাভঙ্গ হয়নি, সাধারণ মুসলিমদের ও আশাভঙ্গ হয়েছিল। সাধারণ মুসলিমেরা মনে করেছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে কাজ ভাল হবে, টাকা পয়সার সুখ হবে, মানুষ ভাল খেতে পারবে, ভাল পরতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নানা রকম ট্যাক্সের চাপে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সাধারণ মুসলিমের মনের কথাই নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী এই নাটকে তুলে ধরেছেন। এই নাটক থেকে আমরা আরও জানি যে, দেশভাগ হয়েছিল উজির, নাজির, সুবেদার হওয়ার জন্য। নাটকের এক চরিত্র রিকসাওয়ালা গরীবুল্লার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বলেছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সরকারি চাকরি-ওয়ালাদের সুখ হয়েছিল। বিদ্বেষের শিকার হয়ে হিন্দুদের একে একে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়াকে সাধারণ মুসলিম কীভাবে দেখতেন তারও বাস্তব সত্য নাট্যকারের এই নাটক থেকে জানা যায়। নাটকের চরিত্র গরীবুল্লার কথা থেকে জানতে পারি, হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সম্পত্তি ভোগ করার

জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী মুসলিম ষড়যন্ত্র করে হিন্দুদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন। পাকিস্তান সরকারের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়া এবং বাঙালিদের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলনের বাস্তবচিত্রও 'বাংলার মাটি' নাটকটি বিশ্লেষণে আমরা পাই। তবে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিমের যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নাট্যকার নাটকের শেষে চিত্রিত করেছেন তা বাস্তবতাকে রক্ষা করতে পারেনি।

তথ্যসূত্র:

১. ড. সনাতন গোস্বামী (সম্পাদক), তুলসী লাহিড়ীর নাট্যসমগ্র, বাংলার মাটি, ভূমিকাংশ, প্রজা বিকাশ, কলকাতা-০৯, বইমেলা ২০১২, পৃ. ৩১০।
২. ড. সনাতন গোস্বামী (সম্পাদক), তুলসী লাহিড়ীর নাট্যসমগ্র, বাংলার মাটি, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-০৯, বইমেলা ২০১২, পৃ. ৩২১।
৩. তদেব, পৃ. ৩১৭
৪. তদেব, পৃ. ৩৪৮-৪৯।
৫. তদেব, পৃ. ৩৪৮।
৬. তদেব, পৃ. ৩২৮।
৭. তদেব, পৃ. ৩৪৯।
৮. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় গন্ড, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং গ্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, দ্বিতীয় সংস্করণ- বৈশাখ ১৩৬৮ (১৯৬১), পৃ. ৪৯৫।

লৌকিক ভাবনায় অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাস

সৈকত মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ

লৌকিক বিশ্বাস মানুষের মনে। আর সাধারণ মানুষের ভীতি থেকে জন্ম নেয় এই বিশ্বাস। মানুষ, বিশেষ করে সাধারণ প্রান্তিক মানুষজন কুসংস্কারে বশীভূত হয়ে নানান রকমের আচার-আচরণ পালন করে থাকে। এই বিশ্বাস প্রবলভাবে দেখা যায় সমাজের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তদের মধ্যে, অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে। নানারকম লোকাচার, লোক-বিশ্বাস, লোকনাচ, লোকগান, ব্রত-অনুষ্ঠান, বিবাহরীতি এই সমস্ত বিষয়ের চিত্র দেখা যায়। অভিজিৎ সেন যেহেতু নিম্নবিত্ত মানুষজনের কথা তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন তাই তাঁর গল্প উপন্যাসে লৌকিক উপাদানের চিত্র চোখে পড়ার মতো। অভিজিৎ সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৫ সালে। দেশভাগের ফলে নানান যন্ত্রণার ছবি দেখেছেন। সাধারণ মানুষদের উপলব্ধি করেছেন যেভাবে সেভাবেই সেই চিত্র তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। আমাদের আলোচ্য অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাস। এই উপন্যাসে লৌকিক উপাদান কিভাবে উঠে এসেছে সেটা আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসে মুসীধাপের পঞ্চায়েতে বয়স্ক বাবা-মা এসেছেন বিচারের আশায়। যদিও তাদের অভিযোগ আলাদা আলাদা। বাবার টাকা নিয়ে ছেলে উধাও হয়েছে বলে বাবার দাবি। সেই বিচার চাইতেই পঞ্চায়েতে এসেছেন তাঁত ব্যবসায়ী রাজকিশোর। মা মায়নোর বিচার টাকা পয়সা, শাড়ি-ব্যবসা নিয়ে নয়। মায়ের বিচার পুত্রের অধিকারের। একমাত্র পুত্রের জন্ম কামনায় তাকে নানান সাধ্য-সাধনা করতে হয়েছিল। তবেই সে পুত্রসন্তানের মা হয়েছে। অভিজিৎ সেন কাহিনির আঠারো-বিশ বছর পূর্বে চলে গিয়ে এই আখ্যানের বর্ণনা দেন, যেখানে রয়েছে এই উপন্যাসের সূচনালগ্ন, মায়নোর সন্তান লাভের জন্য আছে নানান তপস্যা। আর এই সাধনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ, ব্রত-অনুষ্ঠান, কঠোর সাধ্য-সাধনা।

মায়ের পুত্রের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। মায়েরা সন্তানের জন্য যেমন কষ্ট সহ্য করে আবার তাকে হারানোর ভয়ে অনেক কিছু করতে প্রস্তুত। বিচার চায়তে এসে মায়নো পঞ্চায়েতকে বলেছে-

> "শুনেন পঞ্চ, ছয় ছয় বচ্ছর ছোলের তংকে বুক ধাকুড়ে মরেছি আমি। দেব-দেবীর থানে হত্তে দিইছি বচ্ছর বচ্ছর। শেষতক্ দুইদিন রূপাস কইরে দুই কোশ রাস্তা জলে কাদায় দন্ডী করিছি দেবতীর থানতক। বুক চিরা অক্ত দিইছি। তবে না দেবর্তী মোক কিপা কন নেন, ছোল পানো ময়। সেই ছোলেক অঁয় ড্যানে কাইড়ে নিবে! অতেই সস্তা।"[১]

নিজের পুত্রের জন্য মায়নোর এই কঠোর সাধনা, পুত্রলাভ এবং শেষে ছেলেকে জানের কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদির মধ্যেই রয়েছে লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংস্কারের ইঙ্গিত। কাহিনির সূত্রে বিদ্যাধরী, বালা লখিন্দর, গুণমান কবিরাজ এবং গুণমানের নানান

কবিরাজী ও জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও জড়িত রয়েছে নানা লৌকিক উপাদানের প্রসঙ্গ। লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকসংস্কার, অন্ধসংস্কার, মিথ-পুরাণ ইত্যাদি নানান লোকজ উপাদান দ্বারা গঠিত 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসটি। বিয়ের ছয় বছর পরেও যখন পুত্র সন্তানের মা হতে পারল না তখন লোকবিশ্বাসের বশীভূত মায়নোমতি প্রথমে কালীর কাছে হত্যে দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ছুরিকাঘাতে বুক চিরে শরীর রক্তাক্ত করেছিল, সেই রক্ত মায়ের থানে দিয়ে মায়নো সন্তান পায়।

গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছে অন্ধসংস্কার প্রচলিত যে বাস্তুতে সাপ থাকলে সংসারে উন্নতি ঘটে। সাপ মেরে ফেললে সংসারের অমঙ্গল হবে এই ভয়ে তারা বিসাক্ত সাপকেও মারতে পারে না। মহেন্দ্র তাঁতখানায় একটি গোখরো সাপ দেখে ভয়ে সেই সাপকে মেরে ফেলার জন্য মাছমারা কৌচে দিয়ে গেঁথে ফেললে 'মারিস না, মারিস না' বলে চিৎকার করে উপুড় হয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় মায়নোমতি। এই ঘটনায় তাজকিশোরও মহেন্দ্রকে চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে বলে-

> "আকাম করলু, হারামজাদা। এ বাড়িৎ সাপ মারা নিষেধ জানা নাই তোর আহাম্মক। কী সব্বোনাশ করলু! অ্যাঁ!"[২]

বাড়ির আশেপাশে বসবাস করা সাপকে বলা হয় 'বাস্তুসাপ। প্রচলিত আছে সেই সাপ নাকি তাদের গৃহদেবতা, তাই তাকে মারলে গৃহের অমঙ্গল হবে, এমনই বিশ্বাস প্রচলিত আছে মুসীধাপের মানুষদের মধ্যে।

গ্রামবাংলায় অবস্থিত প্রান্তিক অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মানুষেরা অলৌকিক দেব-দেবী, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে থাকে। এমনকি তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেও দেখা যায়। রাজকিশোরের তাঁত কারখানার ঘর নতুন করার জন্য প্রচুর বাঁশের প্রয়োজন। যোগেন ও বালা তিনমাইল উজানের এক গ্রামে নৌকা নিয়ে বাঁশ আনার জন্য যায়। ধীরে ধীরে তারা পৌঁছে যায় সেই ভয়-ভীতিপূর্ণ জায়গায়। নদীপথে মুসীধাপের পরেই আছে এলুয়ার দহ। মুসীধাপের মানুষজন বিশ্বাস করে এই এলুয়ার দহে আছে মাশনা কালী। মাশনা হল লৌকিক দেবতা। মাশনাকে এক কথায় উপদেবতাও বলা চলে। বাঁশ নিয়ে ফেরার পথে তাদের নৌকা এলুয়ার দহে বাঁক নেওয়ার সময় ডুবন্ত এক চড়ে ধাক্কা খেয়ে বাঁশের চালি সোজা গিয়ে পড়ে এলুয়া দহের ঘূর্ণিতে। বাঁশ নিয়ে পড়া এই বিপদের কথা তারা ময়নোকে বলতে থাকে

> "চল্লিশ হাত লম্বা বাঁশের ভড় জলের উপর খাঁড়া- য্যান আকাশ ছুঁবে, আর হামরা দুটা পোক্ পতঙের মত মানুষ তাত্ সিটকে আছি।"[৩]

এই বিপদের হাত থেকে তারা রক্ষা পায় গুণমান কবিরাজের দ্বারা। কবিরাজ গুণমান লাফাতে থাকে আর সেই সঙ্গে মুঠো মুঠো ধুলো নদীতে ফেলতে থাকে। মুখ দিয়ে অনর্গল মন্ত্র উচ্চারণ করে চলে। এরপর তারা বাঁশসুদ্ধ নিজেদের প্রাণ নিয়ে মুসীধাপ গ্রামে পৌঁছায়। আর এইসব শোনামাত্রই মাশনাকালীর কাছে 'মানত' করে বসে মায়নো। কবিরাজ গুণমানের কাছে সিধা পাঠাতে চায়। 'জয় মাও মাশনাকালী, জয় বাবা কবিরাজ গুণমান-'। এরপর বালাকে ডেকে এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'টোটকা' করে মায়নো। বালাকে 'ঠ্যাং ফাঁক কইরে' দাঁড়াতে বলে-

> "মায়নো তার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি চোখ বুলাল বিড়বিড় করতে করতে। তারপর থুতু করে থুক্ কুরি দিল মাথায় আর গায়ে। খ্যংরা বারুনের একটা কাঠি ভেঙে তার আগায় থুতু ছিটিয়ে দু পায়ের ফাঁক গলিয়ে বালার পিছনে ছুড়ে দিল সে।"[৪]

বিপদের হাত থেকে পুত্র বালাকে বাঁচানোর জন্যই এমন টোটকা করে মায়নোমতি। কিন্তু এতকিছু করা সত্ত্বেও বালার ঘাড়ে কিনা চেপে ছিল সেই কালমাশনা। শেষে মায়নোর কথা মত কবিরাজের কাছে সিধা নিয়ে যায় বালা।

কালমাশনার নামে অনেক কথা প্রচলিত আছে। গুণমানের প্রধান চেলা বৈকুণ্ঠ জানায় কালমাশনার জন্মকথা, যা রহস্যময়তায় ও অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। লোকসমাজে মুখে মুখে প্রচলিত এই মিথ চলে আসছে, দেবী কালী একদিন এলুয়ার দহে স্নান করতে নেমেছিলেন, দহের উলঙ্গিনী যুবতীকে দেখে ধর্মরাজ মোহিত হয়ে পড়ে। কথিত আছে দুজনের অবৈধ মিলনের ফলে জন্ম হয় মাশনার। এই সন্তান মাশনা অসম্ভব শক্তির অধিকারী ও দুর্গম যোদ্ধা। অনেক রূপ সে ধরতে পারে। তার বাহন হল গজাল মাছ। গজাল মাছের পিঠে চেপে সে ঘুরে বেড়ায়।

এলুয়ার দহের এই অলৌকিক বৃত্তান্ত শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় মায়নোমতি। যে পুত্রকে পেতে তাকে কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল, সেই পুত্রকে সে হারাতে চায়না। মায়নোমতি পুত্রসন্তান লাভের পূর্বে ও পরে যেসব নিয়মনীতি মেনে নারীসংস্কার পালন করেছিল, তা আজও প্রান্তিক গ্রামবাংলার মহিলারা তাদের সন্তান লাভের এবং মঙ্গল কামনায় নানা সংস্কার পালন করে থাকে। মায়নো কোনদিন পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়েনি আবার ফুঁ দিয়ে বা হাতের ঝাপটায় বাড়ির কুপি বা লণ্ঠন নেভায়নি। এই সব বিশ্বাস প্রান্তীয় মানুষের মধ্যে প্রবল। গাছের ফুল-ফল কখনো নিঃশেষ করে পেড়ে ফেলেনি। যতদিন পর্যন্ত ছেলে বুকের দুধ খেত, ঘর থেকে বাইরে কোথাও গেলে সে চুলে ও আঁচলে গিঁট বেঁধে রাখত। বিশ্বাস মতে ফিরে এসে ঝাঁটা দিয়ে বুলিয়ে নিত মাথা থেকে পা পর্যন্ত আলগা করে। পুত্রসন্তান লালন-পালনের জন্য মায়নোর দ্বারা পালিত এত সব নিয়মনীতি, আচার-আচরণ নারীসংস্কার, বিশ্বাস, পুজোপাট, টোটকা, মানত, সিধা পাঠানো, মাদুলি, তাবিজ, তেলপড়া, জলপড়া, কবিরাজী নানান কার্যকলাপ করা এগুলো সবই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে বশবর্তী হয়ে।

অভিজিৎ সেনের অদ্ভুত সৃষ্টি এই উপন্যাসের অন্যতম রহস্যঘন চরিত্র গুণমান কবিরাজ। গুণমান কবিরাজের যাবতীয় কার্যকলাপ ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদুবাস্তবতায় ঠাসা। কালীপুজা, গোপন ক্রিয়াকর্ম, জড়ি-বুটি শিকড়-বাকড়, তাবিজ-মাদুলি, ওষুধ, সবকিছু মিলে এক এহস্যময় জগতের সঙ্গে যেন গুণমানের নিত্যসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রহস্যপূর্ণ জগতের অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কবিরাজ নাকি তার উঠানে গাছ বানিয়ে রেখে দিয়েছে। এই জাদুবিদ্যা সম্পর্কে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন-

> "যাদু হল একটা আর্ট বা কৌশল, যার সাহায্যে মানুষ তার ইচ্ছাকে আয়ত্তে আনতে ও আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে পারে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনাকে অলৌকিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করার নাম যাদুবিদ্যা।"[৫]

এই সমস্ত জাদুবিদ্যার সাহায্যে গুণমান কবিরাজ অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এই শক্তিধর গুণমান কবিরাজও যে কখনও মৃত্যুবরণ করতে পারে সেটা তার শিষ্যদের কখনও মাথায় আসেনি। জন্ম থাকলেই যে মৃত্যু আছে, মানুষ মাত্রই জন্মমৃত্যুর অধিকারী। কবিরাজ গুণমানের ও মৃত্যুর দিন ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে। কিন্তু গুণমান যেদিন মারা যাবে সেদিন আকাশে আগুনের গোলা লাফ দিয়ে উঠবে, কিংবা বাড়ির তেঁতুল গাছটা আকাশ পথে উড়তে উড়তে কোন নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে চলে যাবে কবিরাজের শিষ্যদের মনে এমনই দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস। তবে শুধু মায়নো বা গুণমানের শিষ্যরাই এমন বিশ্বাস করে তা নয়, মুসীধাপ গ্রামের সকলের

সঙ্গে শিক্ষিত মানুষদেরও অগাধ বিশ্বাস রয়েছে কবিরাজ গুণমানের অলৌকিক শক্তির প্রতি। মৃত্যুশয্যাশায়ী গুণমানের কাছে হাজির হয়ে থানা পঞ্চায়েতের সভাপতি বিষ্ণুপদ নিজের ডান হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলেন-

"আংটি দুইখান একবার ছুঁয়ে দেন মামা। সত্যই বড় অনাথ হয়া যাব।"[৬]

কবিরাজ ও বিদ্যার ঘটনাতেও জড়িয়ে রয়েছে লৌকিক আচার-আচরণ ও লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ। গুণমানের দুটো সংসারই নিষ্ফলা হয়েছিল। প্রথমজন নিঃসন্তান মারা যায়। বকুলবালা ধর্ষিতা বিদ্যাকে গর্ভপাত করানোর উদ্দেশ্যে গুণমানের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল মূলত সন্তান লাভের আশাতেই। বিদ্যার রূপযৌবন দেখে গুণমান মোহিত হয়ে পড়ে। নিজের প্রচুর বিষয় সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে বিদ্যাকে বিয়ে করতে চায় কবিরাজ। কিন্তু নিয়তি তার সঙ্গে নেই, তারপর এই বিদ্যাকে নিজের কাছে রাখে কিভাবে, লোকনিন্দারও ভয় আছে। সেই সময় বন্ধু কুলকান্ত পরামর্শ দিয়েছিল গুনমানকে 'গাও-গছ' হতে। মুসীধাপ গ্রামে এক বিবাহ-সংস্কার প্রচলিত রয়েছে যে, কোন কুমারী মেয়ে কিংবা বিধবা গোপনে বা অন্য কোন উপায়ে অন্তঃসত্ত্বা হলে প্রথম প্রচেষ্টা হল দায়ী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। খুঁজে না পাওয়া গেলে অথবা রাজি না হলে উপায়ন্তর খোঁজা হত। কেউ একজন গাছ হতে রাজি হলে স্ত্রীলোকটিকে সেই গাছে লতিয়ে ওঠার যে ব্যবস্থা তার নাম 'গাও-গছ' বিয়ে। বন্ধু কুলকান্তর পরামর্শে এমনই 'গাও-গছ' মতে বিয়ে করে বিদ্যাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল কবিরাজ গুণমান।

কথিত আছে বাড়িতে বিড়াল পুষলে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে, অতএব বিড়াল পোষা সম্পর্কে নিম্নশ্রেণির এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির গ্রাম্যসমাজের মানুষের মধ্যে এমনই ট্যাবুর প্রচলন শোনা যায়। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে কুসংস্কারে বশবর্তী হয়ে লখিন্দর বিদ্যার বিড়াল পোষা সম্বন্ধে বলে-

"বিলাইওক খাবা দিলে বিলাই অন্ধ হবার অভিশাপ দেয়।"[৭]

এর কারণ হিসেবে বলা হয় গেরস্থ যদি অন্ধ হয় তার থালা থেকে খাওয়ার সুযোগ পাবে সেই বিড়াল।

এভাবেই বাস্তব গ্রামীণ ঘটনাকে অবলম্বন করে উত্তরদিনাজপুরের জনপ্রিয় লোকনাট্য 'খন' বাঁধা হয়। এই 'খন' বাঁধা হয় গ্রামীণ অবৈধ প্রনয়ঘটিত কাহিনি নিয়ে। অভিজিৎ সেন যেহেতু দীর্ঘদিন কর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে বসবাস করেছেন তাই এখানকার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে পরিচিত হতে পেরেছেন তিনি।

প্রাণীকুলের মানুষ জীবশ্রেষ্ট, তাই বলে প্রাকৃতিক সকল শক্তির চেয়ে বলীয়ান নয় মানুষ। আত্মশক্তি ও দৈহিক শক্তির অভাব জীবন বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়। মানুষ এর প্রতিকার কামনা করে। জীবনকে যে ভালোবাসে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও তার। পীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জীবন দুঃখ ভোগ করে। সে জীবন পদ্ধতি এমন যে, যেখানে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে এবং ক্ষণে ক্ষণে বিপত্তির আশঙ্কা আছ। সেই কারণে তাকে পূর্বেই সচেতন হতে হয় এবং তার ফলাফল বিচারের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সংশয় সন্দিগ্ধ মনের দোলাচল অবস্থাতেই অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব বেশি পড়ে। বিপদে পরলে তবেই মানুষ ঈশ্বর বা অলৌকিক শক্তির আরাধনা বেশি করে। তাই নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে সংস্কার-বিশ্বাস বেশি করে দেখা যায়।

উপন্যাসের শেষ পর্বে দেখা যায় বিষাক্ত গোখরোর কামড়ে মৃত, রক্তে মাখামাখি শংকরের দেহটা দেখে বিদ্যা অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায়। একটা অস্বস্তি, একটা আতঙ্ক সর্বদা বিদ্যাকে তাড়া করে বেড়াতে থাকে। হঠাৎ কোন আওয়াজ, বাসন পড়ে যাওয়ার শব্দ কিংবা পাখির ডাক শুনলে আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে আসে বিদ্যার। গুণমান কবিরাজ কালীর থান থেকে কিছু একটা তুলে এনে তাবিজ করে লাল কার দিয়ে তা বিদ্যার কোমড়ে বেঁধে দেয়। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে শংকরের, তার আত্মা আশেপাশে ঘুরছে। এই তাবিজ নানান ভৌতিক অবস্থা থেকে গর্ভবতী বিদ্যাকে রক্ষা করবে এমনই কিছু সংস্কার ও নিয়নকানুন মেনে চলার কথা বলেছে কবিরাজ। তাহলে আর কোন দুষ্ট শক্তি তার ক্ষতি করতে পারবে না।

> “স্কুল ছাড়া দিয়া কখনো থাকপানা। চুল যদি ভিজাও থাকে, নিচে অ্যাটা পিঠা দিয়া রাখবা। বাসী কাপড়ে অশুচ কাপড়ে ঘরবার করবা না। চুল আঁচড়ায়া থুক্ না দিয়া ফেলবানা। বাইরা থিকা আসার পর বারন দিয়া গাও ঝারা দিয়া তাবাদে ঘরে সেঁধুরা। খালাবাসন হাত থিকা পইললে। ঐ থালাত ঐ সময়ে আর খাবানা। খাওয়ার পাতে হাঁচি পইললে পাতের নিচে অ্যানা জল ফেলে তবি ফের মুখেত্ অন্ন নিবা। দই, টক, চিড়া, কচু, তিতা আর পেলকি শাক রাতে খাবানা।”[৮]

বিশ্বাস তৈরি হয় মানুষের মনে ভয় থেকে। তাইতো বেশি আচার আচরণ পালন করে থাকে প্রান্তিক সমাজের মানুষজন। তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হচ্ছে ওই বিশ্বাস-সংস্কার, পালাপার্বণ, লৌকিক দেবদেবীর পুজো, বিভিন্ন কুসংস্কার মেনে চলা। যা অভিজিৎ সেন তাঁর এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে খুব সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন। নানান লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকসংস্কার, অলৌকিক জাদুবিশ্বাস এবং নানান ব্রত-অনুষ্ঠানের সমাবেশে কাহিনিকে রহস্যময় ও সুপাঠ্য করে তুলেছেন। উপন্যাসে বিভিন্ন সংস্কারের কথা লেখক খুব সুন্দর ভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন যার জন্য তিনি প্রশংসার দাবি রাখেন।

তথ্যসূত্র:

১. সেন অভিজিৎ, ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’, দে’জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৫, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২।
২. তদেব, পৃ. – ৫।
৩. তদেব, পৃ. – ১১।
৪. তদেব, পৃ. – ১২।
৫. আহমদ ওয়াকিল, ‘বাংলার লোক-সংস্কৃতি’, গতিধারা, ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০, পৃ- ২৪৫।
৬. সেন অভিজিৎ, ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’, দে’জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৫, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩০।
৭. তদেব, পৃ. – ২৫।
৮. তদেব, পৃ. – ৮৫।

আকর গ্রন্থ:

১. সেন অভিজিৎ, ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’, দে’জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৫, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আহমদ ওয়াকিল, 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি', গতিধারা, ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ-২৪৫।

২. বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্র, 'বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান' করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা – ৯, প্রকাশ- প্রথম সংস্করণ – জানুয়ারি ২০০৫।

মুসলমান শাসকদের বদান্যতায় ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃতি

প্রহেলিকা মন্ডল হাজরা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটি

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসকদের আগমন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই আগমনের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল। মুসলমান শাসকের আগমনের পূর্বে ভারতে প্রাচীনকাল থেকে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তা হলো ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই সকল শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাগন। কিন্তু মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে ভারতীয় হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাটা পড়তে শুরু করে। হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে ধ্বংস করা হয়। ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা তার পূর্ব গৌরব প্রায় হারাতে বসে। এদেশে মুসলমান শাসকরা আরবীয় ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে এসেছিল যেমন নতুন ধর্ম, নতুন ভাষা এবং নতুন ঐতিহ্যময় শিক্ষা সংস্কৃতি লালিত পালিত হতে শুরু করে তাদের যত্নে। ফলে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা অবহেলিত হতে শুরু করে এবং একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুসলিম শাসক শ্রেণী।

ইরাক রাজের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিম যখন প্রথম ভারতবর্ষের সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করেন তখন সেই সিন্ধুর অধিপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ রাজা দাহির। দাহির কে পরাজিত করে সিন্ধুপ্রদেশ জয় করে নেন মুসলিম সেনাপতি। এইভাবেই শুরু হয় ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয় অভিযান। এরপর একে একে মুলতান ও অন্যান্য প্রদেশ জয় করতে শুরু করে। তবে আসল বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল মধ্য এশিয়ার দুই দুধর্ষ বীর যথা গজনীর সুলতান মাহমুদ এবং মহম্মদ ঘোড়ির হাত ধরে। মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করলেও ভারতের অধিপতি হতে চাননি। তিনি ছিলেন খুবই বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। ভারতবর্ষ থেকে অতুল ধন সম্পদ লুট করে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি শিক্ষা খাতেও ব্যয় করেন। অন্যদিকে মহম্মদ ঘোড়ি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে ভারতবর্ষ জয় করেন এবং তার অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক কে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের ভিত্তি প্রস্তর করে নিজে মধ্য এশিয়ায় ফিরে যান।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে দুই দুর্ধর্ষ বীরের আগমন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ।এই দুইজন আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে থাকেন। যেখানে লুটপাট চালিয়ে অতুল ধন সম্পদ আহরণ করেন। এই ধ্বংসলীলা চালানোর ফলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ধীরে ধীরে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে থাকে। গোঁড়া মুসলিম শাসকরা হিন্দু শিক্ষা বিস্তারে বিরূপ মনোভাব দেখালেও মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের কোনরূপ উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। মুসলমান শাসকরা বিদ্যার্জনকে পবিত্র কর্তব্য হিসাবেই দেখতেন ।এমনকি শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও খুবই সম্মান করতেন। মুসলিমদের আগমনের আগে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই শাসকরাই নিম্নবর্গের হিন্দুদের শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সুযোগ করে দেয়। এমনকি মুসলিম শাসকরা শিক্ষার

পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুদেরও নিষ্কর ভূমিদান করতে থাকেন। মুসলিম শাসকরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেন।

ইসলামীয় শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বহুমুখী হতে দেখা গেলেও এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। শিক্ষা দান করা ও শিক্ষা খাতে ব্যয় করাকে মুসলিম শাসকরা পবিত্র কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত করতেন। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদন্ড যেমন -মেরুদন্ড ছাড়া কোন প্রাণী দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি তার উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। হজরত মহম্মদ শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন-" দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো, জ্ঞান হলো অমৃত এবং তাছাড়া পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব"। যদিও শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শাসকের বিভিন্ন মতামত ছিল যেমন- সম্রাট আকবর চেয়েছিলেন সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ঘটাতে। আবার ঔরঙ্গজেবের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করা। যখন থেকেই সুলতানি রাজত্ব ভারতবর্ষে শুরু হয় কুতুবুদ্দিন আইবকের হাত ধরে তখন থেকেই ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কুতুবউদ্দিনের সেনাপতি বখতিয়ার যিনি বিক্রমশিলা ও ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস করে হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধুলিস্যাৎ করে দেন। এর পরের যারা সুলতান ছিলেন যথা ইলতুৎমিস, নাসির উদ্দিন খুবই বিদ্বানুরাগী ব্যক্তি কিন্তু হিন্দু শিক্ষার প্রতি ছিলেন উদাসীন।

এর পরবর্তীকালে খলজি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিন খলজী প্রথম জীবনে ছিলেন নিরক্ষর ব্যক্তি। বিদ্যালাভ করা এবং বিদ্যার প্রসার ঘটাতে তার কোনরকম অনুরাগ ছিল না। তিনি কোনোভাবেই কোষাগার থেকে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ করতেন না। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদের তেমন উৎসাহ না দিলেও, বা শিক্ষা খাতে কোন ব্যয় বরাদ্দ না করলেও, তার সময়কালে দিল্লি একটি অন্যতম মুসলিম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র রূপে পরিণত হয়েছিল। এর পরবর্তী তুঘলক বংশীয় সুলতান মহম্মদ- বিন -তুঘলকও ছিলেন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত নীতি নিয়েছিলেন তাতে নিজের এবং সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনেন। তার খামখেয়ালী রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে দিল্লি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এর ফলে দিল্লির অবনতি ঘটতে শুরু করে। তুঘলক বংশীয় আর এক সুলতান ফিরোজ তুঘলকও ছিলেন জনদরদি সুলতান। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি, শিক্ষিতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি এবং তার চেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। শিক্ষিত ও বিদ্যান ব্যক্তিদের জন্য তিনি "দেওয়ান-ই খয়রাত" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যেখানে শিক্ষিতদের অর্থ সাহায্য করা হতো। সুলতানের আমলে বহু হিন্দু ছিলেন যারা স্বেচ্ছায় পারসিক ভাষাকে রপ্ত করে ছিলেন। আবার বহু মুসলমান পন্ডিতকে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভ করতে। তিনি দ্রাক্ষাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন যেখানে পন্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে মাঝে মাঝে সভা বসাতেন।

সুলতান ফিরোজ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। তিনি বহু কলেজ গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ আবাসিক। ছাত্র ও শিক্ষকরা একত্রে বসবাস করত এবং তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতো। এই সংস্কৃতি ছিল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মতো যেখানে গুরু এবং ছাত্রের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এবং ছাত্ররা গুরু মশাইয়ের গৃহে থেকেই শিক্ষা লাভ করত। সুলতানের নির্দেশে প্রায় ৩০০টি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। "তাজউদ্দিন -খালিদ -খানি"। হিন্দু

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ ও কোন উৎসাহ না দেখলেও ইসলামীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার অনেক ছাপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তুঘলক বংশের পর সৈয়দ ও লোদী বংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব শুরু করে। লোদী বংশের শাসক সিকান্দার লোদীর আমলে আগ্রা শহরটি স্থাপিত হয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে। সিকান্দার লোদীর শাসনকালে প্রত্যেকটি সৈনিককে লেখাপড়া শেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সময়ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসিতে অনুদিত হয়। হিন্দুরাও অনেক সময় নিজেদের আখের গোছানোর জন্য ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন।

বাহমনী সাম্রাজ্যের রাজা মাহমুদ শাহের মন্ত্রী ছিলেন মাহমুদ গাওয়ান খুবই বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। তার অন্যতম সংস্কার কার্যের মধ্যে ছিল বিদরে একটি বিশাল কলেজ ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা। এই গ্রন্থাগারে পুথির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০। ছাত্ররা ওই গ্রন্থাগারে বসে যাতে পড়াশোনা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সকল মধ্যযুগীয় শাসকদের উদার বদান্যতায় শিক্ষাক্ষেত্রে কখনো এসেছে প্রাণ চাঞ্চল্য আবার কখনো এসেছে অবহেলা। বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দু শিক্ষার ক্ষেত্রকে অনুসরণ করা হলেও হিন্দু শিক্ষা অবহেলিত থেকে গিয়েছিল। বেশিরভাগ সুলতানি শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন শুধুমাত্র সুলতানরাই নয় তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সেনাবাহিনী এবং অভিজাত বর্গ সকলেই। শুধু উৎসাহ নয় বিদ্যাশিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু ছোট বড় বিদ্যা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। বেশিরভাগ শহর ও নগরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতো এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলি। সুলতানি সাম্রাজ্যের শেষের দিকে আর এক দুর্ধর্ষ বীর তৈমুর লঙ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এই আক্রমণে প্রচুর মানুষ মারা যায় তার সাথে বহু মন্দির, মসজিদ, বিদ্যাকেন্দ্র গুলি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

তুর্কো আফগানদের পতনের পর ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল মুঘল সাম্রাজ্য। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েও ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে। মুসলমান শাসকরা মনে করতেন তাদের সন্তানদের নির্দিষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাটা ছিল একটি ধর্মীয় কর্তব্য। শুধু তাই নয় জীবনে চলাফেরার জন্য এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষিত হওয়াটা ছিল খুবই জরুরী। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে শিক্ষা কমিশনের বাংলা প্রাদেশিক কমিটি তাদের প্রতিবেদনের বলেছেন যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি থাকতো সেখানেই পাঠশালার অনুকরণে প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র রূপে মক্তব গুলি গড়ে উঠত। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মিস্টার অ্যাডাম মুসলিম আমলের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে সে সময় বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত মানুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল তাই নয়, গ্রামের সাধারণ গরিব পিতা মাতার সন্তানরাও এই বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করত।

বাবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যেই তাকে সিংহাসন চ্যুত হতে হয়েছিল। দিল্লির কাছাকাছি কিছু এলাকা নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তার সাম্রাজ্য। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা লাভের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাতেও তিনি ছিলেন সুদক্ষ। তার সাহিত্যচর্চার অন্যতম নিদর্শন হলো নিজের আত্মজীবনী বাবরনামা লেখা। বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি হলেও তিনি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কিছুই করে যেতে পারেননি। সম্রাট ভূগোল ও বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য অন্যান্য দেশ থেকে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাতেন। কথিত আছে যে তিনি গ্রন্থ পড়তে এতটাই

ভালোবাসতেন যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি পুঁথি নিয়ে যেতে ভুলতেন না। এই ভাবেই তিনি আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান পরিদর্শন করতে গিয়ে গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান। বাবরের মৃত্যুর পর সম্রাট হন তার পুত্র হুমায়ুন। কিন্তু হুমায়ুন কে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত করে শের শাহ দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি পাঁচ বছরের জন্য দিল্লির অধিপতি নির্বাচিত হন, জনগণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের কাজেও ব্রতি হন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নারনৌলে বিদ্যাকেন্দ্র গড়ে তোলেন।মুঘল সম্রাটদের মতোই তিনি শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যদিও তার সিংহাসন আরোহন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এর পরবর্তী সম্রাট হন হুমায়ুনের পুত্র আকবর।

মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন মহামতি আকবর।জনহিতকর কাজের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের কাজেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। একদিকে তিনি মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তেমনি হিন্দু শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্য তিনি রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ববেদ, বত্রিশ সিংহাসনের মত গ্রন্থ্ গুলিকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। দিল্লি ও আগ্রার পাশাপাশি ফতেপুর সিক্রিকেও সুন্দরভাবে সাজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের এক উজ্জ্বল নিদর্শন তিনি রেখে যান। ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদত খানা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটতো, এক একটি নির্দিষ্ট দিনেএক এক ধর্মের পন্ডিত ব্যক্তি তার ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং সম্রাট তা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতেন। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় তার জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিদ্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে সকল শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বাইরে থেকেও ছাত্ররা এসে ভর্তি হতে পারতো এমনকি হিন্দুরাও ইসলামীয় শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা লাভ করতে পারত।

মধ্যযুগের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল সম্রাট আকবরের। তিনি তার সমস্ত ধর্মের প্রজাদের সাথেই একই ধরনের আচার-আচরণ করতেন। তার নবরত্ন সভায় হিন্দুদেরও স্থান দিয়েছিলেন। প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদেও তিনি হিন্দুদের নিয়োগ করতেন। এমনকি হিন্দু রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি তার পুরো রাজত্বকাল জুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন তা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যেমন তার সাম্রাজ্যে মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুদের জন্য বহু স্কুল কলেজ স্থাপন করেছিলেন যাতে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষই শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হতে না পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি পাঠক্রম পরিবর্তন করেছিলেন একান্তই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা এবং জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে। তিনি প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের ধর্ম এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। পাঠক্রমের পরিধি প্রসারিত করতে বলা হয়েছিল মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদেরও ফারসি অধ্যায়নে উৎসাহিত করতেন। শিক্ষা সম্পর্কে সম্রাটের নির্দেশ ছিল যে লেখা শেখার আগে পড়া ভালো করে তৈরি করতে হবে, আবার না বুঝে পড়াও চলবে না। যা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। তিনি এই আদেশও দেন যে যুগোপযোগী শিক্ষাকে শিক্ষার্থীরা যেন কোনভাবেই অবহেলা না করে।

সম্রাট আকবরের সুহৃদ আবুল ফজল আইন -ই- আকবরী গ্রন্থটিতে সম্রাটের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। যেখানে নির্দিষ্ট করা আছে যে একজন শিক্ষার্থী ঠিক

কিভাবে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। এর পাশাপাশি একজন শিক্ষক মহাশয় ঠিক কি পদ্ধতি অবলম্বন করে ছাত্রদের শিক্ষা দান করবেন তার বর্ণনাও দেওয়া আছে। শিক্ষকদের কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হত, যেমন বর্ণমালা, শব্দার্থ, যুক্তবর্ণ, নতুন অর্ধ শ্লোক এর শিক্ষা এই ধরনের নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে একজন শিক্ষার্থী কয়েক বছরের শিক্ষা কয়েক মাসের মধ্যেই আয়ত্ত করতে পারতো। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর হস্তলিপি যাতে সুন্দর হয় সম্রাট সেই দিকেও নজর দিয়েছিলেন। অনেক বিদেশী সমালোচক আকবরের শিক্ষা নীতি সম্পর্কে বলেছেন যে শিক্ষা বিষয়ে আকবরের মতামত পাঠ করলে মনে হয় যেন কোন আধুনিক শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থে এই নির্দেশ গুলি লেখা আছে। তাই বলা যায় যে মধ্যযুগের একজন খ্যাতনামা সম্রাটের চিন্তাভাবনা ছিল সত্যি আধুনিক এবং যুগোপযোগী।

পরবর্তী সম্রাট হন আকবরের সুযোগ্য পুত্র জাহাঙ্গীর। তিনি সুপন্ডিত ও বিদ্বানুরাগী ব্যক্তি হলেও আকবরের ন্যায় শিক্ষানীতি নিয়ে ততটা আগ্রহ দেখাতে পারেননি। পিতা আকবরের ন্যায় হিন্দু শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও কোন আগ্রহ দেখাননি। তিনি নিজে ফারসি ও পারসিক ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি ইসলামীয় বিদ্যাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। পুরানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করেন কিন্তু পিতার ন্যায় শুধুমাত্র শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিল্প রসিক ব্যক্তি, তার সময়কালে একটি নির্দেশ জারি করেছিলেন- যে কোন ব্যক্তি যদি অনেক বিষয় সম্পত্তি থাকে, তিনি যদি কোন কারণে মারা যান এবং তার কোন সন্তান না থাকে তাহলে সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হবে। সম্রাটের এই নির্দেশ প্রমাণ করে যে তিনি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কতটা অনুরাগী ছিলেন। হয়তো তিনি পিতার মতো অতটা উদার মানসিকতা দেখাতে পারেননি কিন্তু এইসব নির্দেশ প্রমাণ করে যে সম্রাট শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কতটা বিদ্বানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সম্রাটের ভূমিকা একেবারেই ছিল না।

জাহাঙ্গীর পরবর্তী সম্রাট হন শাহজাহান। তিনি আবার শিক্ষার প্রতি ততটা অনুরাগী ছিলেন না, যতটা শিল্প সাহিত্যের প্রতি ছিলেন। তিনি দিল্লির জুম্মা মসজিদে একটি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি না হলেও বিদ্বান ব্যক্তি, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা সম্রাটের আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হননি। নিজে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি না হলেও তার পুত্ররা ছিলেন খুবই বিদদ্যানুরাগী। পুত্র দারাশিকো ফারসি,আরবি এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসিতে অনুবাদ করেছিলেন। ফারসি পর্যটক বার্নিয়ে তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে শাহজাহানের সময় শিক্ষায় খুবই দুরাবস্থা ঘটেছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে না হলেও শিল্প স্থাপত্যের জগতে শাহজাহান এক অবিস্মরণীয় স্থান দখল করে আছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব ছিলেন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং ধর্মীয় ব্যাপারে অত্যন্ত গোঁড়া। বিভিন্ন ভাষায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি পড়াশোনাটা নিয়মিত করতেন এবং আইন শাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাতেন। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যতটা আগ্রহ ছিল হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থায় ঠিক ততটাই উদারতা ছিল। তিনি হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করার জন্য তাদের শিক্ষাকেন্দ্র ও বিভিন্ন মন্দিরগুলি ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে তিনি বহু ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি অধ্যাপকদের ঠিকমতো বেতন এবং দুস্থ ছাত্ররা যাতে শিক্ষা খাতে বৃত্তি পেতে পারে তার বন্দোবস্ত করেছিলেন। বারানসি সহ অন্যান্য জায়গায় হিন্দু শিক্ষালয় যথা টোল মন্দিরগুলি ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন সম্রাট। শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বদাই নতুন নতুন পদ্ধতির বিষয়ে চিন্তা করতেন, শিক্ষাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার পরিকল্পনা

করতেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পর মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব রবি প্রায় অস্তমিত হয় এবং মুসলিম শিক্ষারও দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত মধ্যযুগের বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা ছিল খুবই করুন। কারণ যখন ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকদের আগমন ঘটে তখন থেকেই ভারতবর্ষ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। মুসলিম শাসকদের দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক অবদান রয়েছে। যেমন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা, শিক্ষার মান উন্নত করা, নতুন নতুন পাঠক্রম তৈরি করা সব কিছুই নজর ছিল মুসলমান শাসকদের। কিন্তু তা কেবলমাত্র ইসলামিয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে, হিন্দু শিক্ষা বিস্তারে তার কোন প্রভাব ছিল না। মুসলমান শাসকরা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অনুসরণ করলেও হিন্দু শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাই দেখা যায় যে মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান শাসকদের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয়। তারা ইসলামিয় শিক্ষাকে যতটা উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছেন হিন্দু শিক্ষাকে ঠিক ততটাই অবহেলিত হতে দেখা গেছে।

Bibliography (গ্রন্থপঞ্জি):

১) এস. এম. জাফর (১৯৮৮), মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা, অনুবাদ: রশিদ আল ফারুকী- বাংলা অ্যাকাডেমি, ঢাকা।
২) ঘোষ অরুণ (১৯৬৪), শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস, এডুকেশনাল এন্টার প্রাইজার্স।
৩) উইলিয়াম হান্টার (২০১৬), দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, অনুবাদ: আব্দুল মামুদ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৪) মুর্শিদ গোলাম (২০০৬), হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি -প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
৫) রমেশ চন্দ্র মজুমদার (১৯৮৮), বাংলাদেশের ইতিহাস-জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা।
৬) ডক্টর দেবাশীষ পাল (২০০১), সমকালীন ভারত ও শিক্ষা-রীতা পাবলিকেশন।
৭) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০২), মধ্যযুগের বাঙ্গালা-দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিশ শতকে গোবরডাঙার নাট্যচর্চা : একটি তথ্যভিত্তিক সমীক্ষা

অনিমেষ সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গের একটি অতিপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শহর হল গোবরডাঙা। মাত্র ১০ কিমি ব্যাসার্ধ হলেও ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ৪৫৩৭৭ জন; বর্তমানে এই সংখ্যাটি ৫৫-৬০ হাজারের কম নয়। যমুনা, ইছামতি ও গঙ্গা নদীর যোগসূত্র ধরে এই অঞ্চলটি মূলত পলি সমৃদ্ধ দোঁয়াশ মাটিতে পরিপূর্ণ। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। স্থানটির নামেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'গো' অর্থে 'পৃথিবী', 'বর' অর্থে 'শ্রেষ্ঠ' এবং 'ডাঙা' অর্থে 'ভূমি'— অর্থাৎ 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূমি' কিংবা 'পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থান' নামেই অঞ্চলটি পরিচিত। তবে কেবল উর্বর মৃত্তিকায় অঞ্চলটি সমৃদ্ধ নয়; গোবরডাঙা শহরের একটি আলাদা সুনাম রয়েছে।

গোবরডাঙার জমিদার বাড়ির ইতিহাস কম-বেশি অনেকেরই জানা। শুধুমাত্র জমিদার বাড়ির সূত্র ধরে নয়, অঞ্চলটিকে ঋদ্ধ করেছে বহু গুণী মানুষ। লোকশ্রুতি আছে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, শিক্ষাব্রতী রামতনু লাহিড়ী, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও ধরমবীর সিং, শিক্ষাব্রতী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশের প্রথম মহিলা উপাচার্য রমা চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিরা গোবরডাঙা অঞ্চলে একাধিকবার কর্মসূত্রে এসেছিলেন[১]। তাঁদের সংস্পর্শে যেমন এ ভূমি পুণ্য, তেমনই বহু বিশিষ্ট মানুষ এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেই দেশকে সমৃদ্ধ ও পূর্ণতা দিয়েছেন।

প্রাচীনতর পৌরসভাগুলির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভা হল গোবরডাঙা (১৮৭০)। এই পৌরসভার প্রথম পৌরপ্রশাসক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; যিনি প্রথম 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) করে নারীদের জীবনের এক যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। এই শহরেই জন্মলাভ করেছিলেন সাহিত্যিক, ভূ-বিজ্ঞানী এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাগুরু প্রমথনাথ বসু; যাঁর প্রচেষ্টায় বিখ্যাত টাটা কোম্পানি গড়ে উঠেছিল। এছাড়া এই ভূমিতেই জন্মসূত্রে বেড়ে উঠেছেন সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী যাঁর শতাধিকের বেশি গল্প-উপন্যাস রয়েছে এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক হাসিরাশি দেবী যিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা ছিলেন। এছাড়া যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, দুর্গাচরণ রক্ষিত— এরকম বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিই গোবরডাঙা অঞ্চলকে গৌরাবান্বিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত দুটি প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)' ও 'জামাই বারিক (১৮৭২)'– গোবরডাঙার জমিদারবাড়ি থাকাকালীন রচনা করেছিলেন[২]। তবে এই নাট্যচর্চাকে কেন্দ্র করে গোবরডাঙার আরেকটি গর্বের ইতিহাস রয়েছে। বলাবাহুল্য, সেই গর্বের ইতিহাস গড়ে উঠেছে বিশ শতকের সময়ের হাত ধরেই।

গোবরডাঙা অঞ্চল বাংলা নাট্যচর্চা এবং সংস্কৃতিচর্চার একটি ঐতিহাসিক জনপদ। বহু নাট্যদল এই শহরে বর্তমান। তবে বর্তমান সময়ে দলগুলির সংখ্যা কিছুটা কমে গেলেও শোনা যায় গোবরডাঙা অঞ্চলে বিশ শতকে প্রায় দেড়'শ-এর বেশি নাট্যদল ছিল। প্রথম নাট্যদল ছিল 'আর্যরঙ্গভূমি'[৩]। ১৮৭৮ সালে[৪] দলটির যাত্রা শুরু হয়। তারপর আর থেমে থাকতে হয়নি। একের পর এক নাট্যদল গড়ে উঠতে থাকে। মূলত বিশ শতকেই গোবরডাঙা অঞ্চলের নাট্যচর্চার ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। এই শতকে গঠিত গোবরডাঙা অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নাট্যদলগুলি হল— 'ইউনিয়ন ক্লাব' (১৯২০), 'সান্ধ্য সম্মিলন' (১৯২৮), 'জুভেনাইল ক্লাব' (১৯৩০), 'হায়দাদপুর ড্রামাটিক ক্লাব' (১৯৩০), 'খাঁটুরা বীণাপাণি নাট্য সংস্থা' (১৯৩০), 'শ্রীদুর্গা নাট্য নিকেতন' (১৯৩১), 'খাঁটুরা নাট্য মন্দির' (১৯৩২), 'গৈপুরে নাট্যাভিনয়' (১৯৩২), 'গৈপুর তরুণ সংঘ' (১৯৪০), 'সরকারপাড়ার নাটক' (১৯৪০ আনুমানিক), 'গোবরডাঙা তরুণ সংঘ' (১৯৪১), 'গোবরডাঙা জাগরণী নাট্য সমাজ' (১৯৪২), 'বাবুপাড়া বাল্য বন্ধুদের নাটক' (১৯৪২), 'হায়দাদপুর নাট্য সমাজ' (১৯৪৩), 'কল্পনা নাট্যসমাজ' (১৯৪৪), 'স্পোর্টিং ক্লাব' (১৯৪৪), 'বাবুপাড়া বালক সংঘ' (সময়কাল অজানা), 'খাঁটুরা নাট্য সমাজ' (১৯৫০), গৈপুর 'জাগরণী নাট্য সমাজ' (১৯৫০), 'সরকারপাড়া হেমন্ত স্মৃতি সংঘ' (১৯৫২), 'প্রগতি সংসদ' (১৯৫৩), 'মিলন সংঘ' (১৯৫৩), 'সুভাষপল্লী প্রমীলা নাট্যসংস্থা' (১৯৫৫), 'রেজগী বাহিনী' (১৯৫৮), 'সপ্তডিঙা ব্রতচারী সংঘ' (১৯৫৯), 'সন্ধানী' (১৯৬২), 'সপ্তর্ষী' (১৯৬২), 'হায়দাদপুর জাগরণী' (১৯৬৩), 'গৈপুর হলিডে ক্লাব' (১৯৬৩), 'মুষ্টিমেয় নাট্যসংস্থা' (১৯৬৫), 'সরকারপাড়া আরণ্যক নাট্য সংস্থা' (১৯৬৭), 'ডায়মন্ড ক্লাব' (সময়কাল অজানা), 'ঝংকার' (১৯৬৮), 'খাঁটুরা উত্তর পাড়ার নাটক' (১৯৬৮), 'খাঁটুরা ইয়ুথ অয়াসোসিয়েশন' (১৯৭০), 'খাঁটুরা সৃজনী' (১৯৭২), 'রূপান্তর' (১৯৭৩), 'ছন্দম' (১৯৭৪), 'খাঁটুরা স্পোর্টিং ক্লাব' (১৯৭৫), 'সমাদ্দারপাড়া বয়েজ ক্লাব' (১৯৭৫), 'নেতাজি বয়েজ ক্লাব' (১৯৭৫), 'মন্দার' (১৯৭৫), 'বরদাকান্ত পাঠাগার' (সময়কাল অজানা), 'কলেজ রোড কালচারাল গ্রুপ' (সময়কাল অজানা), 'গড়পাড়া রিক্রিয়েশন ক্লাব' (সময়কাল অজানা), 'নাবিক নাট্যম' (১৯৭৭), 'রূপক' (১৯৭৮), 'সহযাত্রী' (১৯৭৮), 'আশুতোষ বয়েজ ক্লাব' (সময়কাল অজানা), 'শিল্পায়ন' (১৯৮০), 'নক্‌সা' (১৯৮১), 'আস্তিক' (১৯৮৪), 'মডার্ণ কোচিং' (১৯৮১), 'আরোহী' (সময়কাল অজানা), 'মালিনী' (সময়কাল অজানা), 'চেতক' (১৯৮৯), 'সঙ্গীতম' (১৯৮৯), 'সহযাত্রী' (১৯৯০), 'টাউন ক্লাব' (১৯৯০), 'পূর্বাচল (সময়কাল অজানা), 'অবেক্ষণ' (১৯৯১), 'ছন্নছাড়া' (১৯৯৩), 'রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা' (১৯৯৫), 'চিরন্তন' (১৯৯৭), 'উদীচী' (১৯৯৯), 'কথাপ্রসঙ্গ' (২০০০), এবং 'স্বপ্নচর' (২০০০) নাট্যসংস্থা।

উপরিউক্ত দলগুলির মধ্যে কিছু কিছু দল ছিল ক্লাবকেন্দ্রিক। যাদের নাট্যচর্চা ছিল নিতান্ত সখের। কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তাই দলগুলির মহিমা কিছুদিন পরেই ম্লান হতে থাকে। এই পর্বে আমরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাট্যদলগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

গোবরডাঙার প্রথম নাট্যদল **'আর্যরঙ্গভূমি'** প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ৪২ বছর পর ২০-এর দশকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গোবরডাঙার প্রফুল্ল মুখার্জীর বাড়িতে **'ইউনিয়ন ক্লাব'** নামে একটি নাট্যদল গড়ে ওঠে। এই নাট্যদলই বিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যদল। এই নাট্যদলে অভিনয়ে প্রথম থেকেই যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন— কালিদাস কুণ্ডু, ধীরেন ভট্টাচার্য, নন্টু নাথ প্রমুখ ব্যক্তি। দলটির প্রথম নাটক হিসাবে অভিনীত হয় 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটি। এটি একটি পৌরাণিক নাটক। এই বছরেই **'জুভেনাইল ক্লাব'** নাট্যদল গঠন হয় গোবরডাঙা বাবুপাড়ায়। এই

নাট্যদলের উল্লেখযোগ্য একটি নাটক হল 'সাজাহান'; যার সম্পাদনা করেন তনুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। পরিবর্তে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় **'সান্ধ্য সম্মিলন'** নামক নাট্যসংস্থা। বর্তমানে গোবরডাঙা ষষ্ঠীতলা 'আশুতোষ বয়েজ ক্লাবে'র মাঠে এই নাট্যসংস্থার কলা-কুশলীরা নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতেন। অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হলো 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পানিপথ', 'দুর্গাদাস', 'সরলা', 'কণ্ঠহার', 'মোগল পাঠান' প্রভৃতি।

এরপর ৩০ এর দশকের শুরু। ১৯৩০ সালে গোবরডাঙার হায়দাদপুরে জন্ম নেয় **'হায়দাদপুর ড্রামাটিক ক্লাব'**। এই নাট্যদলে যে সমস্ত নাটকগুলি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'তনুবালা', 'কর্ণ', 'সংসার' প্রভৃতি। এ বছরেই খাঁটুরা দেবেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা হয় **'খাঁটুরা বীণাপাণি নাট্য সংস্থা'**। এই নাট্যদলে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যাঁদের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরা হলেন দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, পঞ্চানন আঁশ, হৃদয়মানিক আঁশ, দেবেন্দ্রনাথ পাল প্রমুখ ব্যক্তি। অভিনীত নাটকের মধ্যে 'আলিবাবা', 'বঙ্গে বর্গী', 'অহল্যাবাঈ' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। তারপরের বছর ১৯৩১ সালে 'খাঁটুরা বীণাপাণি নাট্য সংস্থা' থেকে দেবেন্দ্রনাথ পাল বেরিয়ে আসার পর ওই একই বছরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন **'শ্রীদুর্গা নাট্য নিকেতন'**। এই নাট্যদলের অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটকটি হল 'ললিতালালিত্য'। এরপর **'খাঁটুরা নাট্য মন্দির'** গঠিত হয় ১৯৩২ সালে মূলত ইছাপুরের চৌধুরী বংশের উদ্যোগে। তবে সঙ্গে ছিলেন অমূল্য দাস ও অক্ষয় পালের মত দক্ষ অভিনেতারা। এই নাট্যদলে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'সাজাহান', 'কণ্ঠহার', 'পথের শেষে', 'রঘুবীর', 'নরনারায়ণ', 'বিশ বছর আগে', 'মানময়ী গার্লস স্কুল' প্রভৃতি।

৪০ এর দশকের প্রথমদিকে আনুমানিক ১৯৪০ সালে **'সরকারপাড়া নাট্যদল'**-এর জন্ম হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে দলটি 'অতসী', 'পথের শেষে', 'মশাল' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে। এই নাট্যদলের হয়ে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তারকচন্দ্র রায়, জগন্নাথ তরফদার, মধু রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, জীতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কাশীনাথ বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ দাস প্রমুখ ব্যক্তিরা আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। এর দুই বছর পরে ১৯৪২ গঠিত হয় **'গোবরডাঙা জাগরণী নাট্য সমাজ'**। এই নাট্যদলে অভিনীত নাটকের মধ্যে— 'রিজিয়া', 'কণ্ঠহার', 'মারাঠা গৌরব' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। এ বছরেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় গোবরডাঙা বাবুপাড়ার একদল যুবক একটি নাট্যদল গঠন করেন এবং নাট্যদলটির নাম দেন **'বাবুপাড়া বাল্য বন্ধুদের নাটক'**। বলাবাহুল্য, এই নাট্যদলে যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়েছিল তার মধ্যে অধিকংশ নাটকের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে; যেমন— 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদৌল্লা', 'কর্ণার্জুন' প্রভৃতি। এরপর ১৯৪৩ সালে গোবরডাঙার হায়দাদপুরে অক্ষয় পালের নির্দেশনায় গড়ে ওঠে **'হায়দাদপুর নাট্য সমাজ'**। পরবর্তীতে এই নাট্যদলের নাম পরিবর্তন হয়। নাম হয় **'হায়দাদপুর শিল্পী সংসদ'**। এই নাট্যদলে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— 'মা', 'সীতা', 'শিবাজী' প্রভৃতি। ১৯৪৪ সালে গোবরডাঙার কুণ্ডুপুকুরে গঠিত হয় **'কল্পনা নাট্যসমাজ'**। এই নাট্যদলে উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা ছিলেন— বীরেন কুণ্ডু, বিশ্বেশ্বর দত্ত, ভোলানাথ প্রামাণিক, যোগজীবন রক্ষিত, ননীগোপাল চক্রবর্তী, পতাকীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই নাট্যদলে নাটকগুলির মধ্যে 'কারাগার', 'বঙ্গে বর্গী', 'চোর', 'রামের সুমতি', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি নাটক জনপ্রিয় ছিল।

এরপর আসে পঞ্চাশের দশক। ১৯৫০ সালে গোবরডাঙার খাঁটুরায় গঠিত হয় **'খাঁটুরা নাট্য সমাজ'**। নাট্যদলটিতে অভিনীত নাটকের মধ্যে জনপ্রিয় নাটকগুলি হল— 'সিরাজদৌল্লা', 'মিশরকুমারী' প্রভৃতি। ১৯৫৫ সালে গোবরডাঙার সুভাষপল্লীতে প্রহ্লাদ ভট্টাচার্য, ব্রজেন বিশ্বাস এবং দেবদাস মণ্ডলের নির্দেশনায় গড়ে ওঠে **'সুভাষপল্লী প্রমীলা নাট্যসংস্থা'**। তবে নাট্যদলটিতে অভিনয়ে সাধারণত নারীরা অংশগ্রহণ করতেন। এই নাট্যদলের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— 'পুরীর মন্দির', 'বড় বৌ', 'পার্থ সারথী' প্রভৃতি। নাটকগুলি যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন— শান্তিলতা দাস, বিভা দাস, করুণাময়ী দাস, শর্বরী দাস, শান্তি দাস, নুপুর দাস, শান্তি মুখার্জী, লতিকা মুখার্জী, প্রমুখ ব্যক্তি। এর কয়েক বছর পরে ১৯৫৮ সালে **'রেজগী বাহিনী'** নাট্যদল গঠিত হয়। এই নাট্যদলে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা হলেন— ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, কমলেশ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কল্পনা চট্টোপাধ্যায়, শংকর ব্যানার্জী, মাখন দাস প্রমুখ ব্যক্তি। অভিনীত নাটকের মধ্যে 'আজকাল', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরের বছর ১৯৫৯ সালে নন্দদুলাল বসুর নির্দেশনায় **'সপ্তডিঙা ব্রতচারী সংঘ'** গঠিত হয়। 'তুষার কণা', 'চড়ুইভাতি', 'ঠাকুমার আচার', 'আলিবাবা' প্রভৃতি নাটক এই নাট্যসংস্থায় মঞ্চস্থ হয়।

এরপর ৬০ এর দশকের প্রথম দিকে **'বাবুপাড়া বালক সংঘ'** নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে নাটকগুলি অভিনীত হতো বরদাকান্ত পাঠাগারের প্রাঙ্গণে। এই নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিভাবসু দত্ত, অমিত বিশ্বাস, পার্থ মিত্র প্রমুখ অভিনেতা। অভিনীত নাটকের মধ্যে 'দুই বিঘা জমি', 'জুতা আবিষ্কার', 'ছাতার জন্মকথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ সালে গোবরডাঙার ভট্টাচার্য পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় **'সন্ধানী নাট্যসংস্থা'**। এখানে 'নটী', 'বিশুর বিয়ে', 'ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এ বছরেই গোবরডাঙা খাঁটুরায় অক্ষয় কুমার পাল, দুলাল দাঁ প্রমুখ ব্যক্তিদের নির্দেশনায় গঠিত হয় **'সপ্তর্ষী নাট্যদল'**। এই নাট্যদলে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে 'মিছিল', 'বিশুর বিয়ে' প্রভৃতি নাটকের নাম করা যায়। ১৯৬৩ সালে গোবরডাঙার হায়দাদপুরে গড়ে ওঠে **'হায়দাদপুর জাগরণী নাট্যসংস্থা'**। পরিচালক ছিলেন সুবোধ দাস। এই নাট্যদলের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'তাহার নামটি রঞ্জনা'।

এরপর ৭০ এর দশক। এই দশকের অন্যতম নাট্যদল **'রূপান্তর'**। ১৯৭৩ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর গোবরডাঙার সংস্কৃতিমনা লোকের উৎসাহে ধতুবাবুর বাড়িতে জন্ম হয় 'রূপান্তর' নাট্যসংস্থার। যার প্রথম সম্পাদক বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশক হলেন দুলাল দাঁ। সভাপতি হলেন হৃষীকেশ চট্টোপাধায়। প্রথম প্রযোজনা সমরেশ বসুর 'ছুটির ফাঁদে'। এছাড়া অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'দত্তবাবু ডেকেছেন', 'আলিবাবা পাঁচালি', 'দান সাগর', 'সাজানো বাগান', 'শাস্তি', 'প্রতিশ্রুতি' 'অভিমন্যু', 'শিবের অসাধ্যি', 'আউট হাউজ', 'মৃত্যুহীন বেঞ্জামিন', 'বিরাজ বউ', 'তালপাতার সেপাই' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। একাঙ্ক নাটকের মধ্যে হারাধনের 'দশটি ছেলে', 'শেষ দৃশ্যে পৌঁছে', 'মিছিল', 'পাখি', 'সন্ধ্যা তারা', 'সন্ধে বেলার মানুষ', 'লাঠি, মানানসই', 'প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিশু-কিশোর নাটকের মধ্যে 'লঙ্কা দহনপালা', 'অঙ্ক মালার দেশে', 'সুরের যাদু', 'জন্মদিন', 'জয় বাবা হনুনাথ' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য।

রূপান্তর নাট্যদলের মাত্র ৫ বছর পরে গোবরডাঙার অঙ্গনে **'নাবিক নাট্যদলে'**র উত্থান হয়। ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরিচালনায় তাঁরা প্রথম নাটক অভিনয় করেন ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বরে গোবরডাঙা জমিদার বাড়ির বড়ো তরফের গৃহ-প্রাঙ্গণে। নাটকের নাম ছিল 'অন্ধকারের নীচে সূর্য'। এছাড়া অন্যান্য নাটকের মধ্যে— মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত

'সবুজ সাহারা' ও 'লালু ভুলু' প্রভৃতি অন্যতম নাটক। একাঙ্ক নাটকের মধ্যে 'অপরাজিত', 'সাঁকিনার গল্প', 'ম্যাজিশিয়ান', 'কেননা মানুষ', 'দুই হুজুরের গপ্পো', 'মারীচ সংবাদ', 'আলোর সন্ধানে', 'তাড়কা রাক্ষসী', 'আলিবাবা', 'মিলনবীণা' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। নাট্যাভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করে থাকেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রাবণী সাহা, প্রদীপ সাহা, অতনু ভট্টাচার্য, স্বরূপ দেবনাথ, শান্তি শীল, অনিল মুখোপাধ্যায়, অবিন দত্ত, জীবন অধিকারী প্রমুখ।

আশির দশকের শ্রেষ্ঠ দুই নাট্যসংস্থা **'শিল্পায়ন'** ও **'নকসা'**। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে **'শিল্পায়ন'** নাট্যদলটির জন্ম হয়। পরিচালক আশিস চট্টোপাধ্যায়। অন্যতম অভিনেতারা ছিলেন অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌভিক সরকার, প্রিয়েন্দু শেখর দাস, সুজিত দাস, তাপস দত্ত চৌধুরী, অঞ্জনা দে, দীপা ব্রহ্ম প্রমুখ ব্যক্তি। নাট্যদলটির বিভিন্ন নাটকের মধ্যে 'রক্তকরবী', 'মারীচ সংবাদ', 'আলিবাবা', 'গৃহযুদ্ধ', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা', 'তমস্', 'শাইলক উপাখ্যান', 'অন্তর্জলী যাত্রা', 'সত্য শাইলক', 'অঙ্কুর', 'খোয়াব', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'আদিম' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য।

'শিল্পায়ন' নাট্য সংস্থার মাত্র ১ বছর পরেই **১৯৮১** সালে **'নক্সা'** নাট্যদলের যাত্রা শুরু হয়। নাট্যদলটির জন্ম হয় **১লা** মে গোবরডাঙার প্রীতিলতা স্কুলে। আজ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার শো তাঁরা মঞ্চস্থ করেছেন। বর্তমানে দলটির সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন আশিস দাস, ভাস্কর মুখার্জি, দীপান্বিতা বণিক দাস, ভূমিসূতা দাস, অঞ্জন কাঞ্জিলাল, সুবীর রক্ষিত, পঙ্কজ রক্ষিত, অসীম পাল, অতুল হাওলাদার প্রমুখ ব্যক্তি। 'অথঃ শিক্ষা বিচিত্রা', 'তিন পয়সার পালা', 'খড়ির গণ্ডী', 'ভিয়েতনাম', 'ডাকঘর', 'সুভা', 'ছোট ছোট বড়োরা', 'বিনোদিনী', 'হুলো', 'ছুটি', 'নষ্ট পাণ্ডুলিপি', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কুঁজাবুড়ি', 'মুচিরাম গুড়', 'আশ্চর্য মানুষ' প্রভৃতি নাটক এই নাট্যদলের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

১৯৮৯ সালের **২৯শে** জুলাই **'চেতক'** নামে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পরিচালক ছিলেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে এই নাট্যদলের সদস্যরা হলেন— দিবাকর মজুমদার, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব নন্দী, দীপক সাহা, মৌমিতা সাহা, দিশা মুখার্জী, ইশিতা যাদব, প্রিয়াঙ্কা দাস প্রমুখ। অভিনীত নাটকের মধ্যে 'গাব্বু খেলা', 'নেকড়ে', 'উলুখাগড়া', 'মহাবিদ্যা', 'বোম্বাগড়ের রাজার গন্ধবিচার', 'অরুণোদয়ের পথে', 'পাবলিক সারভেন্ট', 'দন্তরঙ্গ', 'বল্লভপুরের রূপকথা' প্রভৃতি নাটক অন্যতম।

এরপর ৯০ এর দশক শুরু। এই দশকের অন্যতম নাট্যদল **'রবীন্দ্র নাট্যসংস্থা'**। **১৯৯৫** সালে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় দলটির শুভসূচনা হয়। মূলত শিশুদের নিয়ে দলটি কাজ করে থাকে এবং এটিই গোবরডাঙায় শিশুদের নিয়ে গঠিত অন্যতম প্রধান নাট্যদল। বহু নাটক এখানে প্রযোজনা হয়েছে এবং আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। পরিবেশিত নাটকের মধ্যে 'ডাকঘর', 'লক্ষ্মীপূজা', 'গুপ্তধন', 'বিভীষণের হাফ টাইম', 'মুক্তধারা', 'ধনপতি উপাখ্যান', 'বেচারাম কেনারাম', 'বোকা তাঁতির গল্প', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'রবীন্দ্র নাট্যসংস্থা'-র মাত্র ২ বছর পরে **১৯৯৭** সালে শ্রদ্ধেয় অজয় দাসের পরিচালনায় **'চিরন্তন'** নাট্যদলের পথচলা শুরু হয়। দলটিতে জনপ্রিয় নাটকের মধ্যে 'ভীমবধ', 'শতাব্দীর পদাবলী', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'পরবাস', 'স্বপ্নের রঙ', 'অর্কেস্ট্রা', 'প্রতিদান' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। নাট্যদলটিকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের মধ্যে সুতপা কর্মকার, বিপ্লব মোদক, বিধান চন্দ্র রায়, কাজল কুমার কুণ্ডু, সন্ধ্যা সরকার, দিশা সরদার, লক্ষ্মণ বিশ্বাস, গর্বিতা দাস, অদ্রীশ দাস প্রমুখ ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। এরপর **১৯৯৯** সালে জয়দীপ বিশ্বাসের

পরিচালনায় **উদীচী** নাট্যদলটির প্রতিষ্ঠা হয়। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে 'উমেদ', 'বিদ্যাচরিত', 'স্বীকারোক্তি', 'করিম বাওয়ালীর শত্রু', 'উড়ো মেঘ', 'আদাব' প্রভৃতি নাটক সুনামের সঙ্গে প্রযোজিত হয়েছে।

বিশ শতকের একেবারে শেষদিকে গঠিত হয় **'কথাপ্রসঙ্গ'** ও **'স্বপ্নচর'** নাট্যদল। ২০০০ সালের ১৬ এপ্রিল গোবরডাঙার চ্যাটার্জিপাড়ায় বিকাশ বিশ্বাসের উদ্যোগে **'কথাপ্রসঙ্গ'** নাট্যদলটি গঠিত হয়। মূকাভিনয়ের জন্য দলটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। 'পেটুক পঞ্চানন', 'চোর মহাচোর', 'ওয়েট লিফটার', 'ম্যান এন্ড মেশিন', 'স্টাচু' প্রভৃতি মূকাভিনয় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মূকাভিনয় ছাড়া বিশুদ্ধ নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি হল— 'সংক্রান্তি', 'সমুদ্র সওয়ার', 'মণিকথা', 'ওয়ান টু', 'অসুখ সত্যম', 'আমাদের রবিঠাকুর', 'ভু শণ্ডির মাঠ', 'বারো শিঙায় ফুঁ' প্রভৃতি। তবে যাঁদের জন্য এই নাট্যদলটির এগিয়ে চলা তাঁদের মধ্যে শ্যামলেশ ঘোষ, রাজীব রায়, স্মার্ত সরকার, রাজু বণিক প্রমুখ ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

মহঃ সেলিমের নির্দেশনায় ২০০০ সালের ৯ জুলাই গঠিত হয় গোবরডাঙার সর্বপ্রথম নন-প্রসেনিয়াম নাট্যসংস্থা **'স্বপ্নচর'** নাট্যসংস্থা। যদিও পরবর্তীতে দলটি প্রসেনিয়ম থিয়েটারের ধারাতেও নাটক মঞ্চস্থ করেছে। দলটির প্রথম প্রযোজনা 'হারানো প্রভাত' নাটকটি অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙার টাউন হলে। অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে 'উন্মাদ', 'বিক্ষিপ্ত সমরের তর্জমা', 'মুখোশ', '২১ এর ডায়েরি', 'হাঁড়িকুড়ি.com', 'ধুত্তোরিক্কি', 'টুনটুনিলো', 'কলমবাজ', 'কুজ্ঝটিকা', 'গোগল যখন একা', 'মিছে মানুষ', 'মা নিষাদ' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। দলের সদস্যদের মধ্যে সুদীপ্তা দাস, অভিজিৎ দাস, সৌরভ বিশ্বাস, মৈনাক গুহ, আমীর হোসেন প্রমুখ দক্ষ অভিনেতা বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার।

নাটকের শহর হিসেবে 'গোবরডাঙা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বর্তমানে বহু নাট্যদল এখানে রেপার্টারি নাট্যদল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কেবল নাট্যচর্চা নয়, থিয়েটার নিয়ে এখানে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। বহু নাট্য-বিদ্যালয় এখানে গড়ে উঠেছে যা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম। এসব কারণেই গোবরডাঙাকে বলা হয় 'City of theatre'[৫]। তাই কেবল বিশ শতক নয়, বর্তমান-থিয়েটার জগতেও গোবরডাঙা অঞ্চল একটি উজ্জ্বলতর নক্ষত্ররূপে দেদীপ্যমান তা বলাইবাহুল্য।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য:

১. ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষক, 'গোবরডাঙার ঐতিহাসিক পরিচিতি' 'গ্রাম থেকে শহর: জনপদ গোবরডাঙার বিবর্তনের ধারা (১৮৮৮খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)' দ্রষ্টব্য: সার্ধ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৭০-২০২০), গোবরডাঙ্গা পৌরসভা থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল এপ্রিল-২০২২, পৃ. ২০

২. দীপককুমার দাঁ সম্পাদিত, গোবরডাঙা নবপর্যায়, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ. ১৯

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রদীপ রায়চৌধুরী, ইতিহাসের আলোকে গোবরডাঙ্গা, সংকলন ও প্রকাশন সমিতি প্রাক্তন ছাত্র সংসদ, গোবরডাঙ্গা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়, পৃ.-২৯

৪. দীপক কুমার দাঁ সম্পাদিত , বিশেষ গোবরডাঙ্গা সংখ্যা, কুশদহবার্তা, ১৩তম বর্ষ, গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, গোবরডাঙ্গা, পৃ. ৩২

৫. বিধান চন্দ্র রায় সম্পাদিত, পরম্পরায় গোবরডাঙার নাট্যচর্চা, প্রকাশনা-রঙ্গভূমি, প্রথম প্রকাশ- ৪ মে, ২০১৪, পৃ. ৫১।

বাংলার নাট্য আন্দোলনে নাট্যকার শম্ভু মিত্র

প্রিয়াঙ্কা পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে বাংলা নাটকের অভিমুখ পরিবর্তন হতে থাকে। প্রগতিশীল চিন্তা ধরার শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট চিন্তা ভাবনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনমানসেও তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলার নাট্যকারগণ এই সময় নাটককে শুধুমাত্র মঞ্চে উপস্থাপিত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে জনসচেতনতার মাধ্যম হিসেবে দেখলেন। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নাট্যকারদের নাটকে উঠে আসলো সমকালীন দেশের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা। নাটকের মধ্যে দিয়েই নাট্যকারগণ জনমানসকে সচেতন এবং সংঘবদ্ধ করতে ব্রতী হলেন। সারা ভারতবর্ষ তথা বাংলা জুড়ে শুরু হল এক নতুন নাট্য আন্দোলন। বাংলার নাট্য আন্দোলন পৃথক মাত্রা পেয়েছিল 'গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর। এই গণনাট্য সংঘের একজন সফল এবং সক্রিয় কর্মী ছিলেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র।

শম্ভু মিত্র বাংলার নাটকের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় নাম শুধু তাই নয়, বাংলা থিয়েটারের জগতেও তিনি যে প্রথম সারিতেই অবস্থান করেন একথাও সত্য। শুধু বাংলা নয় ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে শম্ভু মিত্রের কৃতিত্ব তিনি একজন সফল অভিনেতা, নাটক রচয়িতা, প্রযোজক, পরিচালক এবং সফল নাট্যকর্মী। তাই একথা সর্বৈব ভাবেই স্বীকার্য যে শম্ভু মিত্র নানান দিক থেকেই বাংলা থিয়েটারের এক উজ্জ্বল এবং বহুমুখী প্রতিভা। আর সেই বহুমুখী প্রতিভার বলেই বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে শুধুমাত্র ব্যক্তি শম্ভু মিত্র একটি নাম থেকে পঞ্চাশের দশকে শম্ভু মিত্র একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নাট্য জগতে এক পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিল শম্ভু মিত্র। বাংলার নাট্য জগতে তাঁর অবস্থান একজন সফল নাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক তথা থিয়েটারের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে। কারণ একথা সত্য শৈশব কাল থেকেই শম্ভু মিত্রের অভিনয় তথা থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ ছিল। নাট্যাভিনয়ের প্রতি তাঁর সেই বাল্য আকর্ষণের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "কেন যে আমি অভিনয় করতে শুরু করলুম সে বলা আমার পক্ষে খুব শক্ত। কিন্তু হয়েছিল একটা ইচ্ছে, ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করার। কেমন করে জানি না, অভিনয় খুব ভালো লাগত।"[১]

শৈশব কাল থেকেই শম্ভু মিত্রের অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও তিনি সেই সময় অভিনয় করার সুযোগ পাননি। পিতা শরৎকুমার মিত্র চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি পিতার সঙ্গেই কলকাতা এলাহাবাদ চলে যান। তবে পরবর্তী সময়ে আর্থিক সমস্যার কারণে আবার তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। কলকাতায় আসার পর আর্থিক কারণেই শম্ভু মিত্র নাটক এবং থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। অভিনয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তৈরি হয় পৃথক ভাবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—

> "১৬/১৭ বছর বয়সেই শম্ভু মিত্র অভিনয় শিক্ষা পান কৃষ্ণগোবিন্দ সরকার নামের এক ব্যক্তির কাছে। এই অভিনয় শিক্ষকের নামের উল্লেখ করেছেন

তিনি তার 'নাটক রক্তকরবী' গ্রন্থে কিন্তু অভিনয়ে জড়িয়ে পড়ার আগে তিনি শুরু করেন অভিনয় দেখা। তখন তিনি থাকতেন 'জনৈক' উদার ভদ্রলোকের বাড়িতে। এই 'জনৈক' উদার ভদ্রলোকের বাড়িতে শ্রীমিত্র থাকেন আট কি নয় বছর।উক্ত উদার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল তৎকালীন প্রখ্যাত নট ভূমেন রায়ের। তিনি একদিন শম্ভু মিত্র কে বলেন, যদি তার (শম্ভু মিত্রের) অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ থাকে তাহলে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তখন স্বনামধন্য অভিনেতা ভূমেন রায় রঙমহলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। সেই পরিচয় এর সূত্রে শম্ভু মিত্র রঙমহলে ঢুকলেন তখন তার বয়স ২৪ বছর।"[২]

২৪ বছর বয়সে অভিনেতা ভূমেন রায়ের হাত ধরেই শম্ভু মিত্র পেশাদারী থিয়েটার জগতে প্রবেশ করেন। 'রঙমহল' থিয়েটারে অভিনেতা হিসেবে প্রথম তিনি বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' (১৯৩৯) নাটকে অভিনয় করেন। রঙমহলে শম্ভু মিত্র আরো বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। যথা গৌর শী'র নাটক 'ঘূর্ণি'তে নাটকটির নির্দেশক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়', 'রত্নদ্বীপ' নাটকে। নাটক দুটির নির্দেশক ছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। রঙমহলে অভিনীত একাধিক নাটকে অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করলেও শম্ভু মিত্র কোন নাটকে কোন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তা সবটা জানা যায়নি। শুধু এটুকু জানা যায় তিনি 'রত্নদীপ' নাটকে মুখুজ্জের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শম্ভু মিত্র রঙমহল থিয়েটার ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন 'মিনার্ভা'থিয়েটারে। মিনার্ভা থিয়েটারে এসেই তিনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পান ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের 'জয়ন্তী' নাটকে। এই নাটকে শম্ভু মিত্র তাঁর নায়িকা হিসেবে পেয়েছিলেন সেইসময়ের বিশিষ্ট অভিনেত্রী অপর্ণা দেবীকে। মিনার্ভাতে শম্ভু মিত্রের অভিনয় খুবই প্রশংসিত হয়। তবে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অপমানের প্রতিবাদ জানাতে শম্ভু মিত্র সেই সময় মিনার্ভা ত্যাগ করেন এবং অভিনেতা ভূমেন রায়ের সহযোগীতায় নাট্যনিকেতন মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হন। শম্ভু মিত্র এখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটকে অভিনয় করেছিলেন মিস্টার মুখার্জির ভূমিকায়। এছাড়াও এখানে পুনরায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' নাটকের একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নাট্যনিকেতন বন্ধ হয়ে যায়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সহযোগীতায় তখন তিনি নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর 'শ্রীরঙ্গম'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে শম্ভু মিত্র তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ' নাটকে অধ্যাপকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এছাড়াও 'শ্রীরঙ্গম'এ বেশ কিছু নাটকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে শম্ভু মিত্র দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। যেমন 'সীতা' নাটকে শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠের ভূমিকায়, 'আলমগীর' নাটকে দিলীর খার চরিত্রে, 'রীতিমত' নাটকে ডাক্তারের চরিত্রে, নিতাই ভট্টাচার্যের 'উড়ো চিঠি' নাটকের বিশেষ চরিত্রে। শ্রীরঙ্গমে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের পরেও শম্ভু মিত্র শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে বেশিদিন যুক্ত থাকেন নি। শ্রীরঙ্গম থেকে বেরিয়ে গেলে শম্ভু মিত্রের আবার দেখা হয় ভূমেন রায়ের সঙ্গে। তাঁর পরামর্শ ও সহযোগীতায় শম্ভু মিত্র প্রসাদ ঘোষের ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলের সঙ্গেও দু'একটি নাটকে অভিনয় করেন। তারপর দল ত্যাগ করে বাড়িতে বসে পড়েন। পেশাদারী থিয়েটারের ওঠা-নামা শম্ভু মিত্রকে তেমন খ্যাতি না এনে দিলেও অভিনেতা শম্ভু মিত্র কে প্রস্তুত করে দিয়েছিল একথা বলাই যায়—

"বাণিজ্যিক থিয়েটারে থাকাকালীন (১৯৩৯-১৯৪২) তিনি তেমন উল্লেখযোগ্য কোন চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাননি এবং দক্ষতাও দেখাতে পারেননি।

তবে অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দুর লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অবশ্যই শিশির ভাদুড়ির অভিনয় করে নিজেকে অভিনেতা হিসেবে প্রস্তুত করেন। তার নিজস্বতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতলাল মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিশির ভাদুড়ির স্বরক্ষেপণ ও উচ্চারণের রেশও শম্ভু মিত্রের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।”[৩]

ভ্রাম্যমান নাট্য দল থেকে বেরিয়ে শম্ভু মিত্র যখন অভিনয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে বসে আছেন সেই সময় বিনয় ঘোষ এবং বিজন ভট্টাচার্য তাঁর কাছে যান। তাঁদের কথাতেই শম্ভু মিত্র ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে’ যুক্ত হন। সে কথা তিনি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন। তারপর ১৯৪৩ সালের ২৫ শে মে ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র ‘ল্যাবরেটরি’ নাটকে বৈজ্ঞানিকের ভূমিকায় এবং ‘জবানবন্দী’ নাটকে পরান মন্ডলের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। নাটকের মঞ্চে সাবলীল চরিত্রে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শম্ভু মিত্রের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৩ সালের ২৪ শে অক্টোবর গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্য রচিত ‘নবান্ন’ নাটকটি অভিনীত হয় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। ‘নবান্ন’ নাটকে শম্ভু মিত্র দয়াল এবং টাউটের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। উল্লেখ্য অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘নবান্ন’ নাটক অভিনয়ের যুগ্ম পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন তিনি। ‘নবান্ন’ নাটকে শম্ভু মিত্রের অভিনয় প্রসঙ্গে সুধী প্রধান (১০.১১.১৯৯২) তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—‘শম্ভু মিত্র ‘নবান্ন’ নাটকে দয়ালের চরিত্র ছাড়া টাউটের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এবং আমার বিবেচনায় সেই অভিনয় অসাধারণ ছিল। কারণ কথাগুলি আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে হতো এবং অঙ্গভঙ্গি তদানুযায়ী নাটকীয় হত। যেন মনে হত একটা অজগর সাপ একটি হরিণ শিশুকে গিলে ফেলছে।’

গণনাট্য সংঘে একাধিক নাটকে সফলভাবে অভিনয় করেছিলেন নাট্যাভিনেতা শম্ভু মিত্র। অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই সাধারণ দর্শকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেও গণনাট্য সংঘের গুণী জনদের মতান্তরের কারণে গণনাট্য সংঘে ভাঙন দেখা দিলে শম্ভু মিত্র সেখান থেকে বেরিয়ে যান। কারণ শম্ভু মিত্র নিজস্ব অভিরুচি এবং শিল্পের আদর্শ নিয়েই নাটকের অভিনয়, প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন। শিল্পী স্বত্তার স্বতন্ত্রতা নিয়েই গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভু মিত্র প্রতিষ্ঠা করেন ‘বহুরূপী’নাট্যদল। উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠার শুরুতে এই নাট্য দলটির নাম ছিল ‘অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়’। দলটির জন্ম লগ্নে শম্ভু মিত্রের সহযোগী ছিলেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কলিম শরাফি, অশোক মজুমদার, অমর গঙ্গোপাধ্যায় প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায় দলটির প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র ‘নবান্ন’ (১৩/০৯/১৯৪৮) এবং ‘পথিক’ (১৬/১০/১৯৪৮) নাটকে যথাক্রমে দয়াল এবং অসীমের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ‘পথিক’ নাটকের নায়ক অসীমের চরিত্রে শম্ভু মিত্রের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। তারপর সকলের সহযোগীতা ও শম্ভু মিত্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালের ১ লা মে ‘বহুরূপী’পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়। ‘বহুরূপী’র সর্বেসর্বা তথা প্রাণপুরুষ ছিলেন শম্ভু মিত্র। ‘বহুরূপী’ প্রতিষ্ঠার পর অভিনেতা তথা নাট্যকার শম্ভু মিত্রের নানা দিক অধিক উজ্জ্বল ভাবে ফুটে ওঠে। পরিচালক, নির্দেশক, নাট্যকার, নাটক রচনা সবদিক থেকেই শম্ভু মিত্র আরও অধিক দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন। ‘বহুরূপী’-র প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র প্রায় তিন দশক ধরে সাবলীল ভাবে বিভিন্ন চরিত্রে সফলতার সঙ্গে ‘চার অধ্যায়’ (ইন্দ্রনাথ), ‘দশচক্র’ (পুর্ণেন্দু গুহ), ‘রক্তকরবী’, ‘রাজা’, ‘রাজা

অয়দিপাউস' (রাজা), 'ডাকঘর' (রাজকবিরাজ/ঠাকুরদা), 'পুতুল খেলা' (তপন), 'মুক্তধারা' (কঙ্কর), 'কাঞ্চনরঙ্গ' (পাঁচু), 'বিসর্জন' (জয়সিংহ)। এছাড়াও শম্ভু মিত্র বাংলা নাট্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতিতে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চানক্য, 'তুঘলক' নাটকে তুঘলক চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। শম্ভু মিত্র ক্যালকাটা রেপার্টরীতে গালিলিওর জীবন-এ গালিলিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। চরিত্রের বিভিন্নতার মধ্যেও অভিনয়ে শম্ভু মিত্র ছিলেন সাবলীল এবং অসাধারণ একজন অভিনেতা। রক্তকরবী, রাজা এবং রাজা অয়দিপাউস নাটকে শম্ভু মিত্র যেমন রাজকীয় মহিমায় অভিনয় করেছিলেন তা ছিল মন মুগ্ধকর। আবার সেই শম্ভু মিত্র যখন সাধারণ চাষী, ডাক্তার বা মধ্যবিত্ত কেরানীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন তখন তাঁর অভিনয় এবং কণ্ঠস্বর যেন তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত চিন্তাকেই প্রকাশ করেছিল—

> "বিভিন্ন চরিত্র প্রকাশে শম্ভু মিত্রের সাবলীল ও অনায়াস পারঙ্গম শক্তি বিস্ময়কর। কৃষক রহিমুদ্দি থেকে রাজা অয়দিপাউস, চাকর পাঁচু থেকে রাজ কবিরাজ, গৃহী তপন থেকে বিপ্লবী ইন্দ্রনাথ,যুবক জয়সিংহ থেকে বৃদ্ধ চাণক্য, ডাক্তার গুহ থেকে বৈজ্ঞানিক গালিলেও- বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের এবং নানা মাত্রার চরিত্রে শম্ভু মিত্র সব সময়েই অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়ে বাংলা থিয়েটারে চরিত্র অভিনয়ের নতুন ও গভীরতর মাত্রা যোগ করেছেন।"[৪]

শম্ভু মিত্রের এই অভিনয়ের অসাধারণ দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড.অজিত কুমার ঘোষ তার 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস'গ্রন্থে একটি যথার্থ মন্তব্য করেছেন—

> "শম্ভুবাবুর স্বাভাবিক অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে সংলাপ নির্ভর নাটকে। উচ্চারিত সংলাপের আপাত অর্থের গভীরে দর্শকের মনকে নিয়ে যাওয়া ছোটখাটো ক্রিয়া ও অভিব্যক্তি অশেষ তাৎপর্য মন্ডিত করে তোলা এটাই হল শম্ভু মিত্রের বৈশিষ্ট্য।"[৫]

বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে শম্ভু মিত্র শুধু একজন থিয়েটার পরিচালক বা সক্রিয় নাট্যকর্মী হিসেবেই নন একজন সফল নাটক রচয়িতা হিসেবেও স্মরণীয়। নাটককার শম্ভু মিত্র রচিত প্রথম নাটক 'উলুখাগড়া' (১৯৪২) এছাড়া শম্ভু মিত্র রচিত নাটক গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'একটা দৃশ্য' (১৯৪২-৪৩), 'ঘূর্ণি' (১৯৫০), 'বিভাব' ১৯৫১), 'গর্ভবতী বর্তমান' (১৯৬৩) ইত্যাদি। শম্ভু মিত্র রচিত আর একটি বিখ্যাত নাটক 'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৭)। নাটকটি পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর হলেও নাটককার আধুনিকতার মোড়কে নাটকটিকে নির্মাণ করে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া নাটককার শম্ভু মিত্র অমিত মৈত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'কাঞ্চনরঙ্গ' (১৯৬০-৬১) নাটকটি রচনা করেন। মৌলিক নাটক রচনা ছাড়াও শম্ভু মিত্র কয়েকটি নাটক অনুবাদও করেছেন। শম্ভু মিত্র অনূদিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইবসেন রচিত 'ডালস হাউস' অবলম্বনে রচিত 'পুতুল খেলা' নাটকটি এবং সাফোক্লেস রচিত 'ঈডিপাস দ্য রেক্স' অবলম্বনে রচিত 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকটি।

সময়ের ঘূর্ণিপাকে জীবনে প্রয়োজনের তাগিদে মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শম্ভু মিত্র অভিনয় জগতে প্রবেশ করেন। ব্যক্তি জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়েই শম্ভু মিত্র বাংলা নাট্য জগতের খ্যাতনামা অভিনেতা, নাটককার, নাট্যনির্দেশক ও পরিচালক হয়ে ওঠেন। প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সংঘের সান্নিধ্য গণনাট্য সংঘে অভিনয় শম্ভু মিত্রের শিল্পীসত্তার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তারপর গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক ভাবে তিনি নিজের নাট্যদল 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠা করেন। 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠা বাংলার নাট্য আন্দোলনকে পৃথক গতি প্রদান

করেছিল। তাই শুধু নাট্য অভিনেতা, পরিচালক বা নাটক রচয়িতা হিসেবেই নয় গ্রুপ থিয়েটারের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে শম্ভু মিত্র চিরস্মরণীয়।

তথ্যসূত্র:

১. রায়চৌধুরী সুবীর, শম্ভু মিত্রের সঙ্গে কিছুক্ষণ: একটি সাক্ষাৎকার, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৯০
২. ঘোষ জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, প্রকাশক – সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ-কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৪-১৫
৩. চৌধুরী দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ–জানুয়ারি,১৯৯৫,পৃষ্ঠা ৪৭৪
৪. তদেব,পৃষ্ঠা ৪৭৬
৫. ঘোষ ড. অজিত কুমার, বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস,কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৪০৯।

দস্তয়েভস্কির উপন্যাস : আত্মমুখী নায়কের আত্ম-অতিক্রমণের আর্তি

মইজুদ্দিন মোল্লা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

সারসংক্ষেপ: ভিক্টোরীয় যুগের চার্লস ডিকেন্স, থ্যাকারে, এমিলি ব্রনটি, স্যামুয়েল বাটলার, হেনরী জেমস, কনরাড প্রমুখের মধ্যে জর্জ এলিয়াট মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অন্তর্মুখিতার উদঘাটনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। J.W Beach-ও স্বীকার করেছিলেন, “I’m George Eliot, the psychology itself is highly interesting and illuminating”।[১] কিন্তু নীতিবাদী সচেতনতা থেকে সরে আসতে পারেননি। ভিক্টোরীয় যুগের দ্বিতীয় অর্ধে হেনরী জেমস যুগের সেই খেদটুকু মিটিয়ে দিয়েছিলেন। The Ambassador, The Golden Boughs কিংবা The Portrait of the lady প্রত্যেকটি উপন্যাসেই দেখিয়ে দিলেন উপন্যাসের কাহিনি আইডিয়া মাত্র। চরিত্রের চেতনসত্তার অভিব্যক্তি ও অচেতন সত্তার ভাবাবেগের পথে অবিরাম হাঁটতে হাঁটতেই একজন লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সতীর্থ হয়ে যান। এবং তার অন্তর্গত দংশনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে নিজেকে সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া। রুশ সাহিত্যিক দস্তয়েভস্কিও এঁদের থেকে সরে নন। এই প্রবন্ধে দস্তয়েভস্কির নায়ক চরিত্রেরা কিভাবে আত্ম-অতিক্রমণ করতে চেয়েছে তারই ইতিবৃত্ত রয়েছে।
মূল শব্দ: paradox fellow, Superman, mutual negation, Being and Nothingness, আত্মবিস্তার (self-assertion) ইত্যাদি।

মূল আলোচনা:

মানুষের মনের মগ্নচৈতন্যের নানা সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন ফ্রয়েড। যদিও এর বীজ ছিল ফরাসী মনস্তাত্ত্বিক Charot ও তাঁর শিষ্য Janet-এর মনোদর্শনে। তবুও, মগ্নচৈতন্যের যে রহস্য উদঘাটিত করলেন তা অমোঘ ও সনাতন বলে চলে আসা সংস্কার ও নীতিবোধকে ধূলিসাৎ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। নারীপুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের আদর্শায়িত বিধিবদ্ধ রূপের ধারণার বিরুদ্ধে সন্দেহ ও বিদ্রোহের অনুপ্রবেশ যেভাবে ঘটেছিল তাতে লেখকের মনস্তাত্ত্বিক তথা অন্তর্মুখিতায় ডুব দেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না কোনো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে উত্তরগঠনবাদের কাল পর্যন্ত আসতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, ‘Superman’-এর অবতারণা করতে হয়েছিল কখনো, কখনো বা হত্যা করতে হয়েছিল ঈশ্বরকে। কেননা, মানুষের মন বিচিত্র মার্গে লীলাচঞ্চল। লোকদেখানো বা মন ভোলানো কাহিনিমাত্রই সার্থক জীবনশিল্প হতে পারে না। মানবমনের বাধাবন্ধনহীন, অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক গতিপ্রকৃতির পরিচয় দিতে গেলে লেখকের চেতনাপ্রবাহপদ্ধতিকে গ্রহণ করাই ছিল বাঞ্ছনীয়। সুসংবদ্ধ অন্বয়হীন, যৌক্তিক পরম্পরাশূন্য বুদ্ধিচর্চা অনেকেরই লক্ষ্য হতে পারে কিন্তু খাপছাড়া, কিম্ভুত এক জীবনবোধ থেকে নিটোল, সুবলয়িত অর্থ নিষ্কাশন করা কঠিন। কঠিন এই কাজটি মানস-প্রবাহের লেখকেরা সাধ্য করেছিলেন অনেকখানি। কিন্তু, আত্মান্বেষণ প্রসঙ্গটি আরো ব্যাপক। অন্তিম সীমানা দেখার প্রবণতাই এই আর্তির মূল স্বর। এই বিচারে অস্তিবাদী দর্শনের দিকে মুখ ফেরালে প্রসঙ্গটি

আরো সহজ হয়ে যায়। কেননা, সম্ভাবনা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত এবং উদ্যোগ ব্যক্তিমানুষকে অসহায় ও সন্ত্রস্ত করে তোলে এই ধারণা আদমের স্বর্গচ্যুত হওয়ার কাল থেকেই চলে এসেছিল, কিন্তু "Dread is the possibility of freedom"[২] এই অকপট উচ্চারণটি শোনা গিয়েছিল অস্তিবাদী দর্শনের আদিগুরু কিয়ের্কেগার্দেই প্রথম।

কিয়ের্কেগার্দ প্রথাগতভাবে কোনো উপন্যাস লেখেননি, কিন্তু মানুষের নির্বাচিত বিষয়টি যে অসীম বা infinite তার ধারণা তাঁর *Either/or, The concept of anxiety, Point of view, The Present Age*-এর মতো কতগুলো গ্রন্থে যেভাবে দিয়েছিলেন তাতে রাশিয়ান লেখক দস্তয়েভস্কি'কে বোঝার পথটি অনেকটা সহজ হয়ে যায়। ভিক্টোরীয় যুগের দ্বিতীয় অর্ধের 'human being' থেকে 'individual'-এর দিকে হাঁটার যে ঝোঁক উপন্যাস-সাহিত্যের জগতে এসেছিল দস্তয়েভস্কিই সেখানে প্রথম। পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন,

> এক বিস্ফোরক মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা সাংসারিক ভালোমানুষের দল, আমরাও পাপী অথচ নিজেদের সাধু বলে জেনেছি, কিন্তু ডস্টয়েভস্কির পাপীরা নিজেদের পাপী বলেই জানে, তা জানে বলেই পুণ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাদের জ্বলন্ত, এবং সেই হিসেবে তারা আমাদের চাইতে উন্নত মানুষ, চৈতন্যে উন্নত, এবং চৈতন্য মানেই আধ্যাত্মিকতা। যারা সামাজিক বিধিবিধানের অনুগত হয়ে কোনোরকমে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেয়, যারা স্বার্থসিদ্ধির কারণে বাধ্য না হলে অন্যের কোনো ক্ষতি করে না এবং অহমিকার আত্মকণ্ডুয়ন ব্যতীত অপরের জন্যে কড়ে আঙুলটি তুলতে হলেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা আসলে না ভালো না মন্দ না কোনোকিছু... দুর্লভ, অতি দুর্লভ সেই সাধুতা, যা সচেতন সদর্থক এবং সকর্মক, যা কতগুলো নিষেধপালনের সমষ্টি মাত্র নয়, মানুষের অন্তঃস্থিত অকল্যাণ ও বৈনাশিকতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্ঞান, এবং সর্বমানবের দুঃখভার নিজের মধ্যে বহন করা যার তপস্যা।[৩]

১৯৬৪-তে প্রকাশিত হল তাঁর *Notes from the Underground*, মূলত ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে জনকল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার যে ইউরোপীয় তত্ত্ব জন স্টুয়ার্ট মিলের ভাবশিষ্য চের্নিশেভস্কি তাঁর *What is to be done* (১৮৬৩) উপন্যাসে প্রচার করেছিলেন তার প্রতিবাদ করেই দুটি প্রশ্ন রাখলেন উপন্যাসের শুরুতেই— "Where are the primary causes on which I am to build?"[৪], "Where are my foundation?"[৫] আত্মপরিচয়ের উপলব্ধিতে এই দুটি প্রশ্ন যথার্থ। উত্তর কতটা পাওয়া যাবে সে নির্ধারণ সম্ভব না হলেও উপন্যাসের নামহীন নায়ক জানে উত্তরের কাছাকাছি যাওয়ার পদ্ধতি একটিই—— আত্ম-বিশ্লেষণ।

গণিকা লিজাকে ভালোবেসেছে তাকে ফিরে না পাওয়ার অনুশোচনার কালে। ভালোবাসা যার কাছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উৎপীড়ন তার কাছে নীতিপরায়ণ, ন্যায়বাগীশ, পরিত্রাতা শব্দগুলির অর্থ বর্বরোচিত ছাড়া কী-ই বা হতে পারে! লিজা আর যায় হোক পাপপঙ্ক থেকে উঠে এসে সৎ জীবন-যাপন করার ইচ্ছা রেখেছে, নায়ক সেটুকুও পারেনি। অফিস, বন্ধু, ঘর, এমনকি ভৃত্য আপোল্লর কাছেও গ্রাহ্যতা না পাওয়া এই মানুষটি শেষে বুঝেছে লিজা নিজেও স্বাতন্ত্র্যবোধে এক এবং একমাত্র। তার কাছে সে 'paradox fellow' ছাড়া কিছুই হতেই পারেনি। তবে, বিশ্বাস করেছে, লিজার জীবনে পরবর্তীকালে যতই দুঃখকষ্ট আসুক, সহনীয় হয় উঠবে। কারণ যৌনকর্মীর জীবনের স্বাভাবিক আঘাতের চেয়ে প্রেমে পাওয়া আঘাত অনেক বড়। নায়ক অন্যকে

আঘাত করতে চায় না, কিন্তু পরিস্থিতির কাছে পরাজয়ের দুঃখকে অতিক্রম করতে গিয়েই অপর (other)-কে আঘাত দেওয়ার উন্নাসিকতাকে পোষে। ফ্রয়েড যাকে 'masochism' বলেন, ঠিক তাই।

উপন্যাসের শুরুতে যে নায়ক নিজের প্রতি অবজ্ঞায় বলেছিল, "I am a sick man... I am a spiteful man. I am an unattractive man"[৬], উপন্যাসের শেষে এসে বলেছে,

> I have only carried to an extreme in my life what you have not dared to carry halfway - and -what's more - you have taker your cowardice for good sense and have found comfort in deceiving yourselves. So perhaps- after all - there is more life in me than you.[৭]

পাতালবাসী অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছে সে। আত্ম-প্রত্যয়ে বেঁধেছে, নিয়মের আগল ভাঙাতেই তার হয়ে ওঠা। 'mutual negation' বা পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যদিয়ে 'inwardness'-এর এলাকায় নিজেকে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াসেই বেঁচে থাকা তার। হাইডেগার কথিত 'in-authentic man'-এর মতো টিকে থাকার স্রোতে এই তার বিপক্ষ-বিদ্রোহ।

Crime and Punishment (১৮৬৬)-এর নায়ক রাস্কলনিকভও চেয়েছিল তার অতিক্রমণমূলক সত্তা (transcendental being)-কে বাঁচিয়ে রাখার অদম্য শক্তি। যার দৌলতে সে হয়ে উঠতে পারবে নেপোলিয়ান। জার শাসিত রাশিয়ার এক বিপর্যস্ত মানুষ সে। ধারণায় তার গেঁথে আছে সুদখোরেরা পুঁজিবাদের প্রতিনিধি, মানবতাবাদের শত্রু। এই শত্রুদমনের মধ্যেই নিহিত তার 'shared existence' (সামাজিক অস্তিত্ব)-এর অংশ হওয়ার ভুবনজয়ী দুঃসাহস। মা-বোনের অসহায় অবস্থা দেখে মন কাঁদে তার, দেহোপজীবী সোনিয়ার দুঃখে ফোঁপায়। ইউনিভার্সিটির খরচ চালাতে না পারা এই পতিত (fallness) প্রায় মানুষটির ক্ষেত্রে অতিমানবের (Superman) আদর্শকে চেতনায় গ্রহণ করাটাই ছিল স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ছিল, সুদখোর বুড়িটিকে খুন করে স্বীকার করা,

> "আমি শুধু একটা জিনিসই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম, তখন শয়তান আমার উপর ভর করেছিল, সে আমায় দেখিয়েছিল যে ঐ রাস্তায় যাবার কোনো অধিকারই ছিল না। কেননা বাকি আর সবার মতই আমিও একটি কীট বই তো কিছু নই।[৮]

রাস্কলনিকভের নেপোলিয়ান হওয়ার স্বপ্ন দেখার মধ্যেই রয়ে গেছে তার আত্ম-অতিক্রমণের আর্তি যা নীটশের দর্শনের প্রাকরূপ।

নীটশে দর্শনের দিকে তাকালে দেখবো শূন্যবাদ বা 'Nihilism'-এর বিস্তৃতি। *Genealogy of Moral* গ্রন্থে নৈতিকতাকে ভাগ করেছিলেন এই সূত্রেই— প্রভুনৈতিকতা (master morality) ও দাসনৈতিকতা (slave morality)। তাঁর বিশ্বাস, ঈশ্বরশূন্য জগতে ঈশ্বরের বিকল্প আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাবে 'Will to power' বা ক্ষমতালাভের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে। এবং এই ক্ষমতার অধিকারী হবেন ঈশ্বরের বিকল্প ক্ষমতাবান শক্তি অতিমানব বা 'superman'. তিনি তাঁর কাল্পনিক চরিত্র জরাথুষ্ট্রের মধ্যে এই 'Superman'-এর আবির্ভাব ঘোষণা করেন। জরাথুষ্ট্র মানুষের জন্য পর্বত শিখর থেকে নীচে নেমেছেন। মানুষের যন্ত্রণা তিনি বয়ে বেড়ান আপন বুকে।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ তখন; দস্তয়েভস্কি’র *The possessed* উপন্যাসের প্রকাশকাল। উপন্যাসের নায়ক Kirillov দেবতাকে অস্বীকার করে মানুষ যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই বোধে বলে দিল, “there is no God,... if there is no God, then I am God’।[৯]

উপন্যাসের কাহিনিতে প্রবেশ করলে দেখবো, স্ট্যাভরোগিন নামক এক ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির শহরে ফিরে আসার মধ্যদিয়ে জন্ম ভারখোভেনস্কি, শাতভ, এবং কিরিলভের মতো কয়েকজন বিপ্লবীর। যারা সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্নতে নিশ্বাস নেয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে এরাই করতে চেয়েছে আত্মহত্যা। বুঝেছে, মর্তুকাম পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য নির্দিষ্ট পথনির্দেশিকা বা মানচিত্র নেই। ঈশ্বরকে অস্বীকার করা যেতে পারে আত্মহত্যার মাধ্যমেই। হাইডেগার দেখিয়েছিলেন, অস্তিত্বশীল মানুষের ‘Gewisheit’ বা আত্মজ্ঞানই চরম লক্ষ্য মৃত্যুতে পৌঁছে দেয়। কিরলভ এই লক্ষ্যতে পৌঁছতে চেয়েছে আপ্রাণ। দৃঢ় সংকল্পে বলেছে,

> If God exists, all is His will, and from His will I cannot escape. If not, it's all my will, and I am bound to show self will....
>
> I am bound to shoot myself because the higher point of my selfwill is to kill myself with my own hands...I have no higher idea than disbelief in God. I have all the history of mankind on my side. Man has done nothing but invent God so as to go on living, and not kill himself; that's the whole of universal history up till now. I am the first one in the whole history of mankind who would not invent God....
>
> For three years I've been seeking for the attribute of my god-head and I've found it; the attribute of my godhead is self-will! That's all I can do to prove is the highest point of my independence and my new, terrible freedom. For it is very terrible. I am killing myself to prove my independence and my new terrible freedom.[১০]

যুক্তির রাজ্যে বিষয় ও বিষয়ীর মর্যাদা সমান, এবং সেখানে অঙ্গচ্ছেদের সাহায্যে আত্মহত্যার অধিকার কেবল বিষয়েরই থাকতে পারে না, বিষয়ীর অনুরূপ দাবীও অবশ্যমান্য। কিরলভ বিষয় থেকে বিষয়ী হতে চেয়েছে বলেই তার অগাধ শূন্যতা।

উপন্যাসটি সম্পর্কে Ronald Hingley মন্তব্য করেছিলেন,

> it is Dostoevsky's greatest onslaught on Nihilism... and one of humanity's most impressive achievements—perhaps even its supreme achievement—in the art of prose fiction.[১১]

সার্ত্রে তাঁর Being and Nothingness গ্রন্থে পূর্ববর্তী দার্শনিক চিন্তার আলোচনা করে শূন্যতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “Man is the being through whom nothingness comes to the world”।[১২] এবং এর পরে পরেই শূন্যতার শ্রষ্টা মানুষের কর্ম ও চিন্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, “But this question immediately provokes another : what must man be in his being in order that through him nothingness may come to being?”[১৩]

দস্তয়েভস্কির শূন্যতা সংক্রান্ত চিন্তার সঙ্গে সার্ত্রেকে মেলাতে গেলে কালানৌচিত্য দোষ ঘটবে, কিন্তু সামীপ্য পরিস্ফুট। ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সুধীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করলে কিরলভের বেঁচে থাকার প্রয়াসকে অনেকাংশে বোঝা সহজ হয়,

> প্রকৃত প্রস্তাবে অবাধ স্বাধীনতা কেবল নাস্তির মধ্যেই সম্ভব, যেখানে নিষ্ক্রিয়তা অনাদ্যন্ত, সেই সর্বতোভদ্র নির্বাচনক্ষেত্রেই সকল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা যায়। অন্যত্র নিয়মই সর্বেসর্বা, এবং সে নিয়ম হয়তো খেয়ালমতো স্বাধীনতার ছদ্মবেশ পরে, কিন্তু চুল পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতিও তার প্রশ্রয় পায় না। সেই জন্যে সতর্ক জীবনযাত্রার ফলে শুধু দীর্ঘায়ু মেলে, অমরতা আয়ত্তে আসে না; সেই জন্যে স্থলচর মোটর সংস্কারান্তে নৌকা চালাতে পারে, ঘোড়দৌড় জেতে না। অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা ব্যক্তিস্বরূপেরও নেই, দেশ ও কালকে উৎরিয়ে তার দৈবী প্রভাব লোকে লোকান্তরে প্রতীক্ষমান নেই, তাকেও মানুষী উপায়েই ফুটিয়ে তুলতে হয়, এবং উপায় যেকালে উদ্দেশ্যের সেবক তখন যে নিজের অভীষ্ট সম্পর্কে যতখানি সচেতন, তার ব্যক্তিস্বরূপ সেই অনুপাতে ব্যক্ত।[১৪]

১৮৬৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল *The Idiot.* Joseph Frank লিখেছিলেন, "the most personal of all Dostoevsky's major works, the book in which he embodies his most intimate, cherished, and sacred convictions."[১৫] গল্পের নায়ক মিশকিন দীর্ঘদিন সুইজারল্যান্ডে মানসিক চিকিৎসার পর রাশিয়ায় ফিরে এল, দেখল, বাস্তবজীবনেও মানুষের চিন্তা ও আচরণে সর্বত্র লজিক খুঁজতে গেলে নিরাশ হতে হয়। বস্তুত সেইজন্যই যেখানে সরলতা, সততা এবং খ্রিস্টান মূল্যবোধ একটি রোগ সেখানে তার নাম ইডিয়ট হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয় তাই। বিকারগ্রস্ত চরিত্রের মিছিলে সে নিজে একা, একাকী। নাস্তাসিয়া ফিলিপোভনাকে ভালোবেসে ক্লান্ত মিশকিন আত্মপীড়নকে প্রশ্রয় দিতে পারে না, ফ্রয়েডের মতো ভাবতেও পারে না, "instinct of self-preservation will attempt to turn every situation to its own accounts, the ego will try to get some advantage even out of being ill"।[১৬] সে ধর্মপ্রাণ মানুষ। ফ্রয়েড কথিত 'love-hate relationship'-তে বিশ্বাস করে না বলেই অনুচ্চারিত আত্মকথন তার "I used to watch the line where earth and sky met, and longed to go and seek there the key of all mysteries, thinking that I might find there a new life, perhaps some great city where life should be grander and richer-- and then it struck me that life may be grand enough even in a prison."[১৭]

অস্তিবাদী অবক্ষয়িত মূল্যবোধের মুমূর্ষু সময়ের আরো বিস্তার ঘটিয়েছিল তাঁর *The Brothers Karamazov.* 1879 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর 1880 পর্যন্ত 'দ্য রাশিয়ান মেসেঞ্জারে' সিরিয়াল হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল উপন্যাসটি। প্রকাশের চার মাসেরও কম সময়ে মারা গেলেন লেখক স্বয়ং। এর কুড়ি বছর পর থেকেই শুরু হল ঈশ্বর-জারকে উৎখাত করা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। নায়ক ইভান এই বিপ্লব-পথে দাঁড়ালো দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। ফাদার জসিমাকে জানালো অকপটে, "There is no virtue if there is no immortality"।[১৮] অপরাধীর পাপের শাস্তি যদি সকলেই পেয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ, বিশ্ববিধান নিষ্ঠুর; হয় ঈশ্বর নেই, নয় ঈশ্বরই অমঙ্গলের উৎস। *Existentialism Is a Humanism* গ্রন্থে সার্ত্রেও তুলেছিলেন একই স্বর, "Nothing will be changed if God does not exist... even if

God existed that would make no difference from its point of view. Not that we believe God does exist, but we think that the real problem is not that of His existence; what man needs is to find himself again and to understand that nothing can save him from himself, not even a valid proof of the existence of God."[১৯]

পিতা ফিওদর পাভলোভিচ কারামাজভ মদ্যপ, ভাঁড়। প্রথম পুত্র Dimtri-কে রেখে স্ত্রী মারা গেলে আবার বিয়ে করেন। তারই সন্তান ইভান ও আলেক্সেই। দ্বিতীয় স্ত্রীও মারা গেল তার অত্যাচারে। পরে আবার যাকে জন্ম দিলেন তাকে জারজ বলা হল। স্মের্দিকোভ সেই জারজ সন্তান যার মায়ের পরিচয় কেবল পাভলোভিচের পরিচারিকা হিসেবেই। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই সে নিজেকে খুঁজেছে। জেনেছে, আত্মপরিচয়ের পথে নিজের খোলস ভাঙার মধ্যেই নিহিত তার আত্মবিস্তার (self-assertion)। পিতাকে সে খুন করেছে তাই। স্বীকারও করেছে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যাও করেছে সে, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখায় প্রয়াসে জানিয়ে গেছে খুনের পিছনে বাকি তিন ভাইয়েরও প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা ছিল। তারা কোনো না কোনো রকমভাবে পিতা কারামোজভকে ঘৃণাই করে এসেছে। Alyosha গোঁড়া খ্রিষ্টধর্মের মূর্ত প্রতীক। সে কখনোই চায়নি আত্মজিজ্ঞাসুর চিন্তা ও চেতনার অন্তর্দ্বন্দ্বের বয়নে ঈশ্বরকে ছাপিয়ে যাওয়া হোক। বরং এই ইচ্ছাটিকে লালন করেছিল বড়ভাই Dmitri-ই সবচেয়ে বেশি। যেখানে, "Both Ivan and Alyosha are known as proper and well-mannered men. Ivan is known for his pursuit of intelligence and study where Alyosha is a reputable man of faith."[২০] সেখানে সে বলে বসেছে, "... I always liked side-paths, little dark back-alleys behind the main road-- there one finds adventures and surprises, and precious metal in the dirt."[২১] তার এই উল্টোদিকে যাওয়ার গন্তব্য কী সে নিজেও জানে না, শুধু বিশ্বাস করে, মানুষের আত্মিক-নৈতিক শাস্তিই মূখ্য। ঈশ্বর থাক বা না থাক, প্রত্যেক মানুষই 'Agitated melancholia' রোগে আক্রান্ত; প্রত্যেকে আশ্রয়চ্যুত হওয়ার ভয়ে ভীত। এই ভয়কে ছাপিয়ে যাওয়ার মধ্যেই আছে আত্ম-অন্বেষণের প্রয়াস। আর সেইজন্যই ইভান-কাতেরিনা জেল থেকে পালিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে অসম্মতিতে সে জানায়, "I accept the torture of accusation and my public shame. I want to suffer, and by suffering I shall purify myself".[২২] অর্থাৎ পলায়ন নয়, আত্মশুদ্ধির অভিলাষে আত্মপীড়ন অনেক শ্রেয়।

আসলে জিজ্ঞাসু মানুষমাত্রই অপরিমেয় কৌতুহল নিয়ে সে একা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন ক্রমাগত বিকৃত হয়ে চূড়ান্ত সমাজবিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়, তখনই স্বেচ্ছানির্বাসনের যন্ত্রণা আধুনিক অস্তিত্বের পক্ষে অনিবার্য হয়ে ওঠে। *Brother Karamazov*-এর Dmitri, Alyosha, Ivan প্রত্যেকেই র‍্যাঁবোর কবিতার নায়কের মতো ভেবেছে এই যন্ত্রণাকে বুকে নিয়েই, 'I is another'.[২৩] স্থুল বহিরাবয়ব ও সংকেত-ঋদ্ধ অন্তরকাঠামোর মধ্যে প্রলম্বিত রয়েছে এক রক্তাক্ত ঝরোখা। যার কোনো ইতি নেই।

তথ্যসূত্র:

১. Warren Beach, Joseph, 1932, *The Twentieth Century Novel*, New York, Appleton Century Crofts Inc., page : 33

২. *https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/dk/kierkega.htm*, 01.07.2024, 3:10 am

৩. বসু, বুদ্ধদেব, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতার রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা: ৫৫-৫৬

৪. Dostoevsky, Fyodor, 1960, *Notes from the Underground*, trans. Constance Garnett, included in *Three Short Novels of Dostoevsky,* Garden City, New York, Doubleday Anchor, page : 193

৫. তদেব, পৃষ্ঠা : ১৯৩

৬. তদেব, পৃষ্ঠা : ৩২

৭. তদেব, পৃষ্ঠা : ২৯৩

৮. দস্তয়েভস্কি, ফিওদর, ২০০৫,*অপরাধ ও শাস্তি*, অরূণ সোম অনুদিত, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পৃষ্ঠা : ভূমিকা অংশ : ঢ-ণ

৯. Dostoevsky, Fyodor, 2014, *The Posssessed or The Devils*, trans : Constance Garnett, New York, Global Grey, page : 405

১০. তদেব, পৃষ্ঠা : 601

১১. Hingley, Ronald, 1978, *Dostoyevsky : His Life and Work*, 1st ed., London, Paul Elek Limited, page : 65

১২. Sartre, Jean-Paul, January 1956, *Being and Nothigness;an essay on phenomen ological ontology*, trans, Hazel Barhes, New York, Philosophical Library, Page : 24

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা : 25

১৪. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৫, *স্বগত*, সূচনা অংশ, কলকাতা, ভারতী ভবন, পৃষ্ঠা : ১৪

১৫. Frank, Joseph, 2010, *Dostoevsky : A Writer in His Time,* Princeton University Press, page : 577

১৬. Frued, Sigmund, 1933, *New Introductory Lectures on Psycho-Analysis*, Published by Leonard and Virginia Woolf, London, Hogarth Press, page : 121

১৭. Dostoevsky, Fyodor, 2004, *The Idiot*, Mills Todd III edited, Penguin Classics, page : 641

১৮. Dostoyevsky, Fyodor, 1963, *The Brothers Karamzazov*, trans. by Constance Garbett, New York, The Modern Library, page : 169

১৯. Sartre, Jean-Paul, 1989, *Existentialism Is a Humanism*, in Existentialion from Dostoyevsky to Sartre, ed. Walter Kaufman, trans. Philip Mairet, Meridian, page : 26

২০. *sparknotes.com/lit/brothersk/quotes/character/dmitri/, time : 03.10.2024, 05.053 pm.*

২১. Dostoyevsky, Fyodor, 1963, *The Brothers Karamzazov*, trans by Constance Garbett, New York, The Modern Library, page : 243

২২. তদেব, page : 572

২৩. Breton, Andre, 1910, *Manifestos of Surrealism*, trans by Richard Seaver and Helen R. lane, Ann Arbor publication,page : 50.

উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের কথ্যভাষার কবিতা ও তার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয় সন্ধান

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা কতটা গ্রহণযোগ্য? এই বিতর্কে না গিয়ে শুধু এটুকু বলতে চাই স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে মানুষের একঘেঁয়েমি জীবন থেকে বাঁচার তাগিদে জলবায়ুর পরিবর্তন যেমন প্রয়োজন, তেমনি সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে বয়েচলা শিষ্টরূপের একঘেঁয়েমিয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আঞ্চলিকতার সুর কোথাও যেন আবশ্যিক হয়ে ওঠে। কল্লোল পূর্ববর্তী সাহিত্যে মার্জিত শিষ্টরূপের বাইরের ভাষা এক শ্রেণির পাঠক ও সাহিত্যিকের কাছে কু-রুচিকর গেঁও বলে গণ্য হলেও আজ দিন বদলের হাওয়া লেগেছে সাহিত্যের পালে। সেই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সাজানো পুতুলের মত মার্জিত ভাষাকে অনেকে মনে করছেন কৃত্রিম। তাঁদের কাছে মানুষের মৌখিক অকৃত্রিম কথ্য ভাষাটাই হল ভাষার জীবন্ত খাঁটি দলিল। যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে সাধারণ মেহনতি অল্পশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার। কল্লোল পরবর্তী বাংলা শিষ্টসাহিত্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক সাহিত্যের যে ধারার প্রচলন হয়েছিল প্রান্তিক আঞ্চলিক কবিতাও সেই ধারার আরও এক নবতম সংযোজন। বীরভূম, পুরুলিয়া জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সাহিত্যও তার প্রমাণ বহন করে। দেবব্রত সিংহ সম্পাদিত 'বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংগ্রহ' (২০১০) সংকলনটিতে রয়েছে অসমের কাছাড় ও শিলচরসহ দুই বাংলার একশো চোদ্দ জন কবির আঞ্চলিক ভাষায় লেখা দুই শতাধিক কবিতা। বইটিতে সুন্দরবন অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুই থেকে তিন জন কবির একটি করে কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাত্র। কোথাও যেন ব্রাত্য থেকেছে দুই ২৪ পরগনার বাদাবন অঞ্চলের আঞ্চলিক কবিতা। সুন্দরবন অঞ্চলের আঞ্চলিক কবিতাও সাহিত্যের সেই বাস্তবতাকে অনায়াসে চিনিয়ে দেয়, এ কথা আজ অস্বীকার করার জায়গা নেই। যেখানে মার্জিত সাহিত্যের মতো কথ্যভাষার কবিতাতেও ধরা পড়েছে সাহিত্যের মৌল অনুভূতি, মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ কেন্দ্রিক নানান বিষয়বৈচিত্র্য। কথ্যভাষায় কবিতা হয়ে উঠেছে সেকেলে ভাষার যাবতীয় মার্জিত কৃত্রিমতা ব্যতি রেখে মাটিঘেঁষা, ধুলি-ধূসর মণ্ডিত মানুষের জীবনের প্রতীক। প্রাবন্ধিক অধ্যাপক ডক্টর সনৎ কুমার নস্করের কথায় বলতে হয়, সাহিত্য "আর কোন মোহিনী আড়াল রাখতে রাজি নয়। সে এবার হাঁটবে খালি পায়ে, মেঠো পথে, আদুড় গায়ে। তার গায়ে ফুটে উঠবে সদ্যতম সময়ের চিহ্নজাল। চোখে-মুখে-নাকে এসে লাগবে, কোন কুমারী ভূখণ্ডের রূপ-রস-গন্ধ। বাদাবন এমনই এক কুমারী ভূখণ্ড, যা বিস্তৃর্ণ হয়ে আছে এ বাংলার সর্বদক্ষিণ প্রত্যন্তে জল, জঙ্গল আর নোনামাটির রাজ্যে। এখানকার প্রাত্যহিকতার পাঁচালী লিখেছেন এই অঞ্চলেরই রচনা নিপুন কিছু কথাকার। লিখেছেন তারা ভূমিপুত্রদের দায়াধিকার নিয়ে। চারপাশে প্রসারিত জীবনের বিষাদ-কটু অভিজ্ঞতা নিয়ে। কবিতা হচ্ছে কথন নির্ভর সেই সেলুলয়েড যেখানে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে জীবনের জলছবি। বাদাবনের জীবন্ত রূপকে আরো উজ্জ্বল, আরো শানিত করেছে এই অঞ্চলের দেহাতি মানুষের ভাষা। সবাই জানেন আঞ্চলিক ভাষার কবিতা এখন আর ব্রাত্য নয়। বরং তাকে নিয়ে চমৎকার একটা 'অবসেন্' গড়ে উঠেছে

শহুরে শিক্ষিত মার্জিত রুচিবানদের ভিতরে। দেহাতি মানুষের জ্যান্ত স্বরে ভর করে তাঁরা ফিরতে চাইছেন অনতি অতীতে, কেউ কেউ দেখতে চাইছেন নিম্নবর্গের হাড়-হাভাতে জীবনকে।"[১] এই অঞ্চলের নদীর মাছ, জঙ্গলের কাঠ-মধু যেমন এখানকার মানুষের এক মুঠো অন্ন যোগায়, তেমনি জলের কুমীর, ডাঙায় বাঘ–সাপের আক্রমণে অহরহ অসহায় মানুষের প্রায়শ প্রাণ যায়। জীবন-মৃত্যুর এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এখানকার মানুষের সংগ্রামী ভাষা সেকাল থেকে একালে সাহিত্যিকের সাহিত্যের নানা প্রকরণে উপাদান হিসেবে তথ্য যুগিয়ে চলেছে। জীবন-মৃত্যুর রহস্যময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখানকার মানুষের মৌখিক বুলি কথাসাহিত্যের পাশাপাশি ভাষাগত পুষ্টি জুগিয়ে চলেছে আঞ্চলিক ভাষার কবি সাহিত্যিকদের। গল্প ও উপন্যাসের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে কবিতার মতো শাখাতেও আঞ্চলিক কথ্যভাষা স্ব-মহিমায় বিরাজ করেছে। সুন্দরবনের রহস্যঘেরা বন্যপ্রকৃতি আঞ্চলিক কবিতায় যেমন জীবন্ত রূপ লাভ করেছে, তেমনি এখানকার সহজ সরল মানুষের প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার সংগ্রামী জীবনযাপনের ইতিহাস, লোকায়ত সংস্কৃতি প্রভৃতি কাব্য রচনার মৌলিক উপাদান হয়ে সাহিত্যিকদের কাছে ধরা দিয়েছে চিরকাল। বাদাবন অঞ্চলের মানুষের দুঃখ বেদনা সংগ্রাম আনন্দ-অশ্রু যন্ত্রণার সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে মার্জিত ভাষায় রচিত সাহিত্যের পাশাপাশি এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কাব্য-কবিতায়। তাই কথ্যভাষার কবিতার সঙ্গে খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষগুলির প্রাণের যোগ, তাঁদের হৃদয়স্পন্দন সর্বক্ষণ বিরাজমান। যে স্পন্দন অবিরাম ভাবে বয়ে চলেছে নদী ভাঙনের কূলে বসবাসকারী জেলে-মাঝি-কৃষকের অসহায় নুয়ে পড়া জীর্ণ কুটিরে।

বাদাবনের প্রান্তিক অঞ্চলের অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষগুলির মুখের ভাষার একটি নিজস্বতা রয়েছে। রয়েছে সময় ও কালগতভাবে বিবর্তিত সর্বজনস্বীকৃত ভাষার একটি আদর্শায়িত মিশ্রিত কথ্যরূপ। উভয় বাংলার (ওপার বঙ্গ এপার বঙ্গ) মানুষের কাছে ঐতিহ্যনির্ভর ভাষাসংস্কৃতির এই বিবর্তন সত্যিই দুঃখের। পূর্ব বাংলার সুন্দরবন হিসেবে পরিচিত অঞ্চলটি 'বঙ্গালী' উপভাষার ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে অবস্থিত। পশ্চিমবাংলার উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলটি 'রাঢ়ী' উপভাষার মধ্যে পড়ে। কিন্তু মজার বিষয় দুই চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন সংলগ্ন মানুষেরা 'রাঢ়ী' উপভাষার সার্বিক নিয়ম মেনে কথা বলেন না। সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজত্বে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বসবাসের স্বপ্ন নিয়ে আগত অসংখ্য মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষার সঙ্গে এখানকার 'রাঢ়ি' উপভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি 'মিশ্রিতভাষার'[২] জন্ম দিয়েছে। এজন্যই সুন্দরবন গবেষক শশাঙ্ক মণ্ডল সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের ভাষা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে আঞ্চলিক চারটি[৩] দিকের কথা উল্লেখ করেন। যথা—

১) খুলনা বাগেরহাট এলাকা থেকে পূর্বদিকে বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী পর্যন্ত একটি ভাষা অঞ্চল।

২) খুলনার পশ্চিমমাংশের সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার ইছামতি, কালিন্দী, নদীতীরবর্তী অঞ্চল।

৩) যশোর জেলার উপভাষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী তীরবর্তী নদীয়া প্রভৃতি এলাকাভুক্ত অঞ্চল।

৪) ডায়মন্ড হাবরার, কাকদ্বীপ, মগরাহাট জুড়ে বর্তমানে ডায়মন্ড হাবরার আলিপুরের দক্ষিণাংশ নিয়ে আরো একটি অঞ্চল। এই অঞ্চল গুলিতে মেদিনীপুরের আঞ্চলিক প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

উপর্যুক্ত ভাগগুলির মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, হেমনগর কোস্টাল, সন্দেশখালি-১ সন্দেশখালি-২ ব্লকের মধ্যে ইছামতি, কালিন্দী, রায়মঙ্গল নদীতীরবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক মানুষের কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরাই এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

এই অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন, উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থেকে প্রকাশিত, রামগোপাল বিশ্বাস সম্পাদিত 'জলজঙ্গল' (১৯৭৭) ও দুলদুলি গ্রামের মঠবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'সুন্দরবন সাহিত্য পরিষদ' (সাধারণ সম্পাদক বিধানচন্দ্র হালদার, ১৯৮০-৮১) পত্রিকা দু'টির হাত ধরে এই অঞ্চলের অন্যতম স্বভাব কবি নকুল বায়েনের আত্মপ্রকাশ ও পরিচিতি ঘটে। আজীবন কবি তাঁর অভাব অনটনকে সঙ্গী করে 'সদগুরু মাহাত্ম্য' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর চল্লিশটি নির্বাচিত কবিতা নিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয় 'কান্নাহাসির ঝরনা' কাব্যগ্রন্থ খানি।অর্থের অভাবে এই প্রান্তিক কবির অনেক মূল্যবান লেখা অপ্রকাশিত থেকেছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হারিয়েও গেছে।

সুন্দরবন সংলগ্ন এই অঞ্চলে শীতলিয়ার অরবিন্দু মণ্ডল ও হাটগাছার অনুকূল মণ্ডলের সম্পাদনায় 'জাগন্তিকা' (১৩৭৩), 'সুন্দরবন' (১৩৭৬), 'সুন্দরবন সেতু' (১৩৭৭) এই তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, ব্লক সন্দেশখালি-২, শীতলিয়া গ্রাম থেকে অপরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, ২০০৮ সালে প্রথম প্রকাশিত, 'আবাদ সাহিত্য' ত্রৈমাসিক সংস্কৃতি ও গবেষণাধর্মী পত্রিকাটি বর্তমানে আবাদী সুন্দবন চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এবং আঞ্চলিক ভাষার কবিতা প্রকাশে পত্রিকাটি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। এই পত্রিকায় ছোট-বড় নবীন বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক তাঁদের বিভিন্ন কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ আজও পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ করে চলেছেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বিছিন্ন ভাবে প্রকাশিত কবিতায় ও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত কাব্যে আঞ্চলিক ভাষার কবিতা সে অর্থে উঠে আসেনি। তবে, হাতেগোনা কয়েকটি লিটিল ম্যাগাজিনের কয়েকজন সম্পাদক যেমন, 'কনিকা সাহিত্য' (সম্পাদক অরিজিত সিংহ) বইমেলা ২০১৩, এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে প্রকাশিত 'আবাদ সাহিত্য' (অপরেশ মণ্ডল ও কনকান্তি রায় সম্পাদিত) শরৎ ১৪২৬, 'আবাদ সাহিত্য' পৌষ ১৪২৭, 'সুচেতনা' (তপন বাইন সম্পাদিত) রজতজয়ন্তী বর্ষ ২০২৪ এই সমস্ত পত্রিকা এক থেকে দু'টি করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতা প্রকাশ করে প্রান্তিক সুন্দরবন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার প্রতি তাদের ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'কণিকা সাহিত্য' ২০১৪ বই মেলা, এই সংখ্যা থেকে আমরা খুঁজে পেয়েছি ভবশেখর মণ্ডলের 'ও বউ তুই স্যামলা' এবং 'ক্যাঁকড়া খাবে নোভের চারা মেদি ভুঁতি' আঞ্চলিক ভাষার এই দুটি কবিতা। উত্তর ২৪ পরগনার হেমনগর কোস্টাল থানার গোবিন্দকাটি অঞ্চলের ভূমিপুত্র সুমন মিস্ত্রির 'সোঁদরবনের জেবন' এবং সুলতা গায়েনের 'নোনা গাঁ-র বউ' কবিতা দুটি আমরা অপরেশ মণ্ডল ও কনক কান্তি রায় সম্পাদিত 'আবাদ সাহিত্য' বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা, শরৎ ১৪২৬ থেকে সংগ্রহ করেছি। আবাদ সাহিত্যের পৌষ ১৪২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'দোখ্নো' ভাষায় রচিত মাধুরি হালদারের 'উড়ে গেচে চাল' ও রবিরাম হালদারের 'তবু ধরি মিন' এবং অনাথ মৃধার 'সুন্দরী' ভাষায় রচিত 'ফিরে যাও কালিন্দী' এই তিনটি কবিতা। তপন বাইন সম্পাদিত 'সুচেতনা' রজতজয়ন্তী বর্ষ ২০২৪, সংখ্যা-২২ থেকে আমরা আশিস গায়েনের 'মা'-র বাগান' কবিতাটি সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও শিক্ষক কবি আশিস গায়েনের কিছু অপ্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার কবিতা আমরা অনুসন্ধান করতে পেরেছি। প্রসঙ্গক্রমে সেগুলিও ভাষাতাত্ত্বিক

আলোচনার প্রয়োজনে আমরা ব্যবহার করেছি। প্রসঙ্গক্রমে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে আলোকপাত করতে চাই, সুন্দরবন গবেষক ও সমালোচকরা সুন্দবন কেন্দ্রিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুন্দরবনের উত্তর ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ভাষাকে 'সুন্দরী'[৪] ভাষা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার আঞ্চলিক কথ্যভাষাকে 'দোখ্‌নো'[৫] ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন।

উত্তর ২৪ পরগনার বাদাবন অঞ্চল কেন্দ্রিক কবিতায় ব্যবহৃত কথ্যভাষার পরিচয় সন্ধান, এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে বলতেই হয় বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে যারা বসবাস করছেন তারা সবাই কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ নন। এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বিগত বেশ কয়েক যুগ ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে অনেক সংযোজন এবং বিয়োজন লক্ষ্য করা গেছে। প্রাচীনকাল থেকে যারা ছিল তাঁদের অনেকেই জীবিকার প্রয়োজনে বাইরের রাজ্যে গেছেন, আবার একইভাবে অনেকেই বাইরের রাজ্য থেকে জীবিকা বা বাসস্থানের স্বপ্নে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন। ফলে যে সমস্ত অধিবাসী নানান প্রতিকূলতাকে জয় করে থেকে গেছে তাদের ভাষার সঙ্গে বহির্জগত থেকে আগত জনগণের ভাষাগত একটি সংমিশ্রণ ঘটেছে। আবার আঞ্চলিক জেলাগতভাবে এই মিশ্রিত ভাষায় বেশ বৈপরীত্য চোখে পড়ে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার নিম্নাংশে বিশেষ করে হিঙ্গলগঞ্জ, হেমনগর কোস্টাল, সন্দেশখাল-১, সন্দেশখালি-২, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, মিনাখাঁ সাতটি ব্লকের মধ্যে ইছামতী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল নদীতীরবর্তী অঞ্চলকেন্দ্রিক মানুষের মুখের ভাষায় একটি আলাদা ভাষা-ছাঁদের সন্ধান মেলে, যার ভাষাবৈশিষ্ট্য আলোনা এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। উপর্যুক্ত সাতটি ব্লকই সুন্দরবন সংলগ্ন বলে ধরা হয়। সাধারণত এই অঞ্চলের মানুষের মুখের বুলি সমালোচকদের ভাষায় 'সুন্দরী' ভাষা নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের দু'টি কবিতা এ প্রসঙ্গে তুলে ধরতে পারি—

নোনা গাঁ-র বউ

পল্লীগাঙে নৌকা ব্যায়ে ঐ যে কেরা যায়–
ডাক দে আমায় বাপের ঘরের খবর যদি পায়।
কেরাম্‌ আছে মা বাপ তার; কেরাম্‌ আছে পাড়া?
শুনতি পালি, মনডা হবে সোনার চ্যায়ে বাড়া।
সারাদিনির কাজের ফাঁকে গাঙের দিকি চায়
দৌড়ে আসে— যদি কোন চেনা মাঝি যায়।
সেই যে যেদিন বে'হুল অন্য পাড়াতে–
যাতি মানা বাপের ঘরের রাস্তা মাড়াতে।

গরীব বাপে পারিনি দিতি নগদ টাকা-কড়ি,
বে'র পরে তাই বন্দ হুল যাওয়া বাপের বাড়ি।
বদমেজাজী স্বামীডারও স্বভাব সেরাম না
সুখ খুঁজতি কাল কাটিয়ে পালাম কান্না।
দিন মজুর বাপের কথা বড্ড পড়ে মনে–
আজকে আমার নাকে নোলক কানপাশি দুই কানে

টানাটানির সংসারডায় বাপের মুখির হাসি
মাথার ওপর হাতডা রাখে বুলত-ভালোবাসি।

বাপ যে আমার খাবার কালে বুসত হ্যাসে পাশে-
বুলতো ‘এরাম্ সোনার শরীল ভাঙবে যে পোষ মাসে’
আদর কুরে মুখি তুলে খাবিয়ে দিত আমায়,
চোখির জল ফিলত মুছে ঘাড়ের গামছাডায়।

সেই বাপেরে কদ্দিন যে দেখতি পায়নি চোখি,
অন্য গাঁ-র বউ হুয়ে হলাম বড়ো দুঃখি।
চোখির জলে আঁচল ভেজে, কষ্ট কোনে রাখি?
যাতাম উড়ে বাপের কাছে, হতাম যদি পাখি।
বাপডা আমার কেরাম্ আছে দ্যাকপো তারে কবে?
কালকে আমার স্বামীর ঘরে সতীন বরণ হবে!
দুয়োরানীর সোংসারেতে আসপে নতুন মুখ,
মরার পরে চিতের ওপর হবে আমার সুখ।[৬]

সোঁদরবনের জেবন

ভোর না হোতি ছাবালগুনো বিছানা-পত্তর ছাড়ে
বউডা তখন দাওয়ায় বুসে জল দেবা ভাত বাড়ে।
ভাত খাইয়ে, মুখ আঁচিয়ে মাজায় গামছা বাঁধে
বিড়ি জ্বালিয়ে বারিয়ে পড়ে, জাল দড়া নে কাঁধে।
নোনা গাঙের বুকি তো বেশ জোয়ার ভাটা খ্যালে
মানুষগুনো এক এক কুরে, গাঙের চরে ওলে।
গলা সমান জলে ন্যামে, সার-বাঁধে জাল টানে
জলের তলায় কামোট কুমীর কোণে কেডা জানে?
মরার ভয়ে, ভয় পায়না এ মানুষগুনো আর
জাল টানে না, টানে যেন টানাটানির সংসার।
বউডা য্যাকন সরম ঢাকে, ছেঁড়া কাপড় পুরে
গোবর খোঁটে, মাঠে ঘাটে কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে।
একটা তার কাঁখে ঝোলে, একটার হাত ধরা
আধ লেংটা ছাবাল মাইয়ে, পায়না তো পেট পোরা।
এসব কথা ভাবলি বাপের, মাথায় আগুন জ্বলে
মরার সময় মরণ হবে, ভয় পালি কি চলে?
সারাদিনের বাগদা বেচে, দু’দশটা টাকায়
তা না হোলি কেমনে বলো, আগুন জ্বলে পাকায়?
নোনাগাঙের জলে যেমনি জোয়ার ভাটা খ্যালে
ত্যামন করে সোঁদরবনের জেবন বয়ে চলে।[৭]

উপর্যুক্ত দু'টি কবিতার মধ্যে দিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক স্বরূপকে সংক্ষেপে এভাবে চিনে নেওয়া যায়—

ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয়:

অন্ত্যস্বরাগম: কেমন > কেমনে (এ-এর আগম)।যেমন > যেমনি (ই-এর আগম)

অন্ত্যস্বরলোপ: দ্রুত উচ্চারণ বা উচ্চারণকে সহজ করার জন্যে এই ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যথা—

সারি বেঁধে > সার বাঁদে('ই'-র লোপ)

অভিশ্রুতি:

অপিনিহিতি > অভিশ্রুতি (মান্যচলিত) > অভিশ্রিতি (আঞ্চলিক কথ্যরূপ)

ছাড়িয়া > ছাইড়্যা > ছেড়ে > ছাড়ে

নামিয়া > নাইম্যা > নেমে > ন্যামে

টানিয়া > টাইন্যা > টেনে > টানে

বসিয়া > বইস্যা > বসে > বুসে

বাড়িয়া > বাইড়্যা > বেড়ে > বাড়ে

খেলিয়া > খেইল্যা > খেলে > খ্যালে

করিয়া > কইরা > করে > কুরে

বহিয়া > বইয়্যা > বয়ে > বুয়ে

পরিয়া > পইরা > পরে > পুরে

উপর্যুক্ত উদাহরণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মান্যচলিত বাংলা ভাষায় অভিশ্রুতির যে ধ্বনিরূপ বাদাবন অঞ্চলের কথ্যভাষায় সেই একই রূপ পরিলক্ষিত হয় না, সুন্দরবন অঞ্চলের আঞ্চলিক কবিতায় তার বিবর্তনও বর্তমান। সেখানকার সাধারণ মানুষ তাঁদের মতো করে এই ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে, যা একান্ত তাঁদের নিজস্ব ধ্বনি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

পূর্ণ স্বরসঙ্গতি: দিতে > দিতি (ই+এ > ই+ই) উক্ত উদাহরণে পূর্ববর্তী 'ই' এর প্রভাবে পরবর্তী 'এ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ই'তে পরিণত হয়েছে এবং সমধ্বনিতে রূপলাভ করে প্রগত স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে।

পারেনি > পারিনি (এ+ই > ই+ই)

পেলাম > পালাম (এ+আ > আ+আ)

একই ভাবে দ্বিতীয় উদাহরণটিতে দেখি পরবর্তী স্বরধ্বনি 'ই'এর প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর 'এ' ই' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে সমধ্বনিতে পরিণত হয়েছে এবং পরাগত পূর্ণস্বরসংগতি সৃষ্টি করেছে। অনুরূপভাবে আলোচ্য বিভিন্ন কবিতা থেকে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত উদাহরণ গুলিও উক্ত ধ্বনিপরিবর্তনের বহুমাতৃক দিককে চিহ্নিত করে। যেমন—

দিকে > দিকি (ই+এ > ই+ই)

বাপের > বাপেরে (আ+এ+অ > আ+এ+এ)

দেখিনি > দিকিনি (এ+ই+ই > ই+ই+ই)

যেতাম > যাতাম (এ+আ > আ+আ)

ফিরে > ফিরি (ই+এ > ই+ই)

পারবে > পারবা (আ+এ > আ+আ)
কিনতে > কিনতি (ই+এ>ই+ই)
যাবে > যাবা (আ+এ > আ+আ)
ইত্যাদি উদাহরণ ছাড়াও আংশিক স্বরসঙ্গতির প্রচুর উদাহরণ আমরা এই ভাষার কবিতায় খুঁজে পেয়েছি। যেমন—
পূজা > পূজো
(এখানে উচ্চ স্বরধ্বনি 'ঊ'-এর প্রভাবে নিম্ন স্বরধ্বনি 'আ' উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি 'ও'-তে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রায় সমধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। তাই ধ্বনি পরিবর্তনের এই রূপান্তরকে আমরা আংশিক স্বরসঙ্গতি বলতে পারি।)

অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি: যখন পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দ মধ্যস্থ দুটি স্বরধ্বনিরই রূপান্তর ঘটে, অর্থাৎ পরস্পরের প্রভাবে দুটি স্বরধ্বনিরই পরিবর্তন হয়, তখন তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। সুন্দরবন অঞ্চলের আলোচ্য কথ্যভাষার কবিতায় ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিটি দেখা যায়। যেমন–
বড়ো > বাড়া (বৃহৎ অর্থে)

এখানে 'অ' ধ্বনি এবং 'ও' ধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'আ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

স্বরসঙ্গতির পাশাপাশি স্বরের অসংগতি এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিষ্ট বাংলা ভাষার কবিতায় এই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ সমস্বরকে অন্য স্বরে পরিবর্তন করা হয়। আঞ্চলিক কবিতায় যার প্রভাব বিদ্যমান। আলোচ্য কবিতাগুলি থেকে কয়েকটি শব্দ উদাহরণ হিসেবে আমরা এভাবে তুলে ধরতে পারি। যথা—
যেতে > যাতি (এ+এ > আ+ই)
পেলে > পালি (এ+এ > আ+ই)
উপরের দুটি উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'যেতে' বা 'পেলে' শব্দে উপস্থিত সমস্বর (এ+এ) ধ্বনি আঞ্চলিক ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে 'যাতি' বা 'পালি' শব্দে (আ+ই) এই বিষমধ্বনিতে রূপলাভ করেছে এবং স্বরসঙ্গতি স্বাভাবিক ভাবে স্বরের **অসংগতিতে** স্পষ্ট। অনুরূপ ভাবে নিম্নোক্ত উদাহরণ গুলিতে স্বরধনি পরিবর্তনের এই বিশেষ দিক পরিলক্ষিত হতে দেখি। যেমন—
খেলে > খ্যালে (এ+এ > অ্যা+এ)
নেমে > ন্যামে (এ+এ > অ্যা+এ)
যখন > য্যাখন (অ+অ > অ্যা+অ)
পেলে > পালি (এ+এ > আ+ই)
বেয়ে > ব্যাইয়ে (এ+এ > অ্যা+ই+এ)
যেতে > যাতি (এ+এ > আ+ই)
এলে>আলে/আইলে
খেলতে > খেলতি (এ+এ > এ+ই)
এলে > আলে (এ+এ > আ+এ)
মেয়েটার > ম্যায়েটার (এ+এ > অ্যা+এ)
গেলে > গিলে (এ+এ > ই+এ)
...ইত্যাদি।

ধ্বনির স্থানান্তর: ধ্বনির স্থানান্তর বলতে আমরা সাধারণত বিপর্যাস বা বর্ণবিপর্যয় বুঝি। স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়েরই বিপর্যাস বাংলা ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। অনেকে অপিনিহিতিকে স্বরধ্বনির বিপর্যাস বলে থাকেন, কিন্তু বিপর্যাস বলতে বোঝায় দুইটি ধ্বনির উভয়ের মধ্যে স্থান পরিবর্তন। অপিনিহিতিতে দুইটি ধ্বনির অর্থাৎ স্বরধ্বনির পারস্পরিক স্থান বিনিময় হয় না। একটি স্বরধ্বনি স্থানান্তরিত শুধু হয় মাত্র। কাজেই অপিনিহিতিকে বিপর্যাস বলা যায় না।

ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন বলতে চেয়েছেন— "বাঙ্গালায় অপিনিহিতির যেসব উদাহরণ দেওয়া হয় তাহার অধিকাংশেই ব্যাপারটি স্বর-ব্যঞ্জনের বিপর্যাস ছাড়া কিছু নয়।"[৮] যাই হোক, সুন্দরবন অঞ্চল কেন্দ্রিক উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত মানুষের মুখের ভাষায় স্বরধ্বনির স্থানান্তর বা বিপর্যাস হিসেবে কয়েকটি উদাহরণ আমরা উল্লেখিত কাব্য-কবিতা থেকে চিহ্নিত করতে পেরেছি। যথা—

চাহিয়া > চাইয়ে

খায়িয়া > খাইয়ে

কখন কখন বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে এই ভাষায় যেখানে শব্দমধ্যস্থ 'ই' বা 'উ' কার নেই এমন ক্ষেত্রেও 'ই'-এর আগম ঘটে। যেমন—

মেয়ে>মাইয়্যা>মাইয়ে

হয়ে>হইয়া

উল্লেখ্য, অপিনিহিতিতে শব্দের মাঝখানে যেখানে একটি অতিরিক্ত স্বরবর্ণ যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে অপিনিহিতিও কার্যত ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে একপ্রকার মধ্যস্বরাগম।

অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ: দ্রুত উচ্চারণের ফলে দু থেকে তিন বা চার মাত্রার শব্দকে এক মাত্রা বা অক্ষরের শব্দ করে নেয়ার প্রবণতা উত্তর ২৪ পরগনার নদীতীরবর্তী কথ্যভাষায় বেশ দেখা যায়।এর ফলে অন্ত্যব্যঞ্জন লোপও ঘটে থাকে। যেমন—

দিয়ে > দে

সমীভবন:উচ্চারণের সরলীকরণের জন্যে এই অঞ্চলের ভাষায় এক ধরনের সমীভবনের প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে এক ধরনের সমব্যঞ্জনে পরিণত হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যেমন—

পত্র > পত্তর

কতদিন > কদ্দিন

বিষমীভবন:সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হলো বিষমীভবন।আঞ্চলিক কবিতায় তার নিদর্শন মেলে। যথা—

শরীর > শরীল

ক্ষতিপূরণ মূলক দীর্ঘীভবন: কোন শব্দমধ্যস্থ যুক্ত বা অযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে যদি একটি লোপ পায় এবং সেই লোপের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য লুপ্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর যদি দীর্ঘস্বর হয়ে যায়, ধ্বনি পরিবর্তনের সেই রীতিকে আমরা ক্ষতিপূরণ মূলক দীর্ঘীভবন বলে থাকি। আঞ্চলিক ভাষায় ধ্বনির এই রূপান্তর বেশ চোখে পড়ে। যেমন—

কিরকম > কেরাম

দ্রুত উচ্চারণের ফলে আলোচ্য উদাহরণ টিতে 'ক' ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ ঘটায় তার পূর্ববর্তী 'র' ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হ্রস্বস্বর 'অ' ক্ষতিপূরণ হেতু রূপান্তরিত হয়ে দীর্ঘস্বর 'আ'তে পরিনত হয়েছে।ফলে র>রা -এ রূপলাভ করেছে। একই ভাবে সেরকম > সেরাম হয়েছে।

অল্পপ্রাণীভবন:শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের শেষে মহাপ্রাণ ধ্বনি (বর্গের ২য়,৪র্থ বর্ণ) স্বল্পপ্রাণ (বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণ) ধ্বনি হিসাবে উচ্চারিত হয়।যেমন—

তখন > ত্যাকন—বউডা ত্যাকন দাওয়ায় বুসে জলদেবা ভাত বাড়ে

সারিবেঁধে > সার-বাঁদে

নাসিক্যীভবন:শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে ও পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন ঘটেছে।যেমন—

সুন্দরবন > সোঁদরবন

টি/টা>ডা: শব্দের অন্তস্থিত নির্দেশক অব্যয় 'টা' ঘোষীভবনের সূত্রে প্রায়ই অর্ধশিক্ষিত মানুষের মুখে এই আঞ্চলিক ভাষায় 'ডা' হিসেবে উচ্চারিত হয়। যা এই অঞ্চলের ভাষাকে অন্য অঞ্চল থেকে স্বাতন্ত্র্য করেছে। যেমন—

বউটা > বউডা— বউডা য্যাকন সরম ঢাকে

গামছাটা > গামছাডা

ল>ন

মানুষগুলি> মানুষগুনো—মানুশগুনোএক এক কুরে, গাঙের চরে ওলে

সংকোচন: দ্রুত উচ্চারণের ফলে ধ্বনি সংকোচিত হতে দেখা যায়। কবির ভাষায় তার স্পষ্ট উদাহরণ বর্তমান। যেমন—

নিয়ে > নে— জাল দড়া নে কাঁধে [সোঁদরবনের জেবন, পৃ-৬০]

কোথায়/কোন খানে > কোনে

বিয়ে > বে

এভাবে ধ্বনিপরিবর্তনের নানান বৈচিত্র্য উত্তর ২৪ পরগনার কথ্যভাষার কবিতাকে মান্যচলিত ভাষা-সাহিত্যের পাশে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বিশ্বায়নের চাপে, নগরায়নের প্রভাবে, মোবাইলের যুগে এই সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার কবিতা আজ তার স্বতন্ত্র হারিয়ে ফেলছে। আমরা হারিয়ে ফেলছি বা আমরা হারিয়ে যেতে দেখছি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত ভাষা-সংস্কৃতিকে। নতুন প্রজন্ম তথা আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব কতটা প্রাধান্য পাবে জানিনা, তবে একথা নিশ্চিত করে বলতে হয়, আজ যদি প্রান্তিক সুন্দরবন অঞ্চলের কথ্যভাষাকে সংরক্ষণ করতে না পারি, অর্থাৎ এই জঙ্গলা ভাষাকে কাজের ভাষা করে গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে আগামী দিনে এই ভাষার মৃত্যু অনিবার্য। আগামী আধুনিক বিশ্বে নগরায়নের যুগে, সর্বোপরি বাবা মায়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সার্বিক প্রচেষ্টার লক্ষ্যে এই জঙ্গলা ভাষা সমাজ ও সাহিত্যে কতটা কাজের ভাষা হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে জানিনা, তাই ভাষাগত এই সঙ্কটের যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অসংখ্য ভাষার বিপন্নতার (মৃত্যুর) মাঝে সুন্দরবনের ভূমিপুত্র হিসেবে এই প্রবন্ধে আমি একটু চেষ্টা করেছি আঞ্চলিক ভাষার কবিতায় কথ্যভাষার স্বরূপকে স্পষ্ট করতে।

একটি ভাষাগোষ্ঠী তার নিজস্ব সংস্কৃতির গভীরতার ভিতর বেঁচে থাকে। উত্তর ২৪ পরগনার প্রান্তিক সুন্দরবন অঞ্চলের কথ্যভাষার কবিতা সেই সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত গভীরতাকে বাঁচিয়ে রাখলেও, এখানকার মানুষ তার একান্ত ভাষাগত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। তাদের ভাষার

মধ্যে অধিক পরিমাণে মান্য বাংলার শব্দাবলী প্রবেশ করছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে স্কুল-কলেজে আধুনিক শিক্ষার প্রসার গ্রাম্য ভাষা-সংস্কৃতিতে অনেকাংশে প্রভাব ফেলেছে। তাতে হারিয়ে ফেলছি আমরা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে। কোন ভাষার লিখিত রূপের হাত ধরে তার ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলের আঞ্চলিক কবিতা এমনি এক হারিয়ে যাওয়া ভাষা-সংস্কৃতির 'মিসিংলিঙ্ক', যার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই নিবন্ধে আমরা আমাদের হারানো ভাষা-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে কিছুটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য :

১। কালিপদ মণি (সম্পা.) বাদাবনের পাঁচালী-কবিতা সংকলন (গ্রন্থ), সনৎকুমার নস্কর প্রণীত, প্রাগ্ ভাষ (প্রবন্ধ), প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৯ দ্রষ্টব্য।

২। সতীশচন্দ্র মিত্র (গ্রন্থ), যশোহর খুল্‌নার ইতিহাস, ১ম সং. ১৯১৪, লেখক সমবায় প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা- ১০১ মূল পাঠে বাক্যটি এই রূপ— "বঙ্গদেশে প্রধানত বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকলেও, তাহার বিভিন্ন জেলায় সে ভাষার প্রাদেশিক বিশেষত্ব রহিয়াছে। সকল জেলার ন্যায় সুন্দরবনের ভাষারও একটা প্রাদেশিকতা আছে। এই প্রাদেশিকতার সহিত নিকটবর্তী কয়েকটি জেলারও ভাষাগত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুন্দরবনের এই মিশ্রিত ভাষাকে আমরা 'জঙ্গলা' ভাষা বলিতে পারি।..."

৩। শশাঙ্ক মণ্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন (গ্রন্থ), পুনশ্চ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৯৭ দ্রষ্টব্য। মূল পাঠে বাক্যটি এইরকম— "সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভাষা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভাষার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্পষ্ট ভাগ রয়েছে কিন্তু এগুলি পৃথক উপভাষা হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।..."

৪। তাপস ভৌমিক (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষা (গ্রন্থ), কল্যাণ মণ্ডল লিখিত, উত্তর ২৪ পরগনা, ভাসাভাসা ভাষাকথা (প্রবন্ধ), কোরক, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৪ দ্রষ্টব্য। এখানে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে— "লেনার্ড ব্লুমফিল্ড তাঁর 'Language' গ্রন্থে Local Dialect বা স্থানীয় উপভাষা বলতে যা বুঝিয়েছিলেন, সুন্দরবনের ভাষা প্রকৃতপক্ষে তাই। ভাষাটি সুন্দরবনের স্থানীয় উপভাষা বলেই একে 'সুন্দরী ভাষা' নামে ডাকাই বেশি সঙ্গত ..."

৫। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চল 'দোখ্‌নো' নামে পরিচিত। আর এই অঞ্চলের ভাষাকে সমালোচকরা 'দোখ্‌নো' ভাষা বলে থাকেন। যেমন, প্রাবন্ধিক সনৎ কুমার নস্কর কালিপদ মণি সম্পাদিত 'বাঁদাবনের পাঁচালী' কবিতা সংকলন গ্রন্থের 'প্রাগ্ ভাষ' অংশে এই অঞ্চলের ভাষাকে 'দোখ্‌নো' বলেই উল্লেখ করেছেন।

৬। অপরেশ মণ্ডল ও কনক কান্তি রায় (সম্পা.), আবাদ সাহিত্য (পত্রিকা), বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা, শরৎ, ১৪২৬, সুলতা গায়েন লিখিত, নোনা গাঁ-র বউ (কবিতা), পৃষ্ঠা- ৬১

৭। অপরেশ মণ্ডল ও কনক কান্তি রায় (সম্পা.), আবাদ সাহিত্য পত্রিকা, বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা, মে-জুলাই ও আগস্ট-অক্টোবর, ২০১৯, সুমন মিস্ত্রি লিখিত, সোঁদরবনের জেবন(কবিতা), পৃষ্ঠা-৬০।

৮। সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত (গ্রন্থ), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃষ্ঠা-৪৫ দ্রষ্টব্য।

নারীবাদী দৃষ্টিতে ন্যায় বিচার : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

জগন্নাথ জানা
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সাম্প্রতিককালে নারীবাদী চিন্তার আলোকে পরিবেশের ওপর মানুষের প্রভুত্বে আলোচনা নারীবাদী তত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৭০ থেকে নারীবাদী দর্শন স্বতন্ত্র রূপ নিতে শুরু করে। সত্তরের দশক থেকে উঠে আসা নারীর আন্দোলন এক নতুন রূপে চিহ্নিতকরণ করা হয় যাকে নিউ ওয়েভ ফ্যামিনিজম (New wave Feminism) বলা হয়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত নারী আন্দোলন মূলত কিছু দাবি-দাওয়ার ও অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল। নিউ ওয়েভ ফ্যামিনিজম আসার পর নারীবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয় তাত্ত্বিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। নারীবাদী দার্শনিকগণ জোরদেন ধারণার (concepts) স্তরের পরিবর্তনের দাবি। ধারণার স্তরে পরিবর্তনের আন্দোলনে একটি ধারণা হলো ন্যায় বিচার। পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো থেকে শুরু করে কান্ট পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিক ন্যায় বিচারের যে ধারণা দিয়েছেন তাতে পক্ষপাত রয়েছে। নারীবাদী দার্শনিকগণ দেখানোর চেষ্টা করছেন যে প্রত্যেক দার্শনিক তাদের তত্ত্বের কেবলমাত্র যৌক্তিকতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা তাদের তত্ত্বে নারীদের প্রাধান্য দেননি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে পুরুষরাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পুরুষ সর্বদাই নারীদেরকে অধীনে রাখতে চায়। প্লেটোর থেকে শুরু করে প্রত্যেক দার্শনিক তাদের তত্ত্বে নারীর কোনো অধিকার নেই তা তুলে ধরেছেন। ন্যায় বিচারের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারীবাদী দার্শনিকগণ দেখিয়েছেন যে ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বেও নারীর অধিকারকে অমান্য করা হয়েছে এবং পাশাপাশি নারীদেরকেও অবমাননা করা হয়েছে। লিঙ্গ প্রেক্ষিতের ভাবনা থেকে নারীদেরকে পুরুষের অধীনস্থ করা হয়েছে এবং নারীদের যাপীত জীবনের অভিজ্ঞতাকে অমূল্যায়ন করা হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নারীবাদী দার্শনিক এলিজাবেথ কিস (Elizabeth Kiss) ন্যায় বিচারের ধারণাটি কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখানোর চেষ্টা করবো। আমি এই প্রবন্ধ দেখানোর চেষ্টা করবো যে ন্যায় বিচারের ধারণাটিকে প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি দার্শনিকগণ কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন এবং তাদের ন্যায় বিচারের ধারণাটির ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান কিরূপ? এই বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদেরকে ঐতিহ্যগত দার্শনিকদের ধারণার সঙ্গে নারীবাদী দর্শনের পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি এই পার্থক্যটি স্পষ্ট না হয় তাহলে আমরা ন্যায় বিচার সম্পর্কে এলিজাবেথ কিস এর তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে পারবো না। কাজেই এই বিষয়গুলিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, ন্যায়বিচার লিঙ্গ নিরপেক্ষ নাকি লিঙ্গ সাপেক্ষ? এই বিষয়ে আমি নারীবাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পর্যালোচনা করবো।

মূল শব্দ: লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Discrimination), পিতৃতন্ত্র (Patriarchy), যৌক্তিকতা (Rationality), লিঙ্গ রাজনীতি (Gender Politics), যুক্তি (Reason), ধারণা (Concepts), ন্যায় বিচার (Justice)।

মূল আলোচনা:

ইদানিংকালে নারীবাদ একটি বিশিষ্ট শাস্ত্ররূপে সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে নারীবাদী শাস্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট নানান প্রশ্নের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা। কারণ ইদানিংকালে নারীর সমস্যাকে একটি আর্থ সামাজিক সমস্যা রূপেই দেখা হতো এবং সমস্যাগুলির যে একটি পৃথক তাত্ত্বিক পর্যালোচনা প্রয়োজন রয়েছে তা কখনোই ভাবা হয়নি। মূলস্রোতের দর্শনের সঙ্গে নারীবাদী তাত্ত্বিক অবস্থানের মধ্যে একটি বিতর্ক রয়েছে, আর এই বিতর্কের মূলে রয়েছে লিঙ্গ প্রেক্ষিতে ভাবনা। বলা হয়েছে যে লিঙ্গ প্রেক্ষিত তত্ত্বের কোটিকে স্পর্শ করতে পারে কি পারে না? এবং তত্ত্বের লিঙ্গ প্রেক্ষিত থাকা উচিত কি অনুচিত? এইসব প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে নারীবাদী অবস্থানে ভিন্নতা আমরা দেখতে পাই। কোনো কোনো নারীবাদী মনে করেন যে তত্ত্বের লিঙ্গ প্রেক্ষিত থাকা উচিত এবং যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তত্ত্বের লিঙ্গ প্রেক্ষিত রাখা হয় সেক্ষেত্রে এক প্রকার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। আর যারা তত্ত্বের লিঙ্গ প্রেক্ষিত আছে বলে মনে করেন তাদের মতে তত্ত্বকে লিঙ্গ মুক্ত করার চেষ্টার মধ্যে এক প্রকার রাজনীতি রয়েছে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে এক প্রকার লিঙ্গ রাজনীতি আমরা দেখতে পাই। তত্ত্বের লিঙ্গ প্রেক্ষিত থাকা বা না থাকার এই দুইয়ের বিতর্কের মধ্যে আরও দুটি বিতর্ক রয়েছে, একটি হলো যুক্তির স্বরূপকে কেন্দ্র করে এবং অপরটি হল অবজেক্টিভিটি বা বিষয়তাকে নিয়ে। এখন প্রশ্ন হল যে মূলস্রোতের দর্শনের যুক্তি কি দেশ ও কাল অনপেক্ষ হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন যে হতে পারে, যেমন ইমানুয়েল কান্ট। আবার কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন যে, যুক্তি আবশ্যিকভাবেই দেশ ও কাল সাপেক্ষ, এই কথাটি বলেন রিচার্ড রোরটি (Richard Rorty)[১]। কিন্তু এই প্রসঙ্গে নারীবাদী দার্শনিকগণ প্রশ্ন করেন এই দেশ ও কাল সাপেক্ষতার মধ্যে লিঙ্গ পরিচয়ের উপস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা? অর্থাৎ নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেন যুক্তি বা রিজন (reason) কি লিঙ্গ পরিচয় সাপেক্ষ নাকি অনপেক্ষ? এই প্রসঙ্গে লিবারেল নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেন যুক্তি হলো লিঙ্গ পরিচয়ের অনপেক্ষ, কিন্তু র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী দার্শনিকগণ এই মত স্বীকার করেন না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেকোনো তত্ত্ব কাঠামোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক প্রকার লিঙ্গের ধারণাকে পাচ্ছি। যেকোনো তত্ত্বের কাঠামোকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই প্রকার সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। একইভাবে আমরা যদি ন্যায় বিচারের ধারণাকে বিশ্লেষণ করি সেক্ষেত্রেও আমরা এই একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হই। নারীবাদী দার্শনিকগণ এই ন্যায় বিচারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা দেখিয়েছেন যে ন্যায় বিচার ধারণার ক্ষেত্রে লিঙ্গ প্রেক্ষিতের ধারণা রয়েছে। নারীবাদী দার্শনিকগণ দেখানোর চেষ্টা করছেন যে ন্যায় বিচারের ধারণার ক্ষেত্রে আমরা লিঙ্গ সাপেক্ষ ভাবে তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করবো নাকি লিঙ্গ অনপেক্ষ ভাবে তা ব্যাখ্যা করবো।

ন্যায় বিচারের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে ন্যায় বিচার বলতে কি বোঝায়? মূলস্রোতের দার্শনিকগণ তাদের তত্ত্বে কিভাবে ন্যায় বিচারের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন? মূলস্রোতের দার্শনিকগণ তাদের তত্ত্বে নারীর অবস্থানকে কিভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে নারীবাদী দার্শনিকগণ কিভাবে তাদের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করছেন তা আমি এই প্রবন্ধে দেখাবো। সাধারণত ন্যায়বিচার বলতে, প্রত্যেক ব্যক্তির যা প্রাপ্য তাকে তাই দেওয়ার নাম ন্যায় বিচার। এই অর্থে আমরা মূলস্রোতের বিভিন্ন দার্শনিকদের মত পাবো

যারা ন্যায়বিচারে ধারাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' (Republic) গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যা প্রাপ্য তাকে তাই দেওয়ার নাম ন্যায় বিচার। প্রত্যেক ব্যক্তির কতগুলো সহজাত গুণাবলী আছে এবং তার সাহায্যে ব্যক্তির কোনো কাজ করার শক্তি বা সামর্থ্য অর্জন করে। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেকের এমন কাজ করতে হবে যা রাষ্ট্রের প্রগতি উদ্দীপিত হয় এবং তার কাজের জন্য ব্যক্তির কিছু পাওনা দাবি করে। যদি সে পাওনা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তার প্রতি অবিচার করা হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতি ন্যায় বিচার করা হয় না। প্লেটো যে ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন সেটি হল ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনকারী ও সম্প্রীতিপূর্ণ একটি বন্ধন যা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেন। কাজেই প্লেটোর তত্ত্বে ন্যায় বিচারের ভিত্তি হলো যুক্তি ও প্রচলিত রীতি। প্লেটো 'রিপাবলিক' গ্রন্থে বলেছেন ভবিষ্যত অভিভাবকের প্রাথমিক শিক্ষার রূপরেখা দেওয়া আছে সেখানে প্লেটো বক্তব্য এই শিক্ষানবিসদের নারীর ভূমিকা অনুকরণ করতে দেওয়া উচিত নয়, সে নারী বয়স্ক হোক বা অল্প বয়স্ক হোক। যে নারী স্বামী নিন্দা করে তাকে অনুকরণ করা অনুচিত বা যে নারী সুখের বড়াই করে বলে যে তার সুখ দেবতাদের তুল্য, যে নারী দুঃখে বিহ্বল বা দুর্ভাগ্য হত কিংবা প্রেমাসক্ত অথবা অসুস্থ বা যে গর্ভ যন্ত্রণা অনুভব করে তাকে অনুকরণ করা উচিত নয়।[২]

নারীবাদী দার্শনিকগণ প্লেটোর এই রূপ মন্তব্যকে সমালোচনা করে বলেন প্লেটো তাঁর তত্ত্বে ন্যায় বিচারের ধারণাকে ব্যাখ্যা করার সময় বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যা প্রাপ্য তাকে তাই দেওয়ার নাম ন্যায় বিচার। তাই যদি হয় তাহলে ন্যায় বিচারের ধারণার ক্ষেত্রে কেন যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে? এক্ষেত্রে আমাদের একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুক্তিকে মূলস্রোতের দর্শনে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র পুরুষের যুক্তি রয়েছে, নারীদের কোন যুক্তি বা রিজন নেই। নারীবাদী দার্শনিকগণ প্রশ্ন করেন তাহলে আনন্দ, প্রেম, বেদনা, সন্তান ধারণ ইত্যাদি অনুভূতিও অভিজ্ঞতাগুলি কি একান্তই মেয়েলি? অতএব তারা কি শিক্ষণীয় নয়? যদি এইভাবে মানব অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নেওয়া হয় তাহলে নারীদের জীবন যাপনে পরিমণ্ডলের একটি বড় অংশই অনাবহিত থেকে যাবে, যেখানে নারীদের কোন গুরুত্বই থাকবে না এবং নারীদের প্রতি ও ন্যায় বিচার করা হবে না।[৩] অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' (Politics) নামক গ্রন্থে ন্যায় বিচারকে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপন করেছেন। তিনি তার 'পলিটিক্স' (Politics) নামক গ্রন্থে ন্যায়বিচার বলতে মধ্যবিত্তের শাসনকে বুঝিয়েছেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাই করেন তাই ন্যায়। নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে অ্যারিস্টটলের লেখার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যসূচক উক্তি পাওয়া যায়। তিনি তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে লিখেছেন যে মুক্ত পুরুষ ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও মহিলা, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু সকলের মনের বিভিন্ন অংশ আছে, তাদের যৌক্তিক নিয়ামক অংশ আছে এবং অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রিত অংশও আছে। কিন্তু বিভিন্ন জনের মধ্যে তা বিভিন্নভাবে আছে, যেমন দাসের বিচার ক্ষমতা নেই, মেয়েদের বিচার ক্ষমতা থাকলেও তার কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং সে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। আর শিশুদের বিচার ক্ষমতা অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় থাকে।[৪]

অথচ আমরা জানি অ্যারিস্টটলকে দর্শনের ইতিহাসে সাম্যের প্রবক্তা রূপেই স্মরণ করা হয়। তার কারণ হিসেবে বলা হয় তিনি সব মানুষের মধ্যে র‍্যাশনালিটি রুপ আনুগত্য সামান্য ধর্ম স্বীকার করেছেন। র‍্যাশনাল হয়েও যে নরও নারী, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু, প্রভু ও দাসের যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে। নারীবাদী দার্শনিকগণ অ্যারিস্টটলের ন্যায়বিচারের যে ধারণা ব্যাখ্যা

করেছেন সেক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রান্তিকীকরণ করেছেন। অনুরূপভাবে আমরা যদি ইমানুয়েল কান্টের দর্শন পড়ি তাহলে দেখবো কান্টের যে তিনটি ক্রিটিক রয়েছে তার মধ্যে একটি হল 'অবজারভেশনস অন দা ফিলিং অফ দ্যা বিউটিফুল এন্ড সাবলাইম' (Observations on the Feeling of Beautiful and Sublime) এই গ্রন্থটি তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কারণ এই বইটিতে তিনি লিখেছেন মেয়েদের কোন উচ্চ দর্শন নেই, তারা ভীরু, তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য ইত্যাদি এর জন্য তাদের লজ্জাও নেই। নারী সুন্দর সে মুগ্ধ করবে এবং সেটাই যথেষ্ট।[৫] এই ক্ষেত্রে নারীবাদী দার্শনিক বলেন যে কান্ট তার নিঃশর্ত আদেশ অনুসারে সকলকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং বলেছেন প্রত্যেক মানুষকে তার যুক্তিবাদী বৌদ্ধিক ক্ষমতার জন্য যথাযথ মর্যাদা দেখাতে হবে। তিনি আবার নারীদের সম্বন্ধে তাঁর 'Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime' গ্রন্থে বলেছেন মেয়েদের জ্যামিতি শিখে কাজ নেই, তার পর্যাপ্ত চুক্তি বা মোনাড বিষয়ে ঠিক ততটুকু জানলেই হবে যতটুকু জানলে পুরুষদের সেঙ্গর করা নিরস বিদ্রুপের মূল বিষয়টি সে অনুধাবন করতে পারবে। দেকার্তের তত্ত্ব তাদের কষ্ট করে না বুঝলেও চলবে।[৬] এই জায়গাতেই নারীবাদী দার্শনিকদের আপত্তি। তারা বলেন মূলস্রোতে দার্শনিকগণ সর্বদাই নারীদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে এবং সর্বদাই নারীদেরকে পুরুষের অধীনে রেখে নারীদেরকে কুক্ষিগত করতে চায়। তাই নারীবাদী দার্শনিকগণ সর্বপ্রথম যে তথ্যগুলি বা ধারণাগুলি রয়েছে সেই ধারণাগুলির মধ্যে যে লিঙ্গ বিভাজনের একটি ছাপ রয়েছে সেটিকে প্রথমে তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। মূলস্রোতের দর্শনের ধারণাগুলি তথা যৌক্তিকতা, বিমূর্ততা, সামান্যতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি ধারণার মধ্যে লিঙ্গ বিভাজন রয়েছে এবং এই ধারণাগুলি কোনোভাবেই নারীদের অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেয়নি। তাদের বক্তব্য হলো নারীদের অভিজ্ঞতা, ঘরকন্যা যে কাজ সেখানে দেখানো হয়েছে যে এগুলি দেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এগুলি নারীদের ব্যক্তি পরিসরের কাজ, তা কখনোই আইনসম্মতভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে না। নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেছেন, এই ক্ষেত্রে নারীদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হচ্ছে এবং নারীদেরকে বলে দেয়া হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে কি হবে তা নিয়ে রাষ্ট্র কখনো আলোচনা করবে না। ঐতিহ্যগত তত্ত্বের যে নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা, যৌক্তিকতা, সামান্যতা, বিমূর্ততা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় তা নারীদের সঙ্গে কোনোভাবে খাপ খায় না। এই ক্ষেত্রে লিবার‍্যাল নারীবাদী দার্শনিক বলেন, ঐতিহ্যগত তত্ত্ব তাতে পারিবারিক যে সমস্ত সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলির ন্যায়বিচার রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। যার কারণে সেগুলিকে বলা হয় 'সার্বজনীন আচরণের মূলনীতি' (Universal principle of guideline)।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাশ্চাত্য দর্শনে বিচার বুদ্ধিকে বেশি করে প্রাধান্য দেয়া হয়। সামান্যতা, যৌক্তিকতা, বিমূর্ততা, নিরপেক্ষতা এইসব ধারণাগুলিকে সবসময় পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে ব্যাখ্যা করা হয়, আর প্রবল অনুভূতি, যত্নশীল, স্নেহ, শরীর, সত্যতা, করুনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নারীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এইসব নারী সুলভগুণগুলিকে সর্বদাই অবমূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। নারীবাদী দার্শনিকগণ এই জায়গাতে আপত্তি করেন যে, পাশ্চাত্য দর্শনের ধারণার তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার মধ্যে এই বিভাজন দেখতে পাই। আর এই বিভাজনের মূলেই রয়েছে লিঙ্গ ধারণা। লৈঙ্গিক ভিত্তিতে নারীদেরকে সর্বদা অপর বা আদর করে দেখানো হয় এবং নারীদের প্রতি অন্যায় করা হয়। তাই নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেছেন যে

আমরা কেবলমাত্র স্বতন্ত্রতাকে স্বাধীনতা বলতে পারি না। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই আমাদেরকে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যেখানে অনুভূতি, সহানুভূতি, নৈতিকতা থাকবে। নৈতিক তত্ত্ব শুধু আইন-কানুন হতে পারে না। এক্ষেত্রেও অনুভূতি, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, অসমতা নিরপেক্ষতাকে বুঝতে পারা ইত্যাদি বিষয়গুলিকেও যুক্ত করতে হবে। যদি এই বিষয়গুলি যুক্ত করতে না পারি তাহলে এইসব ধারণাগুলি কখনোই নৈতিক মূল্য পাবে না। তাই আমাদেরকে ঐতিহ্যগত যে ন্যায় বিচারের ধারণা তার থেকে বেরিয়ে এমন এক তত্ত্ব গঠন করতে হবে যাতে সেক্ষেত্রে এই সব কিছুই নৈতিক মূল্যায়ন হয়। এই প্রসঙ্গে নারীবাদী দার্শনিক এলিজাবেথ কিস (Elizabeth Kiss) ন্যায়বিচার কি তা বলতে গিয়ে বলেন আগে আমাদেরকে ন্যায় বিচারের যে ধারণা সেই ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। কারণ এই ন্যায়বিচার ধারণাটি হল এক প্রকার পিতৃতান্ত্রিক ধারণ। যেহেতু এটি পিতৃতান্ত্রিক একপ্রকার ধারণা তাই এই ধারণা সাহায্যে নারীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার পেতে পারে না। নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে ন্যায়বিচার কি? কিভাবে হওয়া উচিত? নিয়ম কানুন ইত্যাদি বিষয়গুলিও পিতৃতান্ত্রিক ধারণা সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। তাই আগে আমাদেরকে এই ন্যায়বিচার ধারণা পুনরায় স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।[৭] প্রত্যেক নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে সমাজে যদি সমতা আনতে হয় তাহলে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু সমাজে সর্বস্তরে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। যেমন বলা হচ্ছে যে সমান পদমর্যাদা বা নারী পুরুষের মধ্যে সমান ক্ষমতা হোক সেটি কিভাবে সাধন করব বা তার উপায় কি? নারীবাদী দার্শনিক এখানে প্রশ্ন করছেন যে সমক্ষমতা বা সমানপদ মর্যাদা বলতে আমরা কি বুঝছি? যৌনতার সমতা বা সমভাবের মূল মানদণ্ড কি হবে ইত্যাদি সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে Jaggar বলছেন যৌনতার যে পার্থক্য রয়েছে সেটি বাস্তবে কিরূপ হওয়া উচিত বা আদৌ কি যৌনতার যে পার্থক্য রয়েছে তা মানবো কি মানবো না এই নিয়ে নারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে।[৮] ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে উপায় নেই যে দ্বন্দ্ব তাহল ধারণার ক্ষেত্রে লিঙ্গ নিরপেক্ষ করবো নাকি লিঙ্গ সাপেক্ষ করবো? ধারণার ক্ষেত্রে লিঙ্গ কথাটি সম্পূর্ণভাবে তুলে দেবো নাকি লিঙ্গ সাপেক্ষ করে নারীদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে আমরা দুই ধরনের মত পাই - যথা যারা লিঙ্গ নিরপেক্ষের কথা বলেন তারা বলেন যদি নারীদেরকে কিছু আলাদা সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অমান্য করা হবে। কারণ আমরা বলেই দিচ্ছি যে নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে এবং নারীদেরকে যদি সুযোগ সুবিধা দেওয়া না হয় তাহলে তারা সমাজের কোনোভাবেই এগোতে পারবে না। এক্ষেত্রে কোনোভাবেই লিঙ্গ সমতা হবে না, বরঞ্চ লিঙ্গটি হবে অপরিবর্তনীয়। আর যারা লিঙ্গ সাপেক্ষে কথা বলেন তারা বলেন যদি আমরা নারীদেরকে সুযোগ-সুবিধা না দেয়া হয় তাহলে দেখবো সমাজে মেয়েদের অবস্থা আরো শোচনীয় হবে এবং সমাজে কখনো অগ্রগতি আসবে না।

নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেন ন্যায্যতা বিচার, ন্যায় বিচার বলতে আমরা কি বুঝি? নিরপেক্ষতা হওয়া মানে কি? নিরপেক্ষ হওয়া মানে কি আমরা নারী, পুরুষ উভয়কে বাদ দিয়ে দেবো? নাকি নারী-পুরুষের মধ্যে যে যৌনতার পার্থক্য আছে তা ভুলে যাবো। এক্ষেত্রে নারীবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে নারী-পুরুষের মধ্যে যেমন যৌনতার পার্থক্য আছে আবার তেমনি লিঙ্গ নিরপেক্ষতার পার্থক্যও আছে। এলিজাবেথ কিস বলেন লিঙ্গ নিরপেক্ষতা এবং লিঙ্গ সাপেক্ষতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা কখনোই পৃথক করা যায় না। কারণ লিঙ্গ নিরপেক্ষ হতে যা যা অসুবিধা আবার লিঙ্গ সাপেক্ষ হওয়াতেও সেই একই অসুবিধা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নারীবাদী দার্শনিক

James P. Sterba বলেন, লিঙ্গ নিরপেক্ষ এবং লিঙ্গ সাপেক্ষ এই দুইয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ আমরা এমন সমাজ গঠন করতে পারি যেখানে 'মাতৃত্ব'কে মূল্য হলেও 'মাতৃত্ব' সম্পূর্ণ মায়ের দায়িত্ব নয়। 'মাতৃত্ব' বলতে যদি দেখাশুনা করা হয় এবং দেখাশুনাকে যেহেতু মূল্য দেওয়া হয় সেহেতু সেটি মা, বাবা উভয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে।[৯]

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ন্যায়বিচারের ধারণার ক্ষেত্রে লিঙ্গ প্রেক্ষিতের যে ভাবনা সেক্ষেত্রে লিঙ্গ নিরপেক্ষ এবং লিঙ্গ সাপেক্ষ উভয় ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। নারীবাদী দার্শনিক কিস বলেন ন্যায় বিচারকে শুধু মাত্র লিঙ্গের দ্বারা বুঝলে হবে না ন্যায় বিচারকে শ্রেণী, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে যে যুক্তিবিন্যাস বা যুক্তি তর্ক দেখা যায় সেটি নৈতিকভাবে হতে হবে এবং তা প্রাসঙ্গিক ভিত্তিতে হতে হবে। সে ক্ষেত্রে কোনো উচ্চ নিচ স্তরভেদ থাকবে না। আমরা যদি সম্পর্কের সাথে যুক্ত হয়ে বা সতর্কতার সহিত নিজেদেরকে গুরুত্ব দেই তাহলে ন্যায় বিচারের তত্ত্বটি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। ন্যায় বিচারে ধারণাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রাসঙ্গিক ভিত্তির উপর নির্ভর করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা রলসের তত্ত্ব দেখি সেখানে সামাজিক চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং এই চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকে সমান অধিকার দিতে হবে। প্রত্যেককে সমান অধিকার আছে এই কথা মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে যে তাহলে প্রত্যেকের কার্যক্ষমতা তাঁর শিক্ষা, জীবন প্রণালীও সমান। কিন্তু আমরা জানি প্রত্যেকের কার্যক্ষমতা এক নয়, প্রত্যেকের জীবন প্রণালী, বিচারবুদ্ধিও সমান নয়। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু মানুষের নির্ভরতা, দূর্বলতার জায়গা গুলোকে বাদ দিয়ে দিই। নারীবাদী দার্শনিকগণ বলছেন এই জায়গা গুলোকে আমাদের বাদ দিয়ে দিলে হবে না। এই গুলিকে নিয়েই আমাদের ন্যায় বিচারে ধারণাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে Seyla Benhabib's ও Susan Okin বলেন যে নৈতিকতা, যৌক্তিকতা, ন্যায় বিচার এগুলিকে প্রাসঙ্গিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং মানুষের অভিজ্ঞতাকেও যুক্ত করতে হবে ন্যায় বিচারের তত্ত্বে। তবেই আমরা নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচারের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে পারবো।[১০] এই প্রসঙ্গে নারীবাদী দার্শনিক ন্যান্সি ফেসার (Nancy Fraser) বলেন যদি ন্যায় বিচার করতে হয় তাহলে আমরা দুই রকম ভাবে করতে পারি, যথা- পুনরায় বিতরণে সক্ষম (Redistribution) এবং স্বীকৃতি (Recognition)। যদি সমাজ এইগুলি দেয় তাহলেই হবে ন্যায় বিচার। একজন পুরুষ একক বা অবিবাহিত বাবা এবং একজন নারী একক বা অবিবাহিত মা হতে চায়, তা যদি সমাজ স্বীকৃত দেয় তাহলেই হবে ন্যায় বিচার। এই ক্ষেত্রে যদি ওই ছেলেটি বা মেয়েটিকে এই সুযোগ না দেয়া হয় তাহলেই তার প্রতি অন্যায় বা অবিচার করা হবে। এখানে বিতরণ এবং স্বীকৃতির ক্ষেত্রে যে সমস্যা তা হলো লিঙ্গ নিরপেক্ষ হবো নাকি লিঙ্গ সাপেক্ষ হবো? নাকি লিঙ্গকে নির্দিষ্ট করে দেব? লিঙ্গকে যদি নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে নারীদের আলাদা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আর যদি লিঙ্গ নিরপেক্ষ করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গের ব্যাপার থাকবে না এই জায়গাতেই সমস্যা। Fraser বলেন এক্ষেত্রে আমরা স্বীকৃতি এবং বিতরণ এই দুটিকে এক করতে পারি, যেখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি যথা লিঙ্গ নিরপেক্ষতা এবং লিঙ্গ নির্দিষ্ট করা এই দুটিকে স্মরণে রেখে যদি ন্যায় বিচার করা হয় তাহলেই হয়তো আমরা সমতা নিয়ে আসতে পারবো।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মৈত্র, শেফালী। ২০১৫, *নৈতিকতাও নারীবাদঃ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা* , কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ ১০।

২. Cornford, Macdonald Francis.trans. 1969, *The Republic of Plato*, London, Oxford University Press, p. 395.

৩. মৈত্র, শেফালী। ২০১৫, *নৈতিকতাওনারীবাদঃ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা* , কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ ৩০।

৪. তদেব, পৃঃ ৩০-৩১।

৫. Kant, Immanuel.1960, *Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime*, trans. John J. Goldthwait, Berkely, University of California Press, p. 93.

৬. Ibds. P. 79.

৭. Kiss, Elizabeth. 2000, *Justice: In A Companion to Feminist Philosophy,* ed. Alison M. Jaggar and Iris Marion Young. Oxford, Blackwell Press, p. 488.

৮. Jaggar, Alison M. & Iris Marion Young, eds. 2000, *A Companion to Feminist Philosophy*, Oxford, Blackwell Publishers, p. 239.

৯. Sterba, James P. 2000, *Ethics: Classical Western Text in Feminist and Multicultural Perspectives,* New York, Oxford University Press, p. ch.4.

১০. Okin, Susan M, 1989, *Justice, Gender and The Family*, New York, Basic Books, p. 101.

সাঁওতালদের আদি নিবাস ও বাঁকুড়া জেলা : একটি আলোচনা

পরিতোষ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গলসী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে জঙ্গলকে ঘিরে নানা রকম প্রবাদ ও কাহিনী প্রচলিত আছে। মারাংবুরুর ইচ্ছা অনুসারে সাঁওতাল জাতির আদিপিতা ও সাত কন্যা সাঁতগন গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। প্রথমে তারা সকলেই হিহিড়ি-পিপিড়িতে বাস করত। পরে সেখানে সকলের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা চাই চম্পায় চলে যায়। পরে যায় শিলদায় (মেদিনীপুর)। সেখান থেকে ছোট নাগপুরে, তার পরে উত্তরে দিকে গিয়েছিল। এই ভাবে এক অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাওয়ার কারণ সম্ভবত ছিল যে, তারা চাষের জমি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেত না এবং জঙ্গল পাহাড়ে তাদের জন্য যথেষ্ঠ খাদ্য সংস্থান হত না। সাঁওতালরা সম্ভবত সপ্তদশ শতক নাগাদ বাঁকুড়া জেলায় ঢোকে[i]।

সাঁওতালী রূপকথায় কিন্তু পাওয়া যায় না তাদের পূর্ব পুরুষের হাঁস-হাসিল এর কথা, তাদের প্রথম পুরুষদের নাম 'Haram' ও 'Ayo'. Haram মানে 'Old man'। উল্লেখ্য যে সাঁওতালি ভাষায় 'Hor' শব্দের অর্থ 'man', 'Ayo' শব্দের অর্থ 'Mother', এখানে খ্রীষ্ট ধর্মের মতে প্রথম মানব মানবী Adam এবং Eve এর সাথে এই Haram ও Ayo-র তুলনা করা যেতে পারে[ii]। বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা বোঝা যায় তারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের স্থান পরিবর্তনের পশ্চাদে স্থান সংকুলান বা তাদের রীতিনীতির সংকট দুই-ই হতে পারে। ই.টি. ডালটনের মত অনুযায়ী Ahiri Pipri থেকে তারা Hara Duttie গিয়ে থাকতে শুরু করেছিল। সেখানে তাদের জনসংখ্যায় বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা Kharwrars নামে পরিচিত ছিল। এর পর তারা আবার স্থানান্তরিত হয়ে Chai Champa তে থাকতে শুরু করে। এখানে তারা কয়েক পুরুষ ধরে থাকে। এই চাই চম্পা জায়গাটি হাজারি বাগ (Hazari bagh) জেলার অন্তর্গত ছিল[iii]। পরবর্তীতে মধুসিং এর অত্যাচারে তারা চাই চম্পা পরিত্যাগ করে। তারা ছোটনাগপুর মুন্ডাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারা Marang Buru (The great Mountain) মুন্ডাদের দেবতার নিকট প্রার্থনা করে তাদের রক্ষা করার জন্য। ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন[iv]। রক্ষা করার সেই সময় কাল থেকে তারা Marang Buru এর শিষ্য হয়ে ওঠেছিল। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন- সাঁওতালরা নাগপুরে কোন সময় থাকেনি। তারা Jhalda তে গিয়ে ছিল যেটা Mundas দের দখলে ছিল, বর্তমানে হিন্দু কুর্মিদের দখলে। পরের গন্তব্য Patkum কিন্তু সেখানেও তারা ভুমিজদের মধ্যে কোন জায়গা পেল না। সোজা Saont এ প্রবেশ করে। সেখানে প্রচুর জঙ্গল খুঁজে পায় এবং আনন্দের সাথে বসবাস করতে থাকে। অনেক পন্ডিত মনে করেন এই Santal শব্দটি Saont এর বিকৃতি রূপ থেকেই এসেছে।

সূচক শব্দ: সাঁওতাল, মারাংবুরু, বাঁকুড়া, মানভূম, শিকার, কৃষিকাজ।

মূল আলোচনা:
Saont এ থাকাকালীন তাদের সানট রাজার সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারা সানট পরিত্যাগ করে সিখর এ চলে যায়। Saont ছিল তাদের দীর্ঘদিনের বাসস্থান। সেখান থেকেই তারা Santal নাম পেয়েছে। তারা আগে Kharwars বলেই পরিচিত ছিল। মানভূম জেলার পূর্বাংশে সাঁওতালদের এ রকম অনেক গ্রাম খুজে পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, জঙ্গলে তাদের অবস্থান শেষ করে তারা হাজারীবাগ জেলা ও সিখর (Sikar) এর উদ্দেশ্যে এগোয়। দামোদর প্রবাহের নিকটবর্তী এলাকায় তাদের কোন পূর্বপুরুষ Sonabadi এলাকায় কলোনীর নেতা ছিলেন। সেই সময় অনেক KHARWAR রাজাদের মধ্যে, একজন Gola তে রাজত্ব করত। যাকে সাঁওতালরা রাজস্ব প্রদান করত। কাঙ্গাল পরগনাইত ঘাটওয়ালি ব্যবস্থাপনা শুরু করেছিলেন। এই ব্যবস্থা ইংরেজরা এসে আমাদের দেশে প্রথম দেখেছিল[v]। Rev.L.O. Skrefsrud এর মতে Santal নাম হল Saontar এর অপভ্রংশ। তারা কয়েক পুরুষ মেদিনীপুর এর Saont এ থাকার ফলে সাঁওতাল নাম পেয়েছে[vi]।"

Rev.P.O. Bodding সাঁওতালদের উৎপত্তি নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তার বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন যে, সাঁওতাল রূপকথা খুঁজে পাওয়া যায় হাজারিবাগে ছোট নাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের Che এবং Champa অন্তর্গত। যেখানে তারা ৬০০ বছর আগে বাস করত। তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে তিনি বলেছেন যে, সাঁওতালি রীতিনীতি ও ভাষা থেকে এটা পরিষ্কার যে তারা এই জায়গায় (Cha ও Champa) এসেছিল পশ্চিম থেকে (South- west) এবং এটা অসঙ্গত হবে না যে প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে তারা গঙ্গার উভয় পাশে ছিল যা বেনারসের পশ্চিম তীরে অবস্থিত[vii]। বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা বলা যায় যে সাঁওতালরা এখানকার প্রকৃতি বাসিন্দা নয়। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে। ম্যাকআলপিন তার রিপোর্টে বলেছেন যে- বাঁকুড়াতে ভূমিজরা প্রকৃত আদিবাসী, সে সাঁওতালরা যতই জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি বিস্তার করুক[viii]। রামগড়ে কিছু সাঁওতালদের বসতি ছিল যা কোম্পনী অধিকৃত এলাকায় ছিল[ix]।

সাঁওতালদের ভ্রাম্যমান জীবন চলতেই থাকে। বিভিন্ন তথ্যে একথা বারবার ফুটে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষে তারা পুনরায় রাজমহল সন্নিহিত অঞ্চলে যায় যা ছোটনাগপুরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই অভিবাসনের কথা বিভিন্ন সরকারী দলিলে উল্লেখ আছে[x]। সাঁওতালদের অভিবাসনের সম্ভাব্যকারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উঠেছে পণ্ডিতদের লেখায়, যথা প্রথমত অনেকেই ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষকে একটি কারণ বলেছেন। দুর্ভিক্ষের ফলে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম এর সন্নিকটস্থলে যে জনশূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে ঐ এলাকায় সাঁওতালদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রচুর পরিমান লোকক্ষয়ের ফলে আবাদী জমির তুলনায় কৃষকদের সংখ্যা হ্রাস পায়। এই কৃষকদের সংখ্যা পূরণে জন্য সাঁওতালদের চাহিদা শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় আর একটি কারণ হিসেবে উঠে আসে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত। নতুন ভূমিবন্দোবস্ততে জমিদারের দেয় খাজনার পরিমান স্থির ছিল, ফলে তারা অধিক জমি আবাদী করে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ফলে বনাঞ্চল পরিষ্কার করে চাষের জমি তৈরি করার জন্য কৃষক হিসেবে সাঁওতালরা ভীষণ ভাবে জমিদারের আকর্ষনের ব্যাপার হয়ে ওঠে। যেহেতু তাদের মত সবল, কর্মঠ, বিশ্বস্ত ও জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করার মত আর কেউ ছিল না। তাদের কে প্রথম দিকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে এই কাজে নিযুক্ত করা হত।

বাঁকুড়া জেলা বঙ্গপ্রদেশের বর্ধমান প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত অন্যতম উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এখানে আবার বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতালরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে প্রোটো অষ্টালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অধিবাসীদের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বেশী দেখা যায়। সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহালি, কোড়া, খেড়িয়া, শবর, মুন্ডাদের বসবাস এজেলায় প্রধান। অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব বাঁকুড়া জেলায় কবে, কীসের আকর্ষণে সাঁওতালদের আগমন ও বিস্তার ঘটেছিল? বাঁকুড়ায় সাঁওতালরা প্রধানত তাদের প্রধান জাতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করছে। তথাপি তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি প্রভৃতি তারা প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ অক্ষত রাখতে পেরেছিল। সাঁওতাল পরগনার বাইরে তাদের জীবনের নানা সমস্যা কে সমাধানের মধ্য দিয়ে নিজেদের জমির উপর অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিল, জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অংশে এসমস্ত ঘটনা বেশী চোখে পড়ত[xi]। বাঁকুড়ার সাঁওতালদের চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে সহজ সরল, সত্যবাদী, সাহসী কিন্তু প্রকৃতির লাজুক সন্তান হিসেবে। আর দাবী করা হয় যত দিন না সাঁওতাল এলাকায় কোন বহিরাগতর প্রবেশ ঘটেছে ততদিন তারা খুবই সহজ সরল ছিল। কিন্তু দিকুদের প্রবেশের পরে, তারা প্রতারনা, মিথ্যাকথা ও চুরিকরা শিখেছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বিভিন্ন ভাবে দিকুদের আসা ও যাওয়ার ফলেই তাদের চরিত্র ও সংগঠনে সমস্যা শুরু হয়েছিল।

সাঁওতালরা বাঁকুড়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গীয় জাতি। W.J. Culshow -এর মতে দক্ষিন-পশ্চিম বঙ্গে সাঁওতালরা কমপক্ষে ৩০০ থেকে ৫০০ বছর ধরে বসবাস করছে। বিভিন্ন পন্ডিতদের লেখা থেকে এটা বোঝা যায় তারা বর্তমান বাসস্থানে এসেছে ছোটনাগপুরের পার্বত্যময় অঞ্চল থেকে। এটাও বলা হয়েছে যে রঙ্গীবাড়ি (Rangibari) গ্রাম ৩০০ বছরের বেশী পুরানো। বাঁকুড়ায় তাদের বসতি সম্পর্কে হারু মাঝি বলেছেন যে তাদের পরিবার ও আরও অনেকে বগড়ীর আউরাসুরী (Aurasuri) থেকে হাতির তান্ডবে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করেছিল। বারিকুলে প্রায় ১৮৪০ খ্রী: নাগাদ থেকে তাদের পাঁচ প্রজন্ম বসবাস করছে[xii]"। বাঁকুড়া জেলা ছোটনাগপুর অঞ্চলে সীমন্তবর্তী একটি উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। জেলায় উপজাতিদের প্রাধান্যই বেশী ও 'ম্যালিরমত অনুসারে বলা যায় ১৯০৮ খ্রি: সাঁওতাল জনসংখ্যা ছিল বাঁকুড়া জেলায় ১০৫৬৮২ জন[xiii]। কিন্তু প্রথম সেনসাসে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ জেলায় সাঁওতাল জনসংখ্যা ছিল ২৫৩৭৮ জন। এর দ্বারা বলা যায় জেলায় সাঁওতাল জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুত ঘটেছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, বাঁকুড়ায় সাঁওতালদের আগমন ও শান্তিপূর্ন ভাবে হয়েছিল। সাঁওতালরা বাঁকুড়ার কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় বসতি করেছিল। তাদের বেশির ভাগই জেলার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে দেখা যেত, যেমন শালতোড়া থানা, ছাতনা, খাতড়া, রায়পুর, রানীবাঁধ, সিমলাপাল এবং তালডাংরাতে[xiv]'।

M.C. McAlpin তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে কয়েকটি থানার মধ্যে রাইপুর থানায় সাঁওতালরা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ[xv]। তার রিপোর্ট অনুযায়ী বাঁকুড়াতে সাঁওতালদের দেখা যায় মূলত পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অংশের অনুর্বর ঢেউখেলানো পার্বত্য এলাকায়। ছাতনার দক্ষিণ ভাগ এবং ইন্দপুরের উত্তরে সাঁওতাল বসতি কম ঘনত্ব যুক্ত। কিন্তু যতই দক্ষিনে যাওয়া যাবে সাঁওতাল জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এটা সর্বোচ্চ হয় রাইপুরে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, রঙ্গীবারি গ্রাম হল খাতড়া থানার মধ্যে প্রধান গ্রাম যেখানে সাঁওতাল বসতি ছিল। ম্যাক আলপিনের রিপোর্ট অনুসারে বলা যায় সাঁওতালরা সিখর ভূম থেকে সোজা দক্ষিণে আসেনি, প্রথমে দক্ষিণ থেকে মেদিনীপুর, তারপর পুনরায় উত্তর পথে। রঙ্গীবারি (Rangibari)

গ্রামে সাঁওতালদের বসতি আট-দশ পুরুষ আগেকার, প্রায় ৩০০ বছর পুরোনো। বলা যেতে পারে যে খাতড়া ও রায়পুরে তাদের বসতি ঘটেছিল মেদিনীপুরের থেকে, যারা শিকরভূম থেকে এসেছিল। ছাতনা থেকে দক্ষিণে একটা দুর্বল শাখা গিয়েছিল। Daltonও এ বিষয়ে একমত যে মেদিনীপুরের সানট থেকে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

ম্যাকআলপিন তার রিপোর্টে আরও উল্লেখ করেছেন যে, রায়পুরের দক্ষিনে একটি পরগনা আছে। যাকে দিকুরা 'সিলদা' বলে কিন্তু সাঁওতালদের কাছে 'সামন্তভু'ই (প্রকৃত পক্ষে সামন্তভূম, একই সামন্তভূম বাঁকুড়াতে আছে)। এছাড়া Saont এর কথা বলা যায় Rev.L.O Skrefsrud বলেছেন এখান থেকে সাঁওতাল নামের উৎপত্তি। কেউ যদি বাঁকুড়া বা মেদিনীপুরে অনুসন্ধানে যান তিনি শুনতে পাবেন সাঁওতাল পরগনার কথা, যেটি দামোদরের নিকটবর্তী ছাতনার সামন্তভূম (Santbhum) এবং সান্তভুই মেদিনীপুরের উত্তরদিকের-তাঁকে নাড়া দিয়ে যাবে নামের এই সাদৃশ্যতা। আবার W.B. Oldham এর মতে সাঁওতাল কথাটি সামন্তওয়ালা (Samantawala) থেকে এসেছে। তাঁর মতে সামন্ত (Samanta) একটি অন্য নাম যা সানট (Saont) এর পাশ্ববর্তী এলাকার থেকে নেওয়া হয়েছিল। রাইপুরে অন্যান্য জাতি উপজাতিদের তুলনায় সাঁওতাল বসতি সবচেয়ে বেশী। রাইপুর জন সংখ্যা অর্থাৎ বাঁকুড়ার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ছিল ঘনবসতি। প্রকৃতপক্ষে এখানে সাঁওতালদের বসতির সমস্ত অনুকূল পরিবেশ ছিল। জেলার এই দক্ষিণ পশ্চিম অংশে যেমনটি তারা পছন্দ করে[xvi]। নিচের পরিসংখ্যানটিতে রাইপুরের সাঁওতাল জনসংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রমান দেয়-

Population

	The figures below Have been given for the thanas which contain a large sontahl population			
Thanas	Population	Sonthal Population	Bhumij Population	Bauri Population
Gangajalghati (including saltera)	122399	7709	----	20931
Bankura (including chhatna)	118670	15373	1714	24606
Khatra (including indpur)	115313	19899	11440	20147
Raipur	101345	35186	5480	7172
Simlapal (independent outpast)	38109	8756	550	9580
Onda (including Taldangar)	122917	12232	3078	20931

Source: M.C. McAlpin, Ibid-Page-8

বাঁকুড়া তাদের কাছে পছন্দের জায়গা হয়ে উঠেছিল। বাঁকুড়া দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ঢেউখেলানো, জঙ্গলে পরিপূর্ণ এলাকা খুবই সুন্দর, বসবাসের পক্ষে আদর্শ। তাদের জীবনে জমি, জঙ্গল এর যে গুরুত্ব তার সবই তারা বাঁকুড়ায় পেয়েছিল। সেনসাস রিপোর্টে তাদের বসতির বৃদ্ধির সূচক বেশ উর্ধমুখী ছিল[xvii]। নীচের পরিসংখ্যানটি সেই তথ্যই দেয়-

District	1872	1881	Percentage of increase or Decrease
Bankura	25378	104593	+312.14

বাঁকুড়াতে সাঁওতালরা তাদের মুল জাতি অংশ থেকে বহু দুরে বসবাস করলেও তারা নিজেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গুলি অক্ষত রেখেছে। যদিও তারা সাঁওতাল পরগনায় থাকার বিভিন্ন সুবিধা পায়নি, তথাপি নিজেদের জন্য বিশেষ রক্ষা কবচের সাহায্য হিন্দু- মহাজন, জমিদারদের থেকে নিজেদের জমি রক্ষা করেছে। বাঁকুড়াতে সাঁওতালরা কম- বেশী শান্তিতে বসবাস করছে তাদের আদিম সত্তা বজায় রেখে[xviii]। কিন্তু আইনি সহয়তার অভাবে তারা ক্রমশ দরিদ্র হয়েছে এবং জমিদার ও মহাজনের শোষনের শিকার হয়েছিল। জেলার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের অধিকাংশ গ্রাম হিন্দু মহাজনদের হাতে চলে গিয়েছিল। এটা উল্লেখ করা যায় যে যদি মহাজনরা সাঁওতাল গ্রামে না ঢুকত তারা এখন সাঁওতাল গ্রাম হিসেবেই থাকত[xix]। বাঁকুড়াতে সাঁওতালদের চরিত্র এখনও অক্ষত রয়েছে বলেই বিভিন্ন লেখালেখি থেকে উঠে আসে। এই জঙ্গল ভূমিকে আবাদ ভূমিতে পরিণত করার তার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল[xx]। জেলার কৃষি-জমির বেশীর ভাগই সাঁওতালদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল। রুক্ষ, উর্বর মাটিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরের কৃতিত্ব তাদেরই। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র এলাকা সাঁওতালদের অধিকারে ছিল। এটা প্রতীয়মান হয় যে জেলার পশ্চিম অংশ এখনও বিভিন্ন সাঁওতাল নাম আছে, যেমন তামসোল, দেবাসোল, কাকেসোল, অর্জুনপাড়া, অমৃতপাল ইত্যাদি[xxi]। জেলায় প্রথম লোক গণনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি। গণনা ছিল পরীক্ষা মূলক। সাঁওতালেরা তখন সদ্য জেলায় অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছিল। সংখ্যা ছিল খুবই কম। জেলার এলাকাও বেশী ছিল না। প্রকৃত পক্ষে ১৮৮১ সালের পর থেকে সাঁওতালদের বিপুল প্রবাহ জেলায় আসতে থাকে। নবাগত জনসংখ্যার বিরাট অংশ বসবাস গড়ে তোলেন এখানে। সেনসাস রিপোর্টে থেকে এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যে- বাঁকুড়া জেলার পরিবেশ সাঁওতালদের পছন্দের জায়গা ছিল তা বলা যায়। বাঁকুড়া ও বীরভূমের সাঁওতাল জনসংখ্যার তুলনা করলে আমরা এই পার্থক্য খুঁজে পাব। নীচের সেনসাস রিপোর্টটি লক্ষনীয়[xxii]।

YEAR	TOTAL SANTAHL POPULATION IN WEST BENGAL	SANTHAL POPULATION IN BANKURA	SANTHAL POPULATION IN BIRBHUM
1872	138862	25378	6954
1881	36622	20034	726

1891	304122	101537	21770
1901	512047	105682	47221
1911	636900	115017	56087
1921	672615	104912	57180

Source: A Mitra, Census 1951, P.118.

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে বনের গা ঘেঁষা প্রান্তিক জমি-গুলিতে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছিল। বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল বনভূমি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বর্ধমান ও মেদিনীপুর চাকলা অধিগ্রহণ করারপর জোত ও জমিদারী গুলি নতুন ভাবে ঢেলে সাজাতে শুরু করেছিল। কোম্পানীর ব্যবসায়ে সাহায্যকারী বেনিয়া, এজেন্ট ও কর্মচারীরা অরন্য অঞ্চলের বড় ভূ-খন্ড বন্দোবস্তো নিতে শুরু করেছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ প্রতিষ্ঠা করা ছিল প্রধান সমস্যা। জমির তুলনায় বায়ত ও চাষীর সংখ্যা ছিল কম। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে গ্রামীণ জনসংখ্যার যে বিপুল অবলুপ্তি ঘটেছিল। তখনও পর্যন্ত তা পূরন হয়নি। আবাদী জমির পরিমান চাহিদার তুলনায এত বেশী ছিল যে জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ পত্তন করায় উৎ সাহ ছিল না রায়ত ও চাষীদের মধ্যে। ফলে আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষদের। আমন্ত্রনে সবথেকে বেশী সংখ্যায় সাড়া দিয়েছিলেন সাঁওতালরা। বন্যজন্তু শিকার ও কৃষিভিত্তিক নিশ্চিন্ত জীবনের সম্ভাবনা সম্ভবত তাদের আকৃষ্ট করে ছিল।

তথ্যসূত্র:

---

i বাঁকুড়া পরিচয় চতুর্থ খন্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ-৩৩

ii Mukherjea Charulal, The Santals (with illustrations) page-13

iii E.T. Dalton; Deseriptive Ethnology Of Bengal, Reprint-1959-1960

iv E.T. Dalton; ibid-page-44

v E.T. Dalton; ibid-page-449

vi H.H.Risley; The Tribes and Castes Of Bengal. Vol.II, Cal. 1891, page-224.

vii Mukherjea Charulal, ibid-page-37

viii McAlpin; Report On The Condition Of The Santals In The District Of Birbhum, Bankura, Midnapore And North Balasore Cal-1981, pp-9,10

ix P.C.Roychoudhury; Santal Parganas, District Gazeeteers, Patna 1956, page-856

x J.Triosi; Tribal Religious Beliefs and Practices Among The Santals, Delhi-page-24

xi L.S.S.O' Malley, Bengal District Gazetteers Bankura, Reprint 1995, (Appendix)-page-83

xii W.J.Culsow; Tribal Heritage, A Study Of Santals. Lon-1949

xiii L.S.S.O'Malley' Bengal District Gazetteers, Bankura, cal-1908, page-58

xiv F.W.Robertson; Final Report On The Survey And Settlement Operation In The District Of Bankura, Cal-1926, page-9

xv M.C. McAlpin; Report On The Condition Of The Santals In The District Of Birbhum, Bankura, Midnapore And North Balasore, Cal-1926, pp-8,9

[xvi] M.C. McAlpin, page-8

[xvii] J.A.Bourdilion; Report On The Census Of Bengal, Calcutta-1883, Vol-1. Page-95

[xviii] L.S.S.O'Malley' ibid-page-72

[xix] L.S.S.O'Malley' ibid-page-72

[xx] F.W.Robertson; Final Report On The Survey And Settlement Operation In The District Of Bankura, 1917-1924, Cal-1926, page-9

[xxi] F.W.Robertson; Final pp-9,10

[xxii] ভট্টাচার্য তরুণদেব, পশ্চিমবঙ্গ দর্শণ -২ বাঁকুড়া, ফার্মাকে.এলএমপ্রা. লি. কলকাতা,২০১৪, পৃষ্ঠা-১৮৯।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

ভাস্কর পাল
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ভারতীয় পরম্পরায় বস্তুবাদের সঙ্গে যে দুটি দর্শন সম্প্রদায়ের যোগ সবচেয়ে নিবিড় তারা যথাক্রমে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা যেন বস্তুবাদী এবং ন্যায়-বৈশেষিক শব্দগুলিকে সমার্থক হিসাবেই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এটা কতটা সত্য তা বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক দয়াকৃষ্ণ সংশয় জ্ঞাপন করে বলেছেন- নৈয়ায়িকরা কি সত্যিই বস্তুবাদী? যদি সকল কিছুই জ্ঞেয় এবং অভিধেয় হয়; অস্তিত্ব, জ্ঞেয়ত্ব এবং অভিধেয়ত্ব যদি সমান্তরাল হয় তাহলে সব কিছুই জ্ঞান সাপেক্ষ হয়ে পড়বে যা পক্ষান্তরে ভাববাদকেই সমর্থন করে। যদি নৈয়ায়িকরা এমন কোন বস্তু স্বীকার করতেন যা অস্তিত্বশীল অথচ জ্ঞানগোচর নয়, তাহলেও হয়ত নৈয়ায়িকদের একরকম বস্তুবাদী বলা যেত। এমতাবস্তায় নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদী বলা হবে নাকি ভাববাদী সে বিতর্ক থেকেই যায়। ঐ বিতর্কের উপর আলোকপাত করতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। উভয় মতের সপক্ষে যুক্তি পেশ করে সে গুলির দার্শনিক বিশ্লেষণ এই উপস্থাপনে গুরুত্ব পাবে।
সূচকশব্দ: বস্তুবাদ, জ্ঞেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব, বুদ্ধ্যপেক্ষ, প্রকারতা, অস্তিত্বশীলতা, জ্ঞান নিরাকারবাদ ও পরপ্রকাশবাদ।

ভূমিকা: উৎপত্তির কাল থেকেই দর্শন দুটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে চলেছে একটি স্বরূপসৎ বস্তু (reality) সংক্রান্ত অন্যটি সত্যতা (true) সংক্রান্ত। যা দৃশ্যমান তাই কি স্বরূপসৎ, নাকি এর অন্তরালে স্বরূপত বস্তু অবগুণ্ঠিত রয়েছে? অন্যভাবে বললে- কখন মানুষের জ্ঞান সত্য বলে গন্য হবে? যেভাবে সে জগতকে দেখে সে দেখাই কি সত্য? সত্তা ও সত্যের এই সন্ধান আসলে একই জিজ্ঞাসার দুটি দিককে নির্দেশ করে। সত্তা-সত্যের এই দ্বৈততা জন্ম দিয়েছে নানাবিধ দ্বন্দ্বের। দর্শনের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় প্রায়সর্বত্রই নানা দ্বন্দ্ব চলেছে; এই দ্বৈততা কোথাও বুদ্ধিবাদ-অভিজ্ঞতাবাদে, কোথাও বস্তুবাদ-ভাববাদে, কোথাও সংশয়বাদ-জ্ঞানবাদে, কোথাও বা সাক্ষাৎজ্ঞানবাদ ও পরোক্ষজ্ঞানবাদে। এই দ্বন্দ্বগুলি হয় আধিবিদ্যক কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক। আমরা যদি প্রাক্ সক্রেটিস যুগের দিকে তাকাই তাহলে দেখব এই প্রশ্নটি তখনও উঠেছিল যে এই জগতের চরম উৎস কোনটি? তা কি কোন জড়বস্তু নাকি অজড় কোন কিছু? প্রশ্নটির মুখোমুখি হয়ে থেলস যেখানে জলকেই জগতের সার বলেছেন সেখানে এনাক্সিম্যান্ডার, এনাক্সিমেনিস, ডেমোক্রিটাস যথাক্রমে অনির্দিষ্ট জড়বস্তু, বায়ু এবং পরমাণুকেই চরম উৎস বলে মনে করেন। তবে সকলেই এই তত্ত্বকে জড় বলে কল্পনা করেন নি। যেমন পিথাগোরাস একে দেখেছেন সংখ্যা হিসাবে। জেনোফেনিস থেকে পারমেনাইডিস প্রমুখতাকে দেখেছেন being বা সত্তা হিসাবে, যা কোন জড়বস্তু নয়। এর মাঝামাঝি পথে হেঁটেছেন এম্পেডকেলস এপিডকেলস, এনাক্সাগোরাস প্রমুখ। মূল তত্ত্ব জড় নাকি অজড়- এই দ্বন্দ্ব প্লেটো অ্যারিস্টটলের দর্শনেও অব্যহত। দৃশ্যমান লৌকিক অভিজ্ঞতার জগতকে বাস্তব বা প্রকৃত বস্তু না বলে, অদ্ভুতভাবে এক রহস্যময় ধারণার জগতকে প্রকৃত সৎবস্তুর জগৎ হিসাবে আবিষ্কার করেন প্লেটো। এভাবে

প্লেটোরদর্শন ধারণা ও বিশেষ বস্তুর এক অস্পষ্ট দ্বৈতবাদে পতিত হয়; যা অ্যারিস্টটলের দর্শনে উপাদান (matter) ও আকারের (form) এক স্পষ্ট দ্বৈততায় উপনিত হয়। আমরা যদি আধুনিক দর্শনের দিকে দৃষ্টি রাখি তাহলেও দেখি সেখানে এই জড় ও অজড়ের দ্বন্দ্ব অব্যহতই রয়েছে। আধুনিক দার্শনিকদের কেউ কেউ জড় ও মন উভয়কে রক্ষায় প্রয়াসী হয়েছে, কিন্তু বার্কলের মতো কিছু ব্যতিক্রমী দার্শনিক সকল কিছুকেই মনের ধারণা বা ভাব বলে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে জড়বস্তু বলে কিছুই নেই। এভাবে বস্তু ও ভাবের দ্বন্দ্ব পাশ্চাত্য দর্শনে অব্যহতই থেকেছে।

যদিও এই ভাববাদ (idealism), বস্তুবাদ (realism) অভিধাগুলি পাশ্চাত্য পরম্পরা থেকে এসেছে তাহলেও বস্তুবাদ ও ভাববাদের দ্বন্দ্ব ভারতীয় ঐতিহ্যেও সমান ভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক শিরোমণি চার্বাক কেবল জড়বস্তুর চরম অস্তিত্ব স্বীকার করে দৃঢ় ভাবে সমর্থন করেছেন জড়বাদ তথা বস্তুবাদকে। হয় জড়ের অতিরিক্ত কিছুকেই তারা স্বীকার করেননি অথবা স্বীকার করলেও তাদের জড়ের ক্রিয়া হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। আবার আমরা যদি বৈদিক বা উপনিষদীয় ঐতিহ্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখাতে পাই সেখানে চরম সত্তা রূপে যাকে আবিষ্কার করা হয়েছে তা দেখতে জড়াতিরিক্ত অধ্যাত্ম সত্তা। এক বা অদ্বৈতের বহুধা প্রকাশ হিসাবে দেখা হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে। বেদ উপনিষদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠা যে বেদান্ত দর্শন সেখানেও হয় জগতের পরমার্থতা অস্বীকার করা হয়েছে কিংবা এক পরমার্থ বস্তুর প্রকাশ বা পরিনাম হিসাবে তাকে দেখা হয়েছে। শুধু সম্প্রদায় ভেদে নয় একই সম্প্রদায়ের অন্দরেও কখনো ভাববাদ কখনো বস্তুবাদের সুর প্রকট হয়ে উঠেছে। বেদান্তের ঘরে অদ্বৈতবাদের সাবেকী ঘরানার মধ্যেই দেখি মধ্বের দ্বৈতবাদ। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও হীনযানীদের বস্তুবাদ যেমন রয়েছে তেমনই যোগাচার ও মাধ্যমিকের বস্তুবাদ বিরোধী মতবাদও রয়েছে। তবে যোগাচার ও অদ্বৈত বেদান্ত পরম্পরায় ভাববাদ যেমন স্পষ্ট ভাবে সমর্থিত হয়ছে তেমনই চার্বাক, ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা ঐতিহ্যে বস্তুবাদ স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

ন্যায়-বৈশেষিক পরম্পরায় 'জ্ঞেয়ত্ব' ও 'অভিধেয়ত্ব':

ভারতীয় পরম্পরায় বস্তুবাদের সঙ্গে যে দুটি দর্শন সম্প্রদায়ের যোগ সবচেয়ে নিবিড় তারা যথাক্রমে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা যেন বস্তুবাদী এবং ন্যায়-বৈশেষিক শব্দগুলিকে সমার্থক হিসাবেই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এটা কতটা সত্য তা বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। অধ্যাপক দয়াকৃষ্ণ সংশয় জ্ঞাপন করে বলেছেন- নৈয়ায়িকরা কি সত্যিই বস্তুবাদী? এই রকম সংশয়ের উৎপত্তির মূল কারণ 'জ্ঞেয়ত্ব' এবং 'অভিধেয়ত্ব' সকল পদার্থেই সাধর্ম ন্যায়-বৈশেষিকের এই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত মানলে যা কিছু জ্ঞানগম্য তাই অভিধা বা নাম প্রয়োগের যোগ্য বলে মেনে নিতে হয়। আর এই জ্ঞেয়ত্ব অভিধেয়ত্ব যেহেতু সর্ব পদার্থ-সাধারণ তাই এমন কোন পদার্থই অবশিষ্ট থাকে না যা জ্ঞান নিরপেক্ষ। যা অনেকখানি ভাববাদী সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে, যেখানে বলা হয়- 'অস্তিত্ব হল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য'। এব্যাপারে বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক বার্কলের সূত্রটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়- "There esseest percipi, nor is it possible they should have any existance out of the minds or thinking things which perceive them."[1]। বার্কলের এই অবস্থানটির সঙ্গে 'পদার্থ

Berkeley, George, 1910, *A Treatise Concerning The Principles of Human Knowledge,* London: The Open Court Publishing Company, page- 31.

মাত্রই জ্ঞেয় ও অভিধেয়' এই সিদ্ধান্তের মিল অনেকখানি। বার্কলে এবং নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য কেবল এইটুকুই যে নৈয়ায়িকরা প্রত্যক্ষত্বের পরিবর্তে জ্ঞেয়ত্বের কথা বলেন।

এখন যদি ঈশ্বরের প্রসঙ্গকে বিচারে রাখা হয় তাহলে বার্কলীয়মত এবং ন্যায় মত অনেকখানি একই বিন্দুতে আসে। কেননা নৈয়ায়িক এবং বার্কলে উভয়েই মনে করেন জগতের সকল কিছুই ঈশ্বরীয় প্রত্যক্ষের বিষয় এবং তার জ্ঞানগোচর। জ্ঞান এবং জ্ঞানগম্য হওয়ায় মধ্যে যে অল্পবিস্তর পার্থক্য তা কেবল আমাদের মতো সীমিত সত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ঈশ্বরের সাপেক্ষে তা একে বারেই অর্থহীন। অবশ্য জ্ঞান এবং জ্ঞানগম্যতার মধ্যে যে পার্থক্য সে বিষয় নৈয়ায়িকরা বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন না বলেই মনে হয়। ন্যায়-বৈশেষিকরা কোন কোন বস্তুর 'বুদ্ধ্যপেক্ষতা'-র[2] কথা বলেন অথচ নৈয়ায়িকরা যদি বস্তুর গুণগুলিকে বুদ্ধ্যপেক্ষ বলেন তাহলে তাদের আর বস্তুবাদী বলা যাবে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সংশয় আছে। কেননা ন্যায়-বৈশেষিক মতে যদি 'যা সৎ তাই জ্ঞেয়' হয় অর্থাৎ বুদ্ধ্যপেক্ষ হয় তাহলে অজ্ঞাত বস্তু বলে আর কিছুই থাকতে পারে না।

সুতরাং সকল কিছুই যদি জ্ঞেয় এবং অভিধেয় হয়; অস্তিত্ব, জ্ঞেয়ত্ব এবং অভিধেয়ত্ব যদি সমান্তরাল হয় তাহলে সব কিছুই জ্ঞান সাপেক্ষ হয়ে পড়বে যা পক্ষান্তরে ভাববাদকেই সমর্থন করে। যদি নৈয়ায়িকরা এমন কোন বস্তু স্বীকার করতেন যা অস্তিত্বশীল অথচ জ্ঞানগোচর নয়, তাহলেও হয়ত নৈয়ায়িকদের একরকম বস্তুবাদী বলা যেত। কিন্তু নৈয়ায়িকরা অবভাস ও বস্তু সত্তার মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেননি। এমতাবস্তায় নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদী না বলে ভাববাদী বলাই উচিত বলে মনে করেছেন দয়াকৃষ্ণ।[3]

নৈয়ায়িকরা ভাববাদী না বস্তুবাদী এই বিতর্ককেই অর্থহীন বলে মনে করতে পারেন কেউ কেউ। তাদের বিচারে 'বস্তুবাদ', 'ভাববাদ' এই অভিধাগুলির প্রয়োগ আধুনিক, যা পশ্চিমী সাহিত্যে কিছু বিশেষ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভাবধারার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ্যে নৈয়ায়িকের পরিচিতি যেহেতু বস্তুবাদী হিসাবেই সেহেতু নৈয়ায়িকদের দৃষ্টিকোন থেকেও বিতর্কটি একেবারেই অযৌক্তিক এমন বলা যায় না।

ন্যায় মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কিছু আপত্তি:

আধুনিক ভারতীয় দার্শনিক দয়াকৃষ্ণ এমনই কিছু প্রশ্নের উল্লেখ করেছেন যা নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী- এই বিশ্বাসকেই টলিয়ে দেয়। ঐ প্রশ্ন গুলি একে একে আলোচনা করা যাক, দয়াকৃষ্ণ বলেন- নৈয়ায়িকরা কি এটা সত্যিই স্বীকার করেন যে, 'যা কিছুই সৎ তা জ্ঞেয় এবং অভিধেয়'? এই জ্ঞেয়ত্ব এবং অভিধেয়ত্ব কি পরস্পর স্বতন্ত্র অর্থাৎ কোন কিছু কি জ্ঞেয় না হয়েও অভিধেয় হতে পারে অথবা কোন কিছু অভিধেয় না হয়েও কি জ্ঞেয় হতে পারে? যদি তাই হয় তাহলে সৎ, জ্ঞেয় এবং অভিধেয় এ রূপ ভিন্ন ভিন্ন অভিধা প্রয়োগের অর্থ কী? যদি সকল সৎ বস্তুই

---

[2] বৈশেষিক দর্শনে সামান্য এবং বিশেষকে বুদ্ধ্যপেক্ষ বলা হয়েছে- "সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্"(বৈ.সূ- ১/২/৩) অর্থাৎ সামান্য এবং বিশেষ বুদ্ধি বা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

[3] "Nyāya does not accept the notion of an 'unknowable thing-in-itself, there is no distinction between 'phenomena' and 'reality'... If this is not out-and-out 'idealism', what else is it?"- Krisna, Daya, 2004, "Is Nyāya Realist or Idealist", in *Discussion and Debate in Indian Philosophy*, Daya Krisna (ed.), Delhi: Indian Council Of Philosophical Research, page- 227.

জ্ঞেয়ত্ব এবং অভিধেয়ত্ব বিশিষ্ট হয় তাহলে কি অসৎ বস্তুমাত্রই অজ্ঞেয় এবং অনভিধেয় হবে? তাছাড়াও জ্ঞেয়ত্ব এবং অভিধেয়ত্ব কি অন্যান্য ঘটনার মতোই সৎ? যদি অভিধেয়ত্ব অস্তিত্বের আবশ্যিক বা অপরিহার্য শর্ত হয় তাহলে ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণের কী হবে? 'অব্যপদেশ্য' পদের অর্থ যদি 'অশাব্দিক' হয় এবং সৎ হওয়া ও জ্ঞেয় হওয়ার অর্থ যদি অভিধেয় হওয়া হয় তাহলে প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অব্যপদেশ্য' পদের নিবেশ সিদ্ধান্ত বিরোধকেই নির্দেশ করে না কি? 'বুদ্ধ্যপেক্ষ' কথাটির অর্থ কী? নৈয়ায়িকরা কী বস্তুর কিছু কিছু গুণকে বুদ্ধ্যপেক্ষ বলে মনে করেন অথবা সমস্ত বস্তু গুণকেই তারা বুদ্ধ্যপেক্ষ বলেন? যদি নৈয়ায়িকরা কিছু গুণকে বুদ্ধ্যপেক্ষ এবং কিছু গুণকে বুদ্ধ্যপেক্ষ নয় বলে মনে করেন তাহলে এরূপ বিভাজনের কারণ কী?[4] যদি এমনটা ধরেও নেওয়া হয় যে কিছু গুণ বুদ্ধ্যপেক্ষ এবং কিছু গুণ নয় তাহলেও কী ন্যায় সিদ্ধান্তের বিরোধ হয় না? কেননা নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত হল স্বতন্ত্র বস্তুসত্তা থেকেই জ্ঞানক্রিয়া উৎপন্ন হয়।

দয়াকৃষ্ণের এই আশঙ্কাকে আরও জোরালো করে অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী বলেন- বস্তুর মনোনিরপেক্ষ সত্তা যারা স্বীকার করেন তাদের যদি আমরা বস্তুবাদী বলি তাহলে নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী কিনা এই সংশয় একেবারে অমূলক নয়। সত্যতা (truth) বা যথার্থতা হল জ্ঞানেই ধর্ম। এই যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয় 'তদবতি তৎপ্রকারকত্ব' এর কথা অর্থাৎ বস্তুর যা ধর্ম সেই ধর্মই যদি জ্ঞান বস্তুতে আরোপ করে তাহলেই জ্ঞানটিকে যথার্থ বলা যাবে। ন্যায় দর্শনে 'প্রকারতা', যাকে লক্ষ্য করে লক্ষণ করা হয়েছে তাকে এক ধরণের বিষয়তা হিসাবেই ধরা হয়। এই বিষয়তা আবার জ্ঞান নির্ভর। বিষয়তা কখনোই জ্ঞান নিরপেক্ষ ভাবে থাকতে পারে না। কোন না কোন বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের সাথে সম্বন্ধিত হয়েই থাকে আবার অপরদিকে জ্ঞান জ্ঞাতা সাপেক্ষ। সুতরাং সত্যতা কোন জ্ঞাতার জ্ঞান সাপেক্ষেই অস্তিত্বশীল। নৈয়ায়িকরা এমন কোন সত্যতা স্বীকার করেন না যা জ্ঞান বা জ্ঞানান্তর নিরপেক্ষ ভাবে থাকতে পারে। এই অর্থে যদি নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদী বলা না যায় তাহলেও কি নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদী বলা যায়? তাৎপর্য এই যে জ্ঞান, সত্যতা মনসাপেক্ষ হওয়ার কারণে যদি নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদী বলা না যায় তাহলে বিশেষ, সামান্য, সমবায় সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের যে অভিমত তার পরেও কি তাদের বস্তুবাদী বলা যায়?

উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য কিছু সমাধান:

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী নাকি বস্তুবাদী নয়- দয়াকৃষ্ণের এরূপ আশঙ্কা এবং এই আশঙ্কার কারণ হিসাবে তাঁর মনে উত্থাপিত প্রশ্ন গুলির যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রসিদ্ধ কিছু সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকরা। বিশিষ্ট আধুনিক ভারতীয় দার্শনিক নারায়ণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মনে করেন নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী অথবা ভাববাদী- এ প্রশ্ন খুবই বিভ্রান্তিকর। ন্যায় দর্শনের অনুগামী ছাত্রদের বাদ দিলেও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যায়নকারী কোন ছাত্রের মনেই এমন সংশয় উৎপন্ন হতে পারে না যে, নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী কিনা? তাসত্ত্বেও অধ্যাপক দয়াকৃষ্ণ বলেন- নৈয়ায়িকরা কি মনে করেন যে, যা কিছু সৎ তা জ্ঞেয় এবং অভিধেয়? এর উওরে দ্রাবিড় কোন বিশেষণ প্রয়োগ না করেই বলেন- হ্যাঁ। কেননা 'সৎ', 'প্রমেয়' এবং 'অভিধেয়' এই তিনটি সংস্কৃত শব্দেরই ব্যক্তার্থ (denotation) একই। যদিও তাদের জাত্যার্থ বা লক্ষণার্থ (connotation) ভিন্ন ভিন্ন, যেমন- শুকতারা এবং সন্ধ্যাতারা। তাৎপর্য এই যে 'সৎ', 'প্রমেয়' এবং 'অভিধেয়' শব্দগুলি সর্বদা একই সঙ্গে যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে শব্দগুলির ব্যক্তার্থ একই হলেও লক্ষণার্থ ভিন্ন

Krisna, Daya, 2004, "Is Nyāya Realist or Idealist". Page 227-228.

ভিন্ন, যেমন- ঘটনাক্রমে কোন একবক্তি কারোর পিতা আবার কারোর সন্তান। এক্ষেত্রে পিতা এবং সন্তান একই ব্যক্তিকে বোঝালেও 'পিতা' এবং 'সন্তান' এক জিনিস নয়। জ্ঞেয়ত্ব হল একটি গুণ, অস্তিত্ব এবং অভিধেয়ত্ব হল অন্য আর এক প্রকার গুণ। এই তিনটি শব্দের দ্বারা আমরা জগতের সকল কিছুকেই বোঝাতে পারি অর্থাৎ জগতের সব কিছুই এই তিনটি শব্দের ব্যক্তার্থ হতে পারে। তবে দয়াকৃষ্ণ এখানে শব্দগুলির সাধারণ অর্থেই দিকেই বেশি জড় দিয়েছেন। অভিধেয় বলতে যেমন সাধারণ ভাবে কোন বস্তুকে নাম দেওয়া বোঝায় তেমনই নিত্যকালে শব্দের দ্বারা নামধেয় হওয়ার যোগ্যতাকেও সূচিত করে। প্রথমটি ব্যবহারিক হলেও দ্বিতীয়টি ব্যবহারিক নয়। ঠিক একইভাবে জ্ঞেয় বা প্রমেয় মানে যেমন কোন কিছুকে জানা বোঝায় তেমনই জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় যোগ্যতাকেও বোঝায়। সুতরাং সৎ এবং অস্তিত্ব; জ্ঞেয় এবং প্রমেয়; অভিধেয় এবং বাচ্য শব্দগুলি একই অর্থের বাচক হওয়ায়- যা কিছু সৎ তা'ই জ্ঞেয় এবং অভিধেয়- নৈয়ায়িকের এই সিদ্ধান্ত যথাযথই বলে মনে করেন নারায়ণ শাস্ত্রী।[5]

এখন প্রশ্নটি হল 'জ্ঞেয়ত্ব' এবং 'অভিধেয়ত্ব' বলতে আসলে ঠিক কী বোঝায়? 'জ্ঞানগম্য' বা 'প্রমেয়'-এর অর্থ হল যা যথার্থ বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিষয় অথবা বিষয় হতে পারে এমন কিছু। কাজেই যে বস্তু এখনও জ্ঞাত হয় নি সেই বস্তুরও জ্ঞাত হওয়ায় বা প্রমেয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। এমন বস্তু থাকতেই পারে যা কখনোও কারোর জ্ঞানের বিষয় হয় নি কিন্তু তা অবশ্যই সপ্তপদার্থের কোন না কোনটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেই এবং সেকারণে তা সৎ-ও। ফলে সেই বস্তুকে কখনোও না কখনোও জানা যাবে, এই সম্ভাবনার অন্যথা হয় না। একটি বস্তুর সকল বিশেষ গুণকে আমরা নাও জানতে পারি অর্থাৎ বস্তুর সবকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমানে আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকতেই পারে। কিন্তু তা সপ্তপদার্থের কোন না কোনটির মধ্যে অন্তর্ভূত এবং সৎ। সপ্তপদার্থের মধ্যে অন্তর্গত এমন অনেক পদার্থ আছে যাদের সকল বিশিষ্ট রূপগুলি আমরা এখনও জানতে পারি নি। কিন্তু সপ্তপদার্থের মধ্যে অন্তর্ভূত হওয়ায় অন্তত তা সামান্যরূপে জ্ঞাতই। কাজেই তা অবশ্যই জ্ঞানযোগ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ রূপে প্রমেয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সর্বদা থেকেই যায়। 'অভিধেয়'-বলতে বোঝায় যাকে নাম দ্বারা অভিহিত বা সূচিত করা যায়। একটি পদার্থ সৎ হওয়ার অর্থই হল তা নাম প্রদানের যোগ্য। বিশেষ ভাবে বলা না গেলেও দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি সামান্যত রূপে যে কোন বস্তুরই নামকরণ করা যায়।

'জ্ঞানগম্যত্ব' এবং 'অভিধেয়ত্ব' কি পরস্পর স্বতন্ত্র? অন্যভাবে বললে 'জ্ঞানগম্যত্ব' এবং 'অভিধেয়ত্ব' কি একে অপরকে নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে না? দ্রাবিড় স্পষ্ট উত্তরে বলেন হ্যাঁ- যা কিছু জ্ঞানগম্য তা অভিধেয় এবং যা কিছু অভিধেয় তা জ্ঞানগম্য। এই সমতুল্যতার কারণ হল একটি বস্তুকে জানার অর্থ হল ঐ বস্তুটির কিছু বৈশিষ্ট্যকে জানা- 'বস্তুটি এই রকম', 'বস্তুটি ঐ রকম' ইত্যাকারে জানা। সুতরাং জ্ঞানগম্য হলে তা যে অভিধেয় হবে এবং অভিধেয় হওয়ার অর্থই যে জ্ঞানগম্য হওয়া তা দ্রাবিড়ের বক্তব্যে বেশ স্পষ্ট। এখন প্রশ্ন হল যা কিছু জ্ঞেয় তা অভিধেয় হতে পারে একথা বলা গেলেও কোন কিছু জ্ঞেয় না হয়েও কি অভিধেয় হয়ে পারে? অস্তিত্ব, জ্ঞেয়ত্ব এবং অভিধেয়ত্ব সমব্যাপক হওয়ার কারণে যা কিছু অসৎ তা কোন ভাবে কখনোই জ্ঞানগম্য এবং নামধেয়যোগ্য হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তি

Dravid, N. S, 2004, "Nyāya is Realist per Excellence", in *Discussion and Debate in Indian Philosophy*, Daya Krisna (ed.), Delhi: Indian Council Of Philosophical Research page- 236.

আশঙ্কা করেন যে, যদিও যা কিছু জ্ঞানগম্য তা অস্তিত্বশীল বিপরীতক্রমে যা কিছু অস্তিত্বশীল তা জ্ঞানগম্য এ কথা বলা গেলেও যা কিছু অভিধেয় তা কি অস্তিত্বশীল হবেই?[6] যদি তাই হয় তাহলে যা ভ্রমজ্ঞানের বিষয় তাকেও অস্তিত্বশীল বলতে হয় যেমন 'পক্ষীরাজ ঘোড়া' ইত্যাদি। আর মিথ্যাজ্ঞানের বিষয়ও যদি সৎ বস্তু হয়ে যায় তাহলে ভ্রমাত্মক বস্তু, অনস্তিত্বশীল বস্তু বলে কিছুই থাকবে না। এখন যদি কেউ বলেন যে, যা অপ্রমার বিষয় তা সম্ভাব্য প্রমার বিষয় হতে পারে অর্থাৎ সম্ভাব্য রূপে সকল কিছুই প্রমা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। তাহলে অস্তিত্বশীল বস্তু বলেও কিছু থাকতে পারে না কারণ অনস্তিত্বশীল বলে আর কিছুই থাকবে না। অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব পরস্পর সাপেক্ষ দুটি পদার্থ। একের নিষেধ হলে অন্যটিও আর থাকতে পারে না। কাজেই ন্যায় বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নৈয়ায়িকদের কিছুটা আপোষ করে নিতে হবে বলে মনে করেন অধ্যাপক মোহান্তি।

লক্ষণীয় বিষয় হল জ্ঞানগম্যতা একটি গঠনগত ধারণা হলেও অস্তিত্ব কিন্তু কোন ধারণা নয়। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে এখানে যা অস্তিত্বযোগ্য তা জ্ঞানগম্য একথা বলা হয়নি বরং যা অস্তিত্বশীল তা'ই জ্ঞানগম্য বলা হয়েছে। অধ্যাপক মোহান্তি মনে করেন- পাশ্চাত্য ভাববাদে অস্তিত্বশীলতা এবং প্রত্যক্ষকে অভিন্ন বলে মনে করা হলেও ন্যায়তন্ত্রে অস্তিত্ব ও জ্ঞানগম্যতাকে অভিন্ন বলে মনে করা হয় না; বরং একই সঙ্গে উপস্থিত দুটি সমান্তরাল ঘটনা। এই সমান্তরাল বা সমভাবে ঘটিত হওয়াই প্রমাণ করে অস্তিত্ব এবং জ্ঞানগম্যতা দুটি পৃথক পদার্থ।

আমরা যদি ব্যাপ্তির দিকে তাকাই তাহলে দেখব কার্য থাকলে যেমন কারণ থাকেই ব্যাপ্তি সর্বক্ষেত্রে তেমন সম্বন্ধ নয়। ব্যাপ্তি কোন নিছক যৌক্তিক অনিবার্য সম্বন্ধ নয় বরং এটি একটি সার্বিক সহাবস্থানের সম্বন্ধ। ঠিক তেমনই যা অস্তিত্বশীল তা জ্ঞানগম্য বলা গেলেও তাদের মধ্যে কোন যৌক্তিক অনিবার্য সম্বন্ধ নেই, এটি কেবল একটি ঘটনাগত সম্বন্ধ। কালো বিড়াল আবশ্যিকভাবে কালো হবেই। এটার মধ্যে যৌক্তিক আবশ্যকিতা থাকলেও মানুষের মরণশীল হওয়া যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক নয়, তা ঘটনাগতভাবে আবশ্যিক (factual necessity)। বস্তুর অস্তিত্বশীল হওয়াটা একটি ঘটনা এবং বস্তু কখনোও না কখনোও জ্ঞানের বিষয় হবে এটি অন্য আর একটি ঘটনা। যেমন কোন একটি বস্তু সেটি যে জ্ঞানযোগ্য বিষয় এটা না জেনেও বস্তুটিকে আমরা জানতে পারি। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের বক্তব্য বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁর মতে- প্রথমে আমরা একটি বস্তুকে জানি সেটি একটি ঘটনা এবং সেই বস্তুটি যে জ্ঞানযোগ্য সেটি জানা অন্য আর একটি ঘটনা। বস্তুকে জানা এবং বস্তুকে জ্ঞানগম্য বলে জানা একই ব্যাপার নয়।

এখানে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রমার মতো বিষয়ও অনেক গুলি কারণিক শর্তের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে একটি শর্ত হল বস্তু থাকা। ধরা যাক 'O' একটি বস্তু, এখন 'O' বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্ত গুলির পাশাপাশি 'O' বস্তুটির অস্তিত্বও একটি শর্ত। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে জ্ঞানের উৎপত্তি যেহেতু বস্তু সাপেক্ষ সেহেতু বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যই জ্ঞাননিরপেক্ষ এবং জ্ঞানের পূর্বগামী।

Mohanty, J. N, 2004, "is Nyāya Realism or Idealism", in *Discussion and Debate in Indian Philosophy*, Daya Krisna (ed.), Delhi: Indian Council Of Philosophical Research page- 232.

তাছাড়াও অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য বলেন আমরা যদি নব্য-ন্যায়ের পদার্থ বিন্ন্যাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে সেই পদার্থগুলির মধ্যে অধিকাংশই নিত্য পদার্থ যেমন- ক্ষিত্যাদি ভূত পদার্থের পরমাণু, দিক, কাল, আত্মা প্রভৃতি সকল দ্রব্য পদার্থই নিত্য। সামান্য বা জাতি, সমবায়, বিশেষ এমনকি অত্যন্তাভাবও নিত্য। এখন নিত্য পদার্থ মাত্রই সৃষ্টি-বিনাশ রহিত অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব কোন কিছুর উপরেই নির্ভর করে না। কিন্তু ধর্মগুলি পদার্থের উপরেই নির্ভর করে, পদার্থ ব্যতীত ধর্মগুলি কোথাও অবস্থান করতে পারেনা। কাজেই জ্ঞানগম্যতা এবং নামধেয়তা ধর্ম বিশেষ হওয়ায় তা পদার্থের উপর নির্ভরশীল, পদার্থের অস্তিত্ব কখনোই জ্ঞানগম্যতা বা নামধেয়তার উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। এখন যদি কেউ বলেন যে মানুষ তো সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে না তাহলে জ্ঞানগম্যত্ব বা অভিধেয়ত্ব যে সকল বস্তুর সাধারণ ধর্ম একথা বলা যায় কীভাবে? এর উত্তরে তিনি বলেন কোন ব্যক্তিই সর্বজ্ঞ নয়, কিন্তু সমস্ত সৎ বস্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়। কাজেই সকল পদার্থই যে জ্ঞানের বিষয় হতে পারে অর্থাৎ সকল পদার্থের মধ্যেই যে জ্ঞানগম্যত্ব রয়েছে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এছাড়াও অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন- মুক্তিকালীন অবস্থায় আত্মা চেতনাশূন্য অবস্থাতে অবস্থান করে। কিন্তু জ্ঞানশূন্য অবস্থাতেও আত্মা অনুমানের বিষয় হয়ে পারে। সুতরাং বস্তুস্থিতি কোন ভাবেই জ্ঞানগম্যতার উপর নির্ভর করে না।[7]

উপসংহার: এই প্রবন্ধের অভিমুখ ছিল চিরাচরিত ভাবে প্রচারিত ন্যায়-বৈশেষিকদের বস্তুবাদী বলা যায় কিনা? অধ্যাপক দয়াকৃষ্ণ এবিষয়ে এক গভীর সংশয়ের অবতারণা করলেও বিভিন্ন ভারতীয় পণ্ডিতগণ তার যথাযোগ্য উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন। সে সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে বিচারে রেখে আমার মনে হয়- যোগাচার, যোগ, সাংখ্যমতে জ্ঞান সাকার হলেও ন্যায়মতে জ্ঞান নিরাকার। এখন জ্ঞান যদি নিরাকার হয় তাহলে জ্ঞানের যে আকার তা কখনোই জ্ঞানের নিজের আকার হতে পারে না। কাজেই বাহ্য বস্তুই যে জ্ঞানকে আকার প্রদান করে তা বেশ স্পষ্ট। তাছাড়াও নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত হল জ্ঞান পরপ্রকাশ যা আমাদের বোঝায় জ্ঞান নিজেই নিজেকে উৎপন্ন করতে পারে না তার জন্য বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই নিরাকারবাদ ও পরপ্রকাশবাদ উভয় মতবাদই ন্যায় বস্তুবাদের প্রতি জোরালো সমর্থন জোগায়। আর সকল বস্তুই চেতনা বা জ্ঞানের সম্ভাব্য বিষয় হতে পারে- এই সিদ্ধান্ত কখনোই বস্তুবাদের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কেননা চেতনার বিষয় হওয়া আর চেতনা হয়ে যাওয়া এক বিষয় নয়। সকল জ্ঞানেরই ভ্রান্ত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে, তাই বলে সকল জ্ঞান ভ্রান্ত হতে পারে না। ঠিক তেমনই সকল বস্তু জ্ঞানের বিষয় হওয়ার যোগ্য হলেও বস্তু কখনোই জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে না। জ্ঞানের জালে ধরা পড়ে নি এমন জ্ঞানযোগ্য অজ্ঞাত বস্তুও থাকতে পারে আর তা জ্ঞান নিরপেক্ষ ভাবেই থাকতে পারে। সুতরাং নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদী বলা যায় কিনা এব্যাপারে কিছু বিতর্ক থাকলেও ন্যায় বৈশেষিকদের আধিবিদ্যক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ যে এক ধরণের বস্তুবাদকেই সমর্থন করে তা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে খুবই স্পষ্ট।

Bhattacaryya, Sibajiban, 2004, "Nyāya: Realist or Idealist", in *Discussion and Debate in Indian Philosophy*, Daya Krisna (ed.), Delhi: Indian Council Of Philosophical Research page- 247.

সহায়ক গ্রন্থ:

- মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৬, ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (প্রথম খণ্ড), মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পা.), কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স।
- মিশ্র, শঙ্কর, ১৯৬৯, বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ, শ্রী নারায়ণ মিশ্র (সম্পাঃ), আচার্য দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (ব্যাখ্যাঃ), বারাণসি: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস।
- মিশ্র১৯৬৯,শঙ্কর ,,*বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ* ,(সম্পাঃ) শ্রী নারায়ণ মিশ্র ,আচার্য দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী ,(ব্যাখ্যাঃ)বারাণসি: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস।
- Berkeley, George, 1910, *A Treatise Concerning The Principles of Human Knowledge*, London: The Open Court Publishing Company.
- Chakrabarti, Arindam, 2020, *Realism Interlinked Objects, Subjects, and Other Subjects*, London: Bloomsbury Academic.
- Krishna, Daya, 1991, "*Indian Philosophy: a counter perspective*, New York: Oxford University Press
- Krishna, Daya, 2004, "Is Nyāya Realist or Idealist", in *Discussion and Debate in Indian Philosophy*, Daya Krisna (ed.), Delhi: Indian Council Of Philosophical Research.

ন্যায় মতে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ

সায়ন ভট্টাচার্য্য
গবেষক, দর্শন বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, আবার কেউ কেউ করেন না। ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত মতে শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ, কিন্তু চার্বাক, মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও বৈশেষিকগণের মধ্যে চার্বাক ও বৈশেষিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেননি। চার্বাক মতে শব্দ প্রত্যক্ষপ্রমাণের এবং বৈশেষিক মতে শব্দ অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। আর মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ যেহেতু কোন প্রমাণই স্বীকার করেননি, সেই হেতু শব্দ প্রমাণও তাদের কাছে অস্বীকৃত। এই পত্রটিতে আলোচিত হয়েছে ন্যায় মতে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। এই মতের পূর্বপক্ষী হলেন চার্বাক, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ। এদের মত নৈয়ায়িকদের আকরগ্রন্থ অবলম্বনে যুক্তিপূর্বক খণ্ডিত হয়েছে। পরিশেষে নৈয়ায়িকগণ কেন শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তাও তাদের আকরগ্রন্থ অবলম্বনে এই পত্রে আলোচিত হয়েছে।
সূচক শব্দ: চার্বাক, বৌদ্ধ, বৈশেষিক, ন্যায়, শব্দ, পদপক্ষকানুমান, অর্থপক্ষকানুমান, অনুব্যবসায়।

মূল আলোচনা:

বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতো বৌদ্ধ দার্শনিকগণ শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেননি। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বেদের প্রামাণ্যকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেননি। চার্বাক দর্শনেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত। তবে চার্বাক ও বৈশেষিকদের সাথে শূন্যবাদী বৌদ্ধদের পার্থক্য হ'ল শূন্যবাদী বৌদ্ধরা কোন প্রমাণই স্বীকার করেননি, শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করা তো দূরের কথা। শূন্যবাদী বৌদ্ধরা যেহেতু প্রমাণের প্রামাণ্যই স্বীকার করেননি, তাই তারা অপ্রামাণ্যবাদী নামে পরিচিত, কিন্তু চার্বাক ও বৈশেষিকগণ প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করায় তারা প্রামাণ্যবাদী, অপ্রামাণ্য বাদী নন; তবে শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ ছাড়া বাকি যোগাচার, বৈভাষিক ও সৌত্রান্ত্রিক বৌদ্ধগণ প্রমাণ স্বীকার করেছেন, তাই তারা প্রামাণ্যবাদী। চার্বাক ও বৈশেষিকগণের মতো শূন্যবাদী বৌদ্ধ ছাড়া বাকি বৌদ্ধগণ শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেননি। বাকি আস্তিক, নাস্তিক সকল ভারতীয় দার্শনিকগণ শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। আলোচ্য পত্রে দেখানো হবে নৈয়ায়িকগণ কীভাবে চার্বাক, বৌদ্ধ ও বৈশেষিকদের মত খণ্ডনপূর্বক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে চার্বাক দর্শনের সূত্রপাত ঘটলেও দুঃখের বিষয় হল যে চার্বাক দর্শন সম্পর্কে প্রামাণিক কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ের আকর গ্রন্থে পূর্বপক্ষীরূপে চার্বাক মতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে অস্বীকার করার পশ্চাতে চার্বাকরা যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন সেগুলি পূর্বপক্ষ হিসাবে নৈয়ায়িকদের আকর গ্রন্থসমূহে উপস্থাপিত হয়েছে। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, তাদের মতে শব্দ প্রত্যক্ষের অন্তর্গত, একে তারা ঔপনায়িক প্রত্যক্ষ বলেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট তার *ন্যায়মঞ্জরী* গ্রন্থে বলেছেন প্রাতিভ জ্ঞান একপ্রকার প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ প্রভৃতি

ব্যতিরেকে যে জ্ঞান তা-ই প্রাতিভ জ্ঞান। জয়ন্তভট্ট বলেছেন যখন এরূপ একটি যথার্থ সফল জ্ঞান হয় যে 'আগামীকাল আমার ভাই আসবে' এরকম অনাগত বিষয়ক যে জ্ঞান দেখা যায় সেটিই প্রাতিভ প্রমাণ, সেখানে তো বিষয়ের সাথে কোন ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ইত্যাদি থাকে না, তবু তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বলা হয়। অনুরূপভাবে চার্বাকগণ বলতে পারেন যে শব্দ প্রমাণকে একধরনের প্রত্যক্ষ বললে তো কোন ক্ষতি হয়না, যদিও তা বিষয়ের জ্ঞানে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে অপেক্ষা করে না। ন্যায় দর্শনে লৌকিক ও অলৌকিক দুপ্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়েছে। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়েছে, অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়েছে। অলৌকিক সন্নিকর্ষের অন্যতম হল জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ। 'সুরভি চন্দনং পশ্যামি' এটি একপ্রকার জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ জনিত উৎপন্ন হয়। জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* গ্রন্থে পূর্বপক্ষী চার্বাকের মতকে এই ভাবে উপস্থাপনা করেছেন, 'শব্দ যদি নিজ অর্থ বিষয়ক অনুভবের জনক হয়, তাহলে তা ঔপনায়িক প্রত্যক্ষ রূপ অনুভবের জনক হোক' অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষের জনক হোক। উপনয় কথার অর্থ জ্ঞানলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ জনিত প্রত্যক্ষ হয় বলে তা ঔপনায়িক প্রত্যক্ষ বলা হয়। গঙ্গাধর কর মহাশয় তাঁর '*শব্দশক্তিপ্রকাশিকা শব্দপ্রামাণ্য নিরূপণম*' গ্রন্থে একথার তাৎপর্য এই ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন 'লৌকিক প্রত্যক্ষে শব্দের কোন উপযোগিতা নেই, আবার অতীন্দ্রিয়ার্থবোধক শব্দ স্থলে লৌকিক প্রত্যক্ষের সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং শব্দ স্বকীয় অর্থবিষয়ক অনুভবের হেতু হলে তা কেবল অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষরূপ অনুভবেরই জনক হবে। অভিপ্রায় এই যে, শাব্দবোধের পূর্বে বৃত্তিমৎপদজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতি নিয়মিতভাবেই শাব্দবোধের ব্যাপাররূপে অপেক্ষিত হয়। এই পদার্থোপস্থিতি হল পদার্থের স্মৃতি। উপনয়সন্নিকর্ষ অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্মৃতিস্বরূপ হওয়ায় এতাদৃশ পদার্থোপস্থিতিকে উপনয়সন্নিকর্ষ-রূপে (ব্যাপাররূপ কারণরূপে) স্বীকার করে শাব্দবোধ বা অন্বয়বোধকে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষরূপে স্বীকার করা হোক'। চার্বাকের এই মত খন্ডনার্থে জগদীশ বলেছেন শাব্দবোধকে কোনভাবে ঔপনায়িক প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, যেহেতু আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আসত্তিজ্ঞান প্রভৃতি যেগুলি শাব্দবোধের জন্য অপরিহার্য সেগুলির ঔপনায়িক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোন উপযোগিতাই নেই। তাছাড়াও *শব্দশক্তিপ্রকাশিকার* ভাষ্য *কৃষ্ণকান্তিতে* লেখক কৃষ্ণকান্ত বলেন অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে লৌকিক প্রত্যক্ষ আবশ্যক। 'সুরভি চন্দনং পশ্যামি' – এই জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যক্ষ স্থলে চন্দনের যে প্রত্যক্ষ তা লৌকিক, চন্দনের লৌকিক প্রত্যক্ষ না হলে চন্দন কাঠের সৌরভের জ্ঞান হত না। তবে শাব্দবোধের ক্ষেত্রে এরূপ কোন কিছু থাকে না যার লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে শব্দপ্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য পত্রের শুরুতেই বলা হয়েছে যে অপ্রামাণ্যবাদী শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ কোন প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার না করলেও যোগাচার,বৈভাষিক ও সৌত্রান্ত্রিক বৌদ্ধগণ প্রমাণ স্বীকার করেন। তবে তাদের মতে প্রমাণ দুটি – প্রত্যক্ষ ও অনুমান। যেহেতু তারা প্রমাণ ব্যবস্থাবাদী। স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ বস্তুভেদে প্রমাণ নির্দিষ্ট। স্বলক্ষণ বস্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য এবং সামান্যলক্ষণ বস্তু অনুমান প্রমাণগম্য। বৌদ্ধ দর্শনে শব্দ প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে, তবে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে নয়, বৌদ্ধ দর্শনে শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণ থেকে স্বতন্ত্র রূপে স্বীকৃত নয়।

বৌদ্ধ দর্শন মতে অনুমান দুই প্রকার – স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। যখন নিজের জ্ঞানের জন্য অনুমান করা হয় তখন তা স্বার্থানুমান এবং অপরের জ্ঞান লাভের জন্য যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে পরার্থানুমান বলে। এই দুটি অনুমানের স্বরূপ যেহেতু সম্পূর্ণ ভিন্ন, একটি জ্ঞানের আকার জ্ঞাতার নিজের মধ্যে থাকে এবং অপরটি বাক্য প্রয়োগ করে অপরকে বোঝানো হয়, এজন্য এখানে অনুমানের কোন সাধারণ লক্ষণ দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধ দর্শনে দুধরনের জ্ঞান স্বীকার করা হয়, যথা নির্বিকল্পক জ্ঞান ও সবিকল্পক জ্ঞান। প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সর্বদা নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক হল অনুমানাত্মক। স্বলক্ষণ বস্তুর জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক এবং তা নির্বিকল্পকজ্ঞান। স্বলক্ষণ বস্তু হল তা-ই যা অর্থক্রিয়াকারী। সামান্যলক্ষণ বস্তু অর্থক্রিয়াকারী নয়, তা কাল্পনিক। বস্তুর নিজস্ব যোগ্যতায় এবং ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে বস্তুস্বরূপের যে জ্ঞান তা প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় সম্ভব হয়, এই যে বিশুদ্ধ সংবেদন যা নিজ স্বরূপে যথার্থ। যখনই একটি ইন্দ্রিয় একটি বস্তুর সংস্পর্শে এসে জ্ঞান হওয়ার উপযুক্ত হয়, তখনই বস্তুর নিজস্ব স্বরূপের জ্ঞান হয়। সেখানে নাম, জাতি ইত্যাদি আরোপিত হয় না। বৌদ্ধ তাত্ত্বিকগণের মতে এই বিশুদ্ধ সংবেদন প্রত্যক্ষের ফল। পরে এই বিশুদ্ধ সংবেদনের উপর নাম, জাতি ইত্যাদি আরোপ করে নিজের জন্য যখন জ্ঞান হয় তা স্বার্থানুমান, অপরের জন্য বাক্য ব্যবহার করে যে অনুমান তা পরার্থানুমান। ব্যবহারিক প্রয়োজনে যে অনুমান হয় তার যথার্থতা নিয়ে বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

শান্তরক্ষিত তাঁর বিখ্যাত *তত্ত্বসংগ্রহ* গ্রন্থে যেমন শব্দ প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন, দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তি বলেছেন যে, শব্দপ্রমাণ অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভূক্ত। ধর্মকীর্তি খুব স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে একটি বিশেষ বস্তুর অনুমিতি জ্ঞানের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং সেই বিশেষ বস্তুর শাব্দবোধের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যুগপৎ উপস্থিত থাকলে উক্ত জ্ঞান অনুমিতি জ্ঞান বলেই বিবেচিত হবে। তবে বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে উৎপাদক সামগ্রীর সামর্থ্যের বিচার প্রসঙ্গে সাধারণ নিয়ম হ'ল যে, শব্দ প্রমাণের উৎপাদকসামগ্রী অন্য প্রমাণের উৎপাদকসামগ্রী অপেক্ষা বলবান কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাথে সম্বদ্ধ উৎপাদকসামগ্রী ছাড়া। তবে ধর্মকীর্তির কথা উক্ত সাধারণ নিয়ম থেকে ভিন্ন, ধর্মকীর্তি সুস্পষ্ট ভাবে বলেন যে এই সাধারণ নিয়ম অনুমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অনুমানের প্রক্রিয়া শব্দ প্রমাণের প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। সুতরাং শব্দ অনুমান থেকে স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।

বৈশেষিক চিন্তাবিদ্‌রা আরও বলেন শব্দের স্বতন্ত্র প্রমাণ হবার যোগ্যতা নেই। শ্রীধরাচার্য তাঁর *ন্যায়কন্দলীতে* বলেছেন শব্দ প্রমাণের পদ্ধতি অনুমান প্রমাণের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন নয়। অনুমিতি জ্ঞান হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, শাব্দবোধও শব্দ এবং অর্থের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। শব্দ যেন হেতু হিসাবে কাজ করে এবং শব্দের অর্থ সাধ্য হিসাবে কাজ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য হল উদয়ন তাঁর *কিরণাবলীতে* দুটি অনুমানের সাহায্যে বৈশেষিক মতকে সমর্থন করেছেন। প্রথম অনুমানের পক্ষ হল অর্থ, হেতু পদস্মরিতত্ব এবং সাধ্য হল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। এই অনুমানটিকে বলা হয় অর্থপক্ষকানুমান। দ্বিতীয় অনুমানের পক্ষ হল পদ, হেতু হল পদের দ্বারা নির্দেশিত অর্থের স্মরণের যোগ্যতা এবং সাধ্য হ'ল পদ- পদার্থের সম্বন্ধের পূর্বজ্ঞান। দ্বিতীয় অনুমানটিকে বলা হয় পদপক্ষকানুমান। বৈশেষিকরা দাবী করেন যে এই দুটি অনুমান এরূপ সিদ্ধান্তকে জোরালো করে যে শব্দও অনুমান প্রমাণ থেকে স্বতন্ত্র নয়।

ন্যায় দার্শনিকগণ বৈশেষিক দার্শনিকগণের উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছেন। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে স্মৃতির সাথে সাদৃশ্য দেখিয়ে শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণ ছাড়া কিছু নয় এরূপ সিদ্ধান্ত বৈশেষিকগণ করে থাকেন। নৈয়ায়িকগণের বক্তব্য হল উপমানের পদ্ধতিতে স্মৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে। *ন্যায়বার্ত্তিকে* উদ্দ্যোতকর বলেছেন যে শব্দ প্রমাণের পদ্ধতি অনুমান প্রমাণের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শব্দ মাত্রেই কোন বাস্তব বস্তুকে নির্দেশ করে না। আপ্তব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত শব্দগুলি অর্থের সাথে পারস্পরিক সম্বদ্ধ প্রকৃত ধারণাসমূহকে নির্দেশ করে। তার থেকে বস্তুর সঠিক প্রত্যয় হয়, অন্যদিকে যে ব্যক্তি প্রতারক বা প্রবঞ্চক সে বেঠিক ধারণাগুলিকে নির্দেশ করে। পদজ্ঞান যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তা প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না। জগদীশ তাঁর *শব্দশক্তিপ্রকাশিকাতে* অকাট্য যুক্তির দ্বারা বৈশেষিক দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে 'গৌর্স্তি' – এই বাক্য 'গৌর্স্তিত্ববান অস্তিত্বযোগ্যত্ববত্ত্বাৎ' – এর মত অর্থপক্ষকানুমানের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয় না। অস্তিত্যযোগ্যত্ব হেতুর দ্বারা যদি ব্যক্তি গরুর অস্তিত্ব অনুমান করা হয় তাহলে অনুমানটি সিদ্ধসাধন দোষে দুষ্ট হবে। সিদ্ধ বস্তুর পুনরায় সাধনকে সিদ্ধসাধন বলে। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে সিদ্ধসাধন দোষের। ফলস্বরূপ অনুমিৎসা না থাকলে অনুমিতি জ্ঞান সম্ভব হবে না। তিনি আরও যুক্তি দেন যে 'গৌর্স্তি' -এই বাক্যে 'গৌর্স্তিত্ববান আকাঙ্ক্ষাবত্ত্বাৎ' – এর মত অর্থপক্ষকানুমানের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে উৎপন্ন না হওয়ার কারণ হল ন্যায় মতে আকাঙ্ক্ষা থাকে পদে, অর্থে নয়। বৈশেষিক দর্শনে কেউ কেউ বলেন সেই অর্থকে অনুমান করা হয় 'যোগ্যতা যাকে আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বিশেষিত করে' এরূপ হেতুর দ্বারা অথবা 'আকাঙ্ক্ষা যাকে যোগ্যতার দ্বারা বিশেষিত করে' এরূপ হেতুর দ্বারা। জগদীশ এর উত্তরে বলেন যে এটি একপ্রকার অবাস্তব কল্পনা। বৈশেষিক স্বীকৃত হেতু অপরিচিতি দোষে দুষ্ট। এভাবে নব্য নৈয়ায়িকগণ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে শব্দপ্রমাণ অনুমান প্রমাণের দ্বারা বোধগম্য হয়না।

নৈয়ায়িকরা দৃঢ়তার সাথে বলেন যে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধের সাথে পদ ও তার অর্থের সম্বন্ধ এক নয়। ধূম ও বহ্নির মধ্যে সম্বন্ধ হল স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক, যেখানে পদ ও তার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক নয়, পদ-পদার্থের সম্বন্ধ হল ঈশ্বরের ইচ্ছা বা কোন ব্যক্তির ইচ্ছা। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট বলেন যে শাব্দবোধের জন্য সামগ্রীর বিষয়টি অত্যাবশ্যক এবং অনুমিতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুমিতির ক্ষেত্রে পক্ষ বিশেষ্য হওয়ায় তা প্রথমে জানা যায় এবং সাধ্য বিশেষণ হওয়ায় তা পরে জানা যায়। কিন্তু শাব্দবোধের ক্ষেত্রে বিশেষণের জ্ঞান প্রথমে প্রতিভাত হয় এবং এটি বিশেষ্যের জ্ঞানের দ্বারা অনুসৃত হয়। পদ ও তার অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ শাব্দবোধের বিষয়। কিন্তু হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ অনুমিতি জ্ঞানের বিষয় হয় না। সর্বোপরি ন্যায় জ্ঞানতত্ত্বে কোন জ্ঞানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় অনুব্যবসায়ের দ্বারা। অনুমিতির ক্ষেত্রে অনুব্যবসায়ের আকার হল "আমি গরুর অস্তিত্ব অনুমান করি (অনুমিনোমি)" আর শাব্দবোধের ক্ষেত্রে অনুব্যবসায়ের আকার হল "আমি 'গো' পদের অর্থ বোধ করি (শাব্দয়ামি)"। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে নৈয়ায়িকরা বলেন যে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ।

ভারতীয় দর্শনের আস্তিক-নাস্তিকভেদে সকল দর্শন সম্প্রদায় প্রমেয় বস্তুর সিদ্ধির জন্য প্রমাণ স্বীকার করেছেন। তবে প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন, তবে অন্য প্রমাণ যেমন শব্দ প্রমাণ অস্বীকার

করেননি, শব্দ প্রমাণকে ঔপনায়িক প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধ ছাড়া বাকি বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেননি। তাদের মতে শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। বৈশেষিক সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য টীকা *কিরণাবলী, ন্যায়কন্দলী* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে দেখানো হয়েছে শব্দ অনুমান ছাড়া স্বতন্ত্র প্রমাণ হতে পারে না। আলোচ্য পত্রে এসকল বিষয় সবিস্তারে আলোচনার পর নৈয়ায়িকগণ পূর্বপক্ষীর মত খণ্ডন পূর্বক বলেছেন তাঁদের মতে অনুব্যবসায়ের দ্বারা কোন জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। শাব্দবোধের ক্ষেত্রে অনুব্যবসায়ের আকার হল -"আমি 'গো' পদের অর্থ বোধ করি (শাব্দয়ামি)"। এভাবে ন্যায় মতে সিদ্ধ হয় যে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ।

তথ্যসূত্র:

১. অনাগতজ্ঞানমস্মদাদেরপি ক্বচিৎ।
প্রমাণং প্রাতিভং শ্বো মে ভ্রাতাগন্তেতি দৃশ্যতে।ন্যায়মঞ্জরী,২য় আহ্নিক, পৃ.৩৬২ সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ সম্পাদিত, সদেশ প্রকাশনা, কলকাতা (২০১৫)

২. অথ শব্দো যদি স্বার্থস্যানুভবে ভবেদ্ধেতুঃ প্রাত্যক্ষিক এবৌপনায়িকে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, পৃ.১১শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য সম্পাদিত ও অনূদিত, মহাবধি বুক এজেন্সী প্রকাশনা, কলকাতা(২০১৪)

৩. শব্দশক্তিপ্রকাশিকা শব্দপ্রামাণ্যনিরূপণম্,শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, পৃ.১২-১৩, মহাবধি বুক এজেন্সী প্রকাশনা, কলকাতা(২০১৪)

৪. তত্র নাকাঙ্ক্ষাদ্যুপযোগঃ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, পৃ.১১, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য সম্পাদিত ও অনূদিত, মহাবধি বুক এজেন্সী প্রকাশনা, কলকাতা(২০১৪)

৫. লৌকিকপ্রত্যক্ষে শব্দস্যানুপয়োগোৎ, অতীন্দ্রিয়স্থলে তদসম্ভভাচ্চ, তদেব, কৃষ্ণকান্তি, পৃ ৫/১৮, কাশী সংস্কৃত সিরিজ, নং. ১০৯, ন্যায় সেকশনঃ১৫, বেনারস(১৯৩৪)

৬. তত্রা'নুমানম এব' দং বৌদ্ধৈঃ বৈশেষিকঃ শ্রিতম্ - মীমাংসাসূত্র ১.১.৫, শ্লোকবার্তিক ১৫ক, প্রাচ্যভারতীসিরিজ ১০, তারা প্রকাশনা, বেনারস(১৯৭৮)

৭. শব্দো'নুমানং ব্যাপ্তিবলেনর্থপ্রতিপাদকত্বাৎ ধূমবৎ, ন্যায়কন্দলী, পৃ.৫১২/১৯, দূর্গাধর ঝা, গঙ্গানাথ ঝা গ্রন্থমালা, বেনারস(১৯৭৭)

৮. তথাপ্যাকঙ্ক্ষাদিমদ্ভিঃ পদৈঃ স্মরিতত্বাৎ 'গমভ্যজ ইতি পদার্থত্বাৎ ইতি স্যাৎ, কিরণাবলী, গুণপ্রকরণ, পৃ.২০৪, জে.এস.জেটলি, গোয়েক্যাদাস ওরিয়েন্টাল সিরিজ, নং১৫৪, বরোদা(১৯৭১)

৯. ন চ বিশেষ সিদ্ধির্দোষঃ সংসর্গস্য সংসৃজ্যমানবিশেষাপেক্ষত্বাৎ বা বিশিষ্টবৎ, তদেব

১০. যদিদং ভবত'ভিধিয়তে ... তস্য সধর্ম্যমিতি, ন্যায়সূত্র ২.১.৫৪, ন্যায়বার্তিক,পৃ,৫৪২/১১,১২, তারানাথ ন্যায় তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত, মুন্সিরাম মনোহরলাল, দিল্লি(১৯৮৫)

১১. আপ্তোপদেশসমর্থচ্ছব্দাৎ অর্থে সম্প্রত্যয়ঃ, ন্যায়সূত্র ২.১.৫২, তদেব।

১২. গৌর্স্তিত্ববান অস্তিত্বযোগ্যত্ববত্ত্বাদ্...সাধ্যবিশেষঃ, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,শ্লো ৪, কৃষ্ণকান্তি, পৃ.১১/১২-১৪, কাশী সংস্কৃত সিরিজ, নংঃ১০৯, ন্যায় সেকশনঃ১৫, বেনারস(১৯৩৪)

১৩. তথা চ গৌর্স্তিত্ববান আকাঙ্ক্ষাবত্ত্বাদ্... ন অনুমপকত্বম্, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, প্রবোধিনী, পৃ.১২-১৩, ধুন্ধিরাজ শাস্ত্রী, কাশী সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস(১৯৩৪)

১৪. যোগ্যতার্থ... লিঙ্গমসিদ্ধিতঃ,শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শ্লো ৪, পৃ.১১/১২-১৪, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, পৃ.১২-১৩, মহাবধি বুক এজেন্সী প্রকাশনা, কলকাতা(২০১৪)

১৫ পদস্যত্তু সম্বন্ধধী... ভিন্নত্বম্, ন্যায়মঞ্জরী, পৃ.১৪০/৯-১০, সূর্যনারায়ণ শুক্লা সম্পাদিত, কাশী সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস(১৯৩৬)

১৬. তস্মদন্যো... প্রতীত্যঙ্গম্, তদেব, পৃ.১৪২/১১-১২।

ব্যবহারিক জীবনে পঞ্চশীল ও ব্রহ্মবিহারের গুরুত্ব

ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার
গবেষক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার: মানব জীবনের প্রতি সুষ্টভাবে দৃষ্টিপাত করলে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব খুব সহজেই জানা যায়। যুগ যুগ ধরেই এই দুঃখ বিষয়ে মানব জিজ্ঞাসা বর্তমান। জীবনকালে মানুষের যেভাবে শারীরিক ও মানসিক গঠনে পরিবর্তন সাধিত হয়, দুঃখের স্বরূপেরও সেরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দুঃখের এই বিবিধরূপকে বৌদ্ধ দর্শনে এভাবে সাজানো হয়েছে — জন্ম-দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, জরা দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ, ঈপ্সিত-অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং পঞ্চোপাদানস্কন্ধ দুঃখ। বুদ্ধ এই সকল দুঃখ থেকে নিবৃত্তির পথের সন্ধান দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। এই পথের সন্ধানে তিনি জ্ঞান ও কর্মের সংমিশ্রিত ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’এর কথা বলেন। এই মার্গের বিভিন্ন ক্রমগুলি হল — ১. সম্যক্ দৃষ্টি, ২. সম্যক্ সংকল্প, ৩. সম্যক্ বাক, ৪. সম্যক্ কর্মান্ত, ৫. সম্যক আজীব, ৬. সম্যক্ ব্যায়াম, ৭. সম্যক্ স্মৃতি ও ৮. সম্যক্ সমাধি। তবে এই মার্গটি একজন আশ্রম নিবাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ষে যথাযথ মেনে চলা সম্ভব হলেও সকল সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষে এই মার্গটি সঠিকভাবে মেনে চলা কঠিন। তাই এই মার্গের প্রস্তুতিপর্বরূপে বৌদ্ধদর্শনে পঞ্চশীল ও ব্রহ্মবিহারের ধারণার কথা বলা হয়েছে, যা ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে মার্গের পক্ষে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। এই দুটির মাধ্যমে মার্গের ক্ষেত্র যেমন প্রস্তুত হয়, তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও এদের প্রভাব অনস্বীকার্য। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টির ওপরই বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।
মূল শব্দ: দুঃখ, ঈপ্সিত-অপ্রাপ্তি, শীল, ব্রহ্মবিহার, ভাবনা।

মূল আলোচনা:

‘আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন’

দুঃখের আনাগোনার মধ্য দিয়েই মানব জীবন অতিবাহিত হয়। কেবল কোন একটি নির্দিষ্ট সময়েই দুঃখ মানব জীবনের অংশ হয় না, জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত সময় জুড়েই মানব জীবনে কোন না কোন ভাবে, কোন না কোন আকারে দুঃখ জড়িত থাকে। মানব জীবনের প্রতি সুষ্টভাবে দৃষ্টিপাত করলে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব খুব সহজেই জানা যায়। নিজ স্বভাববশেই দুঃখ আসে, জীবন জর্জরিত হয়। যুগ যুগ ধরেই এই দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের কারণ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বিষয়ে মানব জিজ্ঞাসা বর্তমান। দর্শনের মধ্যযুগে এই জিজ্ঞাসাকে সঙ্গী করেই সিদ্ধার্থ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও জ্ঞানানুশীলনের মধ্য দিয়ে বোধিসত্ত্ব প্রাপ্ত হন ও ‘বুদ্ধ’ হয়ে ওঠেন। গৌতম বুদ্ধ সন্ধান দিয়েছেন — দুঃখ যে কেবল সময় বিশেষে আসে — তা নয়, জন্মলগ্ন থেকেই দুঃখ আমাদের সাথে সাথেই বার্ধক্যে পৌঁছায়। জীবনকালে মানুষের যেভাবে শারীরিক ও মানসিক গঠনে পরিবর্তন সাধিত হয়, দুঃখের স্বরূপেরও সেরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দুঃখের এই বিবিধরূপকে বৌদ্ধ দর্শনে এভাবে সাজানো হয়েছে – জন্ম-দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, জরা দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ, ঈপ্সিত-অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং পঞ্চোপাদানস্কন্ধ দুঃখ।

জন্ম দুঃখ কি?

সাধারণ অর্থে মাতৃগর্ভ হতে জাত হওয়ার ক্ষণই হল জন্ম। জন্মকে একটি প্রক্রিয়ারূপে গ্রহণ করলে মাতৃগর্ভে অঙ্কুরিত অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সমগ্রকেই জন্ম বলতে হয়। জন্ম থেকেই কোনো ব্যক্তি অনাবিল আনন্দে আছে বা থেকেছে – এরূপ দৃষ্টান্ত ধরাধামে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আসলে মানুষের জন্মের প্রক্রিয়াতেই লুকিয়ে আছে দুঃখের বীজ। একটি ভ্রূণ মাতৃগর্ভে, যেখানে কোন আলো-বাতাস নেই, সেখানে নয়মাস থেকে দশমাস পর্যন্ত অবস্থান করে। এই অবস্থায় তার জীবন তার হাতে থাকে না, সে সম্পূর্ণরূপে অসহায়, মায়ের পরম করুণা ও অশেষ মমতার ওপরই তাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। এই অবস্থায় কর্মেন্দ্রিয় সকল ও জ্ঞানন্দ্রিয় সকল থাকলেও সেগুলি নিজ নিজ কর্ম থেকে বিরত থাকে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে পূর্বসঞ্চিত কর্মের ফলে এই অবস্থায় মৃত্যুও ঘটতে পারে অথবা ইন্দ্রিয়ের হানও ঘটতে পারে। ফলে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই দুঃখ আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক এতটাই শক্তিশালী যে, আজীবনকাল এই সম্পর্কের ভার নিয়েই আমাদের চলতে হয়।

ব্যাধি দুঃখ কি?

শরীর হল ব্যাধির মন্দির। মানব শরীর থাকলে, তা যে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবে — তা স্বীকৃত সত্য। ব্যাধির প্রকারভেদের কোন সংখ্যা নির্ধারণ অসম্ভব। শৈশব কাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানব শরীর যে কতপ্রকার ব্যাধির শিকার হয়, তা গনণা করা অসম্ভব। ব্যক্তি ভেদে ব্যাধির ভেদ স্বীকৃত হলেও ব্যাধি মুক্ত মানুষ পাওয়া দুষ্কর। কোন ব্যক্তি শৈশবে, কোন ব্যক্তি যৌবনে অথবা কোন ব্যক্তি বার্ধক্যে নানান ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এমনকি এর ফলে ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সাধারণ মানুষ তো ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হবে স্বাভাবিক, মহামানবগণও ব্যাধি মুক্ত ছিলেন না। স্বয়ং বুদ্ধদেবও শরীর সংযুক্ত অবস্থায় নানান ব্যাধির শিকার হয়েছিলেন, এমনকি রক্তামাশা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

জরা দুঃখ কি?

পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত শরীর যতদিন আছে, তার সাথে সাথে জীর্ণতা, সূক্ষ্মতা, শিথিলতা অবশ্যম্ভবী হিসাবে ততদিন থাকবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কালক্রমে শরীরের ভাঙন, শারীরিক শিথিলতা জনিত দুঃখই হল জরা দুঃখ। জরাগ্রস্থ ব্যক্তির পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়; চোখের দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে, কানের শ্রবণশক্তি কমে যায়, নাকের গন্ধ গ্রহণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, জিভের রসাস্বাদন ক্ষমতা কমে যায়, দেহের অংশবিশেষ ক্ষয়িত হয়। এরূপ অবস্থায় মানুষের কোমলকান্তি নিঃশেষিত হয়, যৌবনের রূপ ধ্বংস হয় এবং এতে করে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথগামীও হয়ে থাকে। জন্ম থাকলে মৃত্যু যেমন সত্য রূপে ধরা দেয়, সেরূপ জরাও সত্য রূপে ধরা দেয়। কোন ব্যক্তিই এই জরা থেকে নিষ্কৃতি পায় না। জরাগ্রস্থ ব্যক্তি এতটাই অসহায় হয় যে, নিজ হাত-পা তার নিজের বসে থাকে না, এমনকি ইন্দ্রিয়সুখ-বর্ধক বিষয় তার সম্মুখে থাকলেও সে তা উপভোগ করতে পারে না। এরকম অবস্থায় সে নিজেই নিজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করে।

মৃত্যু দুঃখ কি?

'জন্মালে মরিতে হবে...' এই ধ্রুব সত্য জানা সত্ত্বেও মৃত্যু আমাদের কাছে দুঃখ রূপেই ধরা দেয়। এখন প্রশ্ন হল — মৃত্যু কি? বুদ্ধের কথা অনুসারে, মৃত্যু হল পঞ্চস্কন্ধের ভেদ অর্থাৎ মৃত্যুতে পঞ্চস্কন্ধের সংঘাত বিনষ্ট হয়। মৃত্যু থেকে কোন ব্যক্তি পালাতে পারে না। যে মানুষ

জন্মগ্রহণ করেছে, সেই ব্যক্তিকে অবশ্যম্ভাবী রূপে মৃত্যু বরণ করতেই হবে। এই মৃত্যু আমাদের নিকট দুঃখজনক রূপে ধরা দেয়। মানুষ সাধারণত জীবিত অবস্থায় জাগতিক বিষয়ের ভোগে লিপ্ত থাকে। মৃত্যু সেই ভোগ থেকে তাকে বিযুক্ত করে। কোনো ব্যক্তিই জীবিত অবস্থায় সঞ্চিত তার ধনদৌলত সহজেই হাত ছাড়া করতে চায় না। কিন্তু মৃত্যু একনিমেষে তার থেকে সমস্তই কেড়ে নেয়। ফলে মৃত্যু ব্যক্তির কাছে দুঃখজনক হয়ে ওঠে। আবার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা দুঃখজনক হওয়ায় মৃত্যুকেও দুঃখজনক বলতে হয়।

অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ কি?

বস্তু অথবা ব্যক্তি সকলের মধ্যে যা কিছু অপ্রিয়, সেসকলের সঙ্গে সংযোগের ফলে মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধদেবের ভাষায় — যে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ অপ্রিয় এবং যা কিছু অহিতকর, অপ্রয়োজনীয়, সুখহননকারী সেই সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ ঘটলে মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই দুঃখের অভিজ্ঞতা জগতের সকল মানুষের হয়ে থাকে।

প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ কি?

বস্তু অথবা ব্যক্তি সকলের মধ্যে যা কিছু প্রিয়, তা থেকে বিযুক্ত হলেও মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। যেসকল রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ মনে প্রিয়ভাব উৎপন্ন করে এবং যে সকল বিষয় প্রয়োজনীয়, হিতকর, সুখবর্ধক, সেসকল প্রীতিকর বিষয় থেকে বিয়োগের ফলে মানসিক পীড়া বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। ব্যক্তির সারাজীবনে এরূপ প্রিয় বিয়োগের অনুভূতি বহুবার হয়ে থাকে। এর ফলে উৎপন্ন মানসিক যন্ত্রণার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

ঈপ্সিত-অপ্রাপ্তি দুঃখ কি?

কোন ব্যক্তির ঈপ্সিত বিষয় অর্থাৎ ব্যক্তি যে বিষয়কে ইচ্ছা করে, সেই বিষয়টির অপ্রাপ্তির ফলে তার মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। ব্যক্তি যা চায় তা সর্বদা পায় না, তার কামনা পরিতৃপ্তিতে ব্যর্থ হয়, এই না পাওয়া ও ব্যর্থতাই ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। মানুষ সারাজীবনে অসংখ্যবার এরূপ অপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সাধারণ মানুষ কখনো মৃত্যুবরণ করতে চায় না, জরা ভোগ করতে চায় না, যেকোন প্রকার দুঃখ ভোগ করতে চায় না, কিন্তু তাকে তা অবশ্যম্ভাবী রূপে ভোগ করতেই হয়। আবার জন্মাধীন সত্ত্বসম্পন্ন ব্যক্তিও জন্মের বন্ধন ভোগ করতে চায় না, তবুও তাকে তা ভোগ করতে হয়। অতএব, কোন ব্যক্তির এরূপ দুঃখ থেকে পরিত্রাণের কোন সম্ভবনা নেই।

পঞ্চোপাদানস্কন্ধ দুঃখ কি?

বৌদ্ধ দর্শনে পঞ্চোপাদান স্কন্ধ হল — রূপোপাদান স্কন্ধ, বেদনাপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞোপাদান স্কন্ধ, সংস্কারোপাদান স্কন্ধ ও বিজ্ঞানোপাদান স্কন্ধ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এবং এদের বিকারজিত রূপের সমষ্টিকেই রূপস্কন্ধ বলা হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সান্নিধ্যের ফলে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হল বেদনাস্কন্ধ। বিষয়ানুভূতির ফলে উৎপন্ন বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা হল সংজ্ঞাস্কন্ধ। কুশল ও অকুশল মনোবৃত্তিকে একত্রে সংস্কারস্কন্ধ বলে। মানসিক বৃত্তিসমূহের আধাররূপ বিজ্ঞানকেই বিজ্ঞানস্কন্ধ বলে। এই পঞ্চোপাদান দ্বারাই মানুষের জৈবশরীর গঠিত। মূলত, পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়কেই 'জীবন' বলা হয়। এই স্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয় হয়ে মানব জীবনে আশ্রয় করে তখন তা স্কন্ধোপাদান নামে পরিচিত হয়। এই পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে রূপস্কন্ধকে 'রূপ' ও বেদনাদি চারটি স্কন্ধকে একত্রে 'নাম' বলা হয় এবং পঞ্চস্কন্ধকে নামরূপও বলা হয়ে থাকে। এই নাম ও রূপ এককভাবে কোন কর্ম করতে পারে না। দুটি পরস্পর সম্মিলিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে। যাকে মানুষ 'জীব' বলে নির্দেশ করে থাকে। এই নামরূপ সমন্বিত সংসার

অনবচ্ছিন্নভাবে দুঃখময়। কেননা, মানুষ অবিদ্যার বশবর্তী হয়ে নিজেকে 'জীব' রূপে কল্পনা করে, নিজেকে 'কর্তা' ভেবে সুখের সন্ধানে বাহ্যজগতে ধাবিত হয় এবং সুখ-দুঃখ নির্বিশেষে দুঃখেরই সাক্ষাৎ পায়।

এই সকল দুঃখের বর্ণনা থেকে জীবনের প্রতিটি অংশে দুঃখের অবস্থান স্পষ্ট হয়। এই দুঃখ নিবৃত্তির পথের সন্ধান দিতে গিয়েই বুদ্ধদেব জ্ঞান ও কর্মের সংমিশ্রিত 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'এর কথা বলেন। এই মার্গের বিভিন্ন ক্রমগুলি হল — ১. সম্যক্ দৃষ্টি, ২. সম্যক্ সংকল্প, ৩. সম্যক্ বাক, ৪. সম্যক্ কর্মান্ত, ৫. সম্যক আজীব, ৬. সম্যক্ ব্যায়াম, ৭. সম্যক্ স্মৃতি ও ৮. সম্যক্ সমাধি। বৌদ্ধস্বীকৃত চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হল সম্যক্ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি অনুসারে জীবন নির্বাহ করার প্রবল ইচ্ছা হল সম্যক্ সংকল্প। এই সংকল্পের অধীন হয়ে প্রিয়, হিতকর ও সত্য বাক্য কথন হল সম্যক্ বাক। এসকলের ভিত্তিতে কোন কর্ম করাই হল সম্যক্ কর্মান্ত। এরূপ কর্মের ওপর ভিত্তি করে নিজ জীবিকা নির্বাহ করা হল সম্যক্ আজীব। সম্যক দৃষ্টির ওপর নির্ভর এই জীবন পরিচালনার যথার্থ অনুশীলন হল সম্যক্ ব্যায়াম। এই অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সম্যক্ দৃষ্টিলব্ধ সত্যকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মনে ধারণ করাই হল সম্যক্ স্মৃতি। এই নিরবচ্ছিন্ন ধারণার মধ্য দিয়েই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে, যা সম্যক্ সমাধি। তবে এই মার্গটি একজন আশ্রম নিবাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ষে যথাযথ মেনে চলা সম্ভব হলেও সকল সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষে এই মার্গটি সঠিকভাবে মেনে চলা কঠিন। তাই গৃহস্থদের এই মার্গের পূর্ব প্রস্তুতিক্ষেত্র হিসেবে বৌদ্ধ দর্শনে দুটি ধারণার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি হল 'শীল'এর ধারণা, আরেকটি হল 'ব্রহ্মবিহার'এর ধারণা। এই দুইটি পরোক্ষভাবে নির্বাণ লাভে সহায়ক, আবার ব্যবহারিক জীবনেও অনেকাংশে সুখ-শান্তিতে বসবাসের ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য । 'শীল' বলতে বোঝায় বিধি বা নিয়ম-নীতি। বৌদ্ধ মতে, একজন ব্যক্তির চরিত্র গঠন করার ক্ষেত্রে কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতি মেনে চলা উচিত। এই নিয়মগুলির প্রাথমিকরূপ হিসাবে পাঁচটি শীলের বা বিধির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল —

১. পাণাতিপাতা বেরমণী বা প্রানীহত্যা থেকে বিরতি

২. আদিন্নাদানা বেরমণী বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরতি

৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী বা অবৈধ কামাচার বা ব্যভিচার থেকে বিরতি

৪. মুসাবাদা বেরমণী বা মিথ্যাবাক্য বলা থেকে বিরতি

৫. সুরামেরয়-মজ্জ-পমাদট্ ঠানা বেরমণী বা সুরা-মদ জাতীয় দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ থেকে বিরতি

পাণাতিপাতা বেরমণী বলতে বোঝায় সজ্ঞানে কোন প্রানীকে হত্যা না করা। এটি আসলে অহিংসা নীতি। বৌদ্ধ মতে, এই পৃথিবীতে একজন পিপীলিকার জীবনের মূল্য যতখানি একজন মানুষের জীবনের মূল্যও ততখানি। ফলে কোন প্রাণীর হত্যাই কাম্য নয়। তবে এখানে হত্যা না করা বলতে কেবল দৈহিকভাবে আঘাত না করাকেই বোঝাননি, দৈহিক-বাচিক-মানসিক কোনভাবেই আঘাত না করাকে বুঝিয়েছেন। তাই বুদ্ধদেব নিজেও যেমন অহিংসার পথ অনুসরণ করেছেন, মানুষকেও সেই শিক্ষা প্রদান করেছেন।

আদিন্নাদানা বেরমণী বলতে বোঝায় যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ না করা। যেকোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপরের বস্তু না বলে গ্রহণ করা উচিত নয়, যদি তা করা হয় তাহলে তা চৌর্যবৃত্তি বলে পরিগণিত হয়। এমনকি যতটুকু প্রয়োজনীয় ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা উচিত নয় এবং অপরকে প্রতারণা করে কোন বস্তু গ্রহণ করা

উচিত না। এরূপ করা হলেও তা চৌর্যবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে। বুদ্ধদেব এরূপ কর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন।

কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী বলতে বোঝায় অবৈধ কামাচার না করা। মানব চাহিদাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কাম। বৌদ্ধ মতে, কামকে সংযত হতে হবে। সংযত কাম বলতে বোঝায় একজন গৃহস্থ ব্যক্তির এক স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। অনৈতিকভাবে কামক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। এরূপ আচরণের দ্বারাই মানুষ চরিত্রবান হয়ে ওঠে।

মুসাবাদা বেরমণী বলতে বোঝায় মিথ্যা উপদেশ ও বাক্য প্রয়োগ না করা। বুদ্ধ মতে, মিথ্যা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। সভাগৃহে ও পরিষদগৃহে কেও কারও সঙ্গে মিথ্যা ভাষণে লিপ্ত হবেন না, কেও অপরকে মিথ্যা ভাষণে প্রবৃত্ত করবেন না, মিথ্যা অনুমোদন করবেন না, সর্বপ্রকার মিথ্যা বর্জন করবেন। এই বক্তব্যের সদর্থক দিকটি হল সর্বদা সত্য কথা বলা, প্রিয় কথা বলা, মধুর কথা বলা, অপরের কল্যাণমূলক কথা বলা, হিতকর ও মনোহর কথা বলা।

সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ ঠানা বেরমণী বলতে বোঝায় সুরাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন না করা। নেশাজাতীয় দ্রব্য মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতিসাধনের সাথে সাথে সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রেও ক্ষতিসাধন করে। বুদ্ধদেবের মতে, এর ফলে মানুষকে ছয়টি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, যথা — ১. বর্তমান অর্থের অপচয়, ২. ঝগড়া বৃদ্ধি, ৩. অসুস্থতা সৃষ্টি, ৪. খ্যাতির ক্ষতিসাধন, ৫. ব্যক্তির অশ্লীলতা প্রকাশ, ও ৬. জ্ঞানের হানি। ফলে নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে ব্যক্তির দূরে থাকাই বাঞ্চনীয়, এতে সমাজ তথা জগতের প্রত্যেকের মঙ্গল সাধিত হয়।

এই শীলাদিপঞ্চ গৃহস্থের জীবনকে চরিত্রসম্পন্ন করে তুলতে সাহায্য করে, তবে সন্ন্যাসী জীবনে প্রবেশের স্তরে অষ্টশীল ও দশশীল পালনের নির্দেশ বর্তমান। চরিত্র ধারণের জন্য অপরিহার্যরূপ শীল মানবজীবনে নৈতিকতার মানদন্ডকে দৃঢ় করার মধ্য দিয়ে মানুষের চারিত্রিক ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। এই ব্যক্তিত্ব আরও প্রগাঢ় হয় মানসিক চারটি ভাবনার অবলম্বনের মাধ্যমে, এই চারটি ভাবনাকে একত্রে বৌদ্ধ দর্শনে 'ব্রহ্মবিহার' বলে। এগুলি হল — **১. মৈত্রী :** সকল প্রকার দ্বেষ ও ক্ষান্তি পরিহার করে জীবের হিত কামনা করা হল মৈত্রী ভাবনা। বৌদ্ধ মতে, 'দাঁড়ানো অবস্থায়, পথ চলতে, উপবেশন অথবা শয়নকালে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিদ্রা আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আলস্যহীনভাবে স্মৃতিমান হয়ে মৈত্রীচিত্তে অবস্থান' করতে হবে। বুদ্ধদেব বলেন, মাতা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি সীমাহীন অপরিমেয় মৈত্রীভাব' কে রক্ষা করতে হবে। এমনকি মৈত্রী ভাবনাকে কঠোরভাবে লালন করার প্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব বলেন যে, 'ভিক্ষুগণ, যদি উভয়প্রান্তে হাতলওয়ালা কোন করাত দিয়ে ডাকাত ও দুর্বৃত্তরা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কেটে ফেলে, তাতেও যে তার মনকে ক্রোধে দূষিত করে সে আমার উপদেশ পালক নয়'। **২. করুণা :** নিষ্ঠুর ব্যক্তির পরিণাম স্মরণ করে জীবের দুঃখ দূর করার নিয়ত বাসনাই করুণা। বৌদ্ধ মতে, করুণার দুটি দিক — একটি হল হৃদয়বৃত্তি হিসেবে অনুকম্পাবোধ ও দ্বিতীয়টি হল এই অনুকম্পাবোধ হেতু দুর্দশাগ্রস্থদের দুঃখ মোচনের প্রবল আকুতি। *'বিভঙ্গ'* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, একজন দুর্গত ও দুরবস্থাগ্রস্থ ব্যক্তিকে যেমন করুণা করবে, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতিও করুণা ভাব স্ফুরিত করতে হবে। **৩. মুদিতা :** অপরের আনন্দঘন অবস্থা দেখে নিজমধ্যে আনন্দ অনুভূতি জাগ্রত করাই হল মুদিতা। মুদিতা প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ বলেন, 'মাতা যেমন তার যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানকে দেখে আনন্দিত হয়, সেই সন্তানের চিরস্থিতি কামনা করে, তেমনই সকল প্রাণীর প্রতি মুদিতাভাব উৎপাদন' করা উচিত।

মুদিতা উপাচার প্রসঙ্গে *'বিভঙ্গ'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভিক্ষু একজন প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখে যেভাবে মুদিতা পরায়ণ হন, একইভাবে অপরাপর সকল জীবের প্রতি মুদিতা পরায়ণ হবেন। ৪. **উপেক্ষা :** দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে মানুষের চিত্তের শান্তভাবাপন্ন অবস্থাই হল উপেক্ষা। এরূপ ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যক্তির লাভ-অলাভ, যশ-অপযশ, নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অষ্টলোকধর্মে সমানভাব উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তি সকল জীবের প্রতি সমান আচরণ করে। বুদ্ধঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, মাতা যেমন তার স্বকৃত্যপ্রসূত সন্তানের জন্য ব্যস্ত হয় না, তেমনি সকল জীবের প্রতি উপেক্ষা পরায়ণ হওয়া উচিত। এই ভাবনাচতুষ্ঠয়ের দ্বারা ব্যক্তির মানসিক অবস্থান দৃঢ় হয় এবং ব্যক্তি যে কোন কর্মকে একাগ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে। এমনকি একথাও বলা হয় যে, এটি পালন করলে অল্প কর্মের দ্বারাই মহৎ ফল লাভ করা যায়।

একটি মরচে পড়া তলোয়ারকে ধারালো করে যুদ্ধকর্মে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে যেমন উত্তাপ ও ঘর্ষণের প্রয়োজন, তেমনি অবিদ্যাস্নাত মানুষের বাহ্যিক ও মানসিক অবস্থানকে মননে স্থিত করে তাকে মার্গে চালিত করার উপযোগী করে তুলতে পঞ্চশীল ও ব্রহ্মবিহারের প্রয়োজন। পঞ্চশীল মানুষকে সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে স্নিগ্ধ ও প্রাঞ্জল করে তোলে ও ব্রহ্মবিহার মানসিক অবস্থায় আনন্দের সঞ্চার করে। পঞ্চশীলের সুফল এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে — অহিংসা ব্রতের মধ্য দিয়ে অপরের ক্ষতি না করলে বা ক্ষতির চিন্তা না করলে অপরের দ্বারা নিজেরও ক্ষতির সম্ভবনা থাকে না। অচৌর্য ব্রতের দ্বারা অপরের প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ না করলে নিজ প্রয়োজনীয় বিষয় হারানোর সম্ভবনা থাকে না। অব্যভিচার ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে অযাচিত কামে মত্ত না হলে দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতার সম্ভাবনা থাকে না। অসত্য-পরিহার ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে অপরকে বাক্যের দ্বারা আঘাত করা থেকে বিরত থাকলে অপরের দ্বারা নিজের বাক্যাঘাত না পাওয়ার সম্ভাবনা জন্মায়। নেশাদ্রব্য বর্জনের মধ্য দিয়ে দৈহিক, মানসিক, সর্বোপরি সামজিক ক্ষতিসাধন না করা হলে নিজেরও ওই সকল বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। আবার, *অঙ্গুত্তরনিকায়'*এ ব্রহ্মবিহার অনুশীলনকারীর স্পষ্টতই এগারোটি সুফলের কথা বলা হয়েছে, যথা — ১. সুখে শয়ন করে, ২. সুখে নিদ্রা ত্যাগ করে, ৩. পাপস্বপ্ন দেখে না, ৪. মানুষের প্রিয় হয়, ৫. মনুষ্যভিন্নদের প্রিয় হয়, ৬. দেবতারা তাকে রক্ষা করে, ৭. আগুন, বিষ, অস্ত্র তার ক্ষতি করতে পারে না, ৮. দ্রুত চিত্ত সমাধিস্থ হয়, ৯. মুখবর্ণ প্রসন্ন থাকে, ১০. সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে ও ১১. অর্হত্ত্বফল না লাভ করতে পারলেও মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করে। অর্থাৎ ব্যক্তি নির্বাণ প্রাপ্ত না হলেও সুখে অবস্থান করতে পারে। অতএব, এই দুটি পন্থার মধ্য দিয়ে একজন গৃহস্থ ব্যক্তি ধীরে ধীরে মার্গের পক্ষে প্রস্তুত হয়, সাথে সাথে ব্যবহারিক জীবনেও দৈহিকভাবে ও মানসিকভাবে, তদুপরি সামাজিকভাবে সুখে ও সুষ্টভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষলেখা, পৃ-২৬
২. গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ডঃ সুকোমল চৌধুরী, পৃ- ২৯
৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জন্মভূলির প্রতি, পৃ-৯
৪. বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শণ, স্বামী বিদ্যারণ্য, পৃ-৬৭
৫. গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ডঃ সুকোমল চৌধুরী, পৃ- ৬৭
৬. An Introduction to Buddhist Ethics, Peter Harvey, P-77
৭. সুত্তনিপাত, উরগ বর্গ, মৈত্রী সূত্র (৩-৯ নং সূত্র), পৃ-৪৫২

৮. সুত্তনিপাত, উরগ বর্গ, মৈত্রী সূত্র (৭ নং সূত্র), পৃ-৪৫১
৯. মজ্ঝিম নিকায় (প্রথম খন্ড), ঔপম্য বর্গ, ককচোপম সূত্র, পৃ-১৯৫
১০. বিভঙ্গ, অপ্রমেয় বিভঙ্গ, পৃ-৩০৬
১১. বিশুদ্ধমার্গ, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় খন্ড, ব্রহ্মবিহার-নিদ্দেশ, পৃ-২০৭
১২. বিভঙ্গ, অপ্রমেয় বিভঙ্গ, পৃ-৩০৭
১৩. বিশুদ্ধমার্গ, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় খন্ড, ব্রহ্মবিহার-নিদ্দেশ, পৃ-২০৭
১৪. অঙ্গুত্তরনিকায়(পঞ্চম খন্ড), একাদশ নিপাত, অনুস্মৃতি বর্গ, মৈত্রী সূত্র, পৃ-৯৬৩

গ্রন্থপঞ্জী:

- Harvey, Peter. *An Introduction to Buddhist Ethics.* Cambridge: Cambridge University Press, 2000. English.
- চৌধুরী, সুকোমল.*গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০২১.বাংলা.
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ.*শেষ লেখা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯০৮.বাংলা.
- দত্ত, মাইকেল মধুসূদন.*বিবিধ কাব্য.* Ed. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস.কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ফাল্গুন, ১৩৪৭.বাংলা.
- বড়ুয়া, শ্রী মেণীমাধব, trans. *মজ্ঝিমনিকায়.* Vol. প্রথম খন্ড.বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৮.বাংলা.
- বিদ্যারণ্য, স্বামী.*বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৯.বাংলা.
- বুদ্ধঘোষ, আচার্য্য.*বিশুদ্ধমার্গ.* কলকাতা: শ্রী গোপালদাস চৌধুরী ও শ্রীমৎ শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, ১৯২৩.বাংলা.
- ভিক্ষু, ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী, trans. *অঙ্গুত্তরনিকায়.* Vol. পঞ্চম খন্ড.বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৮.বাংলা.
- ভিক্ষু, শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, trans. *বিভঙ্গ.* বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৮.বাংলা.
- মহাস্থবির, শ্রীমৎ সাধনানন্দ, trans. *সুত্তনিপাত.* বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৮.বাংলা।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদের দৃষ্টিতে বাহ্যার্থবাদীদের মতামত খণ্ডন প্রক্রিয়া

সন্তু সামন্ত
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মূলত বৌদ্ধদর্শনের মহাযান সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত যোগাচারবাদের অপর নাম বিজ্ঞানবাদ। এই বিজ্ঞানবাদীদের মূল বক্তব্য হচ্ছে মনকে ছাড়া নিরপেক্ষভাবে কোনো বস্তু থাকতে পারেনা। মনকে বিজ্ঞানের ধারা বা চেতনা প্রবাহ মানা হয়। প্রতিটি চেতনাই ক্ষণিক, একটি চেতনা বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে আর একটি নতুন চেতনাকে উৎপন্ন করে এই ব্যপারটি সংঘটিত হয় একটি সংস্কারের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের সংস্কার থেকে পরবর্তী নতুন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়ে থাকে। বিজ্ঞানদের বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি গ্রন্থে, এই গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদার্শনিকদের দৃষ্টিতে বাহ্যার্থবাদীদের মতামত খণ্ডন প্রক্রিয়াটি বিংশতিকায় দেখানো হয়েছে। ছয়টি মূল বক্তব্যকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে বিজ্ঞানবাদী ও বাহ্যার্থবাদীর বক্তব্যের বিরোধিতার করে সম্পূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, বলা হয়েছে পৃথিবীতে যে দ্রব্যটি এককভাবে অবস্থান করে যেমন চন্দ্র, সূর্য সেগুলি একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের কাছে নির্দিষ্ট একটি দ্রব্য হিসাবে পরিচিত কিন্তু যারা মনসিক বিকারগ্রস্ত তারা কখনও কখনও দুটি করে চন্দ্র দেখে মস্তিকের বিকৃতি হেতু তাদের মনে এই ভাবনা জন্মায় সুতরাং এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানবাদীরা কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু এই তিনটির মাধ্যমে জাগতিক সমস্ত বিষয়ের ব্যাখা করেছেন। তৃতীয়ত, পারলৌকিক ক্রিয়াকালাপ ও তাদের ফল সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বাস্তবত আমরা জানি যে ইহলোকের ভালো মন্দ কর্মের ফলে আমাদের সর্গের সুখদুঃখের প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা বলেন এগুলিতো আমরা চোখে দেখতে পাইনা এগুলি আমাদের মনগড়া কথাবার্তা মানসিক ব্যপার। চতুর্থত, বৈশেষিকদের পরমাণুবাদের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। বাস্তবে আমরা জানি পরমাণু নিরয়বয় কিন্তু বৈশেষিকরা পরমাণুর দিগভাগভেদ স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা বলেছেন অবয়বহীন বস্তুর ভেদ সম্ভব নয়। পঞ্চমত, বলা হয়েছে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা নিরধারণ করে থাকি। যেমন টেবিলের অস্তিত্ব আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানবাদীরা বলেছেন না এটি সম্পূর্ণ স্মৃতির বিষয়। ষষ্ঠতঃ, বাহ্যার্থবাদীরা সবকিছুই যদি বিজ্ঞানের স্বরূপ হয়ে থাকে, কোনো শরীর নেই, তাহলে মেষ প্রভৃতি প্রাণীকে বধ করার ফলে তাদের মৃত্যু ঘটে প্রত্যুত্তরে মুণি ঋষিদের কোপে বস্তু নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সবশেষে বলা যায় বিজ্ঞানের বিষয় সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এই বিষয়গুলি কেবলমাত্র ভগবান বুদ্ধের গোচর হয়ে থাকে।

মূলশব্দ: বৌদ্ধদর্শন, বিজ্ঞানবাদ, বাহ্যার্থবাদ।

মূল আলোচনা:

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে আদিপর্বের সূচনা ঘটে বুদ্ধদেবের জীবৎকালে যখন তিনি ভিক্ষু এবং গৃহী শিষ্যদের দেশনা করতেন সেইসময় এবং

তার পরবর্তী কিছু সময়। এই আদিপর্ব সাধারণভাবে 'স্থবিরবাদ' বা 'হীনযান' নামে পরিচিত, যদিও এই 'হীনযান' নামটি 'মহাযান' কতৃক প্রচলিত। এই পর্বের বৌদ্ধদর্শন খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ সাল অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর একশো বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আদিপর্বের এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুবাদের সমর্থক ছিল অর্থাৎ তারা মনোনিরপেক্ষ বাহ্যজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করতেন যে কোনো ব্যাক্তির জ্ঞানের বিষয় না হয়ে ও বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্ব আছে। এবং শুধু তাই নয়, সমস্ত জ্ঞাতার পরিপেক্ষিতেই এই বিষয়গুলি এক হয়ে থাকে, তাদের কোনো পরিবর্তন হয়না।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আবির্ভাব হতে থাকে বিভিন্ন সূত্রগন্থের, যাদের বক্তব্যের বিষয় বস্তুবাদী মতের থেকে অনেকটাই আলাদা। যেমন এইসময় দার্শনিকরা চিত্তমাত্র, আলয়বিজ্ঞান, ত্রিস্বভাব ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করতেন। এই ধারণাগুলি সম্পূর্ণ অভিনব এবং পূর্ব পরিচিত বস্তুবাদী মতের থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। আগে যেরকম মনো নিরপেক্ষ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বা সত্ত্বায় বিশ্বাস করা হত, এই পর্বের সূত্রগুলিতে তার বিপরীত মনে করা হয় যেমন ব্যবহারিকজগৎ বা বাহ্যজগৎ আর কিছু নয় মানব মনের কল্পনামাত্র। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের সূত্রগ্রন্থের এই মনোসাপেক্ষ বা মনোনির্ভর চিন্তাভাবনাগুলিই পরবর্তীকালে যোগাচার নামক ভাববাদী দর্শনভাবনার রূপ গ্রহণ করে। যোগাচার দর্শনের প্রধান প্রবক্তা হলেন অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুনামে দুইভাই। অবশ্য অসঙ্গের গুরু মৈত্রেয়নাথকেই অনেকে এই মতবাদের প্রবক্তা বলেন। এই দর্শনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'লঙ্কাবতারসূত্র'[১]। মূলত বৌদ্ধদর্শনের মহাযান সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত যোগাচারবাদের অপর নাম বিজ্ঞানবাদ। এই বিজ্ঞানবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে মনকে ছাড়া নিরপেক্ষভাবে কোনো বস্তু থাকতে পারেনা। মনকে বিজ্ঞানের ধারা বা চেতনাপ্রবাহ মানা হয়। প্রতিটিই চেতনাই ক্ষণিক, একটি চেতনা বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে আর একটি নতুন চেতনাকে উৎপন্ন করে, এই ব্যাপারটি সংঘটিত হয় একক্ষণ সময়ের মধ্যে তাই এই চেতনাকে ক্ষণিক বলা হয়েছে। এই পুরো ব্যাপারটি সংঘটিত হয় একটি সংস্কারের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের সংস্কার থেকে পরবর্তী নতুন বিজ্ঞানের জন্ম হয়[২]। বিজ্ঞানবাদের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বসুবন্ধুর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' গ্রন্থে। বিজ্ঞানবাদ আবার আগম অনুয়ায়ী বিজ্ঞানবাদ এবং যুক্তি অনুযায়ী বিজ্ঞানবাদ নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বসুবন্ধু বিরচিত 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' গ্রন্থটি আগমানুযায়ী বিজ্ঞানবাদের অর্ন্তভূক্ত বলা যেতে পারে। গ্রন্থের নামকরণ থেকে এই বিষয়ের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব। 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' এই নামের অন্তর্গত 'বিজ্ঞপ্তি' শব্দের অর্থ হল চিত্ত মন বা বিজ্ঞান। 'মাত্র' শব্দটি অবধারনার্থক। এর দ্বারা বাহ্য বিষয়ের নিরাকরণ হয়েছে। ভাববাচক 'তা' প্রত্যয়ের দ্বারা পরমার্থ তত্ত্বের নির্দেশ বা সংকেত করা হয়েছে। সুতরাং 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' এই পদটির অর্থ দাঁড়ায় নির্বাহ্যতা বা বাহ্যার্থশূন্যতা। অর্থাৎ বিজ্ঞান অতিরিক্ত অন্য সমস্ত কিছুর অনস্তিত্ব প্রতিপাদন করে। এই অনস্তিত্ব, রহিততা, শূন্যতা যোগাচার মতানুসারে পরমার্থ সত্য। একেই পরিনিষ্পন্নলক্ষণ বলা হয়েছে। 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা। বিংশতিকা গ্রন্থে ২২টি কারিকা রয়েছে[৩], এই কারিকাগুলির বক্তব্যকে আধার করে ছয়টি মূল বিষয়কে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে বিজ্ঞানবাদীরা বাহ্যার্থবাদীদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে সম্পূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

প্রথমত: বলা হয়েছে তিমির রোগগ্রস্ত ব্যাক্তির অসৎ কেশচন্দ্রাদির দর্শন অর্থাৎ সাধারণত আমরা পৃথিবীতে যে বস্তুগুলি একটি বস্তু হিসাবে নির্দিষ্ট আছে যেমন সূর্য, চন্দ্র

সেগুলিকে আমরা একমাত্র বস্তু হিসাবে নির্ধারণ করতে পারি কিন্তু যারা মানসিক রোগাক্রান্ত তারা কখনো কখনো এগুলিকে দুটো দুটো করে দেখতে পান। আবার পুকুরে বা নদীর জলে ঢেউ খেলে তখন ঢেউয়ের কম্পন সংখ্যা অনুসারে আমাদের মনে ততগুলি চন্দ্রের সংখ্যা প্রতিভাত হয়[৪]। এই জলের মধ্যে যে চন্দ্রের সংখ্যার অসামঞ্জস্য এটি মনের ব্যাপারের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ত্রৈধাতুক সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে কামধাতু রূপধাতু অরূপধাতু এই তিনটিকে একত্রে ত্রৈধাতুক বলা হয়। কামধাতু বলতে রূপ, শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি কাম্যগুণের প্রতি আসক্তিকে 'কামধাতু' বলে। এদের দ্বারা মনুষ্য, তির্যক, দেবতা, অসুর, প্রেত, নরকের প্রাণী তাদের সম্পর্কিত বিষয়ের জ্ঞান হয়ে থাকে। অনেকে কাম্যগুণ ব্যাতিরিক্ত শুধু রূপের প্রতি আসক্ত থাকেন তাদের 'রূপধাতু' বলে। এর দ্বারা রূপ যুক্ত দেবতা ও তাদের সম্পর্কিত বিষয়ের গ্রহণ হয়ে থাকে। কাম এবং রূপের প্রতি অনাসক্ত হয়েও নাম অর্থাৎ চার অরূপী স্কন্ধ বিষয়ে আসক্ত থাকে তাকে 'অরূপধাতু' বলা হয়। এই ব্যপার গুলি সংঘটিত হয়ে থাকে চিত্তের সাহায্যে। 'চিত্তং মন বিজ্ঞপ্তিশ্চ পর্যায়াঃ' অর্থাৎ চিত্ত, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি পর্যায় শব্দ বা সমার্থক[৫]।

দ্বিতীয়ত: দেশনিয়ম, কালনিয়ম, সন্তানের অনিয়ম, অর্থক্রিয়াকারিত্ব এই চারটি বিষয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানবাদীরা বাহ্যার্থবাদীদের বক্তব্যের বিরোধীতা করেছেন। বাহ্যার্থবাদীরা বলেন বিজ্ঞানবাদ অনুসারে বিজ্ঞানই যদি একমাত্র সৎ পদার্থ হিসাবে বিবেচিত হয় বাহ্য বিষয়ের যদি অস্তিত্বই না থাকে তাহলে উপরিক্তো নিয়মগুলি কিভাবে প্রতিপালিত হয়। প্রত্যেকটি নিয়ম ভালোভাবে প্রতিপালনের জন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যবিষয়ও আবশ্যিকভাবে প্রতীত হয়। দেশনিয়ম বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকা সর্বত্র নয়। যেমন সূর্য সবসময় আকাশে অবস্থান করে, বৃক্ষলতাদি পৃথিবীতে অবস্থান করে। অতএব যদি বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্বই না থাকে তাহলে বিষয়গুলির জ্ঞান সর্বত্র হওয়া দরকার। যদি আপনাদের মতে সমস্ত কিছুই অসৎ বলে বিবেচিত হয়, কোনোকিছুর যদি না অস্তিত্ব থাকে তাহলে দেশনিয়মের প্রতিপাদন কি করে সম্ভব? এর প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানবাদীরা বলেছেন স্বপ্নে বস্তুর অভাব থাকে কিন্তু বস্তুর প্রতীতিতে দেশনিয়মের কোনো ব্যাভিচার দেখা যায়না স্বপ্নজ্ঞানেও কিন্তু সূর্যের অবস্থান আকাশেই থাকে এবং বৃক্ষলতাদি পৃথিবীতেই থাকে, অতএব স্বপ্নের মাধ্যমেও আমাদের দেশনিয়মের জ্ঞানটি যথার্থ হয়ে থাকে। কালনিয়ম বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে থাকা, সবসময় নয়। সূর্য দিনের বেলাতে আকাশে এবং চন্দ্র রাত্রিতে আকাশে দেখা যায়। যখন বস্তুর স্থিতি এইরকম যে কোনো বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নেই, সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি পদার্থ অসৎ হয় তাহলে বিজ্ঞানের সৎ স্বীকৃতির উপর কালের নিয়ম কিভাবে নির্বাহ হয়? বিজ্ঞানবাদীরা কালের নিয়মও স্বপ্নের মাধ্যমে প্রতিপাদন করেছেন, স্বপ্ন জ্ঞানেও আমাদের সূর্যের প্রকাশকাল দিন এবং চন্দ্রের প্রকাশকাল রাত্রি হিসাবে বজায় থাকে। সন্তানের অনিয়ম শব্দের অর্থ সমস্ত সন্তানের মধ্যে বিদ্যমান না থাকা, সাধারণত আমরা ঘট, পটকে দেখা মাত্রই আমাদের জ্ঞান হয় যে এটি ঘট, এটি পট কিন্তু যারা মানসিক বিকারগ্রস্ত তাদের বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ভিন্নধর্মী জ্ঞান থাকতেই পারে। অতএব সুস্থসবল ব্যাক্তির বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞান হয়ে থাকে। এই কথার প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানবাদীরা বলেছেন মানুষ কর্মানুযায়ী তার কৃতকর্মের ফলভোগ করে। যেমন যে মানুষ ভালো কর্ম করে সে স্বর্গগামী হয়ে দেবতাদের সান্নিধ্যে রথযুক্ত হস্তী প্রভৃতির দর্শন করে এবং যে মানুষ মন্দ কর্ম করে সে নরকগামী হয়ে পুজপূর্ণ নদী এবং দণ্ডধারী নরকপালদের দেখা পায়, চলতি কথায় এদের পাপীষ্ঠবলা হয়ে থাকে। বাস্তবিকভাবে আমরা কেউই পুজপূর্ণ নদী ও নরকপালকে দেখতে পাইনা। কিন্তু সর্বদা

আমাদের মনের মধ্যে থাকে যে এই বস্তুগুলির অস্তিত্ব কোনো না কোনোভাবে আছে। যখন এইজ্ঞান অসংখ্য নরকগামী লোকের হয়ে থাকে তখন ধরে নিতে এই বিষয়গুলি সুপ্তভাবে থাকে। এরথেকে প্রমাণিত হয় যে বস্তুর অভাবেও সন্তানের অনিয়ম ব্যাখ্যা করা যায়। চতুর্থটি হল ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। যে বস্তুর ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব থাকেনা, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে সর্পের কোনো অস্তিত্ব থাকেনা। বাহ্যবস্তুর অভাব সবসময় দেখানো যায়না। কারণ বাস্তবে জলের দ্বারাই তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে। সর্পদংশনের কারণে অসহ্যপীড়া এবং পরিণামে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে তা জগৎপ্রসিদ্ধ। জীবনের এই অনুভূতি গুলিকে কিভাবে আমরা অবহেলা করতে পারি? অতএব প্রশ্ন ওঠে যে যদি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বই না থাকে তাহলে সৎ বস্তু থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া এবং অসৎ বস্তু থেকে ক্রিয়া উৎপন্ন হতে পারেনা এই অনুভূতি কি করে সম্ভব হতে পারে এর প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানবাদীরা স্বপ্নে স্ত্রী ও পুরুষের সংসর্গ ব্যাতিরেকে বীর্যস্খলন অর্থক্রিয়াকার্যটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে, মানসিক কার্যকালাপের মাধ্যমেও ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে[৬]।

তৃতীয়ত: বাহ্যার্থবাদীরা আবার বলেছেন যে সকল পশু-পক্ষী স্বর্গে জন্মায় তারা তাদের ভালকর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং তারা তাদের স্বর্গসুখ লাভ করতে সক্ষম হয়। এমনকি বিপরীতভাবে যারা মন্দকর্মের অধিকারী তারা তাদের মন্দকর্মের ফলস্বরূপ নরকে অবস্থান করে। এবং তাদের নরকের দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, আপনরা যে এই স্বর্গসুখ ও নরকযন্ত্রনার কথা বলছেন বাস্তবে তার প্রতিফলন তো আমরা কেউ প্রত্যক্ষ করিনা। আমরা আমাদের মনের ধারণা থেকে এইসব মনগড়া কথাবার্তা বলে থাকি[৭]। বৈভাষিকরা বলেন কোনো সত্ত্ব বা আত্মা নেই। জগতের সমস্ত বিষয়বস্তু স্বহেতুর দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। আবার ভগবান বুদ্ধ বলেছেন কোনো আভাসযুক্ত বিজ্ঞপ্তি তার নিজের পরিণামভূত বীজ থেকে উৎপন্ন হয়, ওই বীজ ও প্রতিভাস উভয়কে ওই বিজ্ঞপ্তির চক্ষু ও রূপ আয়তন রূপে ব্যাক্ত করেছেন। এইভাবে এক এক করে ছয়টি আতনের অভিপ্রায় বুঝতে হবে। এই অভিপ্রায়গুলি থেকে ভগবান বুদ্ধ তার শিষ্যদের পুদগলনৈরাত্ম্য এবং ধর্মনৈরাত্ম্যে প্রবেশের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। পুদগল নৈরাত্ম হল এই যে, স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুর দ্বারা অভিব্যক্ত যে সত্ত্ব তা বিজ্ঞানমাত্র। উহাতে আত্মা নামক কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। ধর্মনৈরাত্ম হল এই যে, ঘট, পটাদি যে বাহ্যপদার্থ আছে সেগুলি বিজ্ঞানের প্রতিভাস মাত্র। উহাদের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই[৮]।

চতুর্থত: বাহ্যার্থবাদীরা বৈশেষিকদের পরমাণুবাদকে তুলে ধরেছেন। বৈশেষিকদের মতে পরিমাণের দিক থেকে সব পরমাণুই অনুপরিমাণ। বৈশেষিকরা পরমাণুর সমন্বয় সাধন স্বীকার করেছেন অর্থাৎ ছয়দিক হইতে ছয়টি পরমাণু এসে এক জায়গায় উপস্থিত হয়ে পরমাণুর পিণ্ডাকারে অবস্থান। এবং পরমাণুর দিগভাগভেদ স্বীকার করে পরমাণুকে একটি দ্রব্যের জায়গা করে দিয়েছেন[৯]। পরমাণু যে দ্রব্য নয় তা বিজ্ঞানবাদকার বসুবন্ধু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন, বস্তু যদি মধ্যস্থিত পরমাণুতে ছয়দিক হইতে সমাগত ছয়টি পরমাণুর সহযোগে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে পরমাণুর ছয়টি বিভিন্ন অংশ স্বীকার করতে হবে; আর ছয়টি পরমাণু যদি সমানদেশীয় হয় তাহা হইলে বস্তু অনুমাত্রেই পর্যবসিত হইবে।

একাধিক পরমাণুর সংযোগ বা সংস্থাপন স্বীকার করার অর্থই হল এক একটির তদনুরূপ অংশ স্বীকার করা, নয়তো সংযোগ সম্ভপর নয়। অথচ বৈশেষিকগণ পরমাণুকে নিরবয়ব বলে থাকেন। ষড়ংশত্ব ও নিরবয়বত্ব কখনই একত্র পরমাণুতে থাকতে পারেনা। এর

উত্তরে অবশ্য বলা যেতে পারে যে ছয়টি পরমাণুই তাদের মাঝখানে অবস্থিত পরমাণুরটির সঙ্গে এক জায়গায় এসে অবস্থিত হতে পারে, সুতরাং তাদের সাবয়ব হবার প্রয়োজন নেই "য এবৈকস্য পরমাণোর্দেশঃ স এব ষণ্ণাং" কিন্তু একথাও বলার উপায় নেই, কারণ সমদেশস্থ হলে সকল বস্তু অণুমাত্রে পরিণত হবে "সর্বেষাং সমানদেশত্বাৎ সর্বঃ পিণ্ডঃ পরমাণুমাত্রঃ স্যাৎ" অর্থাৎ পরমাণুর যদি না কোনো বিস্তার থাকে তাহলে পরমাণুর সংহতি যে পিণ্ড তারই বা কোনো বিস্তৃতি থাকবে কেন? কোনো পিণ্ডই তো তাহলে দেখা যাবেনা। এই দুই যুক্তির দ্বারাই বসুবন্ধু বৈশেষিকগণের পরমাণুবাদের প্রত্যাখ্যান করলেন[১০]।

পঞ্চমত: বাহ্যার্থবাদীরা বলেন যে প্রমাণের দ্বারা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়ে থাকে। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করলেও নৈয়ায়িকদের মতে, মূলত প্রত্যক্ষ, অনুমাণ, উপমাণ, শব্দচারটি প্রমাণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ অতিরিক্ত অন্যান্য প্রমাণগুলি এই চারটি প্রমাণের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়। সমস্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রেষ্ট।'বিষয় প্রতি গতম্ ইন্দ্রিয়ং যস্মৈ প্রয়োজনায় তৎ প্রত্যক্ষম্' এই বুৎপত্তির দ্বারা জ্ঞানরূপ অর্থ পাওয়া যায়, যেহেতু জ্ঞানরূপ প্রয়োজনের জন্যই ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি গমন করে[১১]। চর্ক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তু প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে সক্ষম হই। যেমন কোনো টেবিলকে আমরা যখন দেখি তখন আমরা বলে থাকি যে হ্যাঁ এখানে টেবিল বলে কোনো একটি বস্তু আছে। এর উত্তরে বসুবন্ধু অল্প কয়েকটি কথায় দর্শনশাস্ত্রের গূঢ়তম রহস্যটি উদঘাটন করেছেন। উপলব্ধি ও তার বিষয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ সেটি এখানে আলোচিত হয়েছে। যে কোনো বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হলেই আমরা মনে করি বস্তুটি আমাদের প্রত্যক্ষ হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি এতোটাই সহজ নয় যে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সংযোগ হলেই প্রত্যক্ষ হয়েছে বলা যায়না। ইন্দ্রিয়সংযোগ প্রত্যক্ষের কারণমাত্র, তা প্রত্যক্ষের প্রমাণ নয়। ইন্দ্রিয়সংযোগ না হয়ে প্রত্যক্ষ হতে পারেনা একথা মেনে নিলেও এটি কখনই বলা যায়না যে ইন্দ্রিয়সংযোগ হলেই প্রত্যক্ষ হবে। প্রকৃতকথা এই যে, কোনো বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগের পর যতক্ষণনা তার উপর আবার একটি জ্ঞান জন্মাচ্ছে যে, 'আমি বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করছি' ততক্ষণ বলা যাবেনা যে সেই বস্তুটি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মাচ্ছে। ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং 'আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি' এই পরবর্ত্তী জ্ঞানটিও মনের মধ্যে জন্মাবে। সুতরাং বস্তু প্রত্যক্ষ করা এবং সেই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে উপলব্ধিজ্ঞান একসঙ্গে হতে পারেনা। শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিনষ্ট করা হলে তবে তার সম্বন্ধে উপলব্ধিজ্ঞান জন্মাতে পারে। কারণ প্রত্যক্ষের অনুভূতি ও তার উপলব্ধির জ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। প্রথমটিতে মন বাহ্যবস্তুতে সংযুক্ত হয় এবং দ্বিতীয়টিতে মন নিজেরই একটি বিশেষ অবস্থার আলোচনা করে থাকে। এইকারণে দুয়ের সামঞ্জস্য কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, প্রথমে বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ এবং তারপর সেই ইন্দ্রিয়সংযোগ সম্বন্ধে আন্তরিক উপলব্ধি হয়, কিন্তু পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে এইরূপ আন্তরিক উপলব্ধি প্রত্যক্ষজন্য জ্ঞানকে বাধিত করে জন্মাতে পারে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান কখনই সিদ্ধ হতে পারেনা। এক কথায় বিষয়ের জ্ঞান বিষয়ের উপলব্ধি জ্ঞানের দ্বারাই বাধিত হয়ে থাকে[১২]। বিজ্ঞানবাদীরা বলেছেন আমরা যখন স্বপ্নে কোনো টেবিলকে দেখি তখন সেই টেবিলটিতো আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত থাকেনা, কিন্তু তখনও আমাদের টেবিলের জ্ঞান হয়ে থাকে এবং সেটি কেবল মনের দ্বারা হয়। কারণ ঘুমের মধ্যে আমাদের চোখ বন্ধ থাকে। আরও বলেছেন বিষয় ছাড়াও ওই বিষয়ের আভাস সম্বন্বিত চর্ক্ষুবিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য বিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন হয় একথা পূর্বে বলা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তির

স্মৃতিসম্প্রযুক্ত এই বিষয়ের আভাস সম্বন্বিত রূপ প্রভৃতির বিকল্পিতভাবে মনোবিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন হয়। এইজন্য স্মৃতির উৎপত্তির দ্বারা বস্তুর বাস্তবিক অনুভব সিদ্ধ হয়না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, যেভাবে স্বপ্নে যে বিজ্ঞপ্তি হয় তা অসৎ বস্তু বিষয়ক। এই অবস্থা যদি জাগ্রত অবস্থাতেও হয় তাহলে স্বপ্নের মতো জাগ্রত অবস্থাতেও বস্তুর অভাব দেখা দেবে। কিন্তু এটি কখনই হয়না। অতএব স্বপ্নে দেখা বস্তুর উপলব্ধিকে বিষয়শূন্য বলা যাবেনা[১৩]।

ষষ্ঠত: আবার বাহ্যার্থবাদীরা বলেছেন যদি আপনারা বলেন সবকিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র, কোনো শরীর নেই, কোনো বাক্য নেই, তাহলে মেষ প্রভৃতি জন্তুকে যখন কোনো ব্যাক্তি বধ করেন এবং তারফলে মেষটির মৃত্যু ঘটে। এবং মেষ বধ করার জন্য বাধকের পাপ হয় কেন? উত্তরে বলা হয়েছে পিশাচ প্রভৃতির মানসকোপ থেকে অন্যদের স্মৃতিলোভ, স্বপ্নদর্শন, ভূতাগ্রহপ্রবেশ প্রভৃতি বিকার উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ঋষিদের মানসকোপ থেকেও হয়। যেমন, এখানে একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে (উপালি ও গৃহপতির কথোপকথনের মাধ্যমে) বিষয়টি উপস্থাপনা করেছেন। উপালি গৃহপতিকে বলছেন- হে গৃহপতি তুমি কি শুনেছ কিভাবে দণ্ডকারণ্য, মাতঙ্গারণ্য, কলিঙ্গারণ্য ধ্বংস হয়েছিল? তার উত্তর দিয়ে গৃহপতি বলছেন হ্যাঁ গৌতম শুনেছি যে ঋষিদের মানসকোপ থেকে এইসব অরণ্য জনমানব শূন্য হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। এই উদাহরণ দিয়ে বিজ্ঞানবাদীরা বলেছেন যে আপনারা যদি বলেন মানসিক ব্যাপার থেকে কোনো কিছুই সংঘটিত হতে পারেনা তাহলে শুধুমাত্র ঋষিদের মানসকোপ থেকে এত বড় বড় অরণ্য ধ্বংস হল কিভাবে, তাই বলা হয়েছে যেহেতু ঋষিদের মানসকোপ থেকে অরণ্যগুলি হয়েছে এরথেকে প্রমাণ হয় যে মনের অস্তিত্ব আছে[১৪]। যদিনা মনের কোনো গুরুত্ব থাকতো তাহলে পরচিত্তবিদগণ কিভাবে অপরের মনের কথা জানতে পারতো, মনের গুরুত্ব আছে বলেই পরচিত্তবাদীরা অপরের মনের কথা জেনে তাদের মানসিক দুঃখকষ্ট দূর করার চেষ্টা করে। এরথেকে প্রমাণিত হয় যে মনের ব্যপার চেতনা বা বিজ্ঞান তার অস্তিত্ব আছে। সবশেষে বলা যায় এই চেতনা বা বিজ্ঞানের যে বিষয় তা আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝে ওঠা সম্ভপর নয়। এই বিষয়গুলি কেবলমাত্র ভগবান বুদ্ধের গোচর হয়ে থাকে[১৫]।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ২০১৫, ভারতীয়দর্শন, কলিকাতা, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১৭৩।

২. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ২০১৫, ভারতীয়দর্শন, কলিকাতা, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১৭৬।

৩. তিবারী, মহেশ, ২০১৫, বসুবন্ধু বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী-১, সুরভারতী প্রকাশন, পৃষ্ঠা-০৫।

৪. চৌধুরী, সুকোমল, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৭৫, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০১৭, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, কোলকাতা-৭০০৭৩, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃষ্ঠা-৩৫।

৫. ত্রিপাঠী, রামশঙ্কর, ১৯৯২, বসুবন্ধু বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, বারাণসী, বারাণমেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-১৩।

৬. তিবারী, মহেশ, ২০১৫, বসুবন্ধু বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী-১, সুরভারতী প্রকাশন, পৃষ্ঠা-২২।

৭. ত্রিপাঠী, রামশঙ্কর, ১৯৯২, বসুবন্ধু বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, বারাণসী, বারাণমেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-২৮।

৮. চৌধুরী, সুকোমল, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৭৫ দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০১৭, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, কোলকাতা-৭০০০৭৩, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃষ্ঠা-৩২।

৯. চক্রবর্ত্তী, সত্যজ্যোতি, সেপ্টেম্বর ২০১৪, সায়ণমাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, পৃষ্ঠা-৫৬।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল, জানুয়ারী ১৯৮৮, বটকৃষ্ণঘোষ বিজ্ঞানবাদ, কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা-২৩।

১১. কর, গঙ্গাধর, ২০১৩, শ্রীকেশবমিশ্রবিরচিত তর্কভাষা, কলকাতা-৩২, যাদবপুরবিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-৭৭।

১২. বন্ধ্যোপাধ্যায়, সুনীল, জানুয়ারী ১৯৮৮, বটকৃষ্ণঘোষ বিজ্ঞানবাদ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা-২৬।

১৩. ত্রিপাঠী, রামশঙ্কর, ১৯৯২, বসুবন্ধু বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, বারাণসী, বারাণমেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-৬২।

১৪. চৌধুরী, সুকোমল, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৭৫ দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০১৭, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, বঙ্কিমচন্দ্রস্ট্রীট কোলকাতা-৭০০০৭৩, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃষ্ঠা-৫৩।

১৫. ত্রিপাঠী, রামশঙ্কর, ১৯৯২, বসুবন্ধু বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, বারাণসী, বারাণমেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-৭২।

Enhancing The Quality of Teacher Education Through Various Initiatives As Recommended By NEP -2020

Sudipta Kumar Das
Post graduate student, Department of education
University of Calcutta

ABSTRACT: Teacher education occupies an important role in the education system, Because achieving the highest educational outcomes, including overall improvement in education largely depends on the professional skills, dedication and knowledge of the teacher. Just as the teachers professional knowledge makes teaching in the classroom lively and interesting, it also inspire students to assimilate the educational content with interest. Skilled teaching is also essential in shaping students positive Outlook, so that students can progress according to their abilities and interest. Therefore the introduction and implementation of training programs in teacher education is a very significant. This program will help in developing skilled educators by identifying and developing the potential talent of those who will be actively engaged in the teaching profession in the future. In this context the NEP 2020, encourages various initiatives to reform the existing problem in teacher education and improve quality. Teacher education programs play an important role in the advancement of knowledge by making teachers ever of the goals and objective of timely education and teaching methods. This article discusses the quality of all the initiatives that have been taken into improve the quality of teacher education in the light of the NEP 2020,So that teachers can prepare themselves for future needs.
KEY WORDS: Teacher education, quality, initiatives.

INTRODUCTION:

The overall development of any state or nation lies in the quality education system of that country. After India gained independence in 1947, many reforms, expansion and innovation have been made in the education sector to foster the nation'sover all development. This indicate that, in pursuit of establishing a high quality education system has been seen in the thinking of the government, as well as the leadership and local individuals. As a practical reflection of this, the introduction of different education policy has been seen at different times. For example the national policy of education 1968, during the period of former prime minister Indira Gandhi, the national policy of education 1986, during the period of former prime minister Rajiv Gandhi and the national education policy 2020, during the period of the current prime minister Narendra Modi. All these policies

have made various recommendations to improve the quality of education as a tool for the overall development of the nation according to the situation. However the human resource associated with the education system that further improve the quality of the education is the teaching community. In order for the teaching community to use their extensive knowledge, intelligence and sound judgement to improve the quality of education and bring about the overall development of the society,it is necessary to develop the skills and abilities of teachers appropriately. The essential aspect for this is teacher education. This professional development education is significant in maximizing the skills and abilities of teachers in their professional field. But the reality is that as a developing country, India has not been very successful in providing a qualified teaching community. The key to addressing this problem is a quality teacher education plan. This plan will be helpful in providing timely knowledge and skills to teacher. In this context the third and most prominent education policy introduced by India is the national education policy 2020. The ministry of human resource development (MHRD) Government of India,chaired by Dr. K. Kasturirangan, released the final report of NEP 2020. One of the multifaceted recommendations made in the report is the necessary recommendation and their implementation to improve the quality of teacher education.

The 15th chapter of the national education policy 2020 deals with teacher education, and this chapter provide suggestions on improving the quality of teacher education in a total of 11 sub-point.

Various initiatives for teachers education as recommended by NEP – 2020

Society is constantly changing. Naturally the goals and objectives of education have changed in parallel with the change. It is the responsibility of the teacher to ensure that the educational process can be successfully implemented by maintaining the compatibility of educational goals and objectives with this changing social system. Therefore, the teacher's teaching should be quality, lively, interesting and in line with child psychology. Again the fade of our nation depends largely on teachers. Thus, this noble role of teachers has given the teaching profession the most respectable position in Indian civilization. Teacher need to be qualified through training, so that they can faithfully fulfill all these multiple responsibilities of the social system. To implement this objectives the NEP 2020 makes the following recommendation to improve the quality of teacher education.

A focuses on an multidisciplinary viewpoint:

Keeping in mind the current situation, the NEP 2020 emphasizes the importance of a multidisciplinary approach to teacher education. This perspective will help future teachers participating in the teaching profession to accurately identify the multifaceted needs of students in ongoing educational field, and develop them into effective and efficient educators through their satisfaction. This approach

deserves considerable praise for enhancing logical and reflective thinking and adaptive skills in different situations by integrating multidisciplinary branches of knowledge.

Encourages multilingualism in the preparation of Teachers:

One of the most striking manifestation of the diversity of Indian culture is linguistic diversity. Where the presence of multilingual students is normal in the classroom education system. In this regard, the national education policy 2020 calls for the inclusion of multilingual aspects in teacher education. So that classroom teachers can effectively communicate with and understand multilingual students. It is important for teachers to have sound knowledge of multiple language to instill values, respect and dignity in students towards different cultures and to make them proficient in using different languages.

Utilized digital platforms:

To meet the need for excellent teaching learning methods to provide excellent quality instruction, the NEP 2020 has initiated a special initiative to provide excellent quality training through online platforms like SWAYA, DIKSHA at the college and university level. This initiative is of great significance in enabling teachers to acquire knowledge related to the use of technology in teaching innovates new methods, and effectively perform teaching task.

Integrating teacher education with research and various departments of education:

In order for teachers to deal effectively with every practical aspect, including classroom teaching, in the changing circumstances, they need to be enriched with versatile and high – quality knowledge. In this regard, the national education policy 2020 talks about managing the teacher education program through inclusion in higher education institutions with various educational department such as history, geography, literature, sociology, music art's, physical sciences etc.

An excellent four year integrated B. Ed program :

The NEP 2020 has emphasized a four year integrated B.Ed. course as a teacher education training course. This program will be conducted in multidisciplinary Higher education institutions. This course will be conducted mainly through two programs: subject specific knowledge and subject related pedagogical knowledge. One of the main goals of the integrated B. Ed course is to create flexibility in the mental thinking abilities of students, create knowledge from various sources, and also to help teacher's acquire teaching skills in the classroom.

Establishment of a state entrance exam organization:

An important recommendation of the NEP 2020 is the formation of a state entrance examination body to accurately determine the eligibility criteria for

those interested in teaching. This exam play's an important role in maintaining uniform standards of teacher education across the country.

Ongoing professional growth:

It is very important for teachers to be aware of child psychology to accurately identify the different needs of student with different abilities in the classroom education system and to meet those needs with respect. In this context, the NEP 2020 recommends various initiatives to make teachers aware of continuous professional development. The necessary programs for professional development are workshop, seminars, technology education, contemporary education practices, experiential learning etc.

Improvement of the PhD program:

National education policy 2020 emphasizes improving the quality of PhD programs. Through which the students as well the artists society, i.e. teacher's get a comprehensive opportunity to acquire their own professional skills through practicing their teaching skills, writing skills, pedagogy, curriculum development, assessment methods and communication skills in real situation. This program plays a leading role in the radical transformation and improvement of the education system.

Emphasis on practical training:

In the multifaceted realm of knowledge, practical training is much better than theoretical training.which helps make the teaching and learning process practical and usable. Therefore,NEP 2020 has given the utmost importance to practical training in teacher education and also recommends the inclusion of practical content in the proposed curriculum in teacher education.

CONCLUSION:

In light of above discussion, it can said that the initiatives recommended in teacher education by the 2020 education policy have provided an opportunity to build or prepare teacher in a new way. To further enrich the quality of teacher education, we have placed the reformist aspect of teacher education at the fundamental center of education. Because the nep recognizes that teachers need training in pedagogy in addition to high quality content knowledge. It is essential for teachers to acquire the necessary skills to be successful in teaching and achieve the highest educational results, accordance with child psychology, while maintaining compatibility with the current situation. Therefore, the initiative of this policy in developing ideal qualities such as scientific mind, fulfillment of creative thinking, social and moral values and cultural mindset and along with the maximum development of Teachers professional skills in quite significant. Undoubtedly,the national education policy 2020 provides an ideal framework for implementing teacher education. It is expected to present a sustainable education system to the countrymen.

REFERENCE:

1. Kumari,S. (2024). NEP 2020 and teacher education: transforming teacher training programs. International journal of research culture society. 98 – 104.
Retrieved Form: https://ijrcs.org/wp-content/uploads/IJRCS202407016-min.pdf
2. Mahanta,B. (2023). Recommendations and challenges of teacher education in NEP 2020. Journal of emerging technologies and innovative research. 88 - 92.
Retrieved Form :https://www.jetir.org/papers/JETIR2305013.pdf
3. Das, Prasenjit. (2023). Teacher Education in the Light of National Education Policy-2020. 10.5281/zenodo.8332390.
Retrieved Form : https://www.researchgate.net/publication/369627532_Teacher_Education_in_the_Light_of_National_Education_Policy-2020
4. Basak, G. (2024). Prospects And Challenges Of Teacher Education On Nep 2020. EPRA International Journal of Research and Development. 9(3). 320-325.
Retrieved Form :https://eprajournals.com/IJSR/article/12628
5. Jana, Tapas & Chattopadhyay, K N. (2023). Education for Teachers: Considering the Significance of NEP 2020. International Journal of Research Publication and Reviews. 4. 1659-1663. 10.55248/gengpi.4.823.50988.
Retrieved Form: https://www.researchgate.net/publication/373206327_Education_for_Teachers_Considering_the_Significance_of_NEP_2020
6. Das, Tapash & Nandi, Ankur. (2022). A CRITICAL ANALYSIS OF RECOMMENDATIONS OF NEP 2020 TO REFORM TEACHER EDUCATION IN INDIA. 3. 06-14.
RetrievedForm: https://www.researchgate.net/publication/374261922_A_CRITIAL_ANALYSIS_OF_RECOMMENDATIONS_OF_NEP_2020TO_REFORM_TEACHER_EDUCATION_IN_INDIA.

Adding "Sex" to Sex Education : A discussion on Consent, Desire and Positive Sexuality

Biswayan Bhandari
First Year Post Graduate Student, Department of History
Jadavpur University

Abstract: Sex Education in school has become a necessity as it is directly linked to sexual and reproductive health of the Young Adults. With the spread of the propaganda, highlighting the importance of practicing safe sex among the Young Adults and the corresponding absence of discussion on sex in schools, has brought to the forefront, the importance of Sexuality in Education. This Paper highlights the importance of developing a healthy discussion on sexual health in school by focusing on the concepts of Consent, Desire and Positive Sexuality. Thus, this paper argues that sex education should be subtracted from the fear element which has always stymied a healthy understanding of ones sexuality. By adding back the "sex" component in sex education, it is believed it will improve the overall reproductive health of the Young Adults.
Keywords: Sex Education, Positive Sexuality, Consent, Desire, Young Adults.

The American library Association defines young Adults as individuals between 12 and 18 years of age. According to Erikson (1963), the fifth stage i.e. in this time period of psychosocial development there is something that is " between the morality learned by the child, and the ethics to be developed by the adult". It is a time period when they are in a stage somewhere between a child and an Adult. During Adolescence, teenagers are learning to define who they are and they try to develop their own values.

Defining Consent

Consent has been described as an "internal state of willingness" , ' an act of explicitly agreeing to something ' , and behaviour that someone else interprets as willingness ' (Muehlenhard et al. 2016, 462). Consent may be communicated directly, indirectly, verbally and /or non- verbally (Beres 2007). While perhaps not an unreasonable starting point, there arise complexities regarding how , in practice, consent and refusals are or are not communicated, what, exactly, is experienced and interpreted as willingness, and whether and how willingness (or lack of) is associated with explicit agreement. 'Explicit agreement ' suggests consent must be directly/verbally given and should not be assumed by the apparent absence of a refusal(see Beres 2007). These principles underpin the ' affirmative consent model', which requires the initiators of sex to secure verbal agreement for sex, whereby 'no means no' but also anything less than 'yes'

doesn’t constitute consent. Affirmative consent is described as offering freedom from force and coercion through a sex positive ‘eroticisation’ of consent as a basis for mutually wanted sex (Mueller and Peterson 2012) to which, Piemonte et al.(2022) found, young people may be receptive. Yet, many young people nevertheless interpret the absence of a ‘no’ or ‘no response’ signals as passive and non-explicit indicators of consent, and indirect and nonverbal consent communication predominate within young people’s sexual cultures.(Righi et al. 2021). The requirement for free and informed choice, given with capacity, is upheld in law in England and Wales (Sexual Offences Act 2023).

Defining Desire

Desire refers to the psychological aspect of sexuality, particularly fantasies, operating both consciously and unconsciously. It is distinct from both the biological aspects of sexuality- the body and its sensations, its ability to reproduce, and sexual acts- and the social and political aspects, including sexual identity and sexual relationships.

Locating Desire in Men’s Mind

The idea that the body is an important site for the exercise of power can be located withina Foucaultian framework in which the risk of capitalism can be seen to create a new domain of political life, referred to by Foucault (1978) as “bio power”(p.140). Foucault saw sex as a political issue, crucial to the emergence and deployment of biopower: “It[sex] was at the pivot of the two axes along which developed the entire political technology of life. On the one hand it was tied to the disciplines of the body: the harnessing, intensification and distribution of forces, the adjustment and economy of energies. On the other hand, it was applied to the regulation of populations, through all the far- reaching effects of its activity”.(P.145) In school Children’s it is seen that “heterosexual relations” are considered as natural and there is little understanding about the term. A central theme in the demonstration of an esteemed masculinity is the notion of “knowing it already” in matters of sexuality. In the male peer group, heterosexual activity is valorised and frequently spoken about in terms of conquest and prestige (Wood 1984).There are a lot of things that are heard for example exploring desires through sexual intercourse with a female body, already knowing about sex and a lot of talk about porn, masturbation and pornography. It is I guess worthy to note that the male bodies at school/children view seeing porn as a negative and a poor substitute for sex with a woman as there is a missing discourse of desire

Locating Desire in Female’s Body

In a Patriarchal Society, female’s voices are mainly unheard and their expressions are limited by the male bodies. Here, male dominance over the female’s body and suppression of voices that lead to victimization and limited freedom of the voices can be noticed. Girl Students in schools do have sexual

desire but they are unable to find a path to channelize it or to express it at their own free will. School serves as a place of masculine power site mainly and authorities also try to suppress the desire of female voices. It is important to note that Abuse and Negligence is common in the life or the private sphere of female bodies. For example- Whether in a classroom, on the street, at work, or at home, the adolescent female's sexuality is negotiated by, for, and despite the young woman herself. Patricia, a young Puerto Rican woman who worried about her younger sister, relates: "You see, I'm the love child and she's the one born because my mother was raped in Puerto Rico. Her father is in jail now, and she feels so bad about the whole thing so sheacts bad". For Patricia, as for the many young women who have experienced and / orwitnessed sexual violence, discussions of sexuality merge representations of passion withviolence. Often the initiator of conversation about peers about virginity, orgasm, "getting off", and pleasure, Patricia mixed sexual talk freely with references to force and violence.

Importance of sex education in schools

Sex education should be implemented in schools due to its many benefits to teenagers. The implementation of sex education in schools will provide teenagers with the correct information to enable them to make the right choices in life. On the other hand, some have claimed that implementing sex education in schools actually promotes the risk of sex and is ineffective. However, based on various research findings, it is shown that sex education is effective by reducing the rate of teen pregnancy, providing correct information and also decreasing the number of HIV, AIDS and STDs caused among teenagers. Hence, sex education encourages healthy teen sexuality. Young people have the right to lead healthy lives. Providing youth with honest, ageappropriate sexual health education is a key part in helping them to take personal responsibility for their health and well-being. Our children and youth grow up in a rapidly changing world where globalization and technological advancements expose them to a wide range of influences from around the world. They need to acquire the knowledge, skills, values and attitudes which will allow them to develop healthy and responsible relationships and make informed and responsible decisions. While parents play the primary role, schools have a complementary role in providing sexuality education as part of a holistic education. With accurate, current and age-appropriate knowledge, and social and emotional skills, children and youth will be equipped to protect themselves from sexual advances and abuse, and avoid sexual experimentation and activities that lead to problems related to teenage pregnancies and STIs/HIV.

"Positive" Refers to Strengths, Wellbeing, and Happiness

Positive sexuality, similar to positive psychology and a strengths perspective, includes the recognition that people have an assortment of personal strengths and also unique sexualities. People are capable of drawing from their existing

strengths to resolve problems and be happier and more fulfilled, including developing their sexual identities and expressing their sexuality. Positive sexuality, then, is concerned with how people are, or can be, happy and fulfilled with their unique sexualities and sexual expression, which contributes to their overall wellbeing and quality of life.

Individual Sexuality is Unique and Multifaceted

Positive sexuality also begins with the recognition that each person's sexuality is unique and multifaceted. Drawing on the World Health Organization's (WHO, 2006) definition we observe that sexuality involves a diverse array of aspects including roles and identities, preferences and orientations, relationships and activities, pleasures and desires, scripts and fantasies, as well as values and beliefs. These aspects are shaped by the "interaction of biological, psychological,social, economic, political, cultural, ethical, legal, historical, religious and spiritual factors "One of the implications of this is that sexuality is shaped by factors both internal and external to the self. Hence, people often experience some aspects of their sexuality as relatively given and fixed, while other aspects may be experienced as much more fluid and malleable (Diamond,2009). It is important to understand, though, that what is fixed and what is fluid varies significantly both fromperson to person as well as across the life course as people not only make conscious choices to change their sexuality, but also as they inhabit new contexts and participate in new situations that inevitably also lead to change (Sassler, 2010). What we discover, then is that each person has a unique sexual history that contributes to, and helps provide, that person with a unique sexual narrative (Plummer, 1995). In turn, most people find that these narratives form an integral part of who they are, both through the interaction that these narratives have with other characteristics and dimensions of the self, as well as through the role that these narratives play in the development of a person's overall sense of identity (Brottoa, Heiman, & Tolman, 2009).

Positive Sexuality Embraces Multiple Ways of Knowing

Sexuality has been explored and interpreted from diverse disciplines, epistemologies, methods, and theoretical frameworks. Positivist, post positivist, critical, postmodern, and post structural approaches now shape the production of knowledge across many disciplines. More than ever before, scholars are recognizing the value in utilizing a wide range of methodological approaches to more thoroughly understand their topics. Each approach, of course, may have specific scholarly criteria associated with it and will yield unique understandings. Indeed, over a dozen years ago, Gergen (2001) explored how multiple and diverse methods may coexist to enrich and revitalize psychological science.

Positive Sexuality Reflects Professional Ethics

Most professions that interact with the public have a code of ethics to guide decision making, and in particular, to prevent actions based on self-interest, and to prevent discrimination and injustice. For example, the American Bar Association and the American Institute of Certified Public Accountants require putting clients first, and accountants have the added utilitarian requirement of serving the public good ahead of serving their clients.

Positive Sexuality Promotes Open, Honest Communication

Being sex positive means going beyond basic reproductive biology and being free to discuss a full spectrum of sexual attitudes and behaviors. Not only does this include communicating one's needs and wants from a sexual perspective, but also recognizing that communication and negotiation are essential to positive sexual interactions and outcomes. Even though open communication about sex is not the status quo in current American culture, many books and articles, both in pop culture and in academia, discuss good communication as being the key to a happy and healthy sex life.

Positive Sexuality is Humanizing

A sex positive approach acknowledges diverse problems associated with sexuality andseeks to help resolve them, but it does not use language that devalues people. While it is true that sometimes people can engage in problematic, even atrocious, behaviour, people are still human beings. Therefore, our position is that language should not dehumanize or demonize. Terms that contribute to stereotyping, function to establish in-group versus out-group behaviour, imply that sexuality and related behaviours are unclean or unhealthy, or stigmatize are not consistent with positive sexuality.

Positive Sexuality Encourages Peacemaking

The use of humanizing language is directly connected to the notion of peacemaking. Over the course of his long and distinguished academic career, Hal Pepinski (2002, 2013) has drawn from knowledge and wisdom across diverse cultures and social spaces to assemble a theory of peacemaking criminology. While peacemaking applies to community and societal issues (including to promote healing via restorative justice), Pepinski (2013) also sees it as a self-discipline. He suggests that people must find their own path to making peace. According to Vitello (2003), people are invited to explore their own personal emotional pain, so that they can then better understand the pain of others, which often contributes to problematic, sometimes even atrocious, behaviour. While violence is a reaction to emotional pain and fear, peacemaking centres on compassion and love (Pepinski, 2013).

Positive Sexuality is Applicable across all Levels of Social Structure

As sexuality is an integral part of who we are as people, it thus permeates, directly or indirectly, all aspects of human life. Positive sexuality, then, is

relevant across all levels and types of social structure. At the micro level, many individuals struggle with how to understandand express their unique sexualities. The history of sexuality in western society is steeped in negativity, thus many people may feel guilt and shame regarding their sexual curiosities and desires. Many younger people have difficulty establishing their sexual identities or successfully merging their sexuality with other aspects of their identities. At the mezzo level, various sexuality issues are not uncommon, of course, in families and small social groups. Finally, as suggested earlier, positive sexuality may have tremendous potential in helping to resolve important social problems inneighbourhoods, organizations and workplaces, and communities.

Conclusion

To conclude, Sexuality in Education has been a topic of debate for a long period of time. Personally in my P.O.V., there was no sex education in our school. It would be better if there was sex education in our school. As there was the element of "sex" missing there was curiosity at the peak and sex talk was common and to note, there was a presence of fear factor which negatively affected the reproductive health of the Young Adults. Schools should take the responsibility to impart sex education rather than silencing voices. By imparting proper sex- education there will be a holistic understanding regarding sex and it will provide Young Adults with right information and healthy reproductive health and mental well-being .

References

1. Dawson.(1986). *The Effects of Sex Education on Adolescent Behavior. Family Planning and Perspectives,* 18,162-170.
2. Connell, R.W.1995.*Masculinities . London: Polity*
3. Easthope, A.1990,*What a man's gotta do: The masculine myth in popular culture. Boston: Unwin Hyman.*
4. Foucault, M.1978. *_The History of Sexuality._* Vol.1, translated by R . Hurley . Harmondsworth, UK:Penguin.
5. Albanesi,H.P.2009.*"Eschewing Sexual Agency:A Gender Subjective Approach."*Race , Gender and Class 16(1/2):102-132
6. Albury, K. 2013.*" Young People , Media and Sexual Learning: Rethinking Representation."* Sex Education 13(sup1): S32-S44.
7. Barkee,M. 2013.*"Consent is a Grey Area? A Comparison of Understandings of Consent in Fifty Shades of Grey and on the BDSM Blogosphere."* Sexualities16(8) : 896-914.

An Overview of Dalit Theatre and Readers' Response in the Light of Translation Studies

Debashis Biswas
Assistant Professor, Department of English
Raidighi College, West Bengal, India

Abstract: Dalit theatre is an integral part of Indian literature and culture. It represents the struggles, aspirations, and resilience of marginalized communities in India. This paper examines the role of Dalit theatre in reshaping cultural narratives, focusing on how translation studies facilitate its global reach and readers' responses. Translation acts as a bridge that connects the localized, vernacular expressions of Dalit experiences with a broader audience, amplifying the socio-political impact of these works. This study explores the challenges and opportunities inherent in translating Dalit theatre and how readers respond to such translated works, thereby contributing to the discourse on identity, power, and representation.
Keywords: Dalit theatre, Translation studies, Readers' response, Identity and Representation.

Introduction:
Dalit literature has emerged as a powerful voice against caste oppression, offering insights into the lived experiences of communities relegated to the margins of Indian society. Dalit theatre, a subsection of Dalit literature, uses performance to critique societal norms, question historical injustices, and advocate for equality. The intersection of Dalit theatre and translation studies is particularly significant in the context of globalization, as it allows these narratives to transcend linguistic and cultural barriers. This paper provides an overview of Dalit theatre, explores the theoretical framework of translation studies, and analyses readers' responses to translated Dalit plays.

Historical Context of Dalit Theatre
Primarily, Dalit theatre originated in the Marathi-speaking area and developed with the Dalit Panther Movement[1] of the 1970s. Later, it emerged as a cultural movement in the latter half of the twentieth century, coinciding with the rise of Dalit literature. This period saw a growing awareness among Dalit writers and performers about the potential of theatre as a platform to contest caste hierarchies and articulate resistance. Inspired by the writings of Dr. B. R. Ambedkar (1891-1956) and other social reformers such as Jyotiba Phule (1827-1890), Savitribai Phule (1831-1897), and Periyar (1879-1973), Dalit theatre employed indigenous forms of storytelling, folk traditions, and modern dramaturgy to reflect the

realities of caste-based discrimination and the quest for dignity.The development of Dalit theatre originated as a resistance against caste-based discrimination and social injustice. It draws heavily from oral traditions, folk performances, and the lived experiences of Dalit communities. The themes of Dalit theatre often revolve around identity, oppression, resistance, and empowerment. Distinguished Dalit playwrights, such as Baburao Bagul, Daya Pawar, Datta Bhagat, Namdeo Dhasal in Maharashtra, Kotiganahalli Ramaiah in Karnataka, Omprakash Valmiki in Uttar Pradesh, and Raju Das in West Bengal utilized the stage to address the issues of social injustice, economic exploitation, and cultural alienation. In West Bengal, Nakul Mallik started the Bangiya Dalit Sahitya Sammelan in 1987 and later published the quarterly magazine, "Dalit Kantha". In 1994 *Chaturtha Dunia* was published by the Bangla Dalit Sahitya Sanstha as a protest of the death of Chuni Kotal, a tribal girl in Vidyasagar University for caste discrimination (Chatterjee and Biswas 18). Gautam Halder, one of the theatre practitioners in Bengal, directed Jasimmuddin's epic *Sojan Badiyar Ghat*. He is the son of Gayendranath Halder, one of the pioneers of the Dalit movement and the companion of Jogen Mandal. His performance in the play is the best of Dalit plays ever performed (Chatterjee and Biswas19). Their plays often featured themes of defiance and resilience, employing stark realism and symbolic narratives to engage audiences. For instance, Baburao Bagul's play *Jevha Mi Jaat Chorli Hoti* (When I Hid My Caste) portrays the pervasive discrimination faced by Dalits, evoking empathy and outrage among viewers.The performances of Dalit theatre employ innovative techniques, blending traditional art forms with modern theatrical elements. For instance, folk music, rituals, and storytelling in plays such as Vijay Tendulkar's *Kanyadaan* serve to ground these works in local cultural contexts while addressing universal themes of human dignity and social justice.

Translation Studies and Dalit Theatre

Translation plays a crucial role in making Dalit theatre accessible to audiences beyond its regional and linguistic boundaries. The act of translating Dalit theatre involves more than linguistic conversion; it requires an understanding of the cultural, historical, and social nuances embedded in the source text. Translators must navigate the challenges of retaining the authenticity of Dalit voices while making them comprehensible to global readers.

Translation studies provide a framework to analyse how Dalit theatre is interpreted and received in different cultural contexts. Theories such as Lawrence Venuti's domestication and foreignization, and Gayatri Chakravorty Spivak's concept of ethical translation, offer valuable insights into the translation of Dalit works. Venuti's emphasis on retaining the "foreignness" of the source

text aligns with the intention to preserve the cultural specificity of Dalit narratives. In his seminal work *The Translator's Invisibility*, Venuti writes:

"A foreignizing translation seeks to register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader abroad by drawing on the entire range of a major language to signify the foreign" (Venuti 15).

Similarly, Gayatri Chakravorty Spivak's work emphasizes the significance of understanding the politics of language in translation, particularly concerning marginalized voices. In her essay "The Politics of Translation," Spivak argues that translation is not merely a linguistic act but a cultural and political one, requiring sensitivity to the original context and the power dynamics involved. She contends that translators must engage deeply with the socio-political dimensions of the source material to preserve its rhetorical and ideological nuances (Spivak 179-200).

Dalit theatre, however, is deeply rooted in Dalit communities' cultural practices, rituals, and dialects. Translators must grapple with preserving the cultural authenticity and emotional intensity of these works while making them comprehensible to a non-native audience. For example, translating the Marathi term "Dalit" itself involves intricate nuances, as it signifies both a socio-political identity and a collective consciousness of resistance. Homi K. Bhabha's concept of the "third space" mentioned in his essay "Cultural Diversity and Cultural Differences," in *The Location of Culture* (1994) is pertinent in this context. According to Bhabha, the third space is:

"...the cutting edge of translation and negotiation, the in-between space—that carries the burden of the meaning of culture" (Bhabha 38).

It mentions that hybridity emerges in translation. Translators often create a mediatory space where the source and target cultures intersect, allowing for a dialogic exchange of meanings. In the case of Dalit theatre, this process entails negotiating the tensions between fidelity to the source text and the need for accessibility in the target language.

In India, translated Dalit theatre has fostered cross-regional solidarity and raised awareness about caste issues. Such awareness is necessary to get a proper understanding of casteism. In this case, translation plays a significant role in reaching its readership. When translated into Hindi or English, plays such as Daya Pawar's *Baluta* or Namdeo Dhasal's *Golpitha* have reached audiences beyond Maharashtra, prompting critical discussions about caste discrimination. Readers often respond to these works with a mix of empathy, outrage, and introspection, acknowledging their relevance to contemporary social struggles.

Linguistic Challenges

The linguistic diversity of Dalit theatre poses another challenge for translators. Most of the Dalit plays are written in regional languages (specially Marathi, Bengali, Tamil, and Hindi), incorporating dialects and idiomatic expressions

unique to specific communities. These linguistic elements are integral to the authenticity and impact of the plays, as they reflect the lived experiences of Dalit individuals. Translators must strike a balance between retaining these elements and ensuring that the translation resonates with the target audience. For instance, in translating a Marathi play like *Uchalya* (*The Branded*), the translator must convey the sociolect of the protagonist's community without resorting to exoticization or erasure. Strategies such as glossing, footnotes, or creative equivalence can help to make a bridge between the source and target languages while preserving the essence of the original text.Such strategies are necessary mostly for all translated works in Dalit theatre.

Readers' Response to Translated Dalit Theatre

Translated Dalit theatre has the potential to evoke empathy and raise awareness among diverse audiences. By exposing readers to the harsh realities of caste oppression, these works challenge dominant narratives and foster critical engagement with issues of social injustice. For example, the English translation of Omprakash Valmiki's play *Joothan*[2]has been instrumental in bringing the plight of Dalits to the attention of an international readership. In the play, "Fight for Land", we can see how the Mulnibasi people are always trying to protect land and nature for themselves and all. On the other hand, the Government is trying to snatch the land in the name of "Unnayan" (Development) and deliver it to the industrialists for their benefit. The play "Fight for Land", originally written in Bengali *জমির লড়াই* by Raju Das, a Bengali Dalit playwright and translated into English by me (Debashis Biswas myself), is a text for the protection of land and nature. Nobody cares about the basic rights of the Mulnibasi people who are the true protectors of nature "…Ma, we are going to protect and resist our Mother Earth from rape by the Aryan community…" (Chatterjee and Biswas107). They protect the land which is the most indispensable part of nature. Even, they are destabilized from their land. They are constantly struggling to protect their land against the Government which has come to power as a representative of those people. Even death comes by murdering the Mulnibasi youths "…Ma, the Aryan raiders murdered them…" (Chatterjee and Biswas107). The text focuses on a great class and caste struggle between the powerful and the powerless, the political power, and the powerlessness of the poor Mulnibasi people. The English translation of Baburao Bagul's seminal play, *Jevha Mi Jaat Chorli Hoti* (When I Hid My Caste) illustrates the complexities of translating Dalit theatre. The play's portrayal of systemic oppression and its poignant dialogues demand careful rendering to retain their emotional impact. Translators must navigate the cultural and linguistic nuances of the text while ensuring that the translation resonates with a non-Marathi-speaking audience. So in translating a text of Dalit theatre, a reader and a translator must face challenges to represent the malicious and deprived veracity of Dalit's life. Their cultural and ideological contexts

shape readers' responses to translated Dalit theatre. While some readers may approach these works as a window into a marginalized community's struggles, others may interpret them through the lens of universal human rights or postcolonial resistance. Such interpretive shifts highlight the dynamic nature of translation, as it mediates between multiple layers of meaning. Despite its potential for fostering empathy, the reception of translated Dalit theatre is not without challenges. Readers from privileged social backgrounds may struggle to fully grasp the nuances of caste-based discrimination, leading to superficial or reductive interpretations. Moreover, the commodification of Dalit narratives in global literary markets raises ethical questions about representation and agency. Translators and publishers must remain vigilant against the risk of appropriating Dalit voices for commercial gain.

For international readers, translated Dalit theatre serves as an entry point into the caste-based realities of Indian society. These works challenge stereotypes and broaden the global understanding of social justice movements. However, readers unfamiliar with the intricacies of caste may struggle to fully grasp the cultural and historical context of these plays. This underscores the importance of providing supplementary materials, such as glossaries and critical introductions, to enhance readers' comprehension and engagement. The translation of Dalit theatre has facilitated its inclusion in global discourses on race, class, and identity. Comparisons between Dalit struggles and other forms of systemic oppression, such as racial discrimination in the United States or Indigenous marginalization in Australia, highlight the universal relevance of these narratives. Readers often draw parallels between Dalit experiences and their own socio-political realities, fostering a sense of solidarity and shared resistance.

Conclusion

Dalit theatre, with its powerful critique of caste oppression and celebration of resilience, occupies a unique place in Indian and global literary traditions. Translation studies play a pivotal role in amplifying the voices of Dalit playwrights, enabling their works to transcend linguistic and cultural boundaries. While challenges remain in preserving the authenticity and performative essence of Dalit theatre, the transformative potential of translation cannot be overstated. Readers' responses to translated Dalit plays reflect a growing recognition of the importance of these narratives in shaping a more inclusive and equitable world.

Dalit theatre, as a vibrant and transformative cultural form, holds immense potential for challenging social hierarchies and promoting social justice. Through the lens of translation studies, Dalit theatre mediates readers' responses and shapes the global understanding of Dalit experiences. While translation presents significant challenges, it also serves as a powerful tool for fostering empathy, raising awareness, and amplifying marginalized voices. By

bridging the gap between local experiences and global audiences, the translation of Dalit theatre not only enriches literary traditions but also contributes to the broader struggle for social justice. As translators, readers, and scholars continue to engage with Dalit works, the enduring relevance of these stories underscores the power of literature to challenge inequalities and inspire change for better prospectsin society and respect in living.

Notes:

1. The Dalit Panther Movement was a radical social and political movement established in 1972 in Maharashtra by young Dalit activists inspired by the Black Panther Party in the United States. It emerged as a reaction to the oppression of the caste system, social injustice, and the economic exploitation of Dalits (formerly known as "untouchables") within the Indian caste system. The movement aimed to affirm the identity of the Dalits, to oppose caste-based atrocities, and to demand equality and justice.The movement symbolizes resistance and empowerment for marginalized communities in India.

2. The word ‘Joothan’ originates from Hindi. It means ‘leftover’. The food which is left behind after consumption is called Joothan. Here the leftover food acts as a prey for a community to which Valmiki belongs.

References:

1. Bagul, Baburao. *Jevha Mi JaatChorli Hoti (When I Hid My Caste).* Translated by Jerry Pinto,Speaking Tiger,2018.
2. Bhabha, Homi K. *The Location of Culture.* London/New York: Routledge, 1994, p. 38.
3. Chatterjee, Debi, and Asit Biswas, editors. *Dalit Protest Unbridled: Two Dozen Plays of Raju Das—A Collection of Drama.*EkushShatak, 2022.
4. Dhasal, Namdeo. *Golpitha.* Translated by Dilip Chitre, Oxford University Press, 1973.
5. Laxman,Gaikwad. *Uchalya (The Branded).* Translated by P.A. Kolharkar, Delhi: Sahitya Akademi, 2009.
6. Pawar, Daya. *Baluta.* Translated by Jerry Pinto, Speaking Tiger, 2015.
7. Spivak, Gayatri Chakravorty. “The Politics of Translation.” *Outside in the Teaching Machine*, Routledge, 1993, pp. 179-200. Accessed 23 Dec. 2024. https://pierre-legrand.com/16spivak.pdf
8. Tendulkar, Vijay. *Kanyadaan.* Translated by Priya Adarkar, Seagull Books, 1996.
9. Valmiki, Omprakash. “Joothan: A Dalit's Life”, Trans. Arun Prabha Mukherjee, Samya Print, 2003.
10. Venuti, Lawrence. *The Translator’s Invisibility: A History of Translation.* 2nd ed., Routledge,2008, p.15.

India-Bangladesh Relations : Strategic Engagement in Water, Connectivity and Boundary Dynamics (1999-2022)

Minakshi Sarkar
Research Scholar, Dept. of International Relations
Jadavpur University, Kolkata

Abstract: India and Bangladesh are two neighboring countries in South Asia. Several rivers enter their borders through India. But in India, the Farakka Dam has been built in Murshidabad district to overcome the siltation problem of the Ganges River. History says that when the flow of the Padma in Bangladesh decreased due to natural reasons, a water sharing agreement was signed in Delhi in 1996. However, the water sharing agreement between Modi and Sheikh Hasina was made excluding the water sharing of the Kushiyari River. Due to West Bengal's objection, the Teesta River did not come into effect. However, it cannot be denied that this river agreement has special importance in international relations.

In that case, the objective of this research paper is to identify the boundaries and areas of contact between India and Bangladesh with the river agreement, so that a new direction of strategic politics and relations between India and Bangladesh can be revealed. In this regard, it is worth noting that despite the vigilant guarding of the barbed wire fence at the border, the problem of infiltration is causing a radical change in the demographic structure of India.

In the field of transport and communication with Bangladesh, the Chicken Neck of North Bengal is an important geographical location. Especially in the issue of movement and protection of the rights of the Seven Sisters, India has to resort to a strategic foreign policy to keep the Chicken Neck in its possession. Where China-Bhutan-Bangladesh are constantly attacking India for their own interests. In the main research paper, those strategies will be analyzed with appropriate quotes and references in the context of India-Bangladesh relations.

Key-word: *India, Bangladesh, river, agreement, international relations, foreign policy, Chicken Neck.*

Main Article :

Introduction

In 1947, British rule was removed from India. But with that, as the independence of India was true, a sad separation was also associated with that truth. Because India did get independence, but that independence divided India into two, and a

state Pakistan was formed on the basis of religion on the basis of the two-nation theory. Some of which remained in the west of India. And some of which remained in the east of India. Which some historians once identified as East Pakistan. But history says that in 1971, East Pakistan started a war of liberation against West Pakistan. The aim was to get rid of the Urdu language-based aggression of West Pakistan. In this context, a researcher Sudipta Ghosh writes in her article on 'Heritage and Legacy of History'—

> "March 25, 71 became the night of the most terrible genocide in the history of the world. Standing on the fighting blood of unarmed Bengalis, the Pak army reveled in the festive joy of transforming the death march from hundreds to millions. But the dream of the Bengalis could not be suppressed. On March 26, 71, against the genocide of the Pak army, the leader of the nation, Mujibur Rahman, declared the independence of Bangladesh. Which was realized on December 16, 1971, at the cost of a lot of blood. Although this memory of the liberation war is different for each person, the common thread was the end of the occupation of West Pakistan. Where their dream was to form a golden Bangladesh. The realization of the dream of living in peace and doing their own thing. Where there will be no military rule, no unnecessary oppression of the state against the common people."[1]

The then Prime Minister Indira Gandhi played a special role behind the emergence of the newly independent Bangladesh after its liberation from West Pakistan. Because she sent the Indian army to express support and sympathy for the liberation war of Bangladesh. And it was her formula that India got another newly independent Bangladesh as a neighbor in its eastern part. A new era of determining mutual foreign policy was written. India has continued its full cooperation to gradually take Bangladesh to the peak of development in that area. In that case, among the issues on which the mutual relations and cooperation of India and Bangladesh regulate their foreign policy, it can be noted that the strategic water sharing agreement between Bangladesh and India, mutual connectivity, communication system and border area problems and those related areas.

Based on which it can be said that the foreign policy of both countries is determined. In this context, while there was a flexible area of strategic cooperation between India and Bangladesh during the Congress rule, Narendra Modi's 3.0 foreign policy has seen a more flexible and stricter approach to the strategic process than flexibility. Because, currently, the intrusion of Pakistan and sometimes China in the relations between India and Bangladesh, their aggressive mentality, has had a devastating effect on the relations between India and Bangladesh. And judging from that perspective, Narendra Modi's 3.0 foreign

policy can be a big step against that aggressive policy of China. In this context, Prabir Dey wrote in an article in 'The Economic Times' about Narendra Modi's 3.0 foreign policy—

> “India is becoming increasingly integrated with neighbouring countries and regions. Bilateral partnerships with Australia, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Indonesia, Japan, Kenya, Korea, Mauritius, Oman, Tanzania, Singapore, Sri Lanka, etc. will continue to thrive during PM Modi’s third term. India might opt for more bilateral strategic partnerships and services-led FTA such as with the Philippines.”[2]

India-Bangladesh relations and water-sharing policy

The friendship between India and Bangladesh was further strengthened on March 9, 2021, with the inauguration of the ‘Friendship Bridge’ over the Feni River, which borders Bangladesh and India, by the Prime Ministers of the two riparian countries. Water has been an important determinant in defining Bangladesh-India relations since the birth of Bangladesh. A total of 54 rivers cross each other’s borders. The 50-year-old water-centric political relationship between the two countries can be described in a word as “sour”. The origin of this “sourness” is the result of the Indo-Pakistani relations when today’s Bangladesh was part of East Pakistan. While some of the reasons for that sourness can be specified, it is not yet possible to do all of them. In this context, Nilanjan Ghosh wrote about the strategy and mutual objectives of water sharing between Bangladesh and India—

> “Bangladesh-India transboundary water relations must be seen in the context of the geographical area of the Ganges-Brahmaputra-Meghna basin. So far, the most contentious issue in the water-centric political relations between the two countries is the Farakka Barrage. The barrage is located approximately 16.5 km upstream from the Bangladesh border. The dispute began when the barrage was being designed. At that time, present-day Bangladesh was in East Pakistan. The barrage was commissioned in 1975. The main purpose of the barrage was to increase the flow of water in the Bhagirathi-Hooghly River to remove silt and revive the Kolkata Port. Meanwhile, Bangladesh feared that the barrage and its feeder canals located downstream of the river would reduce the water in the main stream flowing to Bangladesh during the dry season. The Ganges Water Sharing Agreement (GWA) of 1996 between India and Bangladesh ended this deadlock. At that time, this agreement was supported by the then ruling party of West

> Bengal, and the Chief Minister and Finance Minister in particular took an active role in this matter."[3]

The agreement stipulated the amount of water that would flow through the Farakka Barrage during the dry season, i.e., January to May. The data shows that India has been strictly adhering to it. It may be mentioned here that some recent data from the Joint Rivers Commission shows that Bangladesh has received much more water at its first gauging station, Hardinge Bridge, than the amount released from the barrage. The reason for this excess water flow is either due to more water coming in from the Mahananda and Pagla rivers — both of which cross the Indian border to join the Bangladesh Ganges — or to the water flowing underground rising up. The real reason is yet to be ascertained.

While the above information is good news on one hand, it is also problematic on the other. There is no denying that the Farakka Barrage was conceived in terms of a 'reductionist engineering paradigm', which only thinks about how much water is available in the river valley. It does not look at the larger ecosystem of the valley. In this context, the GWA is the product of the smaller circle of thinking that 'mathematical hydrology' has brought to India's water governance. Rivers like the Ganges from the Himalayas bring a large amount of sediment that turns into soil and increases the fertility of the land – this is not mentioned in the GWA. That is why the agreement only mentions the issue of water flow, but does not say anything about what is to be done with the sediment or what role it plays in the ecosystem.

The silt accumulation upstream of the Farakka Barrage has led to allegations that it is hindering the soil formation process of the delta, and as a result, it is also having a negative impact on various parts of the Sundarbans. There is a perception that the delta was originally formed by the silt carried by the Koshi River (a tributary of the Ganges from Nepal), which is now being trapped in the barrage. As a result, the important supporting services to the ecosystem of the valley that would have rejuvenated the delta's soil are being disrupted. The delta is already suffering from sea level rise, saltwater intrusion and consequent land loss. The GWA was for 30 years and will expire at the end of 2026. Therefore, it is essential to hold discussions keeping in mind the concerns related to sediment and the delta in mind in preparation for the period after 2026. Then another new dimension will be added to the Bangladesh-India water diplomacy.

While the GWA or Friendship Bridge over the Feni River is a positive development in the water diplomacy of both the countries, the Teesta River is still a source of contention between the two countries. The main issue is the distribution of water flow during the dry season (December to May). This is the time when irrigated Boro rice is cultivated in both West Bengal and Bangladesh. In an ad hoc agreement in 1983, 39 percent of the water was given to India and

36 percent to Bangladesh, and nothing was said about the distribution of the remaining water. But it expired within two years. The attempt by the governments of Bangladesh and India to conclude an agreement in 2011, as recommended in 1984, failed due to objections from West Bengal. The improvement in irrigation due to hydrological interventions has further increased the tendency of dry season paddy cultivation in both Bangladesh and India, and neither seems to have any desire to reverse it. However, another factor is also responsible for this, namely the minimum support price regime, which has changed the terms-of-trade and made farmers interested in cultivating paddy on much larger areas than dry food grains since the 1980s and 1990s.

The institutional and governance impasse between Bangladesh and India over the Teesta is due to the fact that the Indian constitution has made water a state subject. The federal structure of water governance in the Indian Constitution makes it impossible for the Centre to enter into any agreement with Bangladesh if West Bengal is unwilling. Therefore, Teesta has now become a matter of 'conflictual federal structure', where the Centre and the West Bengal government have different views on the use of water. It is important to understand that the future of Bangladesh-India water relations will not be determined solely by what New Delhi and Dhaka think, but will also depend on the federal position on the Centre-State relations and the transboundary water policy. In the case of GWA, West Bengal took an active role in implementing it, while in the case of Teesta, the opposite has happened. Therefore, Bangladesh-India transboundary water relations will always be a 'two-level game' from the Indian side.

India-Bangladesh relations and various strategic areas of connectivity

Bangladesh is going through an unprecedented political transition, which has shrouded its future development trajectory in uncertainty. Former Prime Minister Sheikh Hasina's uninterrupted 15-year term ushered in stability in the country, which has attracted foreign investment in transport, energy and digital infrastructure development. During this period, project aid has emerged as a preferred mode among Bangladesh's development partners, accounting for the largest proportion of overall foreign aid. Under Sheikh Hasina's premiership, with a development pipeline of nearly US$8 billion, India has emerged as Bangladesh's leading development partner, establishing the bilateral and regional connectivity essential to Bangladesh's economic growth potential. However, Sheikh Hasina's abrupt departure from Bangladesh on August 5 brought the country to a standstill. As the interim government led by Muhammad Yunus in Dhaka struggles to restore normalcy and rebuild its institutions, questions have been raised about the prospects for the completion of the bilateral connectivity project.

Connectivity is a central tenet of the India-Bangladesh bilateral partnership due to the geographical proximity and interconnectedness of the two countries. The two countries share the world's fifth longest border (4096 km) and Bangladesh shares its border with the northeastern states of India and West Bengal. Connectivity between the bilateral partners is mutually beneficial. Surrounded by Indian territory on three sides, Bangladesh is often described as 'India locked', highlighting the need for strong connectivity between India and Bangladesh. Connectivity with Bangladesh is also essential for New Delhi. This is because India's northeastern regions will have access to the Bay of Bengal through Bangladesh and will increase opportunities for maritime trade. After all, as India's closest eastern neighbour and a land bridge to Southeast Asia, Bangladesh is a key part of India's 'Neighbourhood First' and 'Act East' policies.

The connectivity between India and Bangladesh is also mutually beneficial due to the strong trade relations between the two countries. India is Bangladesh's largest trading partner, with bilateral trade spanning a wide range of sectors, from energy, food and textile fibres to electrical appliances and plastics. As a result, several connectivity chains have been established between the two countries, including rail links, bus routes, inland waterways and sea ports for trade and transport.

India and Bangladesh define connectivity broadly, going beyond physical connectivity to include energy and digital chains. This was stated in a joint statement by the two countries during Hasina’s last visit to India as Bangladesh Prime Minister in June 2024. The statement identified several joint projects undertaken in these three categories. In the current political context, when the fate of these projects is uncertain, it is important to revisit these initiatives and understand their need and current status. The linkages with India and Bangladesh that are particularly noteworthy in this context are as follows—

- SASEC 1000 MW-HVDC Bangladesh India Electrical Grid Interconnection Project 1 – 2016
- Radhikapur-Biral Railway Line Renovation – 2017
- SASEC 500 MW-HVDC Bangladesh India Electrical Grid Interconnection Project 2 – 2017
- Haldibari-Chilahati Railway Line Renovation – 2020
- Gede-Darshana Railway Line Renovation – 2021
- Petrapole-Benapole Railway Line Renovation – 2022
- Akhaura-Agartala Railway Line 1 – 2023
- Khulna-Mongla Port Rail – 2023
- Maitree Thermal Power Plant 1, 2 – 2023
- India-Bangladesh Friendship Pipeline – 2023
- Rooppur Nuclear Plant 1 – 2024
- Katihar-Parbatipur-Bornagar 765 kV Electricity Transmission Line – 2025

- Rooppur Nuclear Plant 2 – 2027

India's role in economic development and regional growth is partly (still significantly) reflected in its extensive connectivity projects across the region. While other countries' national parties have been instrumental in harnessing anti-India rhetoric to gain power, they have acknowledged the importance of New Delhi's various economic and physical linkages to regional development. This is especially true for Bangladesh, as it is a country that aspires to achieve UN developing country status by 2026 and needs a range of development partnerships to achieve this. The governments in New Delhi and Dhaka need to find a way to sustain bilateral cooperation, which is essential for overall economic development on both sides of the border and to stabilize the volatile geopolitical situation in South Asia. In this context, Sohini Bose and Prithvi Gupta write in a research paper—

> "New Delhi will have to make continuous efforts to maintain its position in the region. India's influence and development in the region depend on its active engagement with its neighbours. The largely untapped credit line extended to Bangladesh presents both challenges and opportunities. The interim government's cautious approach to using India's credit line could slow Bangladesh's long-term development trajectory. Engaging with Bangladesh's interim government requires a dual approach: maintaining existing projects and exploring new avenues of cooperation. Areas such as renewable energy, digital infrastructure, and climate resilience show promise for cooperation. The future of India's bilateral relationship depends on India's adaptive role in driving regional progress and its ability to sustain the relationship."[4]

India-Bangladesh relations: Border issues

The India-Bangladesh border, which is currently a contentious issue between India and Bangladesh, is set to become a major headache for India unless the border issues are resolved urgently. Issues such as illegal immigration, smuggling, spread of Islamic fundamentalism from across the border, etc., need to be addressed effectively. Measures like construction of fences and roads need to be taken on a war footing. It is also important to sensitize the border people about the strategic importance of their area and involve them in guarding the border. In this regard, the proposal of the Group of Ministers on Border Management in 2001 in their report that a Village Volunteer Force (VVF) should be created to assist the security forces in guarding the border should be given serious consideration. Moreover, proposals like issuing photo identity cards to Indian citizens living on the border and work permits to Bangladeshi migrants should be considered positively and ways should be found to take care of the objections raised for various reasons. India should also engage Bangladesh

constructively and develop trade and infrastructure across the border so that Bangladesh also plays a role in maintaining a peaceful and tranquil border.

In this context, it is worth noting that the issue of the India-Bangladesh border came up in the recent joint statement issued by Narendra Modi and his Prime Minister Sheikh Hasina during his visit to Bangladesh. In this context, 'PM-India' wrote—

> "The two leaders emphasized proper border management to ensure a stable situation and a crime-free border area. Coordination should be developed between the border guards of the two countries to ensure security in the border area and to ensure that no civilian is killed. Bangladesh has requested that there be no restrictions on movement along the 1.3 km river route along the Padma River near Rajshahi district for humanitarian reasons. India has requested that the work of fencing all international borders from Tripura, India, be completed at the earliest. Bangladesh has assured to consider this matter properly."[5]

The Bangladesh–India border, also known as the International Border (IB), is the international border between Bangladesh and India, which demarcates the eight divisions of Bangladesh and the states of India. Bangladesh and India share a 4,156.56 km (2,582 mi) long international border, the fifth longest land border in the world, which includes Assam 262 km (163 mi), Tripura 856 km (275 mi), Mizoram 180 km (110 mi), Meghalaya 443 km (275 mi) and West Bengal 2,217 km (1,378 mi).

Along the border, the divisions of Bangladesh include Mymensingh, Khulna, Rajshahi, Rangpur, Sylhet and Chittagong. Several posts are marked between the two countries. Some of the border points are fenced with barbed wire on both sides. "On May 7, 2015, India and Bangladesh signed a land boundary agreement, subject to the approval of both countries, simplifying the border."[6] However, the situation has become increasingly complicated on the India-Bangladesh border, with the rights of the Chit Mahals and the sudden clash between the forces of India and Bangladesh on those lands. In this context, Wikipedia states—

> "The Bangladesh government accused the BSF of forcibly entering Bangladeshi territory and firing indiscriminately along the India-Bangladesh border. This was in retaliation for the widespread illegal infiltration from Bangladesh and the resulting barbed wire fence between India and Bangladesh. In August 2008, BSF authorities admitted at a press conference that they had killed 59 illegal immigrants (34 Bangladeshis, 21 Indians and the rest unidentified) who had tried to cross the border in the previous six months. Bangladeshi media alleged that the BSF had

abducted five Bangladeshi children, aged 8 and 15, from Haripur upazila in Thakurgaon district of Bangladesh in 2010. The children had come to fish near the border. In 2010, Human Rights Watch alleged that the Border Security Force had killed indiscriminately. On January 7, 2011, the BSF killed and hung the body on the fence – which was Felani (a 15-year-old Bangladeshi girl)."[7]

The world is changing rapidly, the Asian continent is changing the power equation every moment. Bangladesh, which once gained independence with the help of the Indian army, is being targeted by a strong anti-India sentiment. Due to the anarchy that has arisen in Bangladesh after Hasina's fall, a large flow of infiltration is increasing in India. Along with this, smuggling of various goods is going on. Because of the vast area of the India-Bangladesh border, it is impossible to erect a barbed wire fence across this vast area, especially in the water border areas. And between those possible and impossible, there are several gaps in the border of the two countries, and those issues have become a big problem in terms of defense. Along with this, there is India's Chicken Neck.

This part of West Bengal is an important place in terms of communication with China-Bhutan-Bangladesh and Nepal. If this chicken neck can be blocked at any moment, then the communication system with the Seven Sisters within India or India's neighboring countries can be completely distorted. In that case, it is necessary to unite in terms of security for both Bangladesh and India, especially to prevent the intrusion of China. In this regard, it can be said that the importance of Narendra Modi's 3.0 foreign policy is that the quadrilateral security zone that he has built with America, Japan and Australia to prevent it, based on which it is possible to prevent Bangladesh from being disobedient in terms of its maritime border - there is no doubt about it.

References:

1. Ghosh, Sudipta. (2021), Heritage and Legacy of History, Rainbow in the Eastern Sky, edited by Sushil Saha, Diya Publication, Page – 269.
2. Dey, Prabir. (Jun 08, 2024). India's foreign policy priorities under Modi 3.0, The Economic Times, Page – 5
3. Ghosh, Nilanjan. (Aug 15, 2021). Various aspects of water politics between Bangladesh and India, Observer Research Foundation (ORF), Page – 11.
4. Bose, Sohini & Gupta, Prithvi. (Oct 21, 2024). The future of India-Bangladesh connectivity projects, Observer Research Foundation (ORF), Page – 17.
5. (27 March 2021), Joint statement during the visit of the Prime Minister of India to Bangladesh, PM-India.

6. Parliament passes historic land accord bill to redraw border with Bangladesh – Times of India. Retrieved 17 November 2016.
7. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E2%80%93%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4_%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4 Access 22/12/20224.

Proper Names as Rigid Designators : Kripke's Semantic Revolution

Pranab Ghosh
Assistant Professor, Dept. of Philosophy
Jatindra Rajendra Mahavidyalaya, WB, India

Abstract: Proper names are unique entities given to specific objects or things, such as people, objects, or places. They are associated with the philosophy of language theories of Mill, Russell, and Frege. Mill's theory is based on grammatical and logical classification, while Frege's sense theory of name is similar. Russell's theory of definite description is stricter but argues that the name (term) cannot be a description. For him,proper namesare two types: ordinary proper names, and logically proper names. He maintains ordinary proper names are disguised description, whereas the demonstrative 'this', 'that'etc. are genuine or logically proper name. Kripke's theory of logically proper name is a direct referential theory, arguing that proper names do not have any sense. He argues that names cannot be disguised descriptions due to three reasons: 1) there are numerous instances where a name is not associated with any uniquely identifying description; 2) a person may know how to use a proper name without knowing the appropriate set of descriptions; and 3) certain names, proper names, and natural kind terms are rigid designators.

Kripke's argument against the sense theory of proper names is based on the distinction between rigid and non-rigid designators. The sense theory suggests that proper names are rigid designators, meaning they lack sense. However, the authors argue that being a rigid designator is essential for proper names and Mill's insight was formulated. Kripke introduces the concept of metaphysical necessity, which follows from the rigidity of names and the metaphysical structure of substances. He rejects the positivist theory of logical necessity and proposes that names, including natural kind terms, causally fix their referents. Casual theorists favour the direct reference theory for understanding naming.

Key Words: Proper Name, Rigid Designator, Description, Sense, Reference, Natural Kind Terms.

A proper name is a name that is used to a particular, distinct thing, such as an Apple, an Indian, the Himalayas, the Ganges River, or any other person, object, or place. They provide clear communication, aid in identifying a particular entity, and assist differentiate one entity from another. Proper name is related to the names of Mill, Russell, and Frege in the philosophy of language.

Mill really sowed the seeds of proper names in his work *A System of Logic*. Later on, Mill's notion of proper names had an impact on both Russell and Frege.

According to Mill, a proper name is a singular name that has devoid of all connotation. However, the issue is: What is a name? What does it mean to be singular? And what does it mean to be devoid of all connotation. A word, or group of words, would only be a name in Mill's view if it could be employed to represent the subject of an assertion. If this is what Mill refers to as a 'name', then what does he mean when he uses the term 'singular name'?As he explains, the function of the subject in a statement is to refer to something or someone in particular. An individual or singular name is a name that may be employed in the position of subject in a statement to refer to one object, thing or person. At this point, the concept of a singular name is rather obvious. Let's examine Mill's definition of a non-connotative name. Mill holds,

> 'A non-connotative term (name) is one which signifies a subject only, or an attribute only. A connotative term is one which denotes a subject, and implies an attribute.'[1]

It appears that Mill's idea of proper names is more grammatical and logical than philosophical. His proper name categorization matches the grammatical classification of names. According to him, proper names have both denotation and connotation. In this context he distinguished between singular and general names. While general names are connotative and refer to an infinite number of people or things, singular names are non-connotative and only refer to one object or characteristic. Therefore, he claims that proper names have a connotational element. So, his idea of general connotative names is comparable to Frege's sense theory of names. Proper names, according to him, have sense in addition to reference. Depending on how the thing is given to us, Frege defines a proper name as the name of the object or the ability to mention or refer to it by name. However, Russell's theory of definite description is similar to Frege's notion of sense of name. According to Russell's theory of proper names, a term can never be a description in the strict sense of the word, and a description can never be a name. He distinguishes between two kinds of proper names: logically proper names and ordinary proper names. He said that an ordinary proper name is a disguised description. Thus, 'Socrates' is really an abbreviation for 'the Master of Plato'. Conversely, a logically proper name is one that we may use to refer to an object or thing that is instantly given to us, or that we have been acquainted with.[2]

All of the names that we often refer to as 'proper names' are now used by us, mostly in *absentia*, or when the item is not presented to us in person. As users of these names, some of these names refer to people we have never met and will never meet in the real world. 'Socrates' is a common example of a name like that. The name 'Socrates' is only a substitute for, or an abbreviation of, this

description because Socrates has never been directly presented to us. Whenever we speak or think of him, we only recognize him as a person who fits a particular description. As Russell concludes, a proper name is a demonstrative, like as 'this' or 'that', which designates an object that is introduced to someone by acquaintance.

Russell therefore defines a proper name as

(a) a singular name and
(b) a name of a specific, which
(c) is able to assume the subject's stance by itself, which
(d) has no descriptive content at all, and
(e) solely applies to the information that is currently provided in the acquaintance.[3]

Kripke accepts Russell's direct referential theory of logically proper names. According to him, proper names make no sense. Kripke formulates his opinions in opposition to both Frege's (perhaps incorrect) assumption that a term's sense determines its reference and Russell's description perspective. Kripke contends, in contrast to Russell, that names cannot be used to mask (disguised) descriptions for three reasons:(i) There are many cases in which a name is not connected to any one or group of descriptors that would help identify it uniquely. (ii) It is possible for someone to use a proper name correctly even if they are unaware of the required set of descriptors that go along with it. Speakers frequently refer to people by their proper names when they don't have the necessary knowledge to identify them specifically. (iii) In the sense that they are not veiled descriptions, some names—proper names and natural sort words in particular—are rigorous designators.

Kripke writes,

(a) "There are numerous instances where a name is not associated with any uniquely identifying description or cluster of descriptions.
(b) A person may know how to use a proper name without knowing the appropriate set of descriptions associated with that name. Speakers often legitimately use proper names to refer to individuals without having the required information which would uniquely identify that individual to them.
(c) Certain names, proper names and natural kind terms in particular, are rigid designators in the sense that they are not disguised description."[4]

Kripke's argument on proper name is based on the distinction between rigid and non-rigid designators. A rigid designator designates the same object in all possible worlds, meaning it exists in all possible worlds. Non-rigid designators do not designate the same object in all possible worlds, meaning there are possible worlds where the designator designates objects different from what it designates in the actual world. "A non- rigid designator, on the other hand, is one which does not designate the same object in all possible worlds; i.e.,

there are possible world in which the designator designates objects that are different from what it designates in the actual world."[5]For example, 'the square root of 4' is a rigid designator, while 'the president of the USA in 1970' is a non-rigid designator, as it does not designate the same individual in all possible worlds, despite the election outcome.

Now that we have established the difference between rigid and non-rigid designators, we may outline Kripke's fundamental argument against the assumption that proper names have both sense and reference. I have put the argument in the following way:

> "If a proper name has a sense, then the reference of the proper name is determined by its sense, i.e., there is associated with a proper name a certain condition, whatever that condition may be, and an object is designated by the name if and only if it satisfies that condition. If this is how the reference of a proper name is determined then a proper name cannot be a rigid designator; at least it cannot in general be a rigid designator."[6]

The sense theory of proper names suggests that a proper name is a rigid designator, meaning it does not have any sense. This is because a proper name must be a rigid designator for counterfactual assertions to be valid. For example, if the person who was the actual president of the USA in 1970 won the election, it could not have been the president in the possible world. This counterfactual could not mean what it means unless the proper name 'Nixon' designated the same individual in both the actual world and the possible world.Kripke's argument is valid in the sense that if the premises are all true, then the conclusion is also true. However, the question remains whether the premises of the argument are all true. In other words, there is no guarantee that an object satisfying the condition associated with a proper name in the actual world would also satisfy it in all other possible worlds.

1stPremise:

According to the reasoning, a proper name only makes sense when it is connected to a specific condition that designates an object if and only if it fulfils the condition.[7] Two arguments may be made to support this: the first holds that the condition just fixes the name's reference, while the second holds that the object's fulfilment of the condition is required by the name's rigid designation of it. It follows that for the item to be labelled by the name, the condition must logically be satisfied.For instance, the designation 'One meter' is connected to the condition in the description of the standard meter bar's length in Paris, but only via ascertaining its reference. If the length of the metre bar were to change, it is conceivable that the length denoted by 'One meter' would no longer meet the requirement while maintaining its designation. In order to keep a proper name meaningful, it is necessary to keep in mind that each proper name has a

deeper connection to some circumstance than only fixing the reference. The two have to make sense in relation to one another.[8]

2nd Premise:

According to Kripke's reasoning, the sense of a name determines its reference, i.e., a name denotes an object if it meets a particular need. This assumption is dubious, though, as Kripke has acknowledged that some rigid designators—like 'the square roots of 4'—are not rigid designators. There must exist in every possible world the square root of 4. 'The square root of 4' has a sense that determines its reference, but it might also be a rigid designator because the sense includes a quality that is necessary for the number it identifies. But 'the square root of 4' is not a proper name, and it designates, like people, things, and places, are not normally identified by proper names. Kripke has contended that there are basic features that may be attributed to specific individuals and objects that are typical bearers of proper names. He has not only maintained but also claimed that some people and things may be regarded to have essential characteristics, thus he is not able to get out of this situation in this way.[9]To use two of his own instances,

> "the property of being born to the parents to whom he is in fact born is an essential property of Nixon, and the property of being made of the block of wood of which it is actually made is an essential property of a wooden table."[10]

3rdPremise:

Kripke argues that assigning proper names to objects has nothing to do with the nature of things thus named. Locke contends that those who employ proper names are unable to use these essences since they are not generally knowable. These essences do not establish the references of proper names, even if they are knowable. Rather, proper names need to offer a way to identify the things to which they are supposed to refer. As the name indicated need not always satisfy the description required to fix the reference of a proper name, this can be accomplished using incidental features. Some instances of this include the relationship that existed in 1970 between Nixon and the US president or the relationship that exists between 'one meter' and the length of the standard meter bar in Paris.[11]

It seems to us that at this point, Kripke's defence has not been pursued. However, it's unclear if my formulation would support Kripke's second assumption, which states that,'if the reference of a name is determined by its sense, then it cannot be rigid designator.'[12]This seems to be the right course of action if our goal is to demonstrate that a proper name is completely meaningless. Because if it isn't the fundamental characteristic that establishes the name's meaning for its users, then it isn't the fundamental characteristic that

gives it meaning. However, this is an unusual, if not ridiculous, conclusion to draw.

This ambiguity regarding the argument's second premise—which we have assigned to Kripke—certainly undermines it. However, we have to examine the third premise of the argument, which states that a proper name is a strict designator. Although the second assumption has an inherent interest of its own, it would not save Kripke's case if there were a problem with it.

It is important to be a rigid designator, as Kripke's contribution to the discussion of proper names highlights. This has important consequences. However, John Stuart Mill developed the fundamental idea underpinning the notion that proper names are rigid designators. According to Mill, a proper name is a name of the item itself; that is, it denotes the things it designates, independent of whatever attributes they may or may not have, or if they meet a certain need or description. Mill tell us that, 'a proper name is a name of the thing itself.'[13]A proper name ought to be a rigid designator if it accurately describes the object in question. Since we cannot conclusively state that an item fulfils or fails to satisfy particular requirements in the absence of rigid designators, we might as well do without them altogether. Counterfactuals, on the other hand, demonstrate that we have the necessary designators in proper names. Russell first identified another fundamental understanding of the nature of proper names, which David Kaplan elaborated on in his work 'demonstratives'. A proper name does not imply any qualities; rather, it refers directly to its bearer. Strict logical equivalency exists between the notions that a designator directly represents the object and that it represents the thing itself:'a designator stands for the object itself *if and only if* it refers to it directly.'[14]

The thesis discusses the concept of proper names as rigid designators, arguing that they both stem from the same basic characteristic: the proper name refers to the object itself or directly. However, it is challenging to maintain that a proper name's rigid designator is a consequence of its not having sense. The argument against the sense theory of proper names does not seem to have succeeded, but it involves fundamental ideas that are rooted in Mill's and Russell's work. The thesis concludes that the proper name's rigid designator is not a consequence of its not having sense.As Kripke acknowledges, Russell's idea of logically proper name is a genuine proper name that names the same object in every possible world of an actual world, as can be shown from the debate above. Regarding the 'reference' component, there is consistency between Russell and Kripke. Regarding the idea of proper names, these two philosophers offer relevant opinions. Russell's theory of logically proper names and Kripke's rigid designator share similar perspectives or are connected to one another. The main distinction between them is that Kripke interprets logical

proper names in terms of modal necessity, whereas Russell interprets them in terms of acquaintance.

References:

1. Mill, J.S., *A System of Logic,* p.19.
2. Cf. Sen, P. K., *Logic, Induction and Ontology,* pp-159-64.
3. Cf. Ibid., p. 167.
4. Kripke, Saul., *Naming and Necessity: 1980:* Oxford: Blackwell: Cambridge, MA: Harvard University Press. P. 321.
5. Ibid. p. 322.
6. Ibid. p. 323.
7. Cf. Ibid. p. 325.
8. Cf. Sen, P. K., *Logic, Induction and Ontology,* pp-233-34.
9. Cf. Ibid., pp- 234-35
10. Kripke, Saul., *Naming and Necessity: 1980:* Oxford: Blackwell: Cambridge, MA: Harvard University Press. P. 325.
11. Cf. Sen, P. K., *Logic, Induction and Ontology*, p- 235
12. Kripke, Saul., *Naming and Necessity: 1980:* Oxford: Blackwell: Cambridge, MA: Harvard University Press. P. 336.
13. Mill, J. S. *A System of Logic* (London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1875).
14. Kaplan, David. “Dthat” in *The Philosophy of Language*, ed. A.P. Martinich, pp. 316-29.

Bibliography:

1. Evans, Gareth., *The Varieties of Reference,* ed. John McDowell, Clarendon Press, Oxford and Oxford University Press, New York, 1982.
2. Frege, G., *Translations from the Philosophical Writings,* (ed.), Peter Geach and Max Black, Blackwell, Oxford, 1950.
3. Kripke, Saul., *Naming and Necessity:* Oxford: Blackwell: Cambridge, MA: Harvard University Press,1980.
4. Kaplan, David. “Dthat” in *The Philosophy of Language*, ed. A.P. Martinich, Oxford University Press, Oxford and New York, 1990.
5. Linsky, L., *Semantics and The Philosophy of Language*, University of Illinois Press, Illinois, Urbana, 1952.
6. Martinich, A.P., *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1990.
7. Mill, J. S. *A System of Logic*, London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1875.
8. Munitz, M. K., *Contemporary Analytic Philosophy,*Macmillian, New York, 1981.
9. Pradhan, R. C., *Recent Development in Analytic Philosophy,* ICPR, New Delhi-110062, 2001.
10. Russell, B., Logic and Knowledge, (ed.) R. C Marsh (Allen and Unwin, London, 1956.
11. Sen, P. K., *Logic, Induction and Ontology,* The Macmillan Company of India Limited, Delhi, Madras 600002, 1980.

The Early Period of Printing and Social Culture of Bengal (India)

Saikat Jana
State Aided College Teacher, Dept. of Political Science
Matiaburj College, Kolkata

Abstract: The first appearance of printing in India was in Goa, by chance. The Portuguese missionaries played an important role in the spread of Printing machine.They sent printing presses to facilitate the spread of Christianity in their new colonies. Jesuit priests took the printing press and started printing. Towards the end of 1556, he printed the book Conclusaes in Portuguese written in Roman characters. The name of an Indian should be mentioned along with a foreigner as the first promoter of Indian printing. His identity remained unknown to us. This did not have much impact as Portuguese missionaries in Goa printed books in Portuguese. He is not known to have any interest in printing. Neither the Marathas, the Nizams nor the Nawabs of Bengal felt the importance of printing. A hundred years passed after the Tamil printing presses on the Malabar coast. But no further information is available on Indian printing history. After the Roman Catholic Portuguese Jesuit missionaries, the activities of the Protestant Danish missionaries became stronger on the west coast. Bartholomew Ziegenblaug, a priest of the Protestant seminary of Trivandrum, succeeded in the Tamil translation of the New Testament between 1705 and 1715 and his printer's work with untimely efforts. Bengali printing took place in 1778, almost two hundred years after the first printing in Indian language. After the beginning of Bengal Company rule, the need for Bengali printing appeared among the English employees for the commercial and administrative interests of the company. From 1778 to 1799, besides English, at least sixteen Bengali printed growths and two English magazines are available in Bengali script. After 1800, Carey's printing press began to operate. William Carey, Joshua Marshman, Panchanan Karmakar and Manohar Karmakar started the second phase of Bengali printing.
key words: Portuguese missionaries, Printing press, Abyssinia deteriorated, Jesuit priests, Conclusaes, Habil imprressor, Bartholimewziegenbaug, Old testament, Charles wilkins, Panchanan karmakar, Calcutta chronicle, Calcutta gazette, Honorable company's press, Srirampur mission.

The first advent of printing in India was in Goa, incidentally by chance.The Portuguese missionaries played one of the most important roles in the spread of the printing press. They sent printing presses to facilitate the spread of Christianity in their new colonies. In 1556, a ship left Portugal for Abyssinia from Lisbon. On this ship were the head of the Roman Catholic Church of

Abyssinia, several Jesuit priests, a printing press and several skilled printers. Uttamasha, en route to Abyssinia, arrived at Goa on the coast of India and stopped for a temporary break. But the missionaries' relations with the emperor of Abyssinia deteriorated, and the bishop and Jesuit priests took the printing press off the ship and established it in Goa. It was the first printing press on Indian soil and the origin of printing.[1]

Jesuit priests started printing with this machine. At the end of 1556, they printed the book ‘Conclusaes’ of the Roman alphabet written in Portuguese. Exactly 100 years after Gutenberg, the first mechanical book was printed on Indian soil. In 1557, the second book was published – Doutrina Christa written in Portuguese by St. Francis Xavier. The minter of these two books was the Spaniard John de Bustamante. Jesuit priests of Goa report -an Indian printing with Bustament. This Indian was trained as a printer in Portugal and was accompanying Bustamante on this ship to assist him in printing. Although he is described as 'Habil impressor' (able printer), we do not find his name anywhere. As a result, the identity of the Indian who needs to be mentioned along with a foreigner as the first pioneer in the Indian printing industry, remains unknown to us.[2]

After the Roman Catholic Portuguese Jesuit missionaries, the activities of the Protestant Danish missionaries became stronger on the west coast. Between 1705 and 1715, Bartholomew Ziegenbaug, a priest of the Protestant denomination of Trivandrum, succeeded in translating the New Testament into Tamil and his muddaran work by tireless efforts and labors. He first brought the Tamil script from Germany. Later he made this font himself. The printing of his translation was completed in 1715. He translated the Old Testament, but could not finish printing it before his death.[3]

The presence of the Portuguese in Bengal is known since 1534. The Firingis are mentioned in the poem Chandimangal written in the late 16th century by the poet Kankankan Mukunda Chakraborty. When the Mughal representative Shaista Khan expelled the Portuguese from Chittagong and Hooghly, they became politically weak. But in the seventeenth century many centers of Portuguese missionaries were established in Bengal. In 1660, the French traveler Bernier wrote that eight to nine thousand Portuguese lived in Bengal. Portuguese missionaries were mainly practicing Bengali in Bhawal of Dhaka region. They learned Bengali and tried to write Portuguese-Bengali dictionaries and translate books on Roman Catholicism into Bengali. 1599 Jesuit missionary the Bengali practice of the Portuguese Catholic missionaries of this period is known from the letters of Francisco Fernandez and the account written by the Jesuit priest Marques Antonio Satucci in 1683. Most of these translations or prints are lost today. Only in 1743 there are two books written and published

from Lisbon by Father Manuel the Assumpsum, Orthabhed of Kripar Shastra and Bangala Grammar and Glossary.[4]

In 1772, Warren Hastings took over the rule of India. Two years later in 1774 he was in India appointed as the first Governor General. Earlier the company did not think of directly ruling Bengal. This time the dual system started. Robert Clive maintained the Nawabi regime after Diwani and focused only on revenue collection. In 1766 Reza Khan was appointed to maintain the regime. The Nawab's army and the pike-lethal of the local zamindars were reduced. There was a need to quickly build an alternative British regime. There was still a big gap between the British and the Bengalis. As a result of the administrative disorder, robbers and thugs were rampant. Common people were afraid to go out on the road. Especially after Manvantar, it was understood that if good governance is not established, the company's statehood will be lost, especially if there is no knowledge of the local language, it is impossible to manage the governance. In 1758 the President of Cuttack, Mr. Bristow, was removed from office because he could not learn the local language. Hastings Bengal took over the governance of Bengal he started encouraging language learning. He gave more importance to Bengali-English dictionary, Bengali glossary, Bengali grammar and Bengali translation of English law. In 1877, James Augustus Hickey established the Calcutta Press in Calcutta. Here the company's annual budget, military bill or annual report - all these were printed. At that time there was no opportunity to print Bengali letters in Calcutta.

Enterprises of Warren Hastings and CompanyWith the efforts of employee Nathaniel Brassey Halhead, Charles Wilkins and his associate Panchanan Karmkar and Hooghly printing press owner Andrews, Bengali letters were first printed in Bengal in A grammar of the Bengali language. It had a staggered typeface and metal-made-larger-than-now font, 4.5 millimeters in height. The pagination of the large book was prelims 29 pages and main text 216 pages. It is not known whether there was a second edition of the book, but it is likely - All copies were sold out very quickly. Because, in the advertisement of 1784 'Calcutta Gazette', there was an advertisement of Halhead'sA Code of Gentoo Laws published before this book, but this book was not advertised. Several copies of this first Bengali book of about two hundred and fifty years ago are preserved in London and Calcutta. Although the book is written in English, long Bengali quotations are printed. Pages 37 to 42 contain a long Bengali quotation of 72 lines from the Drona Parva of the Mahabharata. Its typesetting and printing was done entirely at Hooghly, but its paper was imported from London.[5]

Charles Wilkins came to Bengal in 1770 with company employment. Remembering his previous experience in letter engraving, he came forward to help Halhead and made the first steps to make Bengali letters. When the press

came to print, Sripanth mentions that this font was modeled after the handwriting of Khusmat Munshi, a resident of Hooghly. He was assisted by Panchanan Karmakar in the work of engraving the letters. Surprisingly, Halhead in his extensive Introduction to Grammar details Boltz's words, Wilkins's words and the story behind the creation of the first Bengali alphabet, but nowhere mentions Panchanan Karmakar by name. For example, Halhead only mentions the Bengali scholar from whom he learned Sanskrit and Bengali language - 'The pundit who imparted a small portion of his language to me...', but never mentions his name. It is the arrogance of the foreign ruler.[6]

Panchanan Karmakar was a resident of Banshberia near Triveni, and his disciple and son-in-law Manohar was a resident of Triveni. Later Panchanan Karmakar from the company's printing house joined the Srirampur printing house of the missionaries. From Jasua Marsman's description there we come to know about Panchanan Karmkara. Panchanan Karmakara was skilled in making brass and bronze vessels, so metal engraving and casting was nothing new to him. He from 1777-78 from 1803-1804, he spent about 25 years building Bengali fonts, experimenting with Bengali fonts, creating new small-sized fonts and creating BosloKaraje form the first complex handwriting style of Bengali. First in Hooghly, then in Calcutta, then in Srirampur, he defined the standard and form of the Bengali script over a long period of time. Fonts were supplied to printing presses in Calcutta from the font chalan factory of 'Chandrodaya Press' established by his son-in-law Manohar Karmakar. Between this time and 1800, about forty printing presses can be found in Calcutta and surrounding areas.[7]

In 1797 English-learning books were found in Bengal compiled by John Miller. It was compiled, translated and printed for the purpose of English-teaching Bengalis. Most of the printing houses in Calcutta then focused on printing English books, so Bengali books were published less than in English.

Apart from books, several magazines were being published. Publication of Bengali newspapers and magazines had not yet started, but notices were published in Bengali characters only in English newspapers. These Bengali advertisements were published for the administrative interest of the company or for public awareness of government laws or orders or for commercial purposes. Due to the demand for printing notices in Bengali characters, the system of creating and printing Bengali fonts was developed in various English newspapers and magazines. From 1784, a semi-official newspaper called 'Calcutta Gazette' was published weekly. Francis Gladwin published this newspaper with the approval of the then Governor General. The weekly 'Calcutta Chronicle' was published from 1786. Notices were sometimes printed in Bengali script.

Orientalist William Jones and his colleagues initiated the study of Sanskrit language. European scholars began to be enthused about the ancient poetic philosophy of India written in Sanskrit. It is for this purpose that in 1792

the Ritusanghar Kavya of Sanskritist Kalidasa was first printed, where Bengali characters were used. This book was printed on the Bengali font press of the 'Calcutta Gazette'. This book of poetry by Kalidas is the first Bengali font book published by them.

From 1778 to 1799, besides English, there are at least a few Bengali printed books and two English newspapers in Bengali script. Among these Yolota books are three grammars, translations of nine laws, three dictionaries and a Sanskrit poem. Advertisements in newspapers-two show various types of notices, auctions, sales, trades, government announcements etc. and book advertisements. Handwriting was carried over to print.

Unfortunately, European languages also faced this problem. This was a big problem in the early days of printing in Bengal. The complexity and variety of Bengali characters, especially yuktakshar, their disparity, finding suitable scribes, etc. became a problem. Even if we look at the medieval dolls, we can understand that different regions and different scribes have different types of letters or different types of letters. It was difficult to create a common form out of these variations. In this phase, the Bengali script needed an idealized, universally accepted and aesthetic form. This work was not done in one day or once, in twenty oneyears Bengali font started to get its elegant form little by little in various printing presses. Two trends can be seen in this phase - one, the attempt to progressively reduce the size of the typeface and two, the attempt to abandon the complex twisting tension of various handwritings and to increasingly simple ornamental printing typefaces. Halhead's grammar of 1778 was changed to a notice in the 'Calcutta Gazette' published in 1784. This font is probably the second attempt by Wilkins and Panchanan Karmkar.

Then another new Bengali letter was seen in the dictionary printed by Chronicle Press. This letter is probably the owner of the Chronicle and the coin artist A. Create custom. Later, due to debt, Upjohn's foundry, printing machinery and part of his typeface were sold at auction. In 1797 John Miller's translated-compilation of this font appears. Even this letter is observed in Forster's Bengali Dictionary printed by Ferris Company in 1799.

In 1800, a new chapter in the history of Bengali printing began, William Carey came forward. After 1800, Carey's printing press started working. On November 11, 1793, William Carey first set foot on the soil of Bengal. On his arrival in Calcutta, he took the help of Ram Ram Bose for Bengali language teaching and translation work and employed him as a Munshi on a salary of twenty rupees. When he came to Bengal, he wandered like a madman. He was trying to build permanent shelters and institutions with specific programs to carry out the mission of preaching the Bible message. (PramathanathBishi's novel 'Keri Sahiber Munshi' is based on William Carey and Ramram Bose.) For five years from 1794 to 1799 Carey worked as the caretaker of the Nilkuthi at

Madnabati in Malda. This period was his preparatory period. He started teaching Bengali language first and Bengali translation of New Testament from 1795. He set out in December 1799 made in Srirampur. Srirampur Mission is a new chapter in the history of Bengali printing. Panchanan Karmakar joins Kerry here. William Carey, Jasua Marsman, Panchanan Karmakar and Manohar Karmakar started the second phase of Bengali printing.

REFERENCE:

1. Sripanth, When the Printing Press Came, West Bengal Bangla Academy, Calcutta, July 1977, p. 3
2. Mukhopadhyay, Varunkumar, History of Bengali Printed Books, New Udyog, Kolkata, Revised 2nd Edition, 2014, p. 16
3. SAME BOOK p. 36
4. SAME BOOK p. 44
5. Das, Sajnikant, 'William Carey and Bengali Literature', 'Balaka' Magazine, Bengali Books and Printing 1778-1900, Special Issue, Edited by Dhananjay Ghoshal, Kolkata, December 2008
6. Chakraborty, Pradeep (ed.), Bangla Typographer Panchanan and Parampara, Panchanan Karmkar Smriti Sangsad, Hooghly, 21 February 2012
7. Natarajan, S., A history of the Press in India, New York, Asia Publishing House, 1962.

A Study on Content Knowledge of Geography Students at Secondary School Level in Purba Medinipur District

Tarak Nath Bhunia
Assistant Professor, Dept. of M.Ed.
Y.S. Palpara Mahavidyalaya, Palpara, Purba Medinipur
&
Sheikh Manirul Islam
Associate Professor, Dept. of B.Ed.
Y.S. Palpara Mahavidyalaya, Palpara, Purba Medinipur

Abstract: This paper investigates the content knowledge of secondary school geography students in the Purba Medinipur district. The study assesses their grasp of core geographical concepts and identifies factors influencing their academic performance.To evaluate the content knowledge of rural & urban male-female geography Students in Purba Medinipur District of West Bengal.The investigator was used descriptive survey method. The results findings out that there is no statistically significant difference in the mean scores between rural males and rural females, regardless of whether equal variances are assumed or not. Urban female are better than urban male regarding the content knowledge of secondary school students in Purba Medinipur District. On the other hand, Rural males have a slightly higher average score (64.5) compared to rural females (62.98). Urban females have a higher average score (75.26) compared to urban males (71.44). The content knowledge of class X students is highly moderate these are good sign for effective teaching methodologies and curriculum of geography education under WBBSE Board in Purba Medinipur District.
Key Words: Content Knowledge, Geographical Concepts, Secondary School.

Introduction:

Geography is a part of social science. The real value of geography lies in the fact that it helps man to live; it helps man to place himself in the world. It’s offered a most helpful line of work for a better understanding between the people of the world. Geography is not only a description of the world and its habitants, it also help us to reveal changes and development.The function of the geography is to train future citizens to imagine accurately the condition of the great world stage and so to help them to think same about political and social problems in the world around.It is the mother science out of which most of the other physical and

social science have emerged as specialised science. Geography is the subject with a varied importance and utility. The knowledge of various activities like population,climate,Natural incidents and invention of modern geography made the surrounding more comfortable than the ancient time. These studies are emphasis on Content knowledge in geography of Purba Medinipur District deals with the Earth's landscapes, environments, and the relationships between people and their surroundings. It encompasses both physical and human aspects: **Physical Geography** focuses on natural features and processes such as landforms, climate, ecosystems, and the water cycle. Topics include : Landforms (mountains, rivers, deserts, etc.), Climate and weather patterns,Natural resources, Ecosystems and biomes. **Human Geography** examines the ways humans interact with and shape the world, including topics like:Population dynamics and migration,Urbanization and settlement patterns, Economic activities (e.g., agriculture, industry), Cultural landscapes and geopolitics. **Geospatial Techniques**: The use of maps, GPS, and geographic information systems (GIS) to analyze spatial data and patterns. Overall, geography blends physical science with social science, exploring both the environment and human societies' impacts on the world.

Emergence of the Study:

The emergence of a study like this could be motivated by several factors: The study could be a response to recent curriculum changes or educational reforms in India, especially in the context of Geography education. Changes in the National Curriculum Framework (NCF) or the integration of new teaching methods and materials may prompt studies to assess the effectiveness of Geography teaching at the secondary school level.With an increasing emphasis on improving educational quality, regional studies like this one are conducted to measure how well students understand core subject matter. In the case of Geography, content knowledge encompasses various aspects, such as physical geography (landforms, climate, vegetation, etc.), human geography (population, migration, urbanization), and map reading skills. As the world becomes more interconnected, geographical literacy becomes increasingly important for students. This study could be part of efforts to evaluate the level of geographical awareness and knowledge that students possess, which is essential for their holistic understanding of the world.In districts like Purba Medinipur, which is a relatively rural and economically diverse area, there could be disparities in access to quality education. A study focusing on this region could investigate how local socio-economic factors (like infrastructure, teacher quality, resources, etc.) influence students' grasp of Geography. The study might also explore how well-trained Geography teachers are and how effective their teaching strategies are in imparting content knowledge. This would help in identifying the gaps in teaching and learning practices that need to be addressed. The study could be

trying to identify any gaps in the Geography curriculum and how well it aligns with the needs of the students. In some cases, students may not perform well due to an outdated or overly complex curriculum, or one that does not take into account the local geography of their surroundings.The role of secondary schools in shaping students' understanding of geography may also be a focus. This could include a comparison of performance across different schools in the district, ranging from government schools to private institutions.The study could explore how educational tools like maps, atlases, and technology (such as GIS) are utilized in the classroom, and how their integration (or lack thereof) affects students' understanding of geographic concepts. The study titled **"Content Knowledge of Geography Students at Secondary School Level in Purba Medinipur District"** appears to be an investigation into the level of geographic knowledge possessed by students in secondary schools in the Purba Medinipur district of West Bengal in India.

Objectives of the Study:

1. To comparethe level of content knowledge of rural male-female geography Students in Purba Medinipur District of West Bengal.
2. To comparethe level of content knowledge of urban male-female geography Students in Purba Medinipur District of West Bengal.

Hypotheses of the study:

I. There is no significance difference regardingrural male and female students regarding content knowledge levelof Geography subject.

II. There is no significance Difference regarding urban male and female studentsregarding content knowledge levelof Geography subject.

Methodology:

The investigator was used the descriptive survey method in the present study. Therefore, the investigator was used different statistical techniques to analysis the data.

Population of the study:

Class x studying students are population for the present study of Purba Medinipur district in West Bengal under the West Bengal Board of secondary Education (WBBSE).

Sample and Sampling Techniques:

The investigator was used stratified random sampling for selection of the sample. The Investigator was randomly selected 200 Sample from five urban school and five rural school on random basis under WBBSE Board inPurba Medinipur District with equal no. of gender.

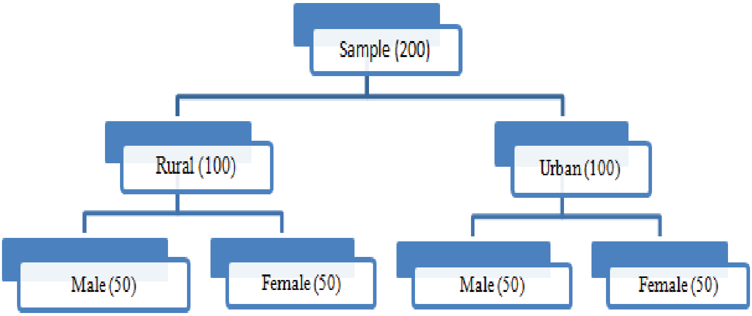

Tools of the study:
The investigator was used self made Questionnaire with the based on WBBSE Geography Syllabus in class x. Investigator was used 50 questions in questionnaire scheduled for the purpose of the study.
Statistical Techniques to be used:
The investigator was used different statistical method such as mean, S.D, t-test to know the significant difference or not of content knowledge of urban and ruralmale - female Students in Purba Medinipur District of West Bengal.
Data Analysis& Interpretation:
Quantitative data analysis procedures were followed for this study. The data were analysed through IBM SPSS 21.0 version and the significance of "t" were tested at 0.05 significance level.
1. Objectives: To compare the content knowledge level of rural male-female geography Students in Purba Medinipur District of West Bengal.
I Hypotheses: There is no significance difference regarding rural male and female students of content knowledge level in Geography subject.

Group Statistics

	Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Score	Rural male	50	64.5000	11.74082	1.66040
	Rural female	50	62.9800	10.89746	1.54113

The result highlighted that,Rural males have a slightly higher average score (64.5) compared to rural females (62.98).The variation in scores is slightly

higher among rural males than females, as shown by the standard deviations (11.74 vs. 10.90). The standard errors suggest relatively small variability in the mean estimates for both groups.

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
score	Equal variances assumed	.092	.763	.671	98	.504	1.52000	2.26540	-2.97561	6.01561
	Equal variances not assumed			.671	97.460	.504	1.52000	2.26540	-2.97592	6.01592

Since the significance value (0.763) is greater than 0.05, we fail to reject the null hypothesis. This indicates that the assumption of equal variances is not violated.There is no statistically significant difference in the mean scores between rural males and rural females, regardless of whether equal variances are assumed or not. The small mean difference (1.52) and the wide confidence interval support this conclusion.

2. Objectives: To compare the level of content knowledge of urban male-female geography Students in Purba Medinipur District of West Bengal.

II. Hypotheses: There is no significance Difference regarding urban male and female students of content knowledge level in Geography subject.

Group Statistics

	gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
score	Urban male	50	71.4400	9.87919	1.39713
	Urban female	50	75.2600	7.79013	1.10169

Urban females have a higher average score (75.26) compared to urban males (71.44).The variability in scores is slightly higher among urban males (Standard Deviation = 9.88) than urban females (Standard Deviation = 7.79). The smaller standard error for urban females (1.10) indicates their mean score is estimated with slightly greater precision compared to urban males (1.40).

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
score	Equal variances assumed	3.970	.049	-2.147	98	.034	-3.82000	1.77924	-7.35084	-.28916
	Equal variances not assumed			-2.147	92.945	.034	-3.82000	1.77924	-7.35324	-.28676

The significance value (0.049) is less than 0.05, indicating that the assumption of equal variances is violated. Therefore, we rely more on the "Equal variances not assumed" row. There is a statistically significant difference in the mean scores between urban males and urban females. Urban females score significantly higher than urban males, with an average difference of 3.82 points. Since the assumption of equal variances is violated, the "Equal variances not assumed" result is more reliable.

Findings & Discussion:

The results findings out that there is no statistically significant difference in the mean scores of content knowledge in geography between rural males and rural females, regardless of whether equal variances are assumed or not. Urban female are better than urban male regarding the content knowledge of secondary school students in Purba Medinipur District. On the other hand, Rural males have a slightly higher average score (64.5) compared to rural females (62.98). Urban females have a higher average score (75.26) compared to urban males (71.44). The content knowledge of class X students is highly moderate these are good sign for effective teaching methodologies and curriculum of geography education under WBBSE Board in Purba Medinipur District.

Conclusion:

This study aims to provide insights into the state of geography education at the secondary school level in Purba Medinipur and offer recommendations for improving content delivery and student engagement. Both rural and urban students are highly moderate in efficiency of different aspect of content knowledge in geography. So, it indicate that in Purba Medinipur District, students' academic progress, teaching strategies, are also high and among class x students are high curriculum adjustment capability.

Reference:

Butt, G. (Ed.). (2011). *Geography, Education, and the Future*. London: Continuum.

Fisher, R. A. (1950). *Statistical Methods for Research Workers* (11th Edition). Hafner.

Butt, G. (Ed.). (2011). *Geography, Education, and the Future*. London: Continuum.

Hartshorne, R. (1959). *Perspective on the Nature of Geography*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 1–11.

Llalen, M. W. (1996). *Methods of research. Review of Educational Research.*

Patra, A., & Guha, A. (2017). Comparative Study on Geography Teachers' Pedagogical Content Knowledge (PCK) and Self-Efficacy in West Bengal, India. *Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science*, *5*(3), 68-71.

Özdemir, U. (2012). High school students, content knowledge, and attitudes towards geography courses. *World Applied Science Journal*, 17(3), pp. 340–346.

Suleman, Q., et al. (2014). Effects of classroom physical environment on the academic achievement scores of secondary school students in Kohat Division, Pakistan. *International Journal of Learning & Development*, 4(1), pp. 71–79.

Thorpeand, S. (2015). *The Pearson Concise General Knowledge Manual 2016, 1/e*. Pearson Education India.

Walker, S. L. (2006). Development and validation of the test of geography-related study. *Journal of Geography*, 105(4), pp. 175–181.

Shakti in Indian Philosophy : A Study from Feminist Perspective

Bhaswati Basu
Assistant Professor, Dept. of Philosophy
Sri Ramkrishna SaradaVidya Mahapitha

ABSTRACT: The subject of this paper is a feminist evaluation of Indian philosophical concept of feminine principle in the form of Shakti (the power of creation or the creative force) and understand the nature of Supreme Reality as propounded by different schools of Indian Philosophy from gender perspective. The antiquity of the worship of the Shakti as the Supreme Reality can be traced to the pre- Vedic period and even before this. The term 'Shakti' represents female divinity in general and stands for the supreme power which creates the universe. In Indian philosophy, role of shakti in cosmogony is such a metaphysical issue that draws our attention for its gender dimension. A belief in '*Shakti*' has brought about a synthesis among philosophies like Samkhya,Vedanta, Shaivism and Shaktism as all these systems are in general agreement as to the nature of the infinite, immutable pure consciousness as the absolute reality and posit therewith a finitizing active principle called *Prakrti, Maya* and *Shakti* respectively to explain rationally the creation and existence of this phenomenal world. This paper attempts to determine the nature of reality from gender perspective and in the light of this perspective elaborate the nature of *Shakti* as the feminine principle and its significant role as the creative authority that suggests contextual connotations for a possible feminist theorization of Indian Philosophical Thought.
Key Words: reality, creation, female, principle, gender, Indian Philosophy, cosmogony, evolution.

Introduction:

"One of the important issues in the present-day Indian context is to discover the space for a possible theorization in feminism" (Kelkar.M, IPQ, 1999). If we look to Indian philosophical thoughts, propounded by different traditional schools, perhaps we will come to a general agreement that none of the school has an explicit feminist theory on the role of women. Though Indian philosophy does not fit into the structured deliberation of feminism yet, we can draw oblique contextual connotations to the same. Theorization of female principle and implications of gender issues in Indian philosophy set forth the impression of gender equality as well as women empowerment. A profound review of a few metaphysical issues like cosmogony reveals that theories on the female

principle by the Indian philosophical systems provide material basis of such theorization.

In Indian philosophical thought, theorization of feminine principle is based on two elements – one empirical and the other speculative. From the empirical point of view, the idea of feminine principle is associated with cosmogony. Indian philosophy describes the creation of this universe in terms of the union of two principles - male and female, where feminine principle or women play a significant role. The expression of the relation of male-female principles in the context of cosmogony provides a nexus of such and other related inquiries. This relationship is expressed by different representations in the context of metaphysical theory on the nature of Reality in ancient Indian philosophy. From the speculative aspect, Indian philosophy conceives feminine principle as the Shakti or power of the supreme reality through which he creates, maintains and destroys. This paper attempts to determine the nature of the Reality from gender perspective in the context of the theories concerning the creation of the universe and in the light of this perspective elaborate the nature of *Shakti* as the feminine principle and its role as the creative authority. The subject of the present paper has been evolved on the basis of *Samkhya Prakriti parinamavada*, *Advaita Vedanta Mayavada* and *Saktivada* of *Shakta* philosophy as all these three systems are in general agreement as to the nature of the infinite, immutable pure consciousness as the absolute reality and posit there with a finitizing active principle called *Prakrti, Maya* and *Shakti* respectively to explain rationally the creation and existence of this phenomenal world.

Feminine Principle in Creation Myths – Vedic Tradition

In the Purusha Sukta of the Rigveda (10.90) '*Purusha*' is regarded as the origin of the universe. Here '*Purusha*' is the embodiment of the universal soul which represents the entire universe. The Brihadaranyakopanishad gives etymological interpretation of the word '*Purusha*'as "*sa yat purva asmat sarvasmat sarvan papmana ausat tasmat purusa bhavati*" means who being primeval had destroyed all sins. So, the word '*Purusha*' stands for such virtues as being manly, valiant, courageous, strong and powerful one because only a potential and determined man is expected to resolutely execute his decision to eliminate sins. By referring the word '*Purusha*', the passages of the *Sukta* presenta male conception of the creator without explicitly pointing out the gender of the creator. The Aitareya Upanishad narrates a creation myth (1.1) in which the Self (*Atman*) creates the universe by dismembering and reconstructing his organs. The gender of the said *Atman* is obviously male as the last verse of this section (1.1.4) states that along with organs like mouth, nostrils, eyes, ears, skin, heart and navel, the male generative organs were separated out from which semen came out in order to create this universe. Such creation myths

imply that the existence of the female body is ultimately derived from the primordial male body. In these myths, creation is linked to a particular construction of gender relations that prioritizes male over female and defines woman as a creation by the man and from the man.

On the other hand, Passages of the *Brihadaranyaka Upanishad* (1.4.1-6), which describe the evolution of the physical gross world, narrate that the ultimate principles of male and female lay unified in a close embrace in the Supreme Being (*Virat Purusha*) and He transformed His unitary form into two forms, husband and wife, which formed all the pairs of creation. Here we may refer to the role of all pervading Female Principle as conceived in the Indian Philosophical traditions. In the Samkhya theory of evolution, the relation between Purusha and Prakriti, two entities recognized as the ultimate reality, is explained in terms of that between a man and woman. Like the Purusha-Prakriti model of Samkhya system, the Brahman-Maya model of Advaita Vedantic School and the Siva-Shakti model of Shaktism are other two models of Man-Woman relationship. All these three systems provide their cosmogonies where a primordial feminine principle is conceived as an active creative force which make the evolution of this gross world possible.

Nature of *Maya*, *Prakriti* and *Shakti*

'*Maya*' literally illusion or magic has multiple meanings in Indian philosophies depending on the context. The *Advaita Vedanta* describes reality as Brahman, the pure consciousness. In the *Advaita Vedanta* School of Samkaracharya, Maya is the magical power of *Brahman* that creates the cosmic illusion which drives the *jiva* or the individual to believe that *Prapancha* or the phenomenal world is real. Samkara's theory '*Brahma-vivara-vada*' takes the world to be only *vivarta* or a phenomenal appearance of *Brahma.* Samkara maintains that creation means only a phenomenal appearance of *Brahma* due to His inherent potency, *Maya*. *Maya*, the conjuring power of *Brahma*, is the ground on which the phenomenal world is super-imposed. *Maya* is something material and unconscious (*jada*) which is indescribable for it is neither real nor unreal nor both (*sadasadanirvachaniya*) though it is something positive (*bhavarupa*) absolutely dependent and inseparable from its locus *Brahma.*

The samkhya philosophy maintains dualism where *purusa* and *prakriti* are the ultimate realities. Both are pure existents and are absolutely independent entities yet they unite purposively to mutually serve their ends. *Prakriti* needs *Purusa* in order to be enjoyed (*darshanartham*) while *Purusa* needs *Prakrti* in order to enjoy (*bhogartham*) and also to obtain liberation by discriminating between himself and *Prakrti* (*kaivalyartham*). Though the creation results from the union of *Purusha* and *Prakriti*, Samkhya describes *Purusha* as an indifferent and inactive witness. *Prakriti* is conceived as constituted of three factors termed as '*gunas*' – named *sattva*, *rajas* and *tamas*. Since *Prakriti*

consists of these *gunas*, worldly objects that emerges from it are also similarly constituted of three *gunas*, for Samkhya doctrine of causality maintains that effects are essentially identical with their material cause. Every period of evolution (*sristi*) is followed by a dissolution (*pralaya*) when the whole diversity of the universe becomes latent, as it were in *Prakriti*. But even in the state of dissolution, *Prakriti* does not cease to be dynamic. In the period of dissolution, these *gunas* remain in a state of perfect equilibrium, until *Prakriti* begins to evolve as a result of its proximity to the Purusha. This *Purusha-Prakriti samyoga* disturbs the state of equilibrium of the *gunas* and twenty-three principles successively spring into being from *Prakriti*. Things that emerge from *Prakriti* sequentially are - intellect (*mahat* or *buddhi*), egoism (ahamkara), eleven senses (*indriyas*), five subtle elements (*tanmatras*) and five gross elements (*mahabhutas*) which are the basis of the objective world. Thus, latent Prakriti (*avyakta*) through its twenty-three manifestations (*vyakta*) evolves into the gross world.

Shaktism – the cult of *Shakti* is an entirely female oriented belief system that describes *Devi*, the great goddess as the Supreme Being. The root of Shaktism, a female dominated religion that focuses worship upon *Shakti* or the all-power female principle as the Reality – penetrate deeply into India's prehistory. The worship of the mother Goddess was prevalent in the Chalcolithic period which is evident from the finds of terracotta and unbaked nude clay figures of women in those settlements. In Harappa and Mohenjo-Daro, two major cities of the Indus Valley Civilization, female figurines were found in almost all households indicating the presence of cults of Goddess worship. The ultimate reality in Shaktism is pure consciousness which is called *Samvit*. In the *Sakta Tantras, Samvit* is conceived as the non-dual existence of *Siva* (*prakasa*) and *Sakti* (*vimarsa*) – two aspects of the same reality. In Shaivism, *Siva* is worshipped as the supreme reality where *Sakti* is worshipped as the consort of *Siva*. On the contrary, in Shaktism, *Sakti* in the form of female divinity is worshipped as the supreme reality where *shiva* or the male principle is the substratum of *shakti*. In Tantras and Puranas, '*Shakti*', the all-pervading eternal power has been conceived as the counterpart of the *Shiva*, the possessor of power. As fire and burning are not two different things, in the supreme transcendental changeless state, *Shiva* and *Shakti* are one. Their relation is identical which is called *Avinabhavasambandha*.

Role of shakti as the creative force

Being an essentially indistinguishable power of *Brahman*, *Maya* provides a medium for the reflection of *Brahman*and for the projection of this world. *Avarana* and*Viksepa* are the two aspects of *Maya,* the former conceals Reality and the latter projects the world on the ground of *Brahma* respectively. *Brahman* reflected in or limited by *Maya*, is called *Isvara* or God. Ramanuja in

his *Visistadvaitavada* recognized maya as the real power of Isvara and this world as the real creation of *Isvara* with his *Maya-shakti.*

The distinctive quality of *Prakriti* is that she is active and it is her activity which generates evolution for the sake of enjoyment and liberation of the *Purusa*. *Purusa* is the neutral seer and indifferent to wards the process of evolution though his mere existence is crucial for the evolution to take place. Indeed Purusha's liberation is the ultimate purpose for which Prakriti evolves For the evolution of *Prakriti* and creation of the gross world, they must come into contact. The mere proximity of the *Purusa* (*purusa-sannidhi-matra*) or the semblance of a contact (*samyogabhasa*) is sufficient to disturb the equilibrium of the three *gunas* in order to generate heterogeneous change in *Prakriti* and thus lead to evolution.

The belief that there is a feminine principle at the root of every creation is central to the *Shakta* philosophy. The *Tantras* say that pure consciousness works through its *Shakti* or inherent power. This *Shakti* at first appears a will-power (*Iccha-Sakti*), the desire to be manifested. Subsequently it works in its two aspects – *Cit-Sakti* and *Maya-Sakti. Siva* is the *Prakasa* or static aspect and *Shakti* is the *Vimarsa* or the kinetic aspect in the *Brahma* or *Samvit.* Again, *Vimarsa Sakti* in its subtle state when there is no activity exists in the form of consciousness. In this state *Siva* and *Shakti* exist in the supreme state as one *Tattva*, *Siva* as *Cit*, Sakti as *Cidrupini.* So, *Shakti* in non- dual state with *Siva* is unmanifested *Cit* or consciousness. *Vimarsa Sakti* in its gross state exists as *Maya* and is manifested in the form of the universe (*Visvarupini*). *Maya-sakti* is therefore an aspect of *Cit* or consciousness which it assumes as material cause in creation. The *Shakta Tantra Sastra* says that *Shakti* functioning as *Cit* and *Maya* (*Cit-Sakti* and *Maya-Sakti*) is real, conscious and *Brahma* itself. Both of these are conscious principles with the difference that while the former is illuminating consciousness, the latter is veiled consciousness. *Maya-Sakti* despite being consciousness appears as unconsciousness by veiling the *svarupa* or own true nature. This is a common principle in all doctrine relating to Sakti. Indeed, this theory of veiling, though expressed in another form, is common to Samkhya and Vedanta. The disparity lies in this that in *samkhya*, *Prkriti*, the unconscious, unintelligent active power (*jada-sakti*) is an independent principle which veils; according to *Mayavada* of *Advaita Vedanta*, *Maya* is the unconscious power of *Brahma* which veils; and in *Shakta Advaitavada*, shakti is pure consciousness which, without ceasing to be such, yet veils itself. In *Samkhya* and *Vedanta* theories of evolution, an unconscious principle (while the former recognizes this principle as real entity, the latter considers it as neither real, nor unreal, nor the both thus indescribable) conceals the *svarupa* or true nature of the pure consciousness, whereas according to *Shakta* philosophy, *Maya-Sakti* which is in itself an aspect of pure

consciousness conceals Itself to Itself.

Significance of female principle from feminist perception

The creation myth of Brihadaranyakopanishad seems to recognize the complementarity of male and female in the process of creation. Despite the privileging of the male role, procreation is represented there as an inherently interactive process. The origination of all creatures became possible only after the primordial female has taken the form of each animal. This account points towards the fact that the primordial female takes a more active part in creation as in the *Sankhya* theory of evolution, the female principle *Prakriti* is conceived as the primordial matter which evolutes into the gross world while the male principle *Puruhsa* is conceived as a passive spectator of this evolution. In a matriarchal system, the father is insignificant in the matter of family affairs. He is almost a passive spectator exactly like the *Purusa* of the Sankhya. The conception of a material *Prakriti* may be viewed in its historical connection with the early agricultural societies of the Indus civilization which developed the conception of a material Earth Mother supposed to represent the forces that stimulate the generative powers of nature. Verses from *Saundaryalahari* (a text of *Shakta* philosophy attributed to Samkaracharya) says, '*Siva*, when he is united with *Shakti*, is able to create; otherwise, he is unable to move even an inch' (1.1). Thus, Indian philosophy has been set up a firm position of women, sometimes superior to that of men and also brought forward the issues of gender equality. On the other hand, *Samkhya* describes this *Shakti*, the active power *Prakriti* as *nirbodh* (unintelligent) and *bhogya* (enjoyable). *Prakriti* exhibits herself to *Purusa* in order to be enjoyed by him. This *bhogya-bhogta* relation of *Prakriti* and *Purusa* indicates towards the male supremacy which is very nature of a patriarchal society.

Conclusion:

According to the Indian tradition, the knowledge can be obtained not only through reason but also through experience. The term '*Darshan'* implies Realization of Truth – not only the reality obtained through the reason but also knowledge through the direct experience of reality. It has been uncontradicted experience of human from the dawn of understanding that there cannot be any origination or creation whatsoever in the universe without the union of the two principles, the Male and the Female. Accordingly, Indian philosophical tradition acknowledges that whatever created in this phenomenal process has been created from the union of the two entities. All traditions consider them as the two aspects of the one non-dual truth though they differ in question related to the nature of this truth. Only *Samkhya* maintains a different position as it considers them as two separate independent entities with almost opposite nature. Like Vedantic line of thoughts, all most all the *Puranic* and *Tantric* views are monistic in nature as they believe either in two aspects of one

absolute truth or in two eternally inseparable entities as the ultimate reality. None of them is dualist in true sense as Samkhya tradition. But in the matter of creation, such monastic-dualistic division is how far plausible since creation is inexplicable without the recognition of either co-existence or union of two principles. Thus philosophical interpretations of creation myths undoubtedly ascertain an implication of gender equality.

References:

1. Singh Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India, Pearson India Education Services Pvt. Ltd., 2019
2. Chhawehharia, Ajay Kumar. *Vedic Upanisads*, Vol.I. Chaukhamba Surbharati Prakashan, Varanasi, India, 2010
3. Woodroffe, John. *Saktiand Sakta*. Shivalik Prakashan, Delhi, 2015
4. Bhattacharya, N.N. *History of the Sakta Religion.* Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2015
5. Sharma,S.A.*KenaUpanishad: AStudy from Sakta Perspective*. Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 2001.
6. Kumar, Pushpendra. *Sakti Cultin Ancient India: With Special Reference to the Puranic Literature*. Bharatiya Publishing House, Varanasi, 1974
7. Kelkar, Meena. Man-Woman Relationship in Indian Philosophy. *Indian Philosophical Quarterly* Vol.XXVI, No.1, January, 1999.
8. Sharma, Chandradhar. *A Critical Survey of Indian Philosophy*. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2000.
9. Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy*, Vol.1&2. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2006.
10. Hiriyanna M., *The Essentials of Indian Philosophy*, George Allen & Unwin Ltd., LonDon, 1974.
11. https://www.shankaracharya.org/soundarya-lahari.php

Moral Values and Ethics as Depicted in Srimad Bhagavad Gita : An Analytical Study

Uday Sarkar
Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Malda College, Malda

Abstract: morality and ethics are the major parts of Indian Culture. Without ethics and morality,in this world, human beings are not less than wild animals.Morality and ethicsare something which differentiate supreme creature of God from his lower creature.In other words, morality and ethics differentiate human beings from animals.All human beings face a lot of problems in their lifetime for which they may be disappointed, frustrated many more. Srimad Bhagavad Gita has answers to all this types of problems faced by human beings.It is considered to be one of the philosophical texts that deals with mental health,which is crying need especially for young generations.It acts as guide for those who are bewildered from their path. Many of us think that The Geeta is a mere conservation between Lord Shrikrishna and Arjun.But this concept is not right whereas it is a confluence of Ethics and Morality.To understand this concept, we need to develop our inner thoughts, we need to have faith in the creator.The Geeta's ethics and moral values teach us how to minimize one's desires,emotions, greed in order to lead a healthy and peaceful life. It is a manual book for the human body.When we buy an electric device, at that time we also get a manual book to regulate that device. Similarly The Geeta does the same for us.The Geeta has come to us through disciplic succession with the view to saving the people on the earth from heading into wrong path of our life.You may have seen ups and downs in your life, you may have faced tough time in your life. Geeta has all answers of your questions. It teaches us how to make balance in our life with honesty and integrity. It also teaches us how to be brave when problems arise. In this article, I will discuss how one can be a good human being with high moral values and ethics.

Keywords: Shrimad Bhagavad Geeta, Moral Values, Ethics, book for good human beings, embodiment of Indian Culture.

Introduction:

Srimad-Bhagavad-Gita is an epitome of all Indian Scriptures. It is found in the Bhishma Parva of Mahabharata written by Vedavyasa Srimad-Bhagavad-Gita consists of eighteen Chapters as well as seven hundred slokas.What Lord Shrikrishna had advised to Arjun, Son of Kunti, during Kurukshetra war is known as Srimad-Bhagavad-Gita. At that time Arjun was bewildered and

reluctant to fight seeing his relatives standing in front of him as opponents then lord Shrikrishna taught him about the duties of Kshatriya, Kshatriya is known as the protector of its subjects.It is not a merely conservation between Lord Shrikrishna and Arjun but upanishadic teachings, philosophical teachings have also been discussed through the conservation.It also deals with brahmavidya meaning the knowledge of Brahman, the absolute God.Since birth, everyone has a desire to attain the ultimate goal of life, Mokṣa or liberation. The Srimad-Bhagavad-Gita, for which, discusses a lot of paths that lead to salvation.It also deals with the material energy named Prakriti.Maya is regarded as one of the aspects of material energy, which keeps the souls bound to the cycle of death and birth.It keeps us under illusion,due to which everybody's tendency is to run after material enjoyments. And material energy are said to be divided into three constituent modes: mode of goodness meaning sattva guna, mode of passion meaning rajoguna, and mode of ignorance meaning tamasikguna. The gunas influence us, due to the increase of the mode of passion, the turbulence of the mind keeps increasing, controlling the mind goes out of control. Due to the increase of the mode of ignorance, we get lethargy, laziness, unwillingness to work. We get illuminated with the pure knowledge, due to the mode of goodness. This guna helps us to develop virtuous qualities. And Gita teaches us in attaining the abode of God which is filled with imperishable happiness by making balance of these three ganus.The Gita is also known for dealing with yajna, referring to fire sacrifice. But the Gita, in this respect, is said to have involved all actions which are discussed in our various Scriptures. The Gita tells us to perform yajna in divine consciousness.

The Srimad-Bhagavad-Gita also describes yoga. From the spiritual perspective, Yoga is the union of an individual soul with the Supreme soul. In other words, Yoga is the evenness of the mind. And various ways of attaining union with the Supreme soul are discussed in Gita like Jnana Yoga which emphases on the self knowledge, bhakti yoga meaning the path of devotion, Karmayoga meaning the path of action.

So it is not wrong to say that the Srimad-Bhagavad-Gita is the most renowned sacred book, which is known for its own comprehensiveness.

Discussion:

The word Ethics is derived from word ηθos meaning character. And ηθos is derived from εθos meaning custom or habit.And the term moral is deeply associated with ethics.And the word moral is derived from Latin word Mores. It has two meanings, primarily stands for customs or habit and secondly stands for character. In India, the world Dharma is used to mean the both ethics and morality.

On the other hand the srimad -Bhagavad-Gita is not merely a conservation but is a philosophical dialogue between Prince Arjuna and Lord

Krishna on the battlefield of Kurukshetra. The core teachings of the Gita put forth the conflict of duty and morality, symbolizing the struggle between good and evil, right and wrong, and the complexities of ethical decision-making. Arjuna, confused and morally troubled, seeking guidance from Lord Krishna, who imparts timeless knowledge on the nature of life, duty (dharma), righteousness, and the path toliberation or *Mokṣa.*In Gita, Arjun represents a man having problems regarding his duty, what to do and what not to do and Lord Srikrishna represents a path shower,who knows the reality of life, truths.

In the context of ethics and moral values, the Srimad Bhagvad Gita profoundly gives us insightful knowledge into the principles of right conduct, personal responsibility, and the moral dilemmas faced by every huamn beings. Its teachings are absolutely universal.It is relevant today in various aspects of human life including personal to professional, individual to societal. This analytical study delves into the ethical principles and moral values depicted in the Gita, setting forth their importance in shaping human conduct. As without morality and ethics, human beings are not less than wild animals. Every human being needs to cultivate compassion, love towards all living beings.

The Srimad Bhagvad Gita significantly holds the concept of dharma. It is one of the most important concept discussed in the Gita.It is a common word which is used in Hinduism and Buddhism. Dharma here refers to duty,good conduct, righteouness, noble quality. The word Dharma comes from the root word dhṛi meaning responsibilites or actions that are appropriate for us.Lord Srikrishna says that one should perform his duty, though it is difficult or challenging.We find Arjun who is reluctant to fight on the battlefield of Kurukshetra as his relatives posing his enemies.Lord Srikrishna advises him stating that one should perform his duty regardless of consequence of it.As it is consideredas a moral imperative.

“śreyānsvadharmoviguṇaḥparadharmātsvanṣṭhitāt
Svadharmenidhanaṃśreyaḥparadharmobhayāvahaḥ”

Krishna here advises Arjuna to follow his prescribed duties as a warrior, rather than taking a step back from his responsibilities. The principle of dharma advocates adherence to ethical conduct based on one’s role in life. Krishna also suggests that moral values are deeply intertwined with performing one’s duty honestly.

An another outstanding concept of central ethical teachings of Gita is niskama Karma which makes it the most revered book in the world.Niskama karma refers here a selfless action that is completely free from the attachments to the results of action.According to Lord Krishna one should perform their duties with full dedication and effort.While perfprming these duties one has to be unconcerned for their personal gain or outcomes. This principle of selfless action signifies the importance selflessness and moral intregity in one’s action.

In the case of desireless action, lord Krishna says

“karmaṇyevādhikārastemāphaleṣukadācana
mākarmaphalaheturbhūrmātesaṇgo’stvakarmaṇi”

This verse emphasizes that actions should be driven by moral responsibility, not by selfish desires. Acting without attachment fosters ethical behavior, as it encourages individuals to prioritize the well-being of others and society rather than seeking personal rewards.We have the right to do our duty , but the results are beyond our efforts. A lot of factors come into play to determine the results-destiny, our efforts and the will of God.But if we become anxious for the results, we will boudendly experience despondency whenever they are not according to our expectations.

Nonviolence adds another dimension to human values.The Srimad-Bhagvad-Gita holds the concept of nonviolence significantly. Although it is set against the backdrop of war.LordKrishna says that violence is justified in extreme situation where protecting righteousness and justice becomes necessary. And the Gita is known for promoting peace and nonviolence as moral values but in some cases, in the pursuit of justice violence is inevitable. In this respect, in the fourth chapter of Gita, Lord Krishna say

‘paritrāṇāyasādhūnāṃvināśāya ca **duṣkṛtāṃ**
dharmasaṃsthāpanārthāyasambhvāmiyugeyuge.’

It means that for the protection of righteous, for the annihilation of wicked, and for the establishment of dharma, I come into being from age to age.The above verse explicitly explains that sometimes, violence becomes necessary. The use of force becomes morally permissible only when it serves to protect righteousness and combat evil, aligning with the ethical principle of acting for the greater good. In connection with nonvilence, Lord Srikrishana is seen saying that various human qualities like fearlessness,fear, nonviolence, satisfaction, equanimity are all created by him alone.Human body is meant for spiritual realization.Committing violent act on human body is the biggest sin.

Truthfulness or *Satya* is another aspect of human values. The virtue of satya (truth) is embedded in the teachings of the Gita.It also emphasizes the importance of upholding truth with compassion and sensitivity, ensuring that truth does not become a tool for harm or cruelty. Satya, as depicted in the Gita, is not just about factual truth but also about ethical truth that considers the impact of one’s words and actions on others.Truthfulness is very important in order to maintain ethical intregity and moral character. Truth is the foundation stone of huamn values.And Lord Krishna, in Gita, emphasizes that truth should guide one’s thoughts, words and action.It is a fundamental ethical principle, which nourishes trust,rightneousness, and justices and also helps to create a harmonious society for all living entities.In this respect, Manusmriti says that-‘speak the truth in such a way that it is pleasing to others.Do not speak the truth in a manner

injurious to others, Never speak untruth, even though it may be pleasant.This is the eternal path of morality and dharma.

Compassion or *daya* and forgiveness or kshama are important aspects of moral values that are highlighted in the Gita. Lord Krishna teaches that an individual should cultivate compassion for all living beings and practice forgiveness to rise above anger and hatred. These values are crucial for building harmonious relationships and promoting peace.

In the twelevth chapter of Bhagavad Gita, Lord Srikrishna says that those devotees are very dear to him who are free from attachment, egoism, who are friendly and compassionate, equipoised in happiness and in pain and ever-forgiving.They are absolutely content, steady in devotion with him and self-controlled.

> "adveṣṭāsarvabhūtānāṃmaitraḥkaruṇaeva ca
> nirmamonirahaṅkāraḥsamaduḥkhasukhaḥkṣami.
> Santuṣṭahsatataṃyogi yatātmādṛḍhaniścayaḥ
> Mayyarpitamanobuddhiryomadbhaktaḥsa me priyaḥ"
> "He who hates no creature, who is friendly and compassionate, who is free from attachment and egoism, balanced in pleasure and pain, and forgiving, that devotee of mine is dear to me."

This verse expresses the ethical ideal of universal love and compassion, suggesting that moral character is defined by kindness and the ability to forgive.So Lord Srikrishna actually urges people to cultivate love, compassion towards all living beings.He hates any act that is harmful to any living beings.

The Gita's ethical framework is based upon Karma Yoga meaning the path of selfless action. Karma Yoga teaches us that the ethical conduct arises from acting according to one's duty without selfish motives. This ethical principle advocates for responsibility, accountability, and dedication in all actions.

In this respect, in the fifth chapter of Bhagvad-Gita,Lord Srikrishna says-

> "brahmaṇyādhāykarmāṇisaṅgaṃtyaktvākarotiyaḥ
> lipyatenasapāpenapadmapatramivāmbhasā"
> 'One who performs his duty without any attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water.'

Lord Krishna, here, actually wants to say that the ethical action is detached from selfish desires and is aligned with the greater good. This principle is applicable to modern ethical dilemmas, where the focus should be on the moral integrity of actions rather than the pursuit of personal gains.

The Bhagavad Gita promotes an ethics of virtue, focusing on cultivating moral character through discipline, self-control, and inner development. Traits

such as humility, non-arrogance, patience, and purity are emphasized as essential virtues for leading an ethical life.In the sixteenth chapter of Gita, krishna says-

“tejaḥkṣamādhrtiḥśaucamadrohonātimānitā
bhavantisampadaṃdaivīmabhijātasyabhārata”

‘Gentleness, modesty, non-injury, forgiveness, uprightness, service to the teacher, purity, steadfastness, and self-control are the qualities of those born with divine nature.’ This verse highlights the importance of internal virtues in ethical conduct, suggesting that moral values stem from cultivating a virtuous character.

Conclusion:

The Srimad Bhagavad Gita offers a wide range of ethical framework grounded in moral values such as duty, selflessness, truthfulness, compassion, and non-violence. Its teachings on ethics provide guidance for navigating moral dilemmas, emphasizing that ethical conduct stems from self-discipline, responsibility, and a focus on the greater good. In a world where ethical conflicts and moral challenges are ever-present, the Gita’s wisdom remains relevant, offering timeless lessons on how to live a virtuous and righteous life.

By examining the moral values and ethical principles in the Gita, it becomes clear that the text provides not only spiritual guidance but also practical advice for living ethically in personal, professional, and societal spheres. The Gita’s teachings, with their emphasis on duty, selflessness, and righteousness, continue to inspire ethical reflection and action in contemporary life.

Reference:

1. Easwaran, Eknath,The Bhagavad Gita for daily living,Mumbai, Jaico Publishing House,1997,2008.
2. Chatterjee, R.K. The Gita and Its Culture. New Delhi: Sterling Publishers,1987.
3. Chattopadhyay, Shankar, Gitabirasha, Kolkata, United Book Agency, 2019.
4. Basu, Sumita,Bharatiya Darshan Samiksha, kolkata, Sadesh,2011.
5. Mukundananda,Swami Bhagavad Gita, the song of God,New Delhi, Rupa Publication India Pvt. Ltd 2022.
6. Adgadananda, Swami, Yatharth Geeta,Mumbai,Shree Paramhans Swami Adgadananda Ji Ashram Trust, 1988.
7. Prabhupad, Swami, A.C. Bhaktivedanta, Bhagavad -Gita As It Is,Mumbai,The Bhaktivedanta Book Trust.1972,1986.
8. Sastry, Avadhoot, Srimad Bhagavad Gita,Delhi/Mumbai, Grapevine India Publishers Pvt Ltd,2022.
9. Dayananda, Swami, the teachings of Bhagavad-Gita, Delhi, vision books Pvt.,ltd., March 29 2005.

Dropout Scenario in Upper Primary School Level : A Geographical Analysis on Baidyapur Gram Panchayet under Ranaghat- II C.D Block of Nadia District

Ujjal Roy
Assistant Professor, Dept. of Geography
Sundarban Mahavidyalaya
Kakdwip, South 24 PGS

Abstract: Education is the back bone of society. Education system of a country always depends on school level which plays a very important role to construct the pillar of knowledge for future. Upper Primary is a very crucial stage in primary education. But unfortunately due to the many unavoidable reasons many families of our country can not wish to continue the education of their child in this level. So, a huge quantity of pupil drop out from schools in upper primary level for many reasons like lack of knowledge, poverty and many others social stigma, especially those points are more highlighted in case of dropout for girl child. A block like Ranaghat II is an ideal example of this fight between drop out problem and many positive movements by government, NGOs & civil societies for the education of next generation. Prevent child marriage, Scholarships for students, Basic infrastructures and job opportunities can prevent the problems of drop out in some extent.

Key Words: Upper Primary, Drop out, Girl Students, Poverty, Child marriage, Infrastructures, Scholarships.

Discussion:

CHAPTER I

1.1. INTRODUCTION

Education is the back bone of society. Education system of a country always depends on school level which plays a very important role to construct the pillar of knowledge for future. Upper Primary is a very crucial stage in primary education where pupil almost completed their primary education and entire to secondary education for making their future. But unfortunately due to the many unavoidable reasons many families of our country can not wish to continue the education of their child in this level. So, a huge quantity of pupil drop out from schools in upper primary level for many reasons like lack of knowledge, poverty and many others social stigma, especially those points are more highlighted in case of dropout for girls child. Naturally dropout problem linked up with child

marriage, child labour and increase various other social problems like domestic violence, dowry, anti social activities etc. The research works finds out the reasons of problems behind dropout and try to solve out with scientific method. Due to dropout the wastage is not only of the family of the particular child but also the society as well as the nation because this child may be rewound person in our country. In all the commission after independence are given emphasis on reduction of the drop out event. Otherwise progresses of the society are same as well as the country. For the benefit of society as well as the nation dropout must be avoided.

To avoid this drop out different scheme of the project in our country such as mid-day-meal, Sobuj Sathi, Kanyashree, Rupashree and many others project are taken. But still the drop out is in different classes for various reasons. The investigations areattended to study the reduction of drop out at upper primary level.

1.2. STATEMENTS OF THE PROBLEM

Thus the problem is stated as the dropout rate at Upper Primary level students at Nadia District under Ranaghat II Block.

1.3. OBJECTIVES

(1) Influence of the attitude of the parents on education of the child.

(2) Influence of the literacy of parents regarding education of the child.

(3) Influence of social status of family regarding education of the child.

(4) Influence of annual-income of parents on education of the child.

1.4. HYPOTHESIS

(1) There exists no influence for the drop out of the children at upper primary level due to attitude of parents.

(2) There exists no influence for the drop out of the children at Upper primary level due to parents' literacy.

(3) There is no significance for the drop out of the children at Upper Primary level due to social status of parents.

(4) There is no significance for the drop out of the children at Upper Primary level due to annual income of parents.

1.5. POPULATION

Upper Primary level students of West Bengal.

1.5.1. SAMPLE

Sample will be taken for the study from two rural schools of Nadia District of Ranaghat II Block.

(1) Baidyapur Vivekananda Vidyamandair.

(2) Paschim Shimulia Junior high school.

Total no. of students- 200; both Male & female students will be taken for the study. All the efficient region & caste will be taken.

1.5.2. METHOD

Survey method will be adopted for the study.

1.5.3. TOOLS & TECHNIQUE

Questionnaire for the teachers.
Questionnaire for the head of the Institutions.
Questionnaire for the students.
Statistical Analysis.

1.5.4. VARIABLES

(1) Independent Variable
Sex wise variables: Male, Female.
Religion wise Variables: Hindu, Muslim, Christian, Jain, Buddhist, Sikhs etc.
Caste wise variables: General, SC, ST, OBC.
(2) Dependent variables: Drop out at upper primary level.

1.6. OPERTIONAL DEFINITION

Drop out

According to the Cambridge English Dictionary the definition of 'Drop out' is a student who leaves school before finishing the course of instruction. As a high school dropout he will never get a decent job. Actually a student who stops going to schools, college etc. Poverty was the highest reason of dropout. Other causes are age of pupils, poor academic performance, employment, teacher-pupil relationship, peer pressure, lack of good launch.

Upper primary

Universalization implies education all children up to the age of 14 which is equivalent to completion of upper primary level of education. However enrolment in Upper Primary school is more function of primary education completion rate the function of the relevant age group. Upper Primary means class V to VIII in our country as per recommendation.

Rural areas

In general, a rural area or country side is a geographic area that is located outside towns and cities. The census Bureau defines rural as "any population, housing or territory NOT in an Urban Arena." Rural is defined by level of development relatives to urban area, such as provision of services or issues of poverty and equality.

1.7. DELIMITATION OF THE STUDY

It will be delimited only for-
(1) The two rural schools of Nadia district Ranaghat II block.
(2) The Upper Primary level students.
(3) The two rural schools.
(4) The sample 200 students including male & female.

1.8. SIGNIFICANCE OF THE STUDY

There are so many facilities are given by govt as well as different authorities to reduce the drop out at Upper Primary level but still the drop out is going on at

Upper Primary level. Especially in a district like Nadia drop out problem is a serious problem for society in respect of future. Because Childs are the future of nation and without their proper education they are unable to uplift our nation in next level. So the government also take some serious steps for counter the problem. A block like Ranaghat II is an ideal example of this fight between drop out problem and many positive movements by government, NGOs & civil societies for the education of next generation. So the study is to be done.

CHAPTER- II

2. REVIEW OF RELATED LITERATURE

2.1. INTRODUCTION

Survey of relevant literature in support of the topic of research is an essential component in any study. Some is true in this case too. Literature reviews are also common in a research proposal or prospectus (The document that is approved before a student formally begins a dissertation or thesis). The main types of literature reviews are: evaluative, exploratory and instrumental. A forth type, the systematic review is often classified separately, but is essentially a literature review focused on a research question, trying to identify, appraise, select and synthesize all high quality research evidence and arguments relevant to that question. A meta analysis is typically a systematic review using statistical methods to effectively combine the data used on all selected studies to produce a more reliable result. Shields and Rangarajan (2013) distinguish between the processes of reviewing the literature and a finished work or product known as literature review. The processes of reviewing the literature are a finished work or product known as literature review. The process of reviewing the literature required different kinds of activities and way of thinking. The review of literature pertaining to the study of dropout rate, school infrastructure, and poverty analysis and curriculum assessment of school education especially in Upper Primary level in the district of Nadia is an attempt to survey the work so far in this line. However many researcher have been done in this line which make it quite impossible to incorporate all of them in this review.

Many studies have been done on the human adoption to similar condition; however the present work tries to understand the reasons of dropout like poverty, lack of launch, toilet facilities, unscientific curriculum and various social stigmas as well as impact of easy income through, labour work on drop out from the schools of Upper Primary level in the study area. Proper funding and concentration of parents and teachers to minimize the dropout rate students is another goal of this work.

2.2. REVIEWS

(1) Kundu. R (2010) reported on girls drop out in Primary education an estimate from agro-economic and socio-cultural variables. Education is a man making process. School dropout consequence is not only an educational fall out but also

is generating immense trauma humanity. The girls drop out at primary level from 25%-65% and the boys drop out as a range 15%-60%.

Findings

(1) The variables are identified through multi level interactions as to get them contextually relevant. The ratio of primary to Upper Primary in West Bengal has been 18.70 as against the national level data 3.11.

(2) While in the national level total number of schools established since 1994 has been 236003, in West Bengal in total number of schools 4016.

(3) As per the data provided by the 2006-2007 census it is depicted that at Primary level 73% of schools in West Bengal are having an enrolment level ranging from 51%-220% at the national level 56%.

(2) Vijay. N (2016) reported on a study of school drop outs causes and consequences with special reference to Mayiladu- thurai taluk Nagapattinam District. Human resources can be developed by providing formal education from elementary to the higher level. India is home to 17% of the world's total population accommodated in an area which is 2.4% of the world's total area, India spent 4.02% of its GDP on education during 2001-02 but about 44% of its adult population still remains to be made literate. The percentage of Upper Primary school manage by government ranging 40%-51% from 1973-74 to 2001-02. The areas concentrated by the present research pertaining to problems and consequences of schools dropout upto H.S level.

Findings

(1) Size of family income and liabilities of despondence have a strong boring on the schools dropouts.

(2) Extend of poverty is cause of extend of drop out.

(3) Social variable like community, religion, sex are responsible for dropout.

(3)Villi, C (2017) reported on study of woman learners who and dropped out of the Open University system of the university of Madras. He emphasized on dropout of Open Universityin Tamil Nadu, as observed from the analysis of the National and International situations few have carried out research in the area of drop out problem in distance education, more especially in Tamil Nadu of India no study has been conducted before it.

Findings

(1) The researcher focused on distance education which is quite neglected in most of the common education related studies.

(2) Drop out in women learner through distance education little bit rare but very serious problem. The researcher clears this matter.

(3) University of Madras is a very reputed education hub in field of distance education in India. So, the research is quite special for distance learning.

2.3. CRITICAL OBSERVATION

(1) As per **Kundu, R (2010)** was done his research on the girls only where compare with boys students in case of dropout were very essential. Otherwise the research group was little bit limited. He mainly identified agro-economical socio-cultural variables on dropout of primary education only. Naturally other reasons was also present those are not discussed here as well as he only done his study on primary level only and by pass the upper primary and other level of education which remarked the limitation of the paper.

(2) As per **Vijay, N (2016)** the study of school dropout was based on various kind of data. But the research did not clarify the ground reality of the study area very brightly. Reasons those were behind for dropout like poverty, child labour etc not properly analyse here.

(3) As per **Villi, C (2017)** studied on dropout of the open university of the university of Madras was completely different & news type of problem in education. But he did not compare such type of problem with regular education system properly. Otherwise the research works not very clear for the public. He only did his work on woman where if he also included male students then maybe it will be better. The author could not identify the so many reasons behind the problem of woman learners in distance education which was a drawback of his research.

CHAPTER III

3. SCENARIO OF STUDENTS DROPOUT IN STUDY AREA

3.1. Differences between two schools in case of dropout (2021-22 A.D)

Two schools of Baidyapur village under Ranaghat II block have different kind of situation in case of dropout.

Serial Numbers	Name of Schools	Number of Dropout students
01	Baidyapur Vivekananda Vidyamandair.	12
02	Paschim Shimulia Junior high school.	06

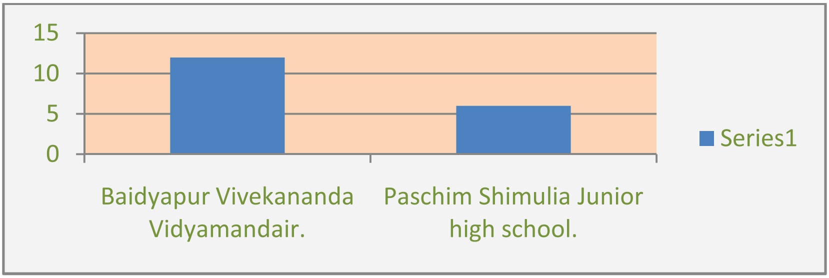

3.2.Differences between male and female students in case of dropout (2021-22 A.D)

Scenarios of dropouts are completely different in case of male and female students. Basically dropouts from schools are more common in case of girl child in study area.

Name of Schools	Male students	Female students
Baidyapur Vivekananda Vidyamandair.	03	09
Paschim Shimulia Junior high school.	01	05

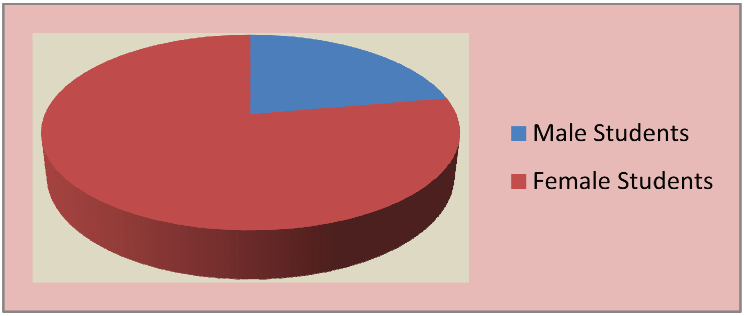

CHAPTER IV

4. SOLUTIONS

Female students' dropout rates are more than male students for many socio-economical reasons. So awareness from the all parts of society including school levels is necessary.

Mainly they are;

1. Prevent child marriage from grass root level and interactions with guardians from teachers as well as school administrations are highly necessary.
2. Scholarships for students and other facilities from government level also can prevent dropout effectively.
3. Basic infrastructures like toilet facilities, laboratories, libraries, boundary walls can feel safe to students and their guardians for go to the schools continuously.
4. Job opportunities as well as lucrative career options in futures can boost both male and female students to learning with regular manner.

CHAPTER V

5. CONCLUSION

A number of key points have emerged after the surveys which are to be kept in mind before forming policies to reduce dropout rate in India. An attempt has been made to look into the socio backgrounds of students. A number of observations have been made.

With regard to parental education, it has been observed parents of dropout students were poorly educated than parents of non-dropout students. Also, specifically mothers of dropouts students were poorly educated than parents of non-dropout students. Also, specifically mothers of dropouts were quite poorly educated. Education of mother is considered an important factor which can lead to a reduction in dropouts.

A positive relation between family size and dropout rate can be explained keeping in mind the larger financial burden of the family and less amount of resources per child.

In Nadia, interestingly gender bias is not observed. Parents of girls were quite willing to send their children to school. Dropouts amongst boys can be attributed to the fact that boys are less interested in studies.

A negative relation between the number of dropouts and family income is also observed. With regard to dropout by class, maximum dropouts are obtained in classes 6^{th} and 8^{th}. This can be explained by transitions between Upper Primary and Secondary and Higher Secondary.

Major factors explaining dropouts are lack of interest in studies, taking care of younger siblings, financial constraints, disputes in family, poor facilities in school, lack of motivation of parents, observation into the labour market and bad school environment especially no effective teaching.

It is also concluded based on the replies of the respondents is that most of the dropped out students are currently in the unorganised sector working for money.

Finally a study of school environment revealed that distance of school was not a factor at all for explaining dropouts. All schools were with in close proximity. However teaching was also not up to the standard according to the dropout students. This also explains the finding that most of the students had to go for private tuitions. Several drop outs happening for lack of extra curriculum activities, health & hygiene for girls.

REFERENCES:

(1) **Kundu, R.** Girls drop out in primary education An estimate from agro-economic & socio cultural variables. Deptt. of Sociology, University of Kalyani. August 02, 2010.

(2) **Nath, I.** Critical study of the problems of non enrolment dropout and non attendance of children at primary stage of education in urban slums of Kolkata a case study. Deptt. of Education, University of Calcutta, Kolkata, June 19, 2017.

(3) **Pal, A.K.** A critical appraisal of minimum level of learning school effect on achievement and drop-out at elementary level in West Bengal. Deptt. of Adult Continuing Education & Extension, University of Kalyani, Kalyani. May 02, 2019.

(4) **Srivastava, P.C.** A study of dropouts problem of Primary school level of Ghazipur district UP. Deptt. of Education, V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur. November 22, 2017.

(5) **Toggu, T.** A study of drop outs in Primary schools of Arunachal Pradesh. Deptt of Education, Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Arunachal Pradesh. July 02, 2019.

(6) **Venkateswaran, R.**A study on the influencing factors for students' dropout in schools of tribal areas in Tamil Nadu. Deptt. of Education Technology, Bharatidarsan University, Tiruchinappalli. September 18, 2018.

(7) **Vijay, N.** A study of school dropouts causes and consequences with special reference to Mayiladuthurai taluk Nagepattinam District. Deptt. of Economics, Bharatidarsan University, Tiruchinapalli. October 13, 2016.

(8) **Villi, C.** Study of Women learners who are dropped out of Open University system of the University of Madras. Deptt. of Economics, Bharatidarsan University, Chennai. October 13, 2016.

(9) **Yadav, R.**A study of dropouts in Primary schools of Allahabad District. Deptt. of Education. V.B.S. Purvanchal University; Jaunpur. November 20, 2017.

(10) **Yadav, R.** Jaunpur janpad ke prathamik vidyalayan meinpadhaichhod dene walen dropouts evam ek hi kaksha mein punah pravesh lene walon Repeaters ka ek edhyayan .Deptt. of Education, V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur. November 21, 2017.

Cholera Outbreak and Prevention in colonial India :1817 to 1947

Uttam Das
Asst. Professor, Dept. of History
Kharagpur College
&
Supriti Mondal
Asst. Professor, Dept. of History
Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

Abstract: Cholera, malaria and smallpox were the main sources of epidemics in India under British rule. Epidemics have spread their shadow in this country at various times, sometimes in the form of epidemics over a wide area or in the form of epidemics in regional areas. The focus of the discussion paper is to review the history of cholera epidemics in colonial India and its cure. Cholera was an epidemic in India at that time. A lot of people lost their lives due to the epidemic and people's lives and lifestyles were destroyed during the colonial rule, cholera appeared in varying degrees in large parts of India. How did the British government deal with this epidemic? What was the reaction of the native people? An attempt has been made to see how indigenous peoples played a role in epidemic prevention.[1]

Keyword: Disease, Epidemic, India, Health, British, People, Impact.

Discussion:

When an infectious disease spreads rapidly among a large population, the disease is said to be epidemic. Numerous epidemics have occurred throughout the world. Millions of people lost their lives in the epidemic. One hell of a killing spree.Undevided Bengal was under the grip of such an epidemic when the rule of the British Raj was going on. Originating from Bangladesh, there were seven cholera epidemics throughout India during the 200-year rule of the British raj and spread all over the world. The first epidemic of which occurred in 1817 in the undivided Bengal of India under British rule. The Seventh Cholera Pandemic is officially a current pandemic and has been ongoing since 1961. According to World Health Organization data as of March 2022, there have been cholera outbreaks in various parts of the world, such as the 1991 to 1994 outbreak in South America and most recently in Yemen from 2016 to 2021 an outbreak of cholera has occurred.[2]

Cholera emerged as an epidemic in colonial India in the 19th century. Indian society at that time European elites living in Bengal were not widely

affected by the disease. At that time, the farmers and laborers of Bengal and India were seriously affected by this disease. Cholera is a bacterial disease. This disease is organized by the infection of the bacteria called Vibrio Cholerae. Italian scientist Filipo Pracini discovered this bacterium. This disease became an epidemic in Russia for the first time.It later spread to India and Bengal. The first case of cholera in India was on 23 August 1817 by a civil surgeon from Jessore in undivided Bengal. The death toll in the first cholera epidemic is not known because data collection in India probably did not begin until 1807. In 1826, the effects of the second cholera epidemic were widespread in Bengal, Punjab andDelhi, killing hundreds of people over several weeks.[3]

The third cholera epidemic began in 1852 and lasted until the late 1860s. This epidemic was much more significant and terrible than the previous epidemics. The outbreak spread beyond Bengal. The fourth cholera epidemic began in 1863. The effects of this epidemic spread to Madras by 1867, the epidemic had spread across northern India. The fifth cholera epidemic began in 1881. The fifth cholera epidemic was less severe than the previous four epidemics.It was the seventh cholera epidemic in Thailand that originated in Indonesia.

Outbreaks of cholera epidemics were also observed in the army. As a cure for the disease, quarantine outbreaks were then govt. The government also started cholera hospitals to treat cholera. Whether cholera is indeed an infectious disease is discussed in detail. Major G.B. Mallson, Director of the Sanitary Department, argued the need for careful treatment of cholera. He also said that the government should take special measures based on the infectiousness of the disease. The government arranged camp hospitals and sanitation for pilgrims. Medicines and disinfectants were being used for the sick. British structural negligence was the main factor in the epidemic of this disease. However, before the society of the time adopted a scientific method for the relief of the disease, they resorted to superstition, which is responsible for both the terrible nature of the epidemic andthe devastating death toll.

The evolution of public health in British India and the history of epidemic prevention in that part of india in the 19th and early 20th century provides a valuable insight into the period that witnessed the development of new trends in medical systems and a transition from surveys to microscopic studies in medicine. It harbors the earliest laboratory works and groundbreaking achievements in microbiology and immunology. The advent of infectious diseases and tropical medicine was a direct consequence of colonialism. The history of epidemic and their prevention in the colonial context traces back the epidemiology of infectious diseases, many of which are still prevalent in third world countries. It reveals the development of surveillance systems and the response to epidemics by the imperial government. It depicts how the prevention

of epidemic systems under the colonial power shaped disease control in British India to improve the health of its citizens.[4]

Officers of the British East India Company were not familiar with cholera before 1817, cholera was confined to Bengal but the 1817–1821 cholera epidemics in India shocked the Company. By the 1830s, cholera was known to be a life-threatening disease to the western world. In India, it gained the focus of medical services due to its serious impact on the troops and officers of the Company; otherwise, it was a disease of poor people. Due to the lack of effective treatment for cholera in that period, the main focus was set on its prevention.[5]

The British Indian government stuck to metrological theories about cholera after the Constantinople International Sanitary Conference of 1868, believing that atmospheric conditions are the basic cause of spreading the disease. After the 1868 cholera epidemic in India, the Cholera Committee was set up to investigate the causes of the disease. It comprised of the Principal Inspector General of the Indian Medical Department, Sanitary Commissioner for Madras, and Col. A.C. Silver. The committee concluded that cholera was frequent especially at religious festivals and fairs. Epidemics were attributable to the importation of disease by pilgrims, travelers, and troops. The committee suggested improving sanitation, ensuring proper management of festivals, and developing hygienic conditions in institutions like hospitals, jails, and military cantonments.Dr. S.C. Townsend, Sanitary Commissioner for Central Provinces and Berar, also reportedhis 1868 cholera epidemic investigations.

In the 1860s and 1870s, Dr. James L. Bryden, India's first epidemiologist and government's chief advisor on epidemic cholera, studied cholera extensively. He had first-hand experience with cholera during his work as a statistical officer in IMS in Bengal. But, he considered cholera to be an air-borne disease probably spread by a seed-like organism. He reported that cholera is not transmitted by contaminated water. A.C. DeRenzy, Sanitary Commissioner of Punjab, opposed his views and stated that it would hurt the sanitary work going on in India to prevent the spread of cholera.John Murray, who served as Inspector General of Civil Hospitals in North Western Provinces and Bengal, conducted detailed studies on cholera. Although there was evidence of contagiousness, Murray believed that environmental factors precipitated the attacks of cholera, but he gave valuable treatment guidelines for cholera in that period. Surgeon W.R. Cornish, Sanitary Commissioner for Madras, challenged metrological theories about the spread of cholera and carried out detailed surveillance and research work to establish the contagiousness of disease, which is evident from his reports on cholera in Southern India in 1871 and his investigations of cholera outbreaks in H.M.'s 18th Hussars in Secunderabad in 1871 that killed 115 people in 1 month including 20 troops of theRoyal Indian Army.Other significant works include reports from H.W. Bellew, Deputy

Surgeon General and Sanitary Commissioner for Punjab, about the cholera outbreaks in India from 1862 to 1881, and the reports of Commissioner Benarus Division (United Provinces) about the disease outbreaks in the sub-division of Bulliah and the district of Mirzapore. In the 1890s, metrological theories about cholera were abandoned, as desired by W.R. Cornish. New treatment options evolved along with better prevention methods resulting in the marked decrease in cholera mortality.

Bacteriological investigations were the next to attract attention. The cholera epidemic of 1861 gave a new dimension to the colonial heath policy in India. If cholera was to be prevented, it had to be sought out, not waited for. Segregation on sanitary grounds was not enough. More knowledge about the disease itself was required. The Government of India promptly appointed a Cholera Commission-the first systematic enquiry into a major epidemic. In 1864 three presidency sanitary commissions were set up. In 1868, at the suggestion of the armyMedical School at Netley,two medical officers, T.R. Lewis and D.D. Cunningham of the AMD and IMS respectively, were sent to Germany for further training in research, and on their return to India were appointed special assistants to the sanitary commissions with the Indian government. They failed to produce conclusive evidence on the cause of cholera, but their study was valuable in the sense that they stressed the importance of seeking other causes than the contagion theory. In 1883 Robert Koch discovered the cholera 'Comma' bacillus in Egypt and visited Calcutta the same year to confirm the discovery. This was an important contribution and helped to establish the germ theory of disease causation over the earlier miasmatic theories. This shift in focus in England and Western Europe from sanitation to epidemiology and bacteriology had significant implications for India. Now inspection, isolation and attention to the water supply were added to the concern for sanitation.Richard Strachey took a keen interest in bacteriological research as a member of the Secretary of State's Council.

The proposal to send Klein (Dr E.E.) to India to investigate the supposed or actual cholera microbe will come on for discussion in the Indian Council. There is naturally a residuum which prefers doing nothing in such a matter and possibly the residuum in this case will be a majority of the Council and the proposal will besquashed. I personally have a belief that such an enquiry is very desirable... and it would strengthen me greatly if I could get an expression of your opinion. The opposition in our Council talk of the expense. Butcertainly it would be worth many thousand poundsif we really knew hoe cholera was propagated.N.C Macnamara (Bengal Medical Service 1854) was devoted to the He found that the rice-water-like stools of cholera were infective when swallowed, and that a number of persons who by accident drank a portion of the watery cholera stool, developed the disease within a day or two. This convinced

him that the disease was caused by an intestinal bacillus and led him to carry out animal experiments on the causation of cholera. In the course of these he contracted the disease and to carry out animal experiments had to retire in 1876. Thereafter he studied bacteriology the disease under Koch at Berlin at his own expense. In February 1883 he requested the India office to depute to him to Egypt, where cholera had broken out, to work on its bacteriology. His application was refused; yet eight months later Koch was given every facility for his investigations in Egypt which resulted in the discovery of the cholera vibrio. Later Macnamara wrote: "The Secretary of State's refusal to accept my offer crushed any hopes I had of completing my life's work. Haffkine was a little more fortunate. He was given every help to develop his prophylactic and his inoculation programme became popular. But this called for far more money, men and technical and administrative facilities than the GOI was willing to give. The AMD on its part saw Haffkine's authoritative handling of the epidemic problem and his apparent command over the new scientific knowledge as a threat to their professional monopoly in India. Misfortune struck him in 1902. In Punjab 13 persons inoculated from a single bottle contracted tetanus and died. The AMD officials promptly asked for the suspension of his activities, and the government obliged. It was also resolved that hence forth only officials of the British AMD would be appointed to head research laboratories. Haffkine left India in disgrace. Later it was found that the tetanus germs had entered the bottle not in the laboratory but through an accident in transit in Punjab, ButHaffkine was never officially exoneratedby the British Government.[6]

Now the question is what was the role of the indigenous people during the epidemic days during the colonial period? In this case, the lack of documents has become an obstacle in front of us. Although there is not much evidence, it can be said without a doubt that even at that time the students came forward spontaneously. Here we highlight some of their roles. I will discuss the direction.The British government's role in dealing with the epidemic in colonial India was never adequate. As a result, native people have to come forward in many cases. In those days of the pandemic, the activism of the student-youth society of Bengal and India was particularly remarkable. For this reason, in the 19th century and several literatures of the 20th century, the contribution of students and young people in the days of epidemics has been repeatedly mentioned, to stand by the people.[7]

Not only in the pages of literature, but also in the pages of history, is the contribution of the student-youth society to fight the pandemic mentioned. Swami Vivekananda also appealed to the students to come forward. It goes without saying that the call of Vivekananda and Nivedita had an impact on the student and youth community. The role of students in dealing with the 1943 famine and epidemic can be found in Gautam Chattopadhyay's book Banglar

Chhatra Samaj', written by Gautam Chattopadhyay. In his writings, the activities of the Nikhilbanga Students Federation in fighting the epidemic have been published. By 1943-44 the slogan of the Students' Federation was that wherever there was a single Student Federation worker, at least one Relief Kitchen should be opened. Innumerable cities and villages opened anchorages in the face of the people of the country. Hundreds of thousands of workers of the student federation have given away the food. Students of medical schools and colleges of Kolkata came forward in the campaign against the epidemic. Month after month in the village they struggled against epidemic and death. Calcutta University Vice-Chancellor Dr. Bidhanchandra Roy as President, Professor Tripurari Chakraborty as Treasurer and Student Federation leader Sunil Munshi as Joint Secretary was formed as a Student-Teacher Relief Committee. Responding to their call, many relief squads formed by students rushed to Bengal with money, clothes, food and medicine from Punjab, Bombay, Bihar, Madras and other regions.[8]

Another significant event in 1943 was the birth of a new organization called 'Kishore Bahini' with school students under the initiative of Annadashankar Bhattacharya, the leader of the Students' Federation and under the leadership of the workers of the Students' Federation. Keeping these three ideals of patriotism, public service, and socialism in front, Kishore Bahini became the favorite organization of Bengali teenagers to prevent famine and epidemic. Within a short time, the youth poet Sukanta Bhattacharya became the center of this organization.Student community participation in colonial India's response to epidemics continues into the 21st century. The current pandemic will end one day. But the new student society that will be formed with education from this epidemic, they will extend their hands to the people of the country. A new country will be built by their relentless efforts. Society is the guide of civilization. This is the future demand for students.[9]

During the colonial rule, the cholera epidemic spread widely not only in Bengal and India but also in other parts of the world. This deadly disease not only disrupted public life but also caused huge losses in military and financial terms. Although the colonial government initially had shortcomings in its prevention, it gradually adopted good measures to prevent this deadly disease. And the native people, the people of India, ignoring the fear of death, made various efforts to protect the people from the deadly disease of cholera. However, due to the advanced medical system from the time of colonial rule until independence, the impact of this deadly disease was largely overcome. The impact of this deadly disease is not so pronounced even today.

References:

1. David Arnold, The New Cambridge History Of India:Science, Technology and Medicine in Colonial India, Cambridge University Press, 2007
2. Suranjan Das & Achinta Kumar Dutta , Dreadful Diseases in Colonial Bengal, Primus Books, 2021
3. Tanmay Barman, Epidemics and Infectious Diseases Colonial Bengal: A Historical Study
4. Biswamoy Pati & Mark Harrison,The Social History Of Health And Medicine In Colonial India, Primus Book, 2011
5. Prajatbihari Mukhopadhyay, Anandabajar Patrika, 5th April, 2020
6. Deepak Kumar, Science And The Raj,Oxford University Press, 1995
7. Arabinda Samanta ,Living with Epidemics In Colonial Bengal, Routledge, 2017
8. Gautam Chattapadhaya, Swadhinata Songrame Banglar Charasomaj, Charuprakash
9. Soumi Adhikari & Shipra Sinha Roy ,Ouponibeshik Banglar Mahamarir Itihas o Chatrasamaj, BKGC Scholars, 2021.

India-Pakistan Relations : Background, Challenges and Current Situation

Parvin Khatun
Asst. Professor, Dept. of Political Science
Banipur Mahila Mahavidyalaya

Abstract: India followed a democratic secular system. Pakistan established a Muslim state and aimed to build up its political foundations on the basis of Islam. The following major issues and problems determined the nature of Indo-Pak relations; migration and problem of the Kashmir issue, Indus Water Treaty 1960 or Sharing of River Waters, Boundary Dispute, issues of Integration of Indian Princely States, bus journey by Vajpayee, India-Pak War of 1947-48, India-Pak War of 1965, India-Pakistan War of 1971, Indian Bombardment continue in Kargil Area (May 28, 1999), Terrorist attacks etc. shows a comprehensive view on India Pakistan relations.

Keywords: Kashmir Issue,Indo-Pak Relations, Integration, Indus Water Treaty 1960, the cross-border terrorism etc.

Introduction:

India and Pakistan, two neighbouring countries in South Asia, sharing linguistic culture and economic tie despite share conflict and tense relationship. The relations between India and Pakistan began with conflicts. India's policy towards neighbouring countries has always been that of friendship and regional cooperation. However, response from different countries has varied. Pakistan came into being on August 14, 1947 as a result of the fulfilment of the demand of the All-India Muslim League as a homeland for Muslims. It came into being because Britain wanted to create this state before leaving the Indian subcontinent. Mr. Mohammad All Jinnah, the President of the Muslim League, decided to give a practical shape to this theoretical demand taking full advantage of the British policy of 'Divide and Rule'. It had a beginning in the form of the demand for separate electorate and which was conceded by the British Government. The partition of the country and the problem arising in its wake embittered relations between India and Pakistan. A number of factors have been identified as the causes of the India-Pakistan conflict, including (a) the canal water dispute, (b) the Kashmir issue, and (c) Pakistan's association with Western military alliances.

The 1947 partition of British India created a Muslim-majority Pakistan and a Secular, Hindu-majority India, which led to the current war between India and Pakistan. The India Independence Act gave Jammu and Kashmir's various

regions the freedom to decide which nation to join.The native maharaja, or king of Kashmir, first pursued independence since the conquering powers had ignored the region for ages. In the end, though, he consented to join India in return for assistance against the invading herdsmen from Pakistan. After that, India assumed responsibility for the area's defence and started the 1947–1948 Indo-Pakistani War. Fighting continued through the second half of 1948. The war officially ended on 1 January 1949, when the United Nations (UN) arranged a ceasefire, with an established ceasefire line, a UN peacekeeping force and the recommendation that a referendum on the accession of Jammu & Kashmir to India be held.

In 1954, the accession of Jammu and Kashmir to India is ratified by the state's constituent assembly. In1957, the Jammu and Kashmir constituent assembly approves a constitution. India, from the point of the 1954 ratification and 1957 constitution, begins to refer to Jammu and Kashmir as an integral part of the Indian union.

Mr. Eugene Blake, president of the World Bank, agreed to mediate between India and Pakistan on the sharing of waters in 1951. An agreement on sharing of canal waters was eventually concluded on September 19, 1960. It was signed at Rawalpindi by Nehru and president Ayyub Khan on Pakistan. It was provided in the agreement that after and interim period of 10 years which could be extended for another 3 years on the request of Pakistan. The treaty gave India the full right to utilise the waters of 3 rivers Sutlej, Beas and Ravi and accepted the right of Pakistan to use the water of Jhelum, Chenab and Indus. The treaty also provided for the establishment of Indus commission. The canal water dispute was as such amicably resolved and the Indus Treaty now stands fully implemented On April 9, 1965, following the Kutch dispute, Pakistan sent organized groups of infiltrators across the ceasefire line, and later mounted large-scale attack in the Chhamb-Jaurian Sector area, violating the international border, thereby threatening the communication line between Kashmir and the rest of India. Indian troops went into action and foiled the Pakistani designs.

The dispute was resolved through the efforts of the Soviet Union which arranged a meeting between the leaders of the two countries at Tashkent. After a virtual breakdown of the Tashkent talks on the night of 9 January,1966, the Prime Minister of India, Shri Lai Bahadur Shastri, and the President of Pakistan Mr. Ayub Khan, reached an agreement on 10 January, 1966, reaffirming their obligations under the United Nations Charter not to have recourse to force but to settle their disputes through peaceful means, without prejudice to their basic positions on Kashmir.

After the Tashkent Declaration the relations between the two countries showed asifiin of improvement. After this some procedural agreement was signed on August 1,1966 in the consideration of Farakka barrage dispute.

East Pakistan (now Bangladesh) became the reason for the third war between India and Pakistan. The conflict between East and West Pakistan begins when the West Pakistani government refused to hand over power Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman, an East Pakistan-based Bengali whose party won the majority of seats in the 1970 parliamentary elections, to assume the premiership of the country. The Pakistani military cracked down on protestors in the Dhaka March in 1971 in which students and teachers were killed in large numbers. India became involved in the conflict in 4^{th} December, after the Pakistani Air Force launched a pre-emptive strike on airfields in India's northwest. India retaliated with a coordinated land, air and sea assault on East Pakistan. It compelled the Pakistani Army to surrender at Dhaka and more than 90,000 Pakistani soldiers were taken prisoners of war.East Pakistan becomes an independent country, Bangladesh, on 6 December 1971.

Throughout the entirety of the war, China strongly criticised India for its involvement in the Bangladeshi Liberation Movement, and accused India of having soft imperialistic designs for South Asia. Prior to the official beginning of the war, China provided the Pakistani leadership with advice, particularly in finding a peaceful resolution with the rebel leaders so that Indian involvement did not reach the level of engagement of a direct war - a difficult war that China advised Pakistan could not win while fighting on multiple fronts. When the war officially started, China disagreed with Pakistani president Yahya Khan's stubborn military approach, but continued to criticize India's supra-national tendencies nonetheless. Furthermore, once the war began, US President Richard Nixon encouraged China to mobilise its military forces across its border with India to increase pressure on the Indian leadership. However, China did not respond to this encouragement as it did not want to formally enter any military confrontation, whilst also being wary of the strength of Indian forces on China's border.

In July 1972, the Indian Prime Minister Indira Gandhi and her Pakistani counterpart Prime Minister Zulifiqar Ali Bhutto signed an agreement in the Indian town of Simla, in which both countries agreed to "put an end to the conflict and confrontation that have hitherto marred bilateral relations and work for the promotion of a friendly and harmonious relationship and the establishment of a durable peace in the subcontinent". Both sides agreed to settle any disputes "by peaceful means through bilateral negotiations". The Simla Agreement designated the ceasefire line of 17 December 1971 as being the new

"Line of Control (LoC)" between the two countries, which neither side was to seek to alter unilaterally, and which "shall be respected by both sides without prejudice to the recognised position of either side". The Simla Agreement was ratified by the Parliaments of both India and Pakistan in 1972.

On 1974, The Kashmiri state government affirms that the state “is a constituent unit of the Union of India”. Pakistan rejects the accord with the Indian government.On May 18, India detonates a nuclear device at Pokhran, in an operation codenamed “Smiling Buddha”. India refers to the device as a “peaceful nuclear explosive”.

On 1988, the two countries sign an agreement that neither side will attack the other’s nuclear installations or facilities. These include “nuclear power and research reactors, fuel fabrication, uranium enrichment, isotopes separation and reprocessing facilities as well as any other installations with fresh or irradiated nuclear fuel and materials in any form and establishments storing significant quantities of radio-active materials”. Both sides agree to share information on the latitudes and longitudes of all nuclear installations.This agreement is later ratified, and the two countries share information on January 1 each year since then.

The decade of the 1990s was difficult: Pakistan’s intransigence and support for militancy in Kashmir remained unabated. The government of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee took several bold steps to engage Pakistan with a view to change its hostile behaviour. On 1991, the two countries sign agreements on providing advance notification of military exercises, manoeuvres and troop movements, as well as on preventing airspace violations and establishing overflight rules.

On 1998 India detonated five nuclear devices at Pokhran. Pakistan responded by detonating six nuclear devices of its own in the Chaghai Hills. The tests resulted in international sanctions being placed on both countries. Both countries became the newest Nuclear-armed nations.

The goal of the agreement, which was signed on December 21, 1988, by Prime Ministers Rajiv Gandhi of India and Benazir Bhutto of Pakistan, was to lessen the fear of nuclear attacks on each other’s installations.In an agreement, both countries pledged never to target the nuclear installations of another country. In this way, it created a secure atmosphere and lessened the fear of any surprise attack.

On 1999, Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee travelled by bus to Lahore (newly opened Delhi–Lahore Bus service) to meet Prime Minister Nawaz Sharif. The two signed the Lahore Declaration, the first major agreement between the two countries since the 1972 Simla Agreement. Both countries

reiterated that they remained committed to the Simla Agreement, and agreed to undertake a number of Confidence Building Measures (CBMs) aimed at improving bilateral relations. In 1999, shortly after the signing of the Lahore Declaration, India and Pakistan fought the Kargil War. In the winter of 1999, infiltrators of Pakistan army surreptitiously occupied about 132 high altitude vantage points in the Kargil region of India overlooking National Highway-1, which links Srinagar with Leh. This brought the highway under range of their artillery fire. India found out of the intrusion on 3 May 1999. 'Operation Vijay' saw a mobilization of around 2 lakh Indian troops. Fighting was carried out in very difficult terrain and extremely harsh weather conditions. Indian air force carried out its operations at very high altitudes without crossing the LOC. After two months of conflict, Indian troops had slowly retaken some 70 to 80 per cent of the ridges that were encroached upon by the infiltrators. The international community held Pakistan responsible for the crisis. The then Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif sought American help to deescalate the conflict.

On 13 December, 2001 an armed attack on the Indian parliament in New Delhi left 14 people dead. LeT and JeM were held responsible for the attacks. India decided to militarily confront Pakistan. It launched its biggest military mobilization, 'Operation Parikarma', since the Kargil conflict and stopped or drastically reduced all contacts with Pakistan. These measures put together came to be described as 'coercive diplomacy'. It is noted that time and again, United States put restraint on both the countries so as not let the situation deteriorate. International diplomatic mediation resulted in October 2002 in the withdrawal of Indian and Pakistani troops from the international border.

Prime Minister Vajpayee was a statesman. He had faith in peace and friendship with Pakistan. He once more extended the hand of friendship while addressing a rally in Srinagar on 18 April 2003; ten days later, Pakistan responded positively. There were immediate developments: full diplomatic relations were restored; bus journey restarted; there were lots of movement of parliamentarians, businessmen and others under Track-II; and release of fishermen and prisoners. This time around, there was the perceptible desire of the people of both India and Pakistan to turn a new chapter in their relations.

On 2004, Prime Minister Vajpayee and President Musharraf held direct talks at the 12th South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) summit in Islamabad in January, and the two countries' Foreign Secretaries met later in the year. The year marked the beginning of the Composite Dialogue Process, in which bilateral meetings were held between officials at various levels of government (including Foreign Ministers, Foreign Secretaries, military officers, border security officials, anti-narcotics officials and nuclear experts).

President Musharaff visited New Delhi from 16 to 18 April 2005. A lot of progress had been made in terms of people-to-people contacts; easing of visa and travel; road, rail and air links; the proposed gas pipelines – one from Iran (IPI) and another from Turkmenistan via Afghanistan and Pakistan (TAPI); confidence building measures in both the conventional and nuclear areas etc. President Musharraf and Prime Minister Singh also discussed Kashmir issue. Indian Prime Minister Manmohan Singh also took keen interest in normalization of relations with Pakistan. In September, Pakistani president Asif Ali Zardari and Indian Prime minister Manmohan Singh formally announced the opening of several trade routes between the both countries.

After that, on 26 November, 2008 in one of the most gruesome Terrorist attacks the world has witnessed, armed gunmen opened fire on civilians at several sites in Mumbai, India. The attacked places were the Taj Mahal Palace & Tower, the Oberoi Trident Hotel, the Chhatrapati Shivaji Train Terminus, Leopold Cafe, Cama Hospital, Nariman House Jewish Community Centre, Metro Cinema, St Xavier's College and a lane near the Times of India office. More than 160 people were killed in the attacks. An almost three-day siege of the Taj, where gunmen remained holed up until all but one of them were killed in an Indian security forces operation, accounted for the bulk of the casualties.

In January, 2011 Indian Home Secretary GK Pillai says India will share information with Pakistan regarding the 2001 Samjhauta Express bombing. The two countries' foreign secretaries meet in Thimpu, Bhutan, in February, and agree to resume peace talks "on all issues".

In 2014, there were expectations that Modi's government will pursue serious peace talks with Pakistan after the then-newly elected Indian prime minister, Modi, invited Nawaz Sharif, the prime minister of Pakistan, to his inauguration in 2014. The new government also announced its 'Nieghbourhood First' policy in all earnestness. Prime Minister Modi made an unannounced 2-hour stopover in Lahore on his return journey from Afghanistan and Russia on 24 December 2015. After a brief moment of hope, though, things soured again in August same year, when India called off talks with Pakistan's foreign minister following a meeting between the Pakistani high commissioner in India and leaders of the Kashmiri separatist movement.On 27 May, Indian Prime Minister Narendra Modi held talks with Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif in New Delhi. Both sides expressed willingness to begin a new era of bilateral relations.

On 2 January 2016 by a heavily armed group which attacked the Pathankot Air Force Station, part of the Western Air Command of the Indian Air Force. The attackers belonged to Jaish-e-Mohammed (JeM) an Islamist militant group designated a terrorist organization by India, the US, the UK and the UN.

The attack led to a breakdown in India-Pakistan relations. On 18 September 2016, there took place the deadliest terrorist attack on the security forces in two decades when JeM terrorists attacked the Indian military camp in Uri in Kashmir, resulting in the death of 19 Indian army soldiers.

Since 2016, the ongoing confrontation and the continued terrorist attacks have resulted in the collapse of bilateral relations. on 14thFebruary, 2019 an attack on a convoy of Indian paramilitary forces in Pulwama which resulted in the death of 40 Indian paramilitary troops. On 26 February 2019, Indian Air Force warplanes crossed the LOC and destroyed the terrorist camps in Balakot in Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. It was a pre-emptive strike on a terrorist training camp and resulted into the deaths of a large number of terrorists who were planning to carry out terrorist activities in India. Tension increased as Pakistani air force sought to target Indian positions in retaliation. Following the 2019 Pulwama attack, the Indian government revoked Pakistan's most favoured nation trade status.On 2019, Kartarpur Corridor Agreement between India and Pakistan for the facilitation of pilgrims to visit Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur, Pakistan, was signed in 2019 in order to fulfil the long-standing demand of the pilgrims to have easy and smooth access to the holy Gurudwara.

In May 2023, Shanghai Cooperation Organization summit in India, missing an opportunity to strengthen ties, the foreign ministers of India and Pakistan hurled jabs about Kashmir. In addition, the recent military's actions against Imran Khan, and the ongoing struggle for power, have sparked worries that political unrest in Pakistan could strengthen the claims made by Indian hardliners and obstruct peace efforts.

Conclusion:

Conflicts like that of India-Pakistan are intractable in the short term. Economic and trade relations with Pakistan are minimal. Political relations remain full of tension and uncertainties; multiple efforts to reach out to Pakistan for peace and understanding have not yielded positive results. Developments in Pakistan are of security concerns to India. Cross-border terrorism has become a major threat over the past many decades; and there are no signs of its abatement. Lots of political, diplomatic and military energy and attention goes into dealing with Pakistan. Issues are getting entwined. Since 2016, there is an effort to expose and isolate Pakistan in the international community and make the international community exert pressure on Pakistan to change its behaviour.

References:

1. Bindra, S.S.(1981). Indo-Pak relations. New Delhi. Deep and Deep. pp.19-24.
2. The Hindustan Times. (1954, Feb. 7).

3. John, Shaji and Joseph, Simi.(2023). India and Pakistan Relations with Special Reference to Kashmir.IJCRT | Volume.11. Issue 3. P.53.
4. Gupta, H.R. (1968). India Pakistan War 1965.New Delhi.Hariyana Prakashan. p.226-227.
5. The Hindustan Times. 11 Jan.1966.
6. Asian Recorder. 9-15 April, 1966. p.7018-19.
7. Singh, Swaran. (ed.) (2007). China-Pakistan Strategic Cooperation: Indian perspectives. New Delhi: Manohar. p. 61.
8. Sareen, Sushant. 2023, The nuclear factor in the India–Pakistan relationship, Observer Research Foundation. Website link- The nuclear factor in the India–Pakistan relationship.
9. Malik, V.P. (2009). Kargil War: Reflection on the Tenth Anniversary. Strategic Analysis. CLAWS Journal. vol.33. no.3. https://archive.claws.in/images/journals_doc/1400824315V%20P%20Malik%20%20CJ%20SSummer%202009.pdf.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-